উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা

[প্রথম খণ্ড]

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সূচীপত্র

অপ্রধান লেখকবৃন্দ : খোন্দকার শামসুদ্দীন সিদ্দিকী ৩৭৩, মুনশী আজিমুদ্দী ৩৭৫, মুনশী নামদার ৩৭৬, গোলাম হোসেন ৩৭৬, শেখ আজিমদ্দী ৩৭৭, আয়েন আলী শিকদার ৩৭৮, মোহাম্মদ ইসমাইল ৩৭৮, মীর আশরাফ আলী ৩৭৯, সৈয়দ আবদুল রহিম ৩৮০, মুনশী মোহাম্মদী ৩৮১, মোহাম্মদ আবদুল করিম ৩৮১, মোহাম্মদ আবেদিন ৩৮৩, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ৩৮৩, শেখ আবদুল লতিফ ৩৮৫, কাজিম উদ্দীন আলী খান ৩৮৬, কাদের আলী ৩৮৬, মোহাম্মদ আবদুল কাদের ৩৮৭, জহিরুদ্দীন আহমদ ৩৮৭, আবদুল আলা ৩৮৯, সলিমুদ্দীন আহমদ ৩৯০, আবদুল গণি ৩৯০, আজিজুন নেসা খাতুন ৩৯০, ফজলর রহমান ৩৯১, মোহাম্মদ আব্বাস আলী ৩৯১, সৈয়দ আবদুল আগফর ৩৯২, হাফেজ নিয়ামতুল্লা ৩৯৪, মোহাম্মদ এহসানউল্লা ৩৯৪, দৌলত আহমদ ৩৯৫, আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী ৩৯৭, মকবুল আলী ৩৯৭, মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ ৪০০, গোলাম কিবরিয়া ৪০২, চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী ৪০৩, একিনুদ্দীন আহমদ ৪০৩, আবিদ আলী খান ৪০৪, আলাউদ্দীন আহমদ ৪০৫, তজর্মুল আলী ৪০৬, মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ ৪০৭, মোহাম্মদ ইয়াকুব ৪০৭, মোসলেম উদ্দীন খান ৪০৮, সৈয়দ আবদুল গাফ্‌ফার আলকাদরী ৪১০, শেখ জোহাদ রহিম ৪১০, মোসারত আলী খান ৪১০, মোহাম্মদ কফিলুদ্দীন আহমদ ৪১১, মোহাম্মদ কাজেম আলী ৪১১, আবদুল করিম ৪১২, মোহাম্মদ রহিম বক্স ৪১৪, কাজী নওয়াব উদ্দীন আহমদ ৪১৫, সমিন উদ্দীন আহমদ ৪১৫, মানিক উদ্দীন আহমদ ৪১৬, মোল্লা খোদাদাত ৪১৭, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ৪১৭, ওহাজুদ্দীন আহমদ ৪২০, শেখ সাজ্জাদ করিম ৪২১, বদরুদ্দোজা চৌধুরী ৪২১, মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল ৪২১, আবদুর রশিদ খান ৪২২, মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ৪২৩ময়েজউদ্দীন আহমদ ৪২৪, আফতাব উদ্দীন আহমদ ৪২৬, দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ ৪২৬, সমিররুদ্দীন আহমদ ৪২৭, শাহ আবদুল্লা ৪২৮, দীন মোহাম্মদ ৪২৯, আবদুল বারি ৪২৯, আবদুর রহমান ৪২৯, সৈয়দ আবুল হোসেন ৪৩০, খোন্দকার গোলাম আহমদ ৪৩১।

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

বাঙালী মুসলমান

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর থেকে এদেশে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। মাঝখানে রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬) বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি-নাজিম। বাংলাদেশ বিজিত হওয়ার অনেক আগে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরবীয় মুসলমানদের আগমন ঘটে। ক্রমে তাঁরা ভারতের অধীশ্বর হন। মামলুক, খিলজী, ঘোরী, বলবন, শূর, মোঘল বংশের নৃপতিগণ রাজত্ব করেন। মোঘল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮–১৭০৭) মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পঞ্চাশ বছর পর ইংরাজগণ প্রথমে বাংলা এবং প্রায় এক শত বছরের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ দখল করে ভারতে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুসলমানদের ভারত বিজয় থেকে ইংরাজদের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালকে ভারতের মধ্যযুগ ধরা হয়। কমবেশী এ সময়ের ব্যবধানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩৩) আরব ভূমিতে সাত শতকের প্রথমার্ধে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন।[১] নতুন ধর্মাদর্শে উদ্দীপিত আরবেরা সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারেও তৎপর হয়। ভারতের পশ্চিম ও পূর্বের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে প্রথমে আরব-বণিকেরা বাণিজ্যতরী নোঙর করেন। এক কালে তাঁরাই ভূমধ্য সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর

---

১. চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে (৬১০ খ্রীঃ) হজরত মহম্মদ 'নবুয়ত' বা ওহি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে আরবে ইসলামের পত্তন ও প্রচার শুরু হয়।

নিয়ন্ত্রণ করতেন। বাংলায় তুর্কীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের আগেই সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রামে আরব-বণিকদের আগমন ঘটে। পাহাড়পুরের ভগ্নাবশেষ থেকে বাদশাহ হারুনর রশীদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, অষ্টম শতকের এই মুদ্রা আরব-বাণিজ্যের ব্যবসায়িক লেনদেনের ফল। বণিকদের জাহাজে চড়ে আরব-ইরানের ধর্মপ্রচারক ওলি-আউলিয়া, পীর-দরবেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন, তা আজ নানা ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুফী দরবেশগণ অনেকে আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ, মসজিদ নির্মাণ করে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেছিলেন, তারও প্রামাণিক নিদর্শন আছে। চট্টগ্রাম শহরে একটি ক্ষুদ্র 'আরব কলোনী'র অস্তিত্বের কথা অনেকে স্বীকার করেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারশীল; পীর-আউলিয়া-দরবেশ ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন, কেননা ধর্ম প্রচারকে তাঁরা পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। ইসলাম ধর্মনীতি ও মুসলমান সমাজব্যবস্থায় এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যা সে যুগের মানুষকে চমকিত করেছিল। ভারতের হিন্দু ধর্মনীতিতে ও সামাজিক আচরণ-বিধিতে কতক বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করা হত, বিশেষ করে, বর্ণভেদ প্রথা, দাসপ্রথা, অস্পৃশ্যপ্রথার কারণে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না।[১] মূল ইসলামে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যপ্রথার স্থান নেই, বরং তা নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমর্থন করে। ইসলামের প্রথম গৌরব-উজ্জ্বল যুগের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পীর-দরবেশগণ মানবসেবায় ও পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে থেকে তাদের প্রতি দয়াধর্ম প্রদর্শন করতেন। তাঁরা অনেকে আধ্যাত্মিক মহিমা ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের ধর্ম, কর্ম ও চরিত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছে আসতো এবং ক্রমে ভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হত। একটি বিদেশী রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনে ধর্ম-

---

১. বৈদিক যুগে বর্ণভেদের বাড়াবাড়ি ছিল না। পৌরাণিক যুগে বর্ণভেদের উপর কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। 'মনুসংহিতা'য় শূদ্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবজ্ঞা, এমন কি যুদ্ধ করার কথা বহু জাগায় উল্লিখিত হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' আছে যে, প্রভু অবাধ্য দাসশূদ্রকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারেন। নিম্ন বর্ণের লোকের এবং বৌদ্ধ শ্রমণের দর্শনে, স্পর্শে পাপ—একথা প্রচার করা হত।
গোপাল হালদার—সংস্কৃতির রূপান্তর, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৭৩-৭৫।

প্রচারকগণ কখন বলপ্রয়োগ করতে পারেন না, সাধারণ দয়াধর্ম, হৃদয়ধর্ম ও মানবধর্মের আবেদনকে তাঁরা মোক্ষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। গ্রাম-বন্দর ছাড়া রাজদরবারেও দরবেশগণের প্রভাব পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'সেক শুভোদয়া' বর্ণিত লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর কথা স্মরণ করা যায়। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র এটি রচনা করেন। শেখ জালালউদ্দীন আধ্যাত্মিকশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তিনি বহু জনপদকে নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।[১] কেবল বণিক ও পীর-দরবেশ নয়, বেতনভোগী তুর্কীসেনারও আগমন এবং আবাস স্থাপনের প্রমাণ আছে। গোবিন্দপাল (১১৫৫-৬২) 'তুরস্কদণ্ড' নামে একটি রাজকরের প্রবর্তন করেন। এটি বহিরাগত তুরস্কদের উপর ধার্য করা হয়। তুর্কীরা অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ ও সাহসী ছিল। তারা স্থানীয় রাজা বা ভৌমিকদের অধীনে বেতনভোগী সৈন্যরূপে কাজ করত।[২] ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী বিজয়ের ফলে বাংলাদেশে পীর-দরবেশদের যেমন সংখ্যা বাড়ে, তেমনি ধর্মান্তরীকরণও ত্বরান্বিত হয়। তখন উচ্চ পদ, ব্যবসায়ে সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোভ ও লাভের প্রশ্ন দেখা দেয়। কোথাও কোথাও তরবারির ভয়ও উপস্থিত হয়েছিল। ধর্মপ্রচারে সুলতান জালালউদ্দীন (১৪১৮-৩২) এবং সোলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় (১৫৬৫-৮৩) তরবারি প্রয়োগ করেছিলেন।[৩] এদিকে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মচারী, ব্যবসাদার, শিক্ষাবিদ ও আরও অনেক ভাগ্যান্বেষীর দল এসেছিলেন। কেন্দ্রের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে অনেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের পূর্বপ্রান্ত বাংলায় আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দিল্লীতে অনেকবার রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে। শেষের দিকে মারাঠা, অমেঠি, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আব্দালির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লীর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত

---

১. Sukumar Sen, Doctor (edited)—*Sekasubhodaya,* The Asiatic Society, Calcutta, 1962

২. সুশীলা মণ্ডল, ডক্টর—বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: প্রথম পর্ব), প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ: ৩৪ (পরিশিষ্ট)।

৩. কালাপাহাড় বাংলার স্বাধীন সুলতান সোলায়মান কররানির (১৫৬৫-৭২) সেনাপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে দখল করেন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল রাজু। গণেশ পুত্র সুলতান জালালউদ্দীনের পূর্বনাম ছিল যদু। জালালউদ্দীন ও কালাপাহাড় উভয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন।
Jadunath Sarkar (edited)—*History of Bengal.* Vol. II, University of Dacca, Dacca, 1972, PP. 183-84, 202 (2nd ed.).

হয়। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে লোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। এঁদের একটি স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। পরে শান্তি স্থাপিত হলেও তাঁদের অনেকেই আর ফিরে যাননি। তাঁরা বসতি গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় নারী-পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিকসূত্রে জাত মিশ্র রক্ত-ধারার মানুষ—এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালী মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মধ্যযুগে লোকগণনার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং কোন শ্রেণীর মুসলমান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আর নির্ণয় করার উপায় নেই। মুসলমান আমলে এদেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেসব ইতিহাসে প্রধানত: রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা প্রায়ই স্থান পায়নি। ব্রিটিশের শাসন-আমলে ইংরাজ রাজকর্মচারী এবং পণ্ডিতগণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে প্রথম 'আদম শুমারী' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়, ১৮৯১ সালে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে লোকগণনা রীতি চলতে থাকে। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মূল বাংলার ৩,৫৭,৬৯,৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৬০৯,১৩৫ এবং হিন্দুর সংখ্যা ১৮,২০০,৪৩৮। বাকি অন্য সম্প্রদায়ের লোক। শতকরা হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%।[১] ১৮৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৩৫.৬০৭,৬২৮ জনের মধ্যে মুসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ (৫০.১৬%) ও হিন্দু ১৬,৩৭০,৯৬৬ (৪৮.৪৫%)।[২] আগের রিপোর্টে প্রায় ছয় লক্ষ মুসলমান কম ছিল, পরের রিপোর্টে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ বেশী হয়েছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও অধিক দেখা যায়।[৩]

---

১. *Report on the Sensus of Bengal,* 1872, Calcutta, 1872, PP. XXXII-XXXIII (General statement IB).

২. *Report on the Sensus of Bengal,* 1881, Calcutta, 1883, P. 74.

৩. *Report on the Sensus of Bengal,* Vol. III, 1891, P. 147.

বাংলার মুসলমানের কুল-পরিচয় এবং সেই সঙ্গে সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন বর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার কারণে মুসলমান পীর-দরবেশগণ নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের সহজে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছেন। আরব, পারস্য, আফগানিস্তান থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর বসতি স্থাপনের ফলে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।[১] বাংলার মুসলমানের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে তাঁরা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গ্রিয়ার্সন, হান্টার, ডাল্টন, উইলিয়ম ক্রুক, জেমস ওয়াইজ, হার্বার্ট রিজলি, জেমস লঙ প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁরা বাংলাদেশের জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা-সমাজ ও ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২]

মুসলমান পণ্ডিতগণের কেউ কেউ ইউরোপীয়দের এ-তত্ত্ব মানতে চাননি। তাঁরা এটাকে মুসলমানের পক্ষে অবমাননাকর এবং অন্যের চক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছেন। মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ তোলেন। তিনি বাংলার মুসলমান আমলের নবাব-সুলতানদের ধারাবাহিক ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, মুসলমানদের নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক।[৩]

---

১. Shila Sen—*Muslim Politics in Bengal* (1937-1947), New Delhi, 1976, P. 3.

২. Grierson—*Linguistic Survey of India* (5 Vols.)
Hunter—*Annals of Rural Bengal* (*1868*), *The Indian Mussalmans* (1871)
Dulton—*Descriptive Ethnology of Bengal* (1872)
Wise—*The Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal* (1883)
Crooke—The popular Religion aud Folklore of Northern India (1893)

৩. Khondker Fuzli Rubbee—*The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895
খোন্দকার ফজলে রাব্বির যুক্তিগুলি ছিল এরূপ :—(১) বাংলা বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল। (২) মুসলমান শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীদের আহ্বান করেছেন; সৈয়দ, মোঘল, পাঠানদের চাকুরী দিয়েছেন, শিক্ষিত, ধার্মিক, নিঃস্ব ব্যক্তিদের করমুক্ত ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার জন্য। গিয়াসউদ্দীন (১২১৪-২৭), নাসিরুদ্দীন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫২১) সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আসতে এবং বসতি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

খোন্দকার ফজলে রাব্বির বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে ঠিকই, তবে বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশাগত বনেদী মুসলমানদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এটি মেনে নেওয়া যায় না। মুহম্মদ আবদুর রহিম তুর্কী ও মোঘল আমলে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলে উল্লেখ করেছেন।[১] ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে কোরান নিয়ে মুসলমানরা ধর্ম প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না এজন্য যে, এদেশে ইসলাম প্রচারে শাসক শ্রেণী অপেক্ষা সাধক শ্রেণীর ভূমিকা অধিক ছিল। সাধু-দরবেশগণই ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের হাতে কোরান ছিল বটে, কিন্তু তরবারি ছিল না। বাংলার পীর-দরবেশগণ সুফীমতের ধারক ছিলেন। সুফীরা উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশে শত শত দরগাহ, খানকাহ, মাজার, মসজিদ আছে যেগুলি শহর-বন্দর অপেক্ষা গ্রামে-গঞ্জে বেশী ছড়িয়ে আছে। পীর-দরবেশগণ লোকালয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংসর্গে থাকতেন; তাঁদের সৈন্য-সামন্ত বা দেহরক্ষী ছিল না, তাঁরা উচ্চ বিত্তেরও মালিক ছিলেন না; তাঁরা অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। কেউ কেউ সরকারের দেওয়া নিষ্কর ভূমি তথা পীরোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করতেন সত্য, তবে বেশীর ভাগ সাধু-সন্ত ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত 'দর্শনি'র উপর নির্ভর করে চলতেন। তাঁরা বলপ্রয়োগ করলে গ্রামাঞ্চলে টিকতে পারতেন না। শাসকদের হাতে তরবারি ছিল; শাসক শ্রেণী থাকতেন সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে। মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসনের ধারায় রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল আনুগত্য স্বীকার ও রাজস্ব প্রদানের সম্পর্ক। বাংলার পাঠান সুলতানগণ ছিলেন বিদ্রোহ-প্রবণ। তাঁরা সামান্য

---

(৩) বাংলার শাসকগণের সৈন্যবাহিনী বাইরের মুসলমান দ্বারা গঠিত; তাদের অধিকাংশ এদেশে থেকে গেছে। (৪) উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তত্যাগী ও পলাতকদের আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ; বিশেষ করে, স্বাধীন সুলতানদের দু'শো বছর রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশ্রয় অনেক ছিল। ঘোরী বংশের পতনের কালে এবং মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের রাজত্বকালেও অনেক ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন। (৫) অনেক ব্যক্তি বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে।

১. Muhammad Abdur Rahim—*Social and Cultural History of Bengal.* (Vol. I, 1200-1576), Vol. II, 1576-1757), Karachi, 1961.

সুযোগে দিল্লীর কেন্দ্র-শক্তির বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পাঠান সুলতানগণ প্রায় দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৭৬) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন। দিল্লীর রক্তচক্ষু, আভ্যন্তরীণ বিপ্লব, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদির আশঙ্কা নিয়ে সুলতানেরা প্রজাগণের উপর 'চণ্ডনীতি' পোষণ করতে পারেন না। এদিকে কি কেন্দ্রের, কি প্রদেশের শাসক গোষ্ঠীর নীতি ছিল 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র নীতি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। ভারতের ইতিহাসে মুসলমানে-মুসলমানেও কম বিপ্লব, বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ হয়নি। মধ্যযুগে দিল্লীর মত বাংলার ইতিহাস ছিল রাজপ্রাসাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস; এক বংশ থেকে আর এক বংশের দ্বন্দ্ব, এমন কি, একই বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ অনবরত লেগেছিল। গণচেতনা বলে তখন কোন কিছু ছিল না। যে সেনাবাহিনীকে সংগ্রামের শক্তিরূপে ব্যবহার করা হত, তা ছিল সম্পূর্ণ ভাড়াটে, তাদের সংগ্রামের প্রেরণার মূলে দেশপ্রেম ছিল না। রাজার সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব ছিল, রাজার সঙ্গে প্রজার দ্বন্দ্ব ছিল না। রাজতন্ত্রের সঙ্গে পীরতন্ত্রের সম্পর্ক কখন ভাল ছিল, কখন মন্দ ছিল। আধ্যাত্মিক নেতা নূর কুতবে আলমের আমন্ত্রণক্রমে জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করে রাজা গণেশকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন, তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে জালালউদ্দীন নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন (১৪১৮)। সুলতান ফখরুউদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫২) রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সইদা নামে একজন সুফী ফকির এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আবার তাঁরই আমলে সুফীরা রাজার ফরমান অনুযায়ী বিনা 'পারানি'তে খেয়া পার হতেন এবং স্থানান্তরে গেলে 'অর্ধ দিনার' উপহার পেতেন।[১] খোন্দকার ফজলে রাব্বি লাখেরাজ রায়তিস্বত্ব বা নিষ্কর ভূমির ভোগস্বত্বের যে ২৭টি দানের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে 'মদদ-ই মাশ', 'আয়মা', 'নাযুরাত' ও 'পীরান' এই ৪টি মুসলমান ধর্মীয় নেতা, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং সৈয়দ ও উচ্চ বংশজাত অভিজাত শ্রেণীকে দেওয়া হত। 'খানকাহ', 'নজরি দরগাহ', 'জমিন-ই-মসজিদ', 'নজরি হজরত' নামের আরও ৪টি দান যথাক্রমে খানকাহ, দরগাহ, মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য দেওয়া হত।[২] ধর্মপ্রচারে ও ধর্মকার্য সম্পাদনের জন্য পীর-মুর্শিদগণ শাসকের কাছ থেকে এসব সুবিধা ভোগ করলেও

১. Mehdi Husain, Doctor (edited)--*The Rehla of Ibn Battuta,* Oriental Institute, Baroda, 1953.

২. *The Origin of the Musalmans of Bengal.* P. 69-70

ইউরোপের যাজকতন্ত্রের মত পীরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র কোন সুগঠিত সঙ্ঘ শ্রেণী-ভুক্ত ছিল না। এগুলি অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ও উদ্যোগ ছিল। খ্রীস্টান জগতে রাজতন্ত্রের সাথে যাজকতন্ত্রের যে রাজনৈতিক সম্পর্ক, মুসলিম বিশ্বের রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের মধ্যে ঐরূপ সম্পর্ক ছিল না। এমন কি, ভারত-বর্ষে প্রাচীন কালে হিন্দু রাজতন্ত্রের সাথে পুরোহিততন্ত্রের পরস্পর স্বার্থের একটা ঘনিষ্ঠ যোগসম্পর্ক ছিল। পীর-দরবেশগণ দরবারে সম্মান পেতেন, কিন্তু দরবারে স্থায়ী আসন পেতেন না। আকবর সলিম চিশতি নামক একজন আলেম-দর-বেশের ভক্ত ছিলেন, তিনি পীরের উদ্দেশ্যে ফতেপুর সিক্রিতে রাজপ্রাসাদের অতি সন্নিকটে বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন; তাঁর দরবারে সুফী-দরবেশদের নিয়ে 'সামা' নাচ-গানের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু এসব আকবর ব্যক্তিগতভাবে করেছিলেন, আওরঙ্গজেব এগুলি তুলে দেন। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক রাজ্য বিজয়ের পূর্বে, কি পরে তাঁরা নিজেরা তরবারি ধারণ করেননি, এমন কি কৃপাণ-ধারী শাসকশ্রেণীর ছত্রচ্ছায়াও তাঁরা সমভাবে ও অবিচ্ছিন্নভাবে পাননি।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক কেন এ প্রশ্নের মীমাংসা পুরোপুরি হয়নি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ ধর্মান্তরের কারণ হিসাবে হিন্দুর 'জাতিভেদ প্রথা'র উল্লেখ করেন; এইচ, ব্রেভালি ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ঢাকা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার তুলনায় রংপুর, দিনাজ-পুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের হার অনেক বেশী। এরূপ সংখ্যা-তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "This circumstances again seems to point out to the conclusion that the existence of Muhammadans in Bengal is not due so much to the introduction of Mughul blood into the country as to the conversion of the former inhabitants for whom a rigid system of caste discipline rendered Hinduism intolerable."[১]

এ প্রথা অবশ্য ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্বত্র ছিল। একজন আধুনিক গবেষক মনে করেছেন, বাংলার মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ 'দাসপ্রথা'।[২] ইবন বতুতা চট্টগ্রামে মানুষের কেনাবেচা দেখেছেন। তিনি নিজেই 'আশুরা'

---

১. *Report on the Sensus of Bengal*, 1872, P. 132.

২. Hossainur Rahman, Doctor—*Hindu-Muslim Relations in Bengal* (1905-1947), Nachiketa Publications Limited, Bombay, 1974, P. 1.

নামে একটি সুন্দরী দাস-বালিকা এক স্বর্ণ দিনার এবং 'লুলু' নামে একটি দাস-বালক দুই স্বর্ণ দিনারে ক্রয় করেছিলেন।[১] পর্তুগীজ দস্যুরা এদেশে দাস-ব্যবসায় পরিচালনা করত। নিম্নবর্ণের দুঃস্থ লোকেরা ও পাহাড়-পর্বতের আদিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কারণে এবং সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণেও স্ত্রী-পুত্রকন্যা বিক্রয় করত। যুদ্ধ বন্দীদেরও দাস রূপে বিক্রয় করা হত। ইসলামে দাসপ্রথার স্বীকৃতি আছে; তবে দাস-দাসীদিগের প্রতি আচরণ সম্পর্কে মুসলমানগণ অনেক উদার ছিলেন। "The Muslims treated the slaves humanely, in fact the slaves were allowed to marry and bring up families."[২] ক্রীতদাসগণ দিল্লী ও গৌড়ে কেবল উচ্চ রাজপদই পাননি, তাঁরা সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মামলুক বংশীয় সুলতানরা দাস ছিলেন। এই দাসপ্রথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। খোন্দকার ফজলে রাব্বি বলেছেন, মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় ঐ সমাজে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বেশী।[৩] এ যুক্তিও সব অঞ্চলের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হয়। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশ' বছর বাংলার বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীন ছিল। পাল রাজাদের অনেকে সুশাসক ছিলেন। পাল আমলে দেশীয় সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ ঘটেছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠে। বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের সম্মান পেয়েছিলেন। ঐ যুগের বিপুল সংখ্যক বাঙালী বৌদ্ধ কোথায় গেলেন? ১৮৭১ সালের সেন্সাসে বৌদ্ধ-জৈন মিলে মাত্র ৮৪,৯৪১ জন পাওয়া যায়। পালদের পর সেনরা একশ' বছর শাসন করেন। বৌদ্ধদের সহিত হিন্দুদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কলিকাতার বাজারে প্রকাশ্যে দাস বিক্রি হত। ক্যাথলিন ব্লেচিনডেন লিখেছেন, "The Picture of Slavery in Calcutta at the close of the Eighteenth century, horrible as it is, was no by means overdrawn, and the hide outs did not die out till nearby fifty years after that period." (*Calcutta Past and Present* 1905) ১৮৪৩ সালে পঞ্চম আইনে ভারতে দাসপ্রথা বেআইনী ঘোষিত হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস (৩ খণ্ড), পৃঃ ৩৬৪; বিনয় ঘোষ—বিদ্রোহী ডিরজিও, পৃঃ ২২; পার্থ চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃঃ ১২১।

১. *The Rehla of Ibn Battuta,*

২. *Hindu-Muslim Relations in Bengal* (1905-1947), P. 1.

৩. *he Origin of the Mussalmans of Bengal,* P. 121

সংস্কৃতির তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল।[১] সেন-বর্মণ যুগে বৌদ্ধ বিরোধিতার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছিল। বর্মণ-রাজ জাতবর্মার রাজত্বকালে 'বঙ্গালসৈন্য' সোমপুর বিহারের একাংশ অগ্নি সংযোগে বিনষ্ট করেছিল। ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' লেখেন। এটি ত্রয়োদশ শতকের রচনা। শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জন রুষ্মা'য় সদ্ধর্মীরা মুসলমানদের মুক্তিদূত রূপে দেখেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার উল্লাস আছে। তুর্কী আক্রমণের প্রথম আঘাত হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়ের উপর পড়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক নেপাল-তিব্বতে চলে গেছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষ না মুসলিম সংঘর্ষকালে তা সঠিক বলা যায় না। জাহ্নবী-কুমার চক্রবর্তী বলেন, "বঙ্গে যখন তুর্ক-আফগানের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রায় ভগ্নদশা। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর আশ্রয় করিয়া ছিলেন। সমাজে তাঁহারা ছিলেন অপাঙক্তেয়। নবাগত তুর্ক-আফগান বঙ্গ-বিহারের বহু সঙ্ঘারাম ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বৌদ্ধরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 'হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর'কে আশ্রয় করে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকার চেয়ে সাম্যবাদী ইসলাম গ্রহণ করে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন তাঁরা। বস্তুতঃ নব গঠিত মুসলমান সমাজে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' তারই স্বাক্ষর বহন করে। যেক্ষেত্রে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে জাতিচ্যুতকে জাতে তোলা কঠিন দায় ছিল, সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় দান অকল্পনীয় ছিল। বস্তুত হিন্দু সমাজে ধর্মান্তরীকরণের কোন রীতি বা বিধি ছিল না।

সেন্সাস রিপোর্টের জেলাভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বাংলার সব জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। কতকগুলি জেলায় তাদের সংখ্যা বেশ কম। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে হিন্দু এবং পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। পশ্চিমবঙ্গের ঐসব অঞ্চলে বর্ণহিন্দুর প্রভাব বেশী। বাংলাদেশে আর্যীকরণ সর্বত্র সমভাবে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির

১. বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: প্রথম পর্ব), পৃঃ ৬৯-৭০।

২. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ মত, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩বর্ষ, ১৯৭৫।

প্রভাব যত বেশী, পূর্ববঙ্গে তত নয়। নদীয়ার নবদ্বীপ, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুদৃঢ় কেন্দ্র ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের লোক অপেক্ষা নিম্নবর্ণের লোকে অধিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেন আমলে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ বেশী সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরা সামাজিকভাবে সচেতন ছিলেন, তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উন্নত ছিল। তাঁরা নিজ নিজ অস্তিত্ব ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে তাঁরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ঐসব জাগায় ইসলাম ধর্ম সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ফলকথা, ধর্মান্তরীকরণ পদ্ধতি মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যার প্রচারকযন্ত্র হিসাবে পীর-দরবেশ, অলি-আউলিয়াগণ গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরা যেখানে বাইরে থেকে শাসক শ্রেণীর ছত্রচ্ছায়া লাভ করেছিলেন আর ভেতর থেকেও বাধার সম্মুখীন হননি সেখানে তাঁদের সাফল্য অধিক। টমাস ওয়াকার আরনল্ড বলেন, "It is in Bengal, however, that the Muhammadan missionaries in India have achieved their greatest success as far as numbers are concerned... The long continuance of the Muhammadan rule would naturally assist the spread of Islam."[১] জনপ্রবাহের এই মূলধারার সাথে আরব-ইরান-তুরস্ক-খোরাসান-আফগানিস্তান থেকে আগত একটি উপধারা মিলিত হয়েছে। দুই ধারার মধ্যস্থলে আছে মিশ্ররক্তের প্রবাহ। এই তিন ধারার শতকরা হিসাব নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়।[২]

---

১. Thomas Waeker Arnold—*Preaching of Islam,* *Lahore,* 1896 P. 277.

২. ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ময়মনসিংহের আবু এ. গজনবীর প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত হয়। 'মুসলমান বিদেশী বংশোদ্ভূত'—এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুসলমানের বংশ-রক্ত-কুলগত পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বর্তমানে জেলার মুসলমানের মধ্যে মোটামুটিভাবে ২০% ভাগ বিদেশাগত বংশধর, ৫০% ভাগ মিশ্র রক্তের লোক এবং বাকী ৩০% ভাগ ধর্মান্তরিত অধিবাসী।
The census Report of India (1901) by E. A. Gait, Vol. VI, 1902, P. 261.
মুহম্মদ আবদুর রহিম প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানের ৩০% ভাগ বহিরাগত বংশধর, ৭০% ভাগ স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত। তাঁর মতে, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রথার কারণে দ্রুত বংশবৃদ্ধি দ্বারা বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা উক্ত ৩০% ভাগে দাঁড়ায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ অভিজাত ও নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর আছে।
Social and Cultural History of Bangal (Vol. 1 1200—1757), Dacca, 1961.

খোন্দকার ফজলে রাব্বি বখতিয়ার খিলজী (১২০৩) থেকে নাজিমউদ্দৌলা (১৭৭৪) পর্যন্ত মোট ৭৬ জন শাসকের তালিকা দিয়েছেন, এঁদের মধ্যে ১১ জন ঘোরী ও খিলজী বংশের দিল্লীর প্রতিনিধি, খিলজী, মামলুক ও শূর বংশের ২৬ জন নরপতি এবং বাকী ৩৪ জন ছিলেন মোঘল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত নবাব-নাজিম।[১] গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন ও আহমদ শাহ ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান। গণেশ, তোডরমল ও মানসিংহ ভারতীয়, বাকী সব বহিরাগত। শাসনকর্তার সাথে আমীর-ওমরাহ ও সৈন্য-সামন্ত থাকতেন। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য জায়গীরদার, জমিদার, সুবাদার, দেওয়ান, নায়েব ইত্যাদি কর্মচারী, সৈন্যবিভাগে ফৌজদার, মনসবদার, সিপাহসালার, লস্কর প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তি, বিচার বিভাগে কাজী-অল-কুজ্জাত, কাজী, মুফতি, মুন্সেফ প্রভৃতি পদবীর কর্মচারী ছিলেন।[২] তাঁরা সুলতান-নবাবকে শাসনকার্যে সহায়তা করতেন। রাজস্ব বিভাগে দেশীয় লোক নিয়োগ করতেন; মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে জমিদারী প্রথা চালু হয়, তাতে স্থানীয় হিন্দু জমিদারের সংখ্যা বেশী ছিল, পরবর্তীকালেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।[৩] সেনাবিভাগে ও বিচারবিভাগে একচেটিয়া মুসলমানদের

---

১. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, PP. 12-22.

২. মোঘল আমলে একটি সুবাহ বা প্রদেশের শাসনপ্রণালী ছিল এরূপ: "প্রতি সুবাহ বা প্রদেশে মোঘল বাদশাহগণ দুজন প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত করতেন—একজন ছিলেন নাজিম, অপরজন দিওয়ান। নাজিম ছিলেন বাদশাহের প্রতিনিধি বা প্রদেশপাল। তিনি ছিলেন শাসনকর্তা ও সামরিক প্রধান; তিনি ফৌজদারী বিচার পরিচালনা করতেন। দিওয়ান সরাসরি বাদশাহের অধীনস্থ ছিলেন, প্রদেশের নাজিমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল স্বাধীন। তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ পরিচালনা করতেন। সুতরাং প্রদেশের প্রশাসনযন্ত্রে সম্পূর্ণ দুটি স্বাধীন চক্র ছিল। নাজিমের অধীনে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা হলেন নায়েব-নাজিম, সেরলস্কর, ফৌজদার, কোতোয়াল এবং থানাদার (দারোগা)। দিওয়ানের অধীনে বিচার বিভাগে ছিলেন কাজী-অল-কুজ্জাত (প্রধান বিচারপতি), কাজী, মুফতী, মীর আদল ও সদর এবং রাজস্ব বিভাগে ছিলেন নায়েব (স্থানীয় দিওয়ান), আমিল, শিকদার, কারকুন, কানুনগো ও পাটোয়ারী। অনেক সময় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ নাজিম ও দিওয়ান উভয়ের প্রভাব মুক্ত হয়ে সরাসরি কেন্দ্রের বিচারপতি সদর-ই-জাহান বা আইনমন্ত্রীর অধীনস্থ হত। সদর-ই-জাহান তাঁর আচরণমালার জন্য স্বয়ং বাদশাহের নিকট দায়ী থাকতেন।"

Abdus Salam, M.A.—*The Riaz-us-Salatin* by Ghulam Hosain Salim, (English translation), Baptist Mission Press, Calcutta 1904, P. 6 (fn.).

৩. সিরাজদ্দৌলার সময়ে বড় জমিদারের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ এবং হিন্দুর (আর্মেনিয়ানসহ) সংখ্যা ছিল ১৭৩; উভয়ের হার যথাক্রমে ১১% এবং ৮৯.%
Abul Khair Nazmul Karim—*The Modern Muslim Political Elite in Beng* (Doctoral Thesis, University of London, unpublished) 1964, P. 78

প্রাধান্য ছিল। সিরাজদ্দৌলার সময়ে সেনাবিভাগে মীরমদন, মোহনলাল উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজবল্লভ ঢাকার এবং নন্দকুমার হুগলীর স্থানীয় প্রতি-নিধি ছিলেন। সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা দুর্গ অথবা রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থাকতেন, জমিদারগণ নিজ দায়িত্বে রাজকোষে রাজস্ব পৌঁছে দিতেন, তাঁরা রাজদরবারে সম্মান পেতেন না। জমিদারগণ নিজ এলাকায় রাজতুল্য আচরণ করতেন, প্রজার সাথে সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। নবাব-নাজিম, আমীর-ওমরাহ তথা শাসক শ্রেণী প্রজাদের নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃষক-শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, ডোম-চণ্ডাল সমানভাবে অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেরূপ নবাব, আমীর-ওমরাহ ও পদস্থ রাজপুরুষদের সরিয়ে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করেছিলেন, দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী সরকারও সেরূপটি করেছিলেন। ইংরাজগণ নেটিভদের প্রথমে চাকুরী দিয়েছেন দোভাষী, কেরানী, সরকার, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, দেওয়ান, পণ্ডিত, মুনশী প্রভৃতি অধঃস্তন পদে। ১৮৪৪ সালের আগে পর্যন্ত প্রশাসন বিভাগে কোন দেশীয় ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী পাননি; এটা ইংরাজ রাজত্বের একশ বছর পরের কথা। মুসলমান আমলে মধ্যস্বত্বভোগী মধ্য ও নিম্ন বিত্তের একটি শ্রেণী ছিল প্রশাসন, রাজস্ব, বিচার ও সেনাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত অধঃস্তন কর্মচারী এবং ছোটখাটো ব্যবসাদার হিসাবে। কোতোয়াল, কয়াল, কলমচি, কাগজি, খাজাঞ্চি, খালাসী, খানসামা, খাসনবিশ, গোমস্তা, চঙ্গদার, চাপরাশি, চৌকিদার, জমাদার, জলবাস, ডিহিদার, তবকচি, তবলচি, তহশিলদার, তালুকদার, দফাদার, দরজি, দস্তিদার, দারোগা, দালাল, নকিব, পাইক, পেয়াদা, পোদ্দার, পেশকার, বরকন্দাজ, বাবুর্চি, বিলদার, ভিস্তি, মশালচি, মুনশী, মহলানবিশ, মুহুরী; মোক্তার, মোল্লা, শরফ, শিকদার, সরকার, সারেঙ্গ, সেরেস্তাদার, হাওলাদার ইত্যাদি পদবীর চাকুরীতে বহিরাগতদের সাথে দেশীয় ব্যক্তিরাও সুযোগ পেতেন। ইতিহাস গ্রন্থ, মধ্যযুগের সাহিত্য, পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি রচনায় এদের কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নতুন নগর পত্তনে যেসব লোকের বসতির কথা বলেছেন, তাতে এ শ্রেণীর অনেক এবং আরও নতুন পদবীর লোকের কথা আছে। এসব চাকুরীতে সুযোগ পাওয়ার প্রবণতা ধর্মান্তর গ্রহণের একটা কারণ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে-সংখ্যা কত? ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে ভেদ নেই—মনুষ্যত্ব ও সাম্যবাদের এই আবেদনের এবং সামাজিক বন্ধনমুক্তির আশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা 'কলেমা'

বা দীক্ষামন্ত্র পাঠ করে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু রাজপুরুষের সংস্কৃতি পায়নি। তারা পূর্বপুরুষের ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-সংস্কার রাতারাতি পাল্টাতে পারেনি। পীর-দরবেশগণ দীক্ষা দিয়ে ভক্তের সংখ্যা বাড়িয়েছেন, এবং তাদের দান-খয়রাত করেছেন, কিন্তু এর বেশী অন্য সুযোগ করে দিতে পারেননি। মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে-শিক্ষা ধর্মীয় আচার পালনের রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, উচ্চ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা দুর্লভ ছিল। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করে বাংলার সাধারণ মুসলমান যে সমাজ ও সংস্কৃতিগত-ভাবে আলাদা কোন চরিত্র লাভ করেছিল, ইতিহাসে তার বেশী প্রমাণ পাওয়া যায় না। পীরপূজা, কবরপূজা, মানত মানা, দরগাহ বানান, তাজিয়া নিয়ে শোভা যাত্রা করা, মর্সিয়া গাওয়া, মনসা-শীতলার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া, যাত্রা মেলাদিতে অংশ গ্রহণ করা, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করা, বিবাহাদিতে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা ইত্যাদি কুসংস্কার ও রীতিনীতি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল তার ভুরিভুরি প্রমাণ আছে। এসব আচরণ গ্রামের মানুষের মধ্য থেকে আজও তিরোহিত হয়নি। বাংলাদেশে ইসলাম আসার ফলে বৈষয়িক, মানসিক, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন গুরুতর পরিবর্তন হয়নি বা বিপ্লব আসেনি, এটাই ধ্রুব সত্য। রাজার সংস্কৃতি, প্রজার সংস্কৃতি এক ছিল না; রাজপুরুষের সংস্কৃতি প্রজাসাধারণ গ্রহণ করে। রাজকার্য পেতে হলে ফারসী শিখতে হত, ধর্মকর্মের জন্য আরবী শিখতে হত। ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে আরব-ইরানের সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ঐসব দেশের ইতিহাস, কাহিনী, ভাবধারা নিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। রাজ-পুরুষদের মধ্যে যারা স্থায়িভাবে বসবাস স্থাপন করেছেন, তাঁরা দেশীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, কাজী দৌলত, সৈয়দ মর্তুজা, শেখ ফয়জুল্লাহ, মাগন ঠাকুর প্রমুখ মুসলমান কবি আরবীয়-ইরানীয় এবং দেশীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে কাব্যচর্চা করেছেন। এঁরা কেউ কেউ রাজপুরুষ ছিলেন। হোসেন শাহ, বারবক শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ কার্যে হিন্দু কবিদের উৎসাহিত করেছেন। ঢাকা ও মুর্শি-দাবাদের নবাবেরা ঘটা করে মহররম উৎসব, বেরা উৎসব ও দীপালি উৎসব পালন করতেন। মীরজাফর মৃত্যুকালে হিন্দুদেবীর পাদোদক পান করেছিলেন।[১] ফকির সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মাচারণে দেশীয় রীতিনীতি পালন করত। পটুয়া

১. Kalikinkar Dutta—*Studies in the History of the Bengal Subah*, Calcutta 1936, P. 95

ও বেদেরা নিজেদের অর্ধ মুসলমান অর্ধ হিন্দু বলে পরিচয় দিত। সুতরাং কি ধর্ম, কি সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মূল নিয়ন্ত্রক। ইসলামে নীতিগতভাবে বর্ণবৈষম্যহীন সাম্যবাদ ও উদার গণতান্ত্রিক মানবতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দেশ থাকলেও, বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি। আরব রাষ্ট্রে প্রথম চারজন খলিফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার পরপরই বংশগত রাজতন্ত্রের প্রথা চালু হয়। ক্রমে উম্মিয়া, আব্বাসীয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে খিলজী, তুঘলক, ঘোরী, মামলুক, শূর, মোঘল প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেন। বাংলাদেশেও ঐসব বংশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। রাজা প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক ; রাজার স্বার্থে প্রজার স্বার্থ—রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোয় সাম্রাজ্যবাদী এই নীতি পুরোপুরি বহাল ছিল।

বাংলা তথা ভারতের নব্যগঠিত মুসলমান সমাজ-কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় বর্ণবৈষম্যবাদ তিরোহিত হয়নি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা রক্ত ভিত্তিক চতুর্বর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ, আরজল প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেছে।[১] সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণী ভেদ প্রধানতঃ 'খানদান' বা রক্তধারা দিয়ে নির্ণীত হয়েছে। বিত্ত ও বিদ্যা সমাজস্তর গঠনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সৈয়দ, শেখ, মোঘল ও পাঠান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানরা নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দেন। মহম্মদের বংশধর সৈয়দ, আসহাব বা মহম্মদের অনুসরণকারীদের বংশধর শেখ, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের অধিবাসীরা পাঠান এবং মোঙ্গলীয় রক্তধারার লোকেরা মোঘল নামে পরিচিত। সৈয়দ বংশজাত লোকেরা হোসাইনি, রিজভি, নকভি, ইসমাইলি, বোখারি, কিরমানি প্রভৃতি এবং শেখ বংশজাত লোকেরা সিদ্দিকী, ফারুকী, আব্বাসী ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করেন। ধর্মীয় নেতাগণ শাহ, খোন্দকার উপাধি ব্যবহার করতেন। পাঠানরা খান, শূর প্রভৃতি এবং মোঘলরা মীর্জা, বেগ, মীর, মল্লিক,

---

১. চতুর্বর্ণ প্রথমে পেশা বা কর্মভিত্তিক ছিল। শক, হূণ, গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী শক্তির আক্রমণের ফলে ভারতের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিল। সপ্তম শতকে মনু সমাজ-কাঠামো রক্ষার এবং একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ কর্মের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের শ্রেণীকরণ করেন। পরে এটি কৌলিক ভেদপ্রথায় রূপান্তরিত হয়। এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। শরীফ (আরবী) শব্দের অর্থ পবিত্র, মান্য ; শরীফের বহুবচন আশরাফ ; অনুরূপ 'তরফ (শ্রম) শব্দজাত আতরাফ ; 'জিলফ' (নীচ) শব্দজাত আজলাফ ; 'রজীল' (ইতর) শব্দজাত আরজল।
F. Steingass (edited)—*Persian-English Dictionary*, London. 1954 (4th. edition).

লস্কর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন।[১] এগুলি পেশাগত উপাধি ছিল। কাজী ও চৌধুরী উক্ত চার শ্রেণীর সকলেই পেশা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারতেন। শেখ, খান, মালিক প্রভৃতি পদবী ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করতেন।[২] এঁরা রাজপদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষাদান প্রভৃতি শ্রমহীন কাজে নিযুক্ত হতেন। আশরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর লোকদের আতরাফ ও আজলাফ বলা হয়। তাদের 'খানদান' উচ্চবংশীয় ছিল না। তাদের প্রধান কাজ ছিল কায়িক শ্রম। কর্ম অনুযায়ী তাদের মান-সম্মানের ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। যারা কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল, তারা নিজেদের জোলা, তাঁতি, দর্জি প্রভৃতি অপেক্ষা বড় মনে করত। জোলা, দর্জি শ্রেণীর লোকেরা আবার জেলে, মাঝি-মাল্লা, কলু কসাই, কামলা, খালাসী, ধুনারী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের অধঃস্তন মনে করত। আরও নিম্নমানের পেশার লোক ছিল যেমন মুচি, দফালি, হাজ্জাম, ভাট, ধোবি, বেসেড়া, নাট, বাদিয়া প্রভৃতি। আতরাফের মধ্যে এদের স্থান ছিল সর্ব নিম্নে। ভাঙ্গড়, মেহতর, কসবি, হিজড়া, মাঙ্গতা প্রভৃতি যারা অতি নীচু স্তরের পেশায় নিযুক্ত ছিল, তারা আরজাল বা ইতর শ্রেণী রূপে গণ্য হত।[৩] হিন্দুদের নিম্ন

---

১. ১৮৯১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে মোট ২০টি 'উপাধি'র উল্লেখ আছে: অক্ষরানুক্রমিক সাজালে সেগুলির নাম হয় আখন্দজি, আতরাফ, খান, গাইন, গাজী, চৌধুরী, দফাদার, দেওয়ান, নায়ক, পাঠান, বিশ্বাস, বেগ, মীর, মীর্জা, মোঘল, শেখ, শানা, সরদার, সৈয়দ ও হাজরা। *Census of India.*, 1891. Vol. V (Lower Provinces of Bengal and their Feudatories), Calcutta 1893, P. 17.

২. *The Origin of the Musalmans of Bengal,* PP. 101-02

৩. ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমান সমাজে মোট ১০২টি পেশাজীবী মানুষের উল্লেখ আছে, সেগুলি হল: আবদল, বাদ্যকার, বাজিকর, বকলি, বাখো, বোরহি, বোরজিব, বেহারী, বেপারি, বেসাতি, বেশ্যা, ভণ্ড, ভাট, ভাতিয়ারা, ভিস্তি, চামার, চৌধুরী, চৌকিদার, ছিপিগর, চিক, চিত্রকর, চুণারি, চুরিহর, দফালি, দহিয়ারা, দাই, দালাল, দপ্তরি, দর্জি, ধরি, ধাওয়া, ধোপা, ধুনিয়া, ফকির, ফেরুশ, গদি, গজনবি, গোলাম, হাজাম, হিজড়া, গোলদার, গোয়ালা, জমাদার, ঝাড়ুদার, জোলা, জোতদার, খয়াজি, কাহার, কলাল, কলু' করদার, কারিগর, কসাই, কসবি, কাজি, খোজা, খোন্দকার, কুসিয়ারা, লাহেরি, মহলদার, মাহিফেরুস, মালা, মাল-বৈদ্য, মালী, মালিক, মণ্ডল, মাঝি, মশালচি, মৌলবি, মেহতর, মেওয়াফেরুস, মিরিয়াসি, মিস্ত্রি, মৃধা, মুকেরি, মোল্লা, মুনশী, নগরচি, নলবান্ধ, নলিয়া, নিকারি, নুরবাফ, পাসি, পাটনি, পটুয়া পাটুরিয়া, পাওয়ারিয়া, পেসকার, রঙ্গরেজ, রসুয়া, সাজগার, সরকার, সাইন, শিকলগর, শিকারী, সিনলি, সোরিয়া, তরফদার, তকলিহর, তুতিয়া। বিদেশীশাসককৃত তালিকায় কিছু কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, তবে বেশীর ভাগ পেশাজীবী মানুষের অস্তিত্ব ছিল।
Census of India, 1891, Vol. IV, PP. 17-19.

স্তরের শূদ্রদের পেশার সাথে এদের পেশার মিল ছিল। সাধারণতঃ আতরাফ আজলাফ ও আরজল শ্রেণীর লোকদের ধর্মান্তরিত দেশীয় অধিবাসী হিসাবে গণ্য করা হত। ঐসব বৃত্তিধারী মানুষ কমবেশী হিন্দু সমাজেও বিদ্যমান ছিল, উচ্চ বংশীয় হিন্দু-বৌদ্ধগণ শেখ নাম ধারণ করে আশরাফ শ্রেণীভুক্ত হতেন। আবার মোঘল-পাঠানের মধ্যে কিছু শ্রেণীর লোক নিম্নমানের পেশায় নিযুক্ত হয়ে আতরাফ-আজলাফ বলে পরিচিত হত। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে লেখাপড়া বা সংস্কৃতি চর্চা ছিল না। এদের রুচিবোধ ও নৈতিকবোধ নীচু স্তরের ছিল, দারিদ্র্য ছিল নিত্য সঙ্গী।

সামাজিকভাবে মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং আহার-বিহারের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীভেদ কোন কোন অঞ্চলে কঠোরভাবে পালন করা হত। 'অনুলোম' পদ্ধতির বিবাহ কোথাও কোথাও হলেও 'প্রতিলোম' পদ্ধতির বিবাহ সামাজিকভাবে অচল ছিল। বিত্তবান গৃহস্থ ঘরের কন্যা বিত্তহীন আশরাফগণ গ্রহণ করতেন, কিন্তু আশরাফগণ কোন অবস্থায় কৃষক, জেলে, জোলার ঘরে কন্যার বিবাহ দিতেন না। এতে খানদানের অবমাননা হত, এটাই সংস্কার ছিল। তবে বিত্তবান ও প্রভাবশালী আতরাফগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীতে দেখা যায়, তাঁর পিতামহ মীর ইব্রাহিম হোসেন এক মলঙ্গ ফকিরের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। স্বয়ং মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কুলসুম বিবি ছিলেন এক দরিদ্র কৃষককন্যা। মীর পরিবারের কোন কন্যার বিবাহ নিম্ন বংশের কোন ঘরে দেওয়া হয়নি।[১] পাদরী জেমস লঙ বলেছেন যে, আরজল বা নীচ শ্রেণীর লোকেরা মসজিদে প্রবেশ করতে এবং সাধারণ গোরস্থানে মৃতদেহ দাফন করতে পেত না।[২]

অবশ্য মুসলমান সমাজের এই শ্রেণীভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার মত বিধি-নিষেধের কঠোর প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি। হিন্দু সমাজে এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণের মধ্যকার বাধা বা দূরত্ব দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য ছিল। ধর্মের দিক থেকে সামাজিক শ্রেণী বিচারে বিধিনিষেধ না থাকায়, মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা সর্বত্র অটুট বা অলঙ্ঘনীয় ছিল না। নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে উঠার পথ অবরুদ্ধ ছিল না। এক শ্রেণীর মানুষ বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করতে পারলে উপরের তলায় উঠে যেতে পারত এবং আশরাফের সমমর্যাদার

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডক্টর (সম্পাদিত)—আমার জীবনী, কলিকাতা, ১৯৭৭
২. Rev. James Long—*An Introduction to the Sociology of Islam*, 1931-33, P. 104.

অধিকারী হত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত দুটি প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে জাতিভেদের শিথিল বাঁধনের রূপটি ধরা পড়ে:

(১) আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন,
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।

(২) গত বছর আমি একজন 'জোলা' ছিলাম, এ বছর আমি একজন শেখ', আগামী বছর ভাল দর পেলে আমি একজন 'সৈয়দ' হব।[১]

উভয় স্থলে আর্থিক উন্নতির দ্বারা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। হিন্দু সমাজে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির অন্য কোন উপায় ছিল না। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান ইত্যাদি শ্রেণীভেদের ধর্মীয় ভিত্তি ছিল না, মুসলমান দেশগুলিতে এ ধরনের ভেদাভেদের কোন সামাজিক তাৎপর্য নেই। ভারতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদের প্রভাবেই নিতান্ত কৃত্রিম এই শ্রেণীভেদের উদ্ভব হয়েছে। জে. ডি. কানিংহাম মন্তব্য করেন, "The Mahametans of India fancifully devided themselves into classes after the manner of Hindus, viz. Syeds, Shek'ies, Moughls and Pathans".[২]

ধর্মরীতি ও মতবাদের ঈষৎ পার্থক্যের ভিত্তিতে বিশ্বের মুসলমানের মত ভারতবর্ষের মুসলমানের মধ্যেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় আছে—শিয়া ও সুন্নি। উভয়ে তৌহিদবাদে বিশ্বাসী এবং মহম্মদের নবীত্বে আস্থাবান; তাদের মূল বিরোধ 'ইমামতি' বা 'খলিফাত্ব' নিয়ে। সুন্নিগণ ধর্মগুরু হিসাবে 'খলিফায়ে রাশেদিন' বা চার খলিফার নেতৃত্ব স্বীকার করেন; চার খলিফা হলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী। শিয়াগণ মনে করেন একমাত্র হজরত মহম্মদের বংশধরেরই 'ইমাম' (আধ্যাত্মিক গুরু) হওয়ার অধিকার আছে, সেই সূত্রে হজরত মহম্মদের জামাতা ও পিতৃব্যপুত্র হজরত আলী এবং দৌহিত্র ইমাম হাসান

---

১. দ্বিতীয়টি প্রাচীন হওয়া সম্ভব, ফারসীতে এর একটি রূপ পাওয়া যায়:

পেশ আজ ইন কাসাব বুদেঁ
বাদাজান গুশতেঁ শৈখ
ঘালা চুঁ আরজান শাওয়াদ
ইস সাল সৈয়দ মেশাওয়েঁ।

অর্থ—প্রথম বছর আমরা কসাই ছিলাম, পরের বছর শেখ, বর্তমান বছরে যদি দাম পাই তবে আমরা সৈয়দ হব।

The Modern Muslim Political Elite in Bengal, P. 189.

২. J. D. Cunningham—*A History of the Shikhs*, 1903, P. 31.

ও ইমাম হোসেন ইমাম হওয়ার যোগ্য। এই মতভেদের কারণে হজরত আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন, ইমাম হাসান বিষপ্রয়োগে ও ইমাম হোসেন কারবালার যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। এর সবটার মূলে ষড়যন্ত্র ছিল। শিয়াগণ কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে স্মরণ করে মহরমের শোকোৎসব পালন করে। সুন্নিগণ মহরমের তাজিয়া, দরগাহ, মর্সিয়া, নকল মকবেরা, দুলদুল ইত্যাদি আচার পদ্ধতির বিরোধী। তারা দোয়া, দরুদ, নামাজ, দান-খয়রাত ইত্যাদি রীতিতে মহরমের শোক দিবস পালনের নির্দেশ দেয়। ইরান ও আফগানিস্তানে শিয়া এবং তুরস্ক ও ভারতে সুন্নিদের প্রভাব বেশী। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বৃহৎ বাংলার সুন্নি ও শিয়ার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০,৯৬৪,৬৫৭ ও ২৬২,২৯৩ জন। উভয়ের অনুপাত ৮০ : ১। রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলীতে শিয়ার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। সুন্নিগণের সংখ্যা সর্বত্রই বেশী ছিল।[১] উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাদশাহ হুমায়ুন ইরানের সহযোগিতার দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তখন থেকে ভারতবর্ষে শিয়াদের আগমন ঘটে। বাংলায় নিযুক্ত মোগল রাজপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের মাধ্যমে এদেশে শিয়াদের প্রভাব পড়ে।

সুন্নিগণ চারজন বড় শাস্ত্রকারের ব্যাখ্যার অনুসারী হিসাবে চারটি মজহাবে বিভক্ত যথা—হানাফী, মালেকী, সাফী ও হাম্বেলী। তাঁরা ধর্মপালনের 'তরিকা' বা পথ এবং সমাজ গঠনের 'আহকাম' বা পদ্ধতির চুলচেরা বিবরণ বিশ্লেষণ করে গেছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক আইনসমূহ তাঁদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। কোথাও কোথাও সামান্য মতভেদ ছাড়া তাঁদের মতের মধ্যে বিরোধ ছিল না।

ইসলামে শরীয়ত ও মারিফত নামে ধর্মপালনের দুটি ধারা প্রচলিত আছে। হাদিস কোরানে ধর্মপালনের যে রীতিনীতির বিবরণ আছে, সেই অনুযায়ী একেশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁর উপাসনা করার নাম শরীয়ত মত। এটা শুষ্ক জ্ঞানবাদের ধারা। মারিফত হল অধ্যাত্মমুখী সাধন-ভজনের মত ও পথ। শরীয়ত মতে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে দ্বৈত সম্পর্কের কথা বলা হয়। মানুষ উপাসনার দ্বারা পুণ্য অর্জন করে মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হবে। মারিফতপন্থীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অদ্বৈত সম্পর্কের কথা বলে। 'জিকর' বা আরাধনার মাধ্যমে মানুষ কামেল ইনসান বা 'পূর্ণ মানবে' পরিণত হতে পারে। তখন ঈশ্বরের

---

১. *Report on the Sensus of Bengal*, 1872, P. 81.

সাথে তার সম্পর্ক দ্বৈতাদ্বৈত রূপ লাভ করে। সুফী সাধকগণ এই মতের ধারক। সুফীরা মধ্যস্থ হিসাবে পীর বা মুর্শিদকে মান্য করে। এই পীরবাদ হিন্দু গুরুবাদ ও বৌদ্ধ থেরবাদের অনুরূপ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দেহসাধনার বিষয়ও সুফীসাধনায় গৃহীত হয়েছে। মুরীদ মুর্শিদের নির্দেশে নাসুত, মালকুত, জবরুত ও লাহুত এই চারটি স্তর পরম্পরায় সাধনা করবেন, সাধনায় সফল হলে তিনি সিদ্ধপুরুষ তথা 'পূর্ণ মানবে' পরিণত হবেন। এই তত্ত্ব থেকে 'আশিক-মাশুকে'র তত্ত্ব এসেছে। ঈশ্বর মাশুক অর্থাৎ প্রেমের পাত্র এবং মানুষ 'আশিক' বা প্রেমিক। প্রেম সাধনার দ্বারা ভক্ত বা মুরীদ ঈশ্বরে লীন হতে পারেন। ঈশ্বরে প্রেমলীনতার নাম 'ফানাফিল্লাহ'।[১] তখন মুর্শিদ-মওলায় কোন তফাৎ থাকে না। সুফীরা দেহসাধনা অথবা অধ্যাত্মসাধনা উভয় পদ্ধতিতে আল্লাহর আরাধনা করতে পারে। বিখ্যাত সুফী সাধক মনসুর হল্লাজ 'আনাল হক' বা 'আমি ঈশ্বর' এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বর সত্য, আমি সত্য, অতএব আমিই ঈশ্বর এই পদ্ধতিতে তিনি ঐ তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। এই তত্ত্বের জন্য তিনি শরীয়ত পন্থীদের হাতে প্রাণ হারান। জ্ঞানসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা উভয় ধারা হজরত মহম্মদের মধ্যে ছিল। তিনি হজরত আলীকে অধ্যাত্মবাদের গুপ্ত সাধনার কথা বলে যান।[২] সেই ধারণা থেকে আরবে অধ্যাত্মসাধনার উদ্ভব হয়েছিল। পরে এটি ইরানের সুফী সাধকদের দ্বারা সুগঠিত ও সম্প্রচারিত হয়। সেখান থেকে সুফীমত ভারতভূমিতে বিস্তার লাভ করে। বাংলার ইসলাম প্রচারক পীর-দরবেশগণ এই সুফীমতের ধারক ছিলেন। বাংলার মাটি ও আবহাওয়া যেমন নরম, বাঙালীর মনও তেমনি আবেগপ্রবণ; এই আবেগ-প্রবণ মনোভূমি সুফীমতের উত্তম ক্ষেত্র। ইরানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে বাংলার সবুজ শ্যামলিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিল আছে। এজন্য পীরবাদী মারিফত ধারার প্রভাব বাংলাদেশে বেশী পড়েছে। এছাড়া গুরুবাদ ও থের-বাদের স্রোত হিন্দু, নাথ, বৌদ্ধ সাধনার মধ্য দিয়ে পূর্ব হতেই প্রবাহিত ছিল।

---

১ পূর্বোক্ত, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭৫

২. 'এই মহাত্মা (হজরত আলী) মুসলমানদিগের আধ্যাত্মিক মহাধর্মগুরু। প্রেরিত মহাপুরুষ (হজরত মহম্মদ) প্রধানতঃ ইহাকেই পারমার্থিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় মুসলমান তাপসমণ্ডলীই ইঁহার পদানুসরণ করিয়া, পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"
আলাউদ্দীন আহমদ—উপদেশ-সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৮৯৪, পৃঃ ৮ (পাদটীকা)।

এজন্য সুফীমত অবাধে প্রচার লাভ করেছে। এম. টি. টাইটাসের অভিমত, "In fact, it was through Sufism that Islam really found a point of contact with Hinduism and an effective entrance to Hindu hearts'."[১] তিনি আরও বলেছেন, "It (Sufism) is rather a natural revolt of human heart against the cold formalism of a ritualistic religion."[২] মরমীয়াবাদের সাথে এই মানবতাবাদের সংমিশ্রণ ছিল বলে সুফীমত মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বাংলাদেশে সতের শতকের পর থেকে বেশরা ফকিরী বা বাউলমত গড়ে উঠে তা এই সুফীমতেরই পরিবর্তিত লোকায়াত রূপ। শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত লোকেরা নানা প্রকার লৌকিক আচার-সংস্কারের সঙ্গে লোকশ্রুত সুফীমতের মিশ্রণ ঘটিয়ে বাউলমতের সৃষ্টি করে। তাই বাউল মতবাদ লোক-ধর্ম, শাস্ত্রধর্ম নয়। সমাজের একটি অংশে বাউলদের প্রভাব পড়ে, সর্বত্র পড়েনি।

হানাফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা পীরবাদী সুফীসাধনাকে গ্রহণ করেন। সুফীবাদে পীর-গুরুর প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় ক্রমে তাঁদের মাজার-মকবেরা-দরগাহ-আস্তানাহ নির্মাণ করে তাতে শিরনি, মানত, ধূপধূনা দেওয়া, জিয়ারত করা, উরস পালন করার রীতির উদ্ভব হয়। এসবের বিরুদ্ধে আরবের আবদুল ওহাব (১৭০৩-৯২) আঠার শতকে ধর্মসংস্কার আন্দোলন করেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা মক্কা-মদিনার অনেক মাজার, দরগাহ ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি কেবলমাত্র কোরান ও হাদিসের নির্দেশ মত নিয়মতান্ত্রিক ধর্ম পালনের মতবাদ প্রচার করেন। আবদুল ওহাবের আন্দোলনের আদর্শ বহন করে ভারতবর্ষে প্রথম ধর্মসংস্কার আন্দোলন করেছিলেন রায়বেরেলীর শহীদ সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১)। বাংলাদেশে ঐ আদর্শে আন্দোলন করেন ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লা (১৭৬৪-১৮৪০) এবং পুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২)। প্রথমটি 'ওয়াহাবী আন্দোলন' এবং দ্বিতীয়টি 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উভয় আন্দোলন ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। উভয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 'ইসলামীকরণ'। ইসলামধর্মে ও মুসলমান সমাজে যেসব অনৈসলামিক রীতিনীতি রয়েছে, সেগুলি দূর করে শাস্ত্রের নির্দেশমত ধর্মকর্ম পালন করার কথা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হয়। ফারায়েজীগণ হানাফীমতের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু ওয়াহাবীগণ কোন মধ্যস্থ গুরু হিসাবে পীর-মুর্শিদের ভূমিকা মানতে চাননি। পিউরিটান মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তাঁরা শরা-শরীয়তমতে

১. M. T. Titus—*Islam in India and Pakistan*, London, 1930.

২. *Idid.*

খাঁটি ইসলামে ফিরে যেতে চান। এঁদেরই একটি 'স্কুলে'র নাম হয় 'আহলে হাদিস'। এটিও উনিশ শতকের কথা; মধ্যযুগ অবধি বাংলাদেশে কোন রকম ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়নি।

নবাব, সুলতান, আমীর-ওমরাহ অভিজাত শ্রেণী সংস্কৃতি চর্চার ভাষা হিসাবে ফারসী ব্যবহার করতেন। বাঙালী মুসলমান আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষা করলেও কাব্যচর্চা করেছেন বাংলায়। হিন্দু লেখকগণ বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, শাক্তসাহিত্য, নাথসাহিত্য ও জীবনী-সাহিত্য রচনা করেছেন; সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও চর্চা করেছেন তাঁরা। মুসলমান কবিগণ সুফীসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এবং সুফী-বৈষ্ণব ভাবমিশ্রিত পদাবলী রচনা করেছেন। শাহ মোহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, শেখ কবির, আফজল আলী, দৌলত উজির বাহরাম খান, শাহ বারিদ খান, মোহাম্মদ কবির, দোনা গাজী চৌধুরী, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, মোহাম্মদ খান, মাগন ঠাকুর, কাজী দৌলত, সৈয়দ আলাওল, আবদুল হাকিম, নওয়াজিস খান, মুজাম্মিল, সৈয়দ মর্তুজা, শেখ মুত্তালিব প্রমুখ কবি মধ্যযুগে বাংলা কাব্যচর্চা করেছেন। ধর্মসাহিত্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবকাব্য উভয় শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। অনেকে আরবী-ফারসী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, অনেকে সংস্কৃত, হিন্দী-অবধী থেকে, আবার কেউ কেউ দেশীয় ঐতিহ্য থেকে ভাবধারা সংগ্রহ করেছেন। ধর্মশাস্ত্র বাংলায় রচনা করতে গিয়ে কোন কোন কবিকে জবাবদিহি দিতে হয়েছে। শেখ মুত্তালিব বলেছেন যে, 'মুসলমানী শাস্ত্রকথা' বাংলা ভাষায় রচনা করায় তাঁর 'বহু পাপ' হল। মোহাম্মদ জান 'নামাজনামা' গ্রন্থে বলেছেন যে, আরবী কথা বাংলা ভাষায় রচনা করলে 'সত্তর নবী বধে'র অপরাধ হবে। আবদুল হাকিম বাংলা ভাষা বিরোধী একটি শ্রেণীর মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, 'কর্মদোষে বঙ্গ দেশে বাঙালী উৎপন।' কিন্তু বিরোধী দলের অভিযোগ উপেক্ষা করে তাঁরা বাংলায় কাব্য লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন, তার প্রধান কারণ ছিল, আরবী-ফারসী অনভিজ্ঞ এদেশের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কাছে ঐ ভাষার সম্পদ পৌঁছে দেওয়া। সৈয়দ সুলতান লিখেছেন,

> আরবী ফারসী ভাসে কিতাব বহুত।
> আলিমনে বুঝে ন বুঝে মূর্খসুত॥
> দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
> রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক॥ —শব-ই-মিরাজ

শেখ মুত্তালিবের উক্তি,

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু॥ —কিফায়িতুল মুসল্লীন

মোহাম্মদ কবিরের উক্তি,

পণ্ডিত জনার ঘিন্না মূর্খের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি॥
মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এই কূল অই কূল॥ —মধুমালতী

আরবী-ফারসী ধর্মশাস্ত্রের ও প্রেমোপাখ্যানের অনুবাদগুলিতে ইসলামী ভাবধারা, পদাবলী ও পীর-পাঁচালীগুলিতে ইসলামী ও হিন্দুয়ানী মিশ্রিত ভাবধারা এবং গোরক্ষ-বিজয়, বিদ্যাসুন্দর চন্দ্রাবতী প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে হিন্দুয়ানী বিষয় গৃহীত হয়েছে। কোন কোন কবি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও কাব্য-রীতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। মাগন ঠাকুর, কাজী দৌলত, সৈয়দ আলাওল রাজসভার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শাহ, সৈয়দ, শেখ উপাধিধারী কবিদের কৌলিন্য মর্যাদাও উচ্চ ছিল। সুফীমতের চর্চা বেশী হয়েছে; 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি'র সংখ্যা ছিল শতাধিক।[১] রাজা প্রজা উভয়ে তাঁদের রচনার পাঠক বা শ্রোতা ছিলেন। এক শ্রেণীর গোঁড়া মোল্লাদের বিরোধিতার কথা স্মরণে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলার মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষাকে বর্জন না করে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ করে নিয়েছিল। 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণেতা শাহ মোহাম্মদ সগীর গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সুতরাং পনের শতকের গোড়া থেকেই মুসলিম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা 'রামায়ণ' রচয়িতা কৃত্তিবাস ঐ সময় আবির্ভূত হন। 'অমাত্য তনয়' আলাওল আরাকান রাজসভায় বসে ছয়খানি বাংলা কাব্য লিখেছেন; প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুর, রাজমন্ত্রী সৈয়দ মুসা, সোলায়মান,

১. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাঙ্গালা বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬১ (২সং)।
২. মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর—মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৫ (২সং), পৃঃ ৫৭

সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজপুরুষ। 'লায়লী-মজনু' রচয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খান 'দৌলত উজির' উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাস বাংলা শ্লোক পড়ে 'গৌড়েশ্বর'কে নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করেছিলেন। ইনি ছিলেন জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)। 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' রচয়িতা মালাধর বসু রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। সুতরাং মুসলমান রাজপরিবারে বাংলা ভাষা যে একেবারে অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত ছিল তা নয়। ধর্মকাব্যে যেমন অধ্যাত্মপ্রেমের কথা আছে, রোমান্টিক আখ্যানে তেমনি মানবপ্রেমের কথা আছে। মুসলমান সমাজের তখন গৌরবের কাল; সে সমাজের সাহিত্যে ভোগ ও উল্লাসের চিত্র থাকবেই। গোরক্ষ-বিজয়, হানিফার দিগ্বিজয়, গাজী-বিজয়, রসুল-বিজয়, ইমাম-বিজয় প্রভৃতি কাব্যে জয়োল্লাস এবং পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হানিফা-কয়রাপরী, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সতীময়না লোর চন্দ্রানী, গুলে বকাওলী প্রভৃতি কাব্যে প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তবে মধ্যযুগে মুসলমান সমাজ যে একটা শক্ত ভিত্তি ও স্থিতি লাভ করেছিল তা এসব সাহিত্যের ভাবজগৎ, রূপজগৎ ও রসজগতের প্রকৃতি ও উৎকর্ষ থেকে বুঝা যায়। কবিরা দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট উদার ছিলেন; বিশেষতঃ বিষয় নির্বাচনে তাঁরা কূপমণ্ডুকতার পরিচয় দেননি। এটাই জীবন্ত সমাজমানসের লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল স্থূল বৃদ্ধির যুগ, গতিশীল উর্মিমুখর যুগ ছিল না। সামন্তপতি দুর্গে বন্দী থেকে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকেন, রাজনৈতিকভাবে জনগণকে সচেতন করে তোলার কোন দায়িত্ব পালন করেন না। অর্থাৎ জনগণকে শক্তির উৎস হিসাবে না দেখে তিনি প্রাসাদের কতক রাজপুরুষের ইচ্ছার পুত্তলি হয়ে পড়েন। ডক্টর জগদীশ নারায়ণ সরকার বাংলার মোঘল-পূর্ব যুগের (১২০৩-১৫৭৬) রাজনীতির গতি-প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন যে, সে ইতিহাস ছিল :

"...a dreary and sickening story of frequent dynastic or gubernaterial changes, palace intrigues, disputed successions, short reigns, rebellions, usurpations and murders. In these political upheavals, the nobles and the principal officers played an important part, either as king-makers or as active participants in the game of power politics. Sometimes Kings reigned but did not rule. An ambitious minister or a group of officers or nobles ruled through the medium of the

royal puppet."[১] সব সামন্ত শাসনের ধারাই ছিল এইরূপ। মোঘল সামন্ত প্রভুরা প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশ শাসন করতেন; শিরে কেন্দ্রের আশীর্বাদ থাকায় তাঁরা প্রজাপালন অপেক্ষা আত্মরতির চর্চা করতেন বেশী। মোঘল শাসকদের ভোগবিলাসিতায় কালযাপন একটা স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থবলই প্রধান বল। রাজভাণ্ডার অর্থপূর্ণ থাকলে তবে সৈন্য-সামন্ত গঠন, আমীর-ওমরাহ পোষণ এবং প্রজা শাসন-শোষণ। মোঘল সামন্তপতিরা নির্দিষ্ট কর কেন্দ্রে প্রেরণ করে বাকী অর্থে আত্মপোষণ করতেন। ফল হত একই—প্রজার দিকে কল্যাণের হস্ত কেউ বাড়াতেন না। রাজা-প্রজার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রজারা রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। এজন্য দেখা যায়, রাজার পতন প্রজার পতন নয়, আবার রাজার উত্থান প্রজার উন্নতি নয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটায় কোন সমাজপতি সমাজসংগঠন দ্বারা সাধারণ মানুষকে সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে দেওয়ার আন্দোলনে এগিয়ে আসেননি। এক চৈতন্যদেবের ধর্ম-আন্দোলন সমাজের এক অংশে আলোড়ন এনেছিল, কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক-মুক্তির সুর ছিল, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির ডাক ছিল না। ভোগী, স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতান্ধ, স্বৈরাচারী রাজপুরুষদের অত্যাচার-অবিচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া জনগণের অন্য উপায় ছিল না। এজন্যই এ সমাজকে আমরা নিশ্চল স্থবির নিষ্ক্রিয় গতিহীন বলে অভিহিত করেছি। সুযোগ-সুবিধা ভোগের কিছু তারতম্য ছিল, নচেৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া এ যুগে আর কিছু হয়নি। যেটুকু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়, সেটুকু স্বাভাবিক বিকাশের ফল, সুসংগঠিত আন্দোলনের দ্বারা জাতির জন্য কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়নি। রাজশক্তির অধিকারী হয়েও মুসলমান সমাজ মধ্যযুগের এই সীমাবদ্ধতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, একে অতিক্রম করে নতুন বিপ্লব আনতে পারেনি।

অর্থনীতির দিক থেকেও একই নিশ্চলতার কথা উঠে। কৃষি ও কুটীর শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে সচলতা আসতে পারে না, যদি উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

---

১ Jagadish Narayan Sarkar—*Islam in Bengal,* Ratna Prakashan, Calcutta, 1972, P. 2.
ডক্টর সুশীলা মণ্ডল দেখিয়েছেন যে, তুর্ক-আফগান যুগের (১২০০–১৫২৬) মোট ৫২ জন শাসক ও সুলতানের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল অপঘাতে। তাঁর মতে তুর্ক-আফগান যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল, সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব এবং রক্তপাত। কেননা ইসলামে রাজতন্ত্র ছিল না বলে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারনীতিও ছিল না।
বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: প্রথম পর্ব), পৃ: ৮: (ভূমিকা)।

আসে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ এবং সীমাবদ্ধ পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে কুটীর শিল্প সমাজের অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তবে স্বল্পতুষ্ট গ্রামীণ সমাজের চাহিদা এতে মিটে যেত। স্বনির্ভর অর্থনীতির জন্য স্যার মেটকাফ বাংলার গ্রামগুলিকে ছোট ছোট গণরাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছেন।[১] অনুন্নত রাস্তাঘাট, নদীনালা-খালবিল পরিবেষ্টিত জলাজঙ্গলাকীর্ণ প্রকৃতি পরিবেশের কারণে ছোট ছোট গণরাষ্ট্র পরস্পর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। কোন বিশেষ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা সহজ ব্যাপার ছিল না। স্বনির্ভর অর্থনীতির কারণে বাঙালীর মধ্যে জীবিকার জন্য কোন সংগ্রামী মনোভাব জাগেনি বা বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। সুতরাং বাঙালীর চিত্তের বিকাশ, চিন্তার বিকাশ, মূল্যবোধের পরিবর্তন, ভাবধারার নবায়ণ হবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। অন্ততঃ ভেতর থেকে এ ধরনের তাগিদ ছিল না। ইসলাম এর মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করে সামান্য হেরফের দ্বারা আপন স্থান করে নিয়েছে মাত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতানুগতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়ার মত বিদ্যা ও হাতিয়ার আরব-ইরান-তুরস্কের নব্য শাসক গোষ্ঠীর ছিল না। এজন্য তাঁরা সমঝোতা ও সমন্বয় চেয়েছেন, সংঘাত বা বিপ্লব চাননি। ইংরাজগণই প্রথম ব্যবহারিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যার ফলে দীর্ঘকালের গতানুগতিক প্রবহমানতা, আড়ষ্টতা, মন্থরতা এবং নিষ্প্রাণতার আবরণ খুলে যায় এবং নবজীবনের চিন্তাভাবনা, কর্মকুশলতা, মননশীলতার বিকাশ ঘটে। আর তাতেই নবযুগ বা আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

মুসলমান সমাজ ও আধুনিকতা

ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ আমলে প্রবেশ করেছে; বাঙালীর ইতিহাসে এটাই আধুনিক যুগ। আরবদের মত ইংরাজদেরও প্রথমে বাণিজ্যতরী বাংলার মাটিতে নোঙর করেছিল। ১৬৯০ সালে জব চার্নক সূতানটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ সালে নিরাপত্তার কারণে

---

১. বিনয় ঘোষ—বাঙালীর নবজাগৃতি, ১ খণ্ড, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃঃ ২৫

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয়। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ করে বাংলায় বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানী সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৭৬৫ সালে বকসারের যুদ্ধে মীর কাসেমকে পরাভূত করে এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ফরমানের বলে দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানী বাংলার রাজস্ব আদায়ের মালিক হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে কোম্পানী বাংলার সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ইউরোপে 'শিল্পবিপ্লব' হয়। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিল্পবিপ্লব ঘটে। সামন্ত-তন্ত্র বিদায় নিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। ব্যক্তির মালিকানা ও ভোগাধিকার পুঁজিবাদের বড় কথা। ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চেতনা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ফল। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তি ছিল অবহেলিত, ব্যক্তি সমষ্টির অধীন ছিল। ব্যক্তিত্ববোধে উজ্জীবিত মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে এবং মনুষ্যত্বের নতুন মূল্যবোধ রচনা করে।[১] ইউরোপের রেনেসাঁসের এটি ছিল প্রধান লক্ষণ। ইংরাজগণ যখন বাংলাদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেন, তখন তাঁরা এই রেনেসাঁসের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। যন্ত্র চালাবার জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি অত্যাবশ্যক, তাই ভারতের মত বিরাট উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। পরস্পর বিবদমান ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরাজগণ ছলে বলে কৌশলে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে সফল হন। কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল অপরিমিত শোষণ। ইংরাজগণ এদেশের কুটীরশিল্প ধ্বংস করেছেন, নিজ দেশের পণ্য আমদানীর জন্য। তাঁরাই রাজ্যের মালিক, রাজস্বের মালিক, বাণিজ্যের মালিক। ভারতবর্ষের সমস্ত পুঁজি কোম্পানীর জাহাজে করে ইংলণ্ডে গেছে এবং সেখানকার পুঁজিপতির উদর স্ফীত করেছে। কোম্পানীর শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, জনগণের দুর্দশা চরমে উঠে। ভারতবাসীর বস্তুগত লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশী। যা লাভ হয়েছে, সেটি তাদের মন ও মানসের জগৎ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ। কোম্পানীর বাণিজ্যতরীতে পণ্যের সাথে ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসলও এসেছে। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা, শিক্ষা ও সভ্যতা তখন গতিশীল ও বিচিত্রমুখী ছিল।

---

১. "It indicates the endeavour of men to reconstitute himself as a free being, not as the thrall of theological despotism." *Encyclopeadia britannica*, Vol. XXIII, P. 83.

গতানুগতিক আবর্তসঙ্কুল আবহমান ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী ফল বহন করে। এই প্রথম ভারতীয় চিত্ত জেগে উঠে, তার অন্তর্জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। জীবনের পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ে, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় যার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের লক্ষণ বিকশিত হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ক্রান্তিকাল ছিল। প্রশাসনিক কাঠামো গঠন, নীতি উদ্ভাবন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল ফলতে শুরু করে। ১৮00 সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় ইংরাজ সিভিলিযানদের দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এতে দেশীয় লোকেরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন না, কিন্তু শিক্ষা দান ও গ্রন্থ প্রণয়নের সুযোগ পেলেন। ইংরাজ শিক্ষক ও পণ্ডিতের সাথে বাঙালী শিক্ষক ও পণ্ডিত-গণ বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেন যা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জগতে নব অধ্যায়ের সূচনা করে। আধুনিক মন ও মনন, বিদ্যা ও বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা বিকাশের অন্যতম বাহন গদ্য। এই গদ্যশিল্পের উদ্ভবকে ইংরাজদের একটা বড় দান বলে স্বীকার করতে হয়। বাংলা ভাষার জন্মের প্রায় হাজার বছর পর বাংলা গদ্য দলিল-দস্তাবেজের অঙ্গন ছেড়ে সাহিত্য রচনায় এই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। এই গদ্যশিল্প অল্পকাল পরে স্কুল-কলেজ শিক্ষায়, পাঠ্য পুস্তক ও সাহিত্য রচনায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে বাক-বিতণ্ডায়, পত্র-পত্রিকায় সৃজনশীল ও মননশীল লেখায়, সভা-সমিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব।

শাসক গোষ্ঠীর সহিত রাজকার্যে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে ও নানাবিধ ব্যবহারিক নিত্যকর্মে ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে ইংরাজী রাজভাষা হলে এরূপ শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কোন কোন ব্যক্তি ও খ্রীস্টান মিশনারীর উদ্যোগে প্রথমে কলিকাতা শহর ও শহরতলীতে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে বর্ণহিন্দুর সন্তানেরা উচ্চ মানের ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পান। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই 'ইয়ং বেঙ্গল দলে'র (১৮২৬) আবির্ভাব ঘটে। ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা আসে, ধর্মের পরিবর্তে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার নানাবিধ জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানী কর্তৃক নতুন সনদ লাভের সময় বাংলা

সরকার প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করার অনুমতি পায়।[১] সরকারের উদ্যোগে ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। ক্রমে জেলা স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে শহরের বাইরে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা এবং সে ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান শিক্ষার ভেতর দিয়ে বাঙালীর আত্মার জাগরণ, ব্যক্তিচিন্তার উন্মেষ এবং সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্ববোধের উদ্বোধন, মনুষ্যত্বের উপলব্ধি, স্বদেশ ও স্বজাতি চিন্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এরূপ বিদ্যাচর্চার ফল। ব্যক্তিগতভাবে এবং ক্রমশ: যৌথভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন তখনই সম্ভব হয়েছে। মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেসব কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অন্যায় আচরণ সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, এতকাল পরে সে সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, সমাজশাস্ত্রের স্থলে মানবতার জয় ঘোষিত হয়। গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জন ও সতীদাহ প্রথা নিরোধ এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে লাঞ্ছিত মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দান। সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ফলে মানুষ যুক্তিবিদ্যা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হয়েছে।

১৭৭৮ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে খড় ও পালকের কলমে তালপাতা, তুলট কাগজে হাতের লেখা পুঁথি ছিল বিদ্যাচর্চার উপায়। ছাপাখানার চাহিদা মিটাবার জন্য কাগজের কলও স্থাপিত হয়। ১৮২৯ সালে কলিকাতায় গমপেষার কল, ১৮৫৩ সালে কাপড় সেলাই-এর কল, ১৮৫৪ সালে শ্রীরামপুরে পাটকল, ১৮৭২ সালে কাপড় তৈরির কল স্থাপিত হয়। রাণীগঞ্জে কয়লা তোলা শুরু হয় ১৮২০ সালে। এ হল যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রশিল্পের পদধ্বনি। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যন্ত্র আসতে শুরু করে। এ পর্বে রেল-লাইন বসে এবং তাতে কলের গাড়ী চলে (১৮৫১)। টেলিগ্রাফ পদ্ধতিও আমদানী হয় (১৮৫৩)। এগুলি হল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর

---

১. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ সালের সনদের ৪৩ ধারা মতে আইনটি ছিল এরূপ:—
"It shall be lawful for the Governor General in Council to direct that out of many surplus which may remain of the rents. revenues and profits, a sum of not less than one lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge of the Science among the inhabitants or the British territories in India." H. Sharp (edited)—*Selection From Educational Records*, 1771—1839, Part I, Calcutta, 1920, P. 22

করার উপায়। দূর ও নিকটকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে এসব যন্ত্র মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে। গ্রামের সাথে শহরের সম্পর্ক স্থাপন সহজতর হয়েছে, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের শহরে আসা এবং শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ যন্ত্র মানুষের জীবনকে গতিশীল ও সূচীমুখী করে তুলেছে। এটিও ইউরোপীয় সভ্যতার দান।

কলিকাতার মত আধুনিক কসমোপলিটান শহর এবং শহরকেন্দ্রিক আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ইংরাজের শাসন আমলে সম্পন্ন হয়। কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির দরুন বাংলার সংস্কৃতি ছিল মূলতঃ গ্রামীণ সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শহর ও বন্দর ছিল, কিন্তু সেগুলি মুখ্যতঃ দুর্গকেন্দ্রিক ছিল। রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ পারিষদসহ দুর্গের অভ্যন্তরে বাস করতেন। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে সেনাবাহিনী শিবির করে থাকত। রাজপুরুষ ও সেনাবাহিনীর খাদ্য-পানীয় সরবরাহ ও সেবাশুশ্রূষার জন্য কিছু লোক শহরে বাস করত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য দোকানপাট থাকত, সরাইখানা, মুসাফিরখানা, মন্দির, মসজিদ থাকত। মোঘল যুগে ভূমির মালিকানার মত দরবারেও ব্যক্তি-সম্পত্তির মালি-কানা ছিল না। আমীর-উজির লোকান্তরিত হলে 'ফৌৎ আইনে' তাঁর অর্জিত সম্পত্তির বেশীর ভাগ যেত রাজভাণ্ডারে, তাঁর পরিবার-পরিজন সামান্য ভাগ পেতেন।[১] সমস্ত ভূমির মালিকানা স্বয়ং সম্রাটের; জায়গীরদার, মনসবদার, নবাব-নাজিম কেবল রাজস্ব আদায় ও তার অংশবিশেষ ভাগ ও ভোগের অধিকার পেতেন। ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং তা বংশধরদের জন্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি না থাকায় মানুষ শহরমুখী হয়নি। মোঘল যুগে ভোগের প্রবণতা এজন্য খুবই বেশী ছিল। ইংরাজের তৈরি শহরের রীতিনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ব্যক্তি-সম্পত্তির উপর ভোগাধিকার ও সঞ্চয়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল বলে ধনবান লোকেরা শহরে এসেছেন এবং গৃহনির্মাণ করে বসবাস স্থাপন করেছেন।[২] সিরাজদ্দৌলা ঢাকার নায়েব-নাজিমের সহকারী রাজদুর্লভের কাছে অর্থ চেয়ে পাঠালে তিনি পুত্র কৃষ্ণদাসকে

---

১. আবদুল মওদুদ—মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৪২

২. প্যারিচাঁদ মিত্র মন্তব্য করেন, "When Fort William was built, the Hindu seem to have looked upon it as a place of refugee and the setts, Gobardhan Mitra, Nabakissen, and other families settle there"." Notes on Early Commerce in Bengal, *Calcutta Review*, Vol. LXXII, 1881, P. 116.

দিয়ে ঐ সম্পত্তি কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। ইংরাজ কর্তৃক ক্ষমতা লাভের পর শাসন কাঠামোর পরিবর্তন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে কলিকাতা শহরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। রাজধানী শহরে সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক ও ছোট বড় ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আগমন ঘটেছে। এই শহর-বাসীর সমন্বয়েই একটি শ্রেণী-সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের সহিত সম্পর্কহীন একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু সেটি সংখ্যায় ক্ষীণাঙ্গ এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। তারা প্রায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় ছিল; শ্রেণী-সচেতনতা না থাকায় সমাজকে নতুন করে কিছু দিতে পারেনি। পোলার্ড বলেছেন, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয় না, আর মধ্য-শ্রেণী ছাড়া সমাজে নবজাগরণ আসে না।[১] আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ এক জাগায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গতিশীল, কর্মচঞ্চল ও অধিকার-সচেতন হয়ে উঠে। এটি সংকর শ্রেণী হলেও সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ জীবনব্যবস্থায় বসবাস করতে থাকে এবং সমাজের সারবান জাগ্রত অংশ হিসাবে ক্রমশঃ সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ হলে ও ব্যক্তি-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণের স্বার্থের সহিত একাত্মতা স্থাপন করে এবং ঔপনিবেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অবশ্য জীবিকার জন্য পরনির্ভরশীল বলে এর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে—কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে এ শ্রেণী সরাসরি দ্বন্দ্বে নামতে পারে না। আর্থিক কারণেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব বেড়ে যায় এবং সামাজিকভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠে। এসব দোষগুণের সমন্বয়ে গঠিত শহরকেন্দ্রিক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলায় ব্রিটিশ শাসনেরই ফল বলে স্বীকার করতে হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ইংরাজের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর অন্তর্জীবন ও বহি-র্জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা বাঙালী মুসলমান সমাজকে কিভাবে এবং কি পরিমাণে স্পর্শ করেছে। একথা ঠিক যে, এসব পরিবর্তনের সূত্র ধরেই আংশিকভাবে হলেও বাংলাদেশে নবজাগরণ এসেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই নবজাগরণের পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আধুনিক ভাষা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পত্রপত্রিকার প্রকাশ, সভাসমিতির গঠন, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও তার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর সৃষ্টি এবং নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ সংস্কার

---

১. বিনয় ঘোষ—বাংলার বিদ্বৎসমাজ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৫৮

আন্দোলন এবং তার মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধির ও মানবতাবোধের বিকাশ—আধুনিকতার এসব লক্ষণ দিয়েই নবজাগরণের আত্মপ্রকাশ হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে এসব লক্ষণ হিন্দু সমাজকে যতখানি আলোড়িত ও স্পন্দিত করেছিল, মুসলমান সমাজকে ততখানি করেনি। পূর্ব থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্যবসায়ের লেনদেনে যাঁরা দোভাষী, দালাল, খাজাঞ্চী, ঠিকাদার, মহাজন, বেনিয়ান, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, সরকার, দেওয়ান, মুনশী ও কেরানীর কাজ করতেন কোম্পানীর শাসনকালে তাঁরাই আর্থিক সুবিধা ভোগের অধিকারী হন।[১] সরকারী-বেসরকারী অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মিল-কারখানায় চাকুরীর সুবিধা তাঁরাই পান। ঐসব কাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের সাথে ইংরাজদের প্রথমে যোগাযোগ হয়েছিল। মুসলমান শাসনামলে ব্যবসায় ও মহাজনী কারবারে হিন্দুগণ অধিকতর নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার ভৌগোলিক অবস্থানহেতু হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী পায়ে হেঁটে কলিকাতার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। এসব জেলা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ছিল, ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকে অধিক পরিমাণে কলিকাতায় সমবেত হয়েছে। দূরবর্তী জেলাগুলিতে, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী ছিল। শহরে যাতায়াত ও অবস্থান করার মত আর্থিক অবস্থা যাদের ছিল, সাধারণতঃ তারাই শহরমুখী হয়েছে। মুসলমানের অধিকাংশ সংখ্যা ছিল কৃষিজীবী; চাকুরীজীবী খুব কম ছিল। মুসলমান আমলে চাকুরী সম্প্রসারিত ছিল না। ভূমির স্থায়ী আর্থিক নির্ভরতা ত্যাগ করে মুসলমানগণ শহরের

---

১. এ প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ (হেস্টিংসের মুন্সী), কান্তবাবু (মিঃ সাইকসের বেনিয়ান), লক্ষ্মীকান্ত (ক্লাইভের বেনিয়ান), দর্পনারায়ণ (মিঃ হুইলারের দেওয়ান), শান্তিরাম সিংহ (টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান), রামদুলাল দে (ফেয়ারলি কোম্পানীর দেওয়ান), গোকুলচন্দ্র ঘোষাল (ভেরেলস্টের দেওয়ান) প্রভৃতির নাম স্মরণ করা যায় যাঁরা প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন। শেখ ইতিসামুদ্দীন তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণবৃত্তান্ত 'শিগুর্ফ নামা ই-বেলায়েত' (১৭৮০) গ্রন্থে নিজের নামসহ মোট আট জন মুনশীর নাম করেছেন যাঁরা কলিকাতায় কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করতেন। তাঁরা হলেন, ১. মুনশী আমানুল্লাহ, ২. মুনশী ফকরুদ্দীন (তাজউদ্দীনের পুত্র), ৩. মুনশী মোহাম্মদ আসলাব, ৪. মুনশী আবদুল বারী, ৫. মুনশী মোহাম্মদ ফয়েজ (মেজর কর্নেলের অধীনস্থ), ৬. মুনশী মীর সদরুদ্দীন (কর্নেল কুটের অধীনস্থ), ৭. মুনশী সলিমুল্লাহ (গবর্নর হেনরী ভেন্সিটাটের অধীনস্থ) ও ৮. মুনশী শেখ ইতিসামুদ্দীন। Syed Aulad Hussain—The Vilayetnama, *The Dacca Reviews,* Feb.—Mar. 1917, P. 328 এঁরা কেউ বিত্তের মালিক হননি। এ সময় গোলাম হোসেন নামে একজন মুসলমানের নাম পাওয়া যায় যিনি কোম্পানীর দালালী করে ৯০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন।
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, ডক্টর—সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩৬

অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি। যাঁরা চাকুরী ও অন্যান্য রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, শাসন ক্ষমতা হারানোর পর তাঁরা কৃষিকার্যে যোগ দিয়েছেন, খ্রীস্টান শাসকের অধীনে গোলামি করা পছন্দ করেননি। খোন্দকার ফজলে রাব্বি বলেছেন যে, অভিজাত শ্রেণীর জীবিকার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সম্মানজনক উৎস ছিল তরবারি, কলম পেশা ও ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়। তাঁরা এগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত পেশা, হস্তশিল্প, দোকানদারি, ব্যবসায় ইত্যাদি কাজকে উচ্চপদ ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করতেন।[১] তাঁরা ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তাঁরা স্বহস্তে কৃষিকাজকে উত্তম পেশা বলে মনে করতেন না সত্য, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভূমি ও চাষ ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। রাজকার্যের চাকুরী হারিয়ে ঐ শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকার্যে গ্রামের দিকে ঝুঁকেছেন, শহরের নানাবিধ পেশার দিকে যাননি। যাঁরা চাকুরী হারাননি, তাঁরা অবশ্য পূর্ব পেশায় নিযুক্ত ছিলেন, যেমন বিচার বিভাগে কাজী, মুফতী, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, মুহুরী প্রভৃতি। যাদের চাকুরী ও ভূমি কিছুই ছিল না, তারা কেউ কেউ ভাগ্যের সন্ধানে শহরে ভিড় করে। ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী কলিকাতায় মুসলমান বসতির এক বিবরণে লিখেছেন যে, কতকগুলি কাজ মুসলমানের একচেটিয়া ছিল, যেমন নগর নির্মাণ কালে রাজমিস্ত্রির কাজ, বন্দর উন্নতির কালে খালাসী-সারেঙ্গের কাজ, কাপড় সেলাই-এর পেশায় দর্জির কাজ, কসাই-এর কাজ, ফলমূল ও শাকসব্জির ব্যবসায়ে দোকানদারি ও ফেরিওয়ালার কাজ, গাড়ী চালনায় সহিস-কোচোওয়ানের কাজ, ভিস্তির কাজ, রান্নার পেশায় খানসামা-বাবুর্চির কাজ, বই-পুস্তক বাঁধাই-এর কাজ, চামড়ার ট্যানারির কাজ, ঘোড়া-গরু-ছাগল কেনাবেচনায় ব্যাপারীর কাজ ইত্যাদি। এগুলিতে বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান নিয়োজিত ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে বিহার ও অন্য অঞ্চলের মুসলমানের প্রাধান্য ছিল।[২] এরা প্রধানতঃ শ্রমজীবী শ্রেণী ছিল। ডক্টর সিদ্দিকী কলিকাতার নানাবিধ দরগাহ, খানকাহ, মাজার, ইমামবাড়া, মসজিদ, মাদ্রাসার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছেন যে, ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশ, শিক্ষাদাতা মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও এখানে সমবেত হয়েছিলেন। এর উপরের তলায় আছেন নবাব-নাজিম ও অন্যান্য অভিজাত পরিবারের লোকজন। অর্থাৎ কর্মী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী ও

---

১. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, P. 107

২. M. K. A. Siddiqui—*Muslims of Calcutta*, Calcutta 1974, PP. 19-20

বৃত্তিভোগী অভিজাত পরিবার—এসব শ্রেণীর মানুষ নিয়ে কলিকাতার মুসলমান সমাজ গড়ে উঠে।[১]

১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কলিকাতার মুসলমানরা হেস্টিংসের কাছে এর জন্য দরবার করেছিলেন। মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, "...to promote the study of the Arabic and Persian Languages and of Muhammadan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the Courts of Justice."[২]

১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়; প্রথম বছর ছাত্র ছিল ৪২ জন।[৩] ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়; সেখানে ইংরাজী বিভাগে মুসলমান ছাত্র ছিল ৩১ জন (হিন্দু ছাত্র ৯৪৮ জন)।[৪] ১৮১৭ সালে স্থাপিত হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রের পড়ার অধিকার ছিল না। কলিকাতা ও শহরতলীর খ্রীস্টান মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মান্তরের ভয়ে মুসলমান অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের পাঠাতেন না। কেউ কেউ বিক্ষিপ্তভাবে পড়াশুনা করত। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার লাভ করেনি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে মুসলমান মুনশী-মৌলবীরা ছিলেন। এক সময় তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ জনেরও অধিক। কিন্তু তাঁরা উর্দু-ফারসী ভাষার চর্চা করেছিলেন, তাঁদের কেউ বাংলা গদ্য বা পদ্য কিছুই লেখেননি। তাঁরা অনেকেই পাটনাবাসী, লক্ষ্ণৌবাসী, দিল্লীবাসী ছিলেন।[৫] কলিকাতার 'স্কুল বুক

---

১. *Muslims of Calcutta,* P. 28

২. Abdul Karim, B.A.—*Mohammedan Education in Bengal,* Metcalfe Press, Calcutta, 1900, P. 1

৩. A. R. Mallick—*British Policy and the Muslims in Bengal,* P. 187

৪. *Mohammedan Education in Bengal,* P. 14

৫. ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত জড়িত ৩০ জন লেখকের কথা বলেছেন, তাঁদের ২২ জনের নাম উল্লেখ করেছেন: তাঁরা হলেন সৈয়দ বকসিস আলী ফৈজাবাদী, মোহাম্মদ আলী ইবন নিসার আলী, সৈয়দ মনসুর আলী হোসাইন, ফজর আলী ফজলি, মোহাম্মদ বকস, মীর মোহাম্মদ আতা খান তহসীন, মীর আমন, মীর বাহাদুর আলী হোসাইন, মীর শের আলী আফসোস, হায়দার বকস হায়দারী, মজহার আলী খান ওয়েলা, মীর্জা কাজিম আলী জওয়ান, হাফিজুদ্দীন বর্ধমানী, খলিল আলী আশক, মীর মইনুদ্দীন ফয়েজ, বাসিত খান, আমানাতুল্লা সৈয়দ, মীর্জা লুৎফ, মীর্জা জান তাপিস, মৌলভী ইকরাম আলী, মীর্জা মোঘল নিশান, খান নেয়ামত। *Muslims of Calcutta,* P. 23 টমাস রোবাক ১৮১৮ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরবী-ফারসী ও উর্দু বিভাগে কর্মরত

সোসাইটি'র (১৮১৭) পরিচালক কমিটিতে ৪ জন এবং 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র (১৮১৮) পরিচালক কমিটিতে ৪ জন মুসলমান সদস্য ছিলেন, তাঁরাও বাংলা ভাষা চর্চা করেননি, তাঁদের উপর উর্দু ও ফারসী ভাষার পুস্তক প্রণয়নের ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল।[১] মুসলমানের সম্পাদনায় কয়েকখানি উর্দু ও ফারসী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা পত্রিকা একখানাও প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩১ সালে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' নামে দ্বিভাষী এবং ১৮৪৬ সালে রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' নামে পঞ্চভাষী পত্রিকায় বাংলার স্থান ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল উর্দু-ইংরাজী সংবাদের বাংলা তরজমা মাত্র; সে তরজমাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল, বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ বহন করে না তা।[২] আধুনিক মন ও মননের বাহন হিসাবে যে বাংলা গদ্যের বিকাশ হয়েছিল, ঐযুগে বাংলার মুসলমান তার অংশভাগী ছিল না। সভারাজেন্দ্র ও ভাস্করের গদ্যাদর্শ কোন বাঙালী মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, করলে ঐ সময় দু'একজন গদ্য লেখককে পাওয়া যেত।

আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্বে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি ছিল ভিন্নমুখী। ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরাজী শিক্ষার

---

৩৩ জন মৌলবী—মুনশীর নাম দিয়েছেন। তাঁরা হলেন—আরবী-ফারসী বিভাগ: করম হোসেন, আবদুর রহিম, জান আলী, শেখ আহম্মদ, বাহাদুর আলী, হোসেন আলী, তেগ আলী, হিসাম উদ্দীন, মির্জা নূর আলী, মওলা বকস, আব্বাস আলী, কোববান আলী, নাদির আলী, মির্জা হাসান আলী, সৈয়দ কাজিম আলী, ফরহাত আলী, মহম্মদ আলী, কলব আলী, মীর বকসিস আলী, মহম্মদ ওয়াজিদ, মর্তুজা খান, ইউসুফ আলী, আবদুস সামাদ, নজরুল্লাহ,-ওয়াজিব উদ্দীন, মহম্মদ ওয়াসি, বাবউল্লাহ, দলিল উদ্দীন, মাহফুজ আলী, মীর তসাদ্দক হোসেন, বাহাদুর আলী, মীর মনসুর আলী ও মীর সৈয়দ আলী।

Thomas Roebuck (edited)—*The Annals of the College of Fort William*, Hindoostans Press, Calcutta, 1819, PP. 47-48 (Appendix).

১. স্কুল বুক সোসাইটির সদস্যদের নাম: মৌলবী আমানুল্লা, কোম্পানীর উকিল, সদর দেওয়ানী, মৌলবী করম হোসেন, ফারসী ও আরবী পণ্ডিত, মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ, সোসাইটির সম্পাদক, মৌলবী আবদুল হামিদ।

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির সদস্যদের নাম: মীর্জা কাজিম আলী খান, সরকারী সেক্রেটারী অফিসের ফারসী মুনশী, বেলায়েত হোসেন, মুফতি, কলিকাতা হাইকোর্ট, দরবেশ আলী, বেনারসের রাজার উকিল, নুরুন্নবী, রামপুরের নবাবের উকিল।

A. F. Salahuddin Ahmed—*Social Ideas and Social Changes in Bengal* (1818-1835). Calcutta 1976, P. 24 (2nd. Edition).

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯ পৃ: ৩৯, ৮৮ (৪সং)।

দ্বারা চাকুরী-বাকুরীতে সুযোগ করে নিয়ে হিন্দুগণ উন্নতির দিকে, এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অমনোযোগী ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিমুখ থেকে চাকুরী ও ব্যবসায়ের সুযোগ হারিয়ে মুসলমানগণ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। হিন্দু-মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে, মধ্যবিত্তের এই অসম বিকাশ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা ছিল। বিনয় ঘোষ ঐ সময় মধ্যবিত্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীর অনুপস্থিতিকে সমাজের 'ট্র্যাজেডি' বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও মুসলমান সমাজের পতন

মুসলমান আমলে অভিজাত রাজপুরুষ, মধ্যস্বত্বভোগী সরকারী বেসরকারী কর্মচারী,, জমিদার-জোতদার, ছোটখাট ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী এবং গ্রামের ক্ষেতচাষী, দিনমজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা—এই তিন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর কতকগুলি দিক দিয়ে মুসলমান সমাজে প্রত্যক্ষ আঘাত আসে। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশীয় সামরিক বাহিনী বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। লর্ড ক্লাইভ সামরিক ক্ষমতা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন, উচ্চ পদ-গুলি ইংরাজ অফিসার দ্বারা পূর্ণ করেন। 'পুতুল' নবাব মীরজাফরের অধীনে পরিমিত সৈন্য রাখা হয়। পরে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার কাজে যে সামান্য সংখ্যক সেনাবাহিনী ছিল, সেটাও অপ্রয়োজনবোধে সরকার তুলে দেন।[২] ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর রাজস্ববিভাগেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শাসনভার নামে মাত্র মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতে থাকে। মোহাম্মদ রেজা খান বাংলায় এবং সিতাব রায় বিহারে কিছুকাল নায়েব-নাজিম ছিলেন বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে রাজস্ব বিভাগে জেলা-কালেক্টর ও দেওয়ানী আদালতে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলিতে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করা হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা বিহার উড়িষ্যার সর্বময় কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং 'গভর্নর জেনারেল' উপাধি ধারণ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বৃত্তিভোগী হয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। নবাবের ভাতা প্রথমে ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা, পরে পরিমাণ কমে ৩২ লক্ষ এবং আরও পরে ১৬ লক্ষ টাকা হয়। নবাবের বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর

১. বিনয় ঘোষ—বাংলার বিদ্বৎসমাজ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২২
২. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 101

অধীনস্থ কর্মচারী, আশ্রিতজন ও অনুগ্রহ ভাজনের সংখ্যাও হ্রাস পায়। বিচার বিভাগে কিছুকাল মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল বটে কিন্তু ক্রমে সেখানেও ইংরাজদের হাত পড়ে এবং উচ্চ পদগুলি তাঁরা গ্রাস করেন। প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালত (১৭৭২) এবং পরে সদর নিজামত আদালত (১৭৯০) কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়; সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি হন স্বয়ং গভর্নর। জেলা দেওয়ানী আদালতে বিচারের ভার থাকে জেলা-কালেক্টরের উপর। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে কাজী-অল-কুজ্জাত, কাজী, আমীন, দারোগা, মুফতি, মৌলবী, মুহুরী প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারী থাকতেন। ফৌজদারী আদালতে মুসলমান আইন বলবৎ থাকায় মুসলমান কর্মচারীর প্রভাব আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে।[১]

দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে হেস্টিংস প্রথমে রাজস্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, কেননা ভূমি-রাজস্বই সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল। রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার, আয়মাদার, মদদ-ই মাশ, ইজারাদার প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের মালিকানায় ভূমির ভোগস্বত্ব ছিল। রাজা মহারাজা বংশ পরম্পরায় ভূমির মালিকানা পেতেন। জায়গীরদার নগদ টাকার পরিবর্তে নিষ্কর অথবা সামান্য করের বিনিময়ে জায়গীরদারী পেতেন। রাজা, মহারাজা ও জায়গীরদার নিজ নিজ এলাকায় জমিদার নিয়োগ করে রাজস্ব আদায় করতেন। জমিদারের

---

১. প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৩ সালে এক আইনের বলে ভারতীয়দের উচ্চপদাধিকার রহিত করা হয়। ঐ বছর বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালস কোর্ড' অনুযায়ী বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করে জেলা-জজ, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দেশীয়দের আধিপত্যের অবসান ঘটান হয়। ঐতিহাসিকের অভিমত—"The net result of the changes introduced by Cornwalis was to devide the entire administrative work in a district between two European officers, one acting as a Collecror of Revenue, and the other a Judge and Magistrate, Indians were deliberately excluded from offices involving trust and responsibility." রাজস্ব ও বিচার বিভাগ থেকে দেশীয় কর্মচারী অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরো আগে থেকে। দেশের প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে কোম্পানীর স্বার্থোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্য তাঁদের সব সময় ছিল কিন্তু কাজী ও ফৌজদারগণ সহযোগিতা না করায় তাঁরা প্রথমে সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু পরে কোম্পানীর জয় হয়। ১৭৮৬ সালে দেওয়ানী বিচার ক্ষমতা এবং ১৭৯০ সালে ফৌজদারী ক্ষমতা দেশীয় কর্মচারীর নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ১৭৯৩ সালে 'কর্ণওয়ালিশ কোর্ডে' উক্ত প্রক্রিয়ার আরও প্রসার ঘটে।

Roychoudhury, Majumder and Datta—*An Advanced History of India*, Calcutta, 1953, P. 788; সুরেশচন্দ্র মৈত্র—বাংলা কবিতার নবজন্ম, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৬৯; ডক্টর সিরাজুল ইসলাম—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ, ১৯৮১

অধীন দেওয়ান, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী থাকতেন । খাস ভূমির মালিক সরকার ছিলেন; সরকার নায়েব, আমিল, সোজওয়াল প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। প্রথমে লর্ড হেস্টিংস ও পরে লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি-ব্যবস্থার এসব জটিল পদ্ধতি তুলে দিয়ে একটা সুষ্ঠু ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। একশালা, পাঁচশালা, দশশালা এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) পদ্ধতি স্থাপন করে ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিক হন। তিনি সরকারকে নিয়মিত বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রদান করে বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোগ করার অধিকার পান। এর সাথে 'সূর্যাস্ত আইন' নামে একটি আইন যুক্ত হয়। এই আইনের বলে নির্দিষ্ট সময় জমিদারীর খাজনা রাজকোষে পৌঁছে দিতে না পারলে সে-জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। বিত্তশালীরা জমিদারী নিলামে কিনে নিতেন। সরকারের উপর্যুপরি এসব ব্যবস্থার ফলে বনেদী জমিদারীগুলি বিধ্বস্ত হয়; এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার ক্ষতিগ্রস্ত হন। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, নাটোর থেকে শুরু করে ছোটখাটো জমিদারী এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। যাঁরা জমিদারী কিনতেন তাঁরা বেশীর ভাগ কলিকাতার নব্য বিত্তবান।[১] তাঁরা কোম্পানীর দেওয়ানী, বেনিয়াগিরী মুৎসুদ্দীগিরী, দালালী গোমস্তাগিরী, পোদ্দারী, মহাজনী করে টাকা উপার্জন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণী হিন্দু সমাজের লোক। পুরাতন হিন্দু ও মুসলমানের জমিদারী নব্য হিন্দু বিত্তবানের হাতে যায়। ১৮৭২-৭৩ সনে বাংলা বিহারের মোট ৩৮টি জেলায় জমিদারের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[২]

বড় জমিদারী (২০,০০০ একর ও তদূর্ধ্বে)	৫৩৩
মাঝারি জমিদারী (৫০০-২০,০০০ একরের মধ্যে)	১৫,৭৪৭
ছোট জমিদারী (৫০০ একরের নীচে)	১৩৭,৯২০
সর্বমোট	১৫৪,২০০

১৭৯৩ সালে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩১৭টি। সিটনকারের হিসাব মতে ১৮৫৮ সালে 'সদর জমিদারী'র সংখ্যা ছিল ৪,৫৫০টি। ইচ্ছামতী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত

---

১. রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্য, "Decendants of old houses found their estates pass into hands of money-lenders and speculators from Calcutta."
Ramesh Chandra Dutt—*The Economic History of India Under Early British Rule.*

২. Hailing Berry—*The Bengal Administration Report of 1872—73*, Vol. 1, P. 314 (Appendix).

এই সদর জমিদারীগুলি বিস্তৃত ছিল। এগুলির মালিক ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু ৩,৮৫৫টি (৮৫%), মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%) এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (১%)।[১] মুসলমানের জমিদারীগুলির বৃদ্ধি ছিল না, উপরন্তু এগুলি উত্তরাধিকারী আইনের ফলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এককালের জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি-কৃষকে পরিণত হন।[২]

মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের অধিকারী এক শ্রেণীর ভূমি-মালিক ছিলেন। সমাজের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। মসজিদ, মন্দির, দরগাহ নির্মাণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন, এমন কি নিঃস্ব ভিখারী ও মুসাফিরের জন্য লাখেরাজ দানস্বত্ব ছিল। খোন্দকার ফজলে রাব্বি এরূপ ভোগদখলকারীর ২৭ প্রকার নাম করেছেন, যেমন জায়গীর আল-তমঘা মদদ-ই-মাশ, আয়মা, মসকান, নজরাত, খানকাহ ফকিরান, নজরি দরগাহ, নজরি ইমামাইন জমিন-ই-মসজিদ, নজরি হজরত, খরচি মুসাফিরান, মেরামতি মসজিদ, মা-আফি, পীরান, খয়রাতি, খারিজ জমা, মিনহাই, ব্রহ্মোত্তর, মেহতেরান মালেক ও মালেকানা, দেবোত্তর, শিবোত্তর সুরজপর্বত, ইনাম ও মানকর।[৩] এগুলির মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, মেহতেরান ও সুরজপর্বত এই পাঁচটি কেবল হিন্দু এবং জায়গীর, আল-তমঘা, খারিজ জমা, মিনহাই, মালেকানা, ইনাম ও মানকর এই সাতটি হিন্দু-মুসলমান উভয় এবং বাকী পনেরটি মুসলমানরা ভোগ করত। রাব্বি সাহেব কয়েকটি জেলার কেবলমাত্র আয়মা সম্পত্তির একটি তালিকা দিয়েছেন এরূপে:[৪]

বর্ধমান	১,৭০৫
হুগলী	৮৯৪
মুর্শিদাবাদ	৭০০
বগুড়া	৬৯৪
২৪-পরগণা	১৬
মেদিনীপুর	১২
সর্বমোট	৪,০২১

১. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal,* P. 142.

২. "Owing to the Muhammadan Law of inheritence. there is a tendency for all Muhammadan families to gradually become impoverished, and many of the Ashraf (noble born) have thus been merged into the rank of the Ajlaf (low born)."

Census Report of India, 1901, Vol, IV. P. 442.

৩, *The Origin of the the Musalmans of Bengal,* PP. 69-70

৪. ঐ, পৃঃ ৭২

১৮২৮ সালের 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে' এসব সম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে বড় সম্ভ্রান্ত পরিবার দরিদ্র অথবা ধ্বংস হয়ে যায়।

শরীফ মুসলমানদের শেষ অবলম্বন ছিল রাজভাষা ফারসী। আদালতে ফারসী ভাষা চালু থাকায় বিচার বিভাগে অনেকে চাকুরীতে নিযুক্ত হতেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় ফারসীতে মুসলমান আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রথম দিকে সরকার মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে চাকুরীতে বহাল না করার নির্দেশ দিয়ে বিচার বিভাগের এই চাকুরীগুলিতে মুসলমানদের একচেটিয়া দখল বলবৎ রেখেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮৩৩–৩৮) ফারসী রহিত করে ইংরাজীকে রাজভাষা করেন। মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী-বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তী কালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও মুসলমান ছাত্ররা ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখায়নি। ফলে বিচার বিভাগে তাদের চাকুরীর ভিত ভেঙে পড়ে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪–৪৮) নিয়ম করেন যে, যাঁদের ইংরাজীতে ডিগ্রী আছে, তাঁরাই সরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার পাবেন।[১] ইংরাজী জ্ঞান ছাড়া চাকুরীতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় হিন্দুগণ ইংরাজী শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। অতএব অফিস-আদালতে তাঁদেরই চাকুরী হল, মুসলমানরা নেপথ্যে গেল। ১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী আইন হয় যে, কেবল ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠান পাবে না।[২] ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন,

১. 10 October, 1844, Resolution No. 1

"....that in every possible case a preference shall be given to those who have been educated in institutions thus establisbed (Zillah Schools and Central Colleges) and especially to those who distinguished themselves therein of a more than ordinary degree of merit and attainments."

Bengal Education Consultations (1843—52), (qouted from *'British Policy and the Muslims in Bengal*, P. 324).

২. ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ৭ মার্চ, ১৮৩৫ সালের ১৯ ধারার প্রস্তাবটি ছিল এরূপ: "His Lordship in Council is of the opinion that great of the British Government ought to be promotion of European Literature and Science amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purposes of education would be best employed on English education alone."

এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, ছাত্র-শিক্ষককে প্রদত্ত পুরাতন বৃত্তিগুলি চালু থাকবে, কিন্তু নতুনভাবে আর দেওয়া হবে না; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী নতুন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাচ্য বিদ্যার যেসব পুস্তক শিক্ষা খাতের টাকায় ছাপান হত, তা বন্ধ করে, উক্ত টাকায় গ্রামের লোকেদের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়।

British Policy and the Muslims in Bengal, P. 222

১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন ১৮৩৭ সালেব রাজভাষার পরিবর্তন, ১৮৪৪ সালের নতুন চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন—পরপর এই সব নিয়মের ফলে মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়; এতে অনেক শিক্ষক, মৌলবী, মুনশী জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন।[১] নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তনকে হান্টার মুসলমানের জন্য 'মরণাঘাত' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীর সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসীর রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরাজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এরূপটি হয়েছে। মূলতঃ অভিজাত শ্রেণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কৃষক, শ্রমিক. বিত্তহীন শ্রেণীর লোকেরা এসব আইনের বাইরে ছিল; তবে বণিক কোম্পানীর শোষণনীতি থেকে তারাও রেহাই পায়নি। কোম্পানী এদেশের কুটীরশিল্প ধ্বংস করেন বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। কোম্পানীর বাণিজ্যনীতির ফলে তাঁতি সর্বস্বান্ত হয়। নীলচাষে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। এর উপর রোগব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। আধুনিক জীবনের ফল তারা কিছুই পায়নি। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঘোর অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

---

১. ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত এই পাঁচটি জেলার ফারসী ভাষায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৭১৫ জন। ১৮৭২-৭৩ সালে ২৪-পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও কলিকাতা এই পাঁচটি জেলার হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকেব সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৯ ও ৮ জন।

W. Adam—*Third Report on the State of Education in Bengal.* 1938 : *General Report of Public Instruction in Bengal.* 1872—73, P. 411

১৭৮৫ সালেই লর্ড হেস্টিংস এই পতন দেখেছিলেন। তিনি ২১ জানুয়ারী ১৭৮৫ সালের এক 'মন্তব্যপত্রে' পতনেব ছবিটি বর্ণনা করেছেন এভাবে: "Since the management of revenues has been taken into our hands, it has chiefly been carried on by the English servants of this Company, and by the Hindus, ...In consequence of this change Mahomedan families have lost their sources of private emoluments which would enable them to bestow much expence on the education of their children, and are deprived of the power which they formerly possessed, of endowing and patronizing public seminaries of learning."

Bengal: Past and Present, Vol. VIII, PP. 109--11

২. *The Indian Mussalmans.* P. 167

কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ১৮৪৯ সালে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৫ সালে কলিকাতায় প্রথম মুসলমান প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জমনে ইসলামী' বা 'মহামেডান এসো-সিয়েশন' স্থাপিত হয়। মুসলমান আইন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মজহার এর নেতৃত্ব দেন। কলিকাতা হাইকোর্টের কাজী-অল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচারক কাজী ফজলুর রহমান আঞ্জমনের সভাপতি ছিলেন। আবদুল লতিফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া সরকারের নিকট গোচরীভূত করা উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এটি হিন্দু-মুসলমান মিলিত সিপাহীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল, তবে তাদের মদদ জোগিয়েছিলেন ইংরাজের দুর্নীতি, শাসননীতি ও কূটনীতির ফলে বঞ্চিত কতি-পয় ভারতীয় সামন্তপতি। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এই বিদ্রোহের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা হৃত মোঘল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু, হতবল ও অপরিণামদর্শী সামন্ত শক্তি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে হার মানে। বৃদ্ধ শাহ আলম বন্দী অবস্থায় রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন; মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ নির্বাপিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিল। ইংরাজ কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এতে চার কোটি টাকা রাজকোষ থেকে ব্যয় হয়েছিল। এই প্রথম 'ব্রিটিশ সিংহ' প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খায় এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শতাব্দীকালের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম পালন, ন্যায় বিচার ও মানবিক অধিকার লাভের সুযোগ পাবে। মুসলমানদের রাজ্য হারানোর ক্ষোভই সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল বলে ইংরাজদের ধারণা হয়েছিল। ফলে মুসলমানের প্রতি তাঁদের মনোভাব কঠোরতর হয়, কিন্তু সেই সাথে তাদের দাবী-দাওয়াকে তাঁরা অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল লতিফ কলিকাতায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেন। ভারতের বড় লাট এলগিন সোসাইটি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। আবদুল লতিফের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুটি, মুসলমানদের প্রতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সন্দেহ ও বিরূপ মনোভাব দূর করা এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, পশ্চাদপদ মুসলমানদের সরকারের প্রতি অনুগত করে তোলা। তিনি তাঁর কর্মসূচীর প্রতি স্থির লক্ষ্য

রেখে কলিকাতা ও কলিকাতার বাইরের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের একত্র করেছিলেন এবং যৌথচিন্তা ও কর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা স্বজাতির মন ও মননকে উদ্বোধিত করেছিলেন। আবদুল লতিফই প্রথম বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত ন্যূনাধিক এই পঁচিশ বছর মুসলমান সমাজের পতনের চূড়ান্ত কাল ছিল। এ সময় পর্যন্ত সমাজ ছিল কাণ্ডারী শূন্য। ছিন্ন পাল, ভগ্ন হাল নিয়ে তা অকূলে ভেসে গেছে। এদিকে হিন্দু সমাজের গতিপ্রকৃতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) মত শক্তিধর নেতা আবির্ভূত হয়ে শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সমাজের মানুষকে আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ ও সচকিত করে দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ত্রিমুখী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। পুস্তক প্রণয়ন, সভা গঠন, পত্রিকা সম্পাদন, তর্ক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে তিনি তাঁর আন্দোলনকে সজীব ও গতিশীল করে তুলেছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে তিনি মানবতারই জয় ঘোষণা করেন; হিন্দু সমাজের আবহমান কালের বদ্ধ অচলায়তন সংস্কারের ভিত ভেঙে পড়ে। হিন্দু কলেজে উচ্চমানের ইংরাজী শিক্ষা সমাজের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। জাতির আশা-আকাঙক্ষা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে হিন্দু সাহিত্যিক ও মনীষিগণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কলিকাতায় হিন্দুগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন; কলিকাতার নগরজীবনের সুযোগ সুবিধা তাঁরাই বেশী পরিমাণে লাভ করেন। ইংরাজদের সংসর্গে ও সহযোগিতায় চাকুরী ও ব্যবসায় করে তাঁরা অর্থের মালিক হন, তাঁরাই জমিদারী কিনে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। কয়েকটি ধনী পরিবারকে কেন্দ্র করে কলিকাতায় একটি নব্য অভিজাত শ্রেণীর সাথে 'নব্য বাবু' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও উদ্ভব হয়। এঁদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন, যাঁরা পুরাতন মূল্যবোধ ধরে রাখতে চান; আবার নবীনপন্থী প্রগতিশীল মানুষও ছিলেন, যাঁরা আধুনিক জীবনের মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায়; বলা বাহুল্য, নবীনরাই জয়ের গৌরবটিকা লাভ করেন। তাঁরাই আচার-সংস্কারে জর্জরিত সমাজকে গ্লানি ও বন্ধন থেকে মুক্ত করেন এবং সমাজদেহে নবতেজ ও নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। সুতরাং হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী ও ভিন্নধর্মী ছিল। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক যেসব সংস্কার-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ এগিয়ে যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে

সেসব ধরনের আন্দোলন মুসলমান সমাজে হয়নি। মুসলমানেরা হিন্দুদের এসব আন্দোলনে যোগদানও করেনি। আমরা পূর্বে দেখেছি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাথে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা উর্দুর চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ বাঙালী ছিলেন। উর্দুর সাথে বাঙালী মুসলমানের আত্মিক যোগ ছিল না। উপরন্তু তাঁরা যা রচনা করেছেন তা দিয়ে উর্দুভাষী ও উর্দুজ্ঞানী মুসলমানের চিত্তেও নতুন ভাব ও আশার সঞ্চার করতে পারেননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পণ্ডিতদের হাতে বাংলা গদ্যে কেবল সংস্কৃতের প্রভাব পড়েনি, সেই সাথে ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ সংযুক্ত হয়েছে। প্রতাপাদিত্যকে বীর চরিত্র রূপে আঁকা হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্রকে মহৎ করে দেখান হয়েছে। 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র সাথে যে আট জন মুসলমান বিদ্বান ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, তাঁরাও বাংলা ভাষার চর্চা করেননি; অন্য কোন ভাবেও সমাজের মধ্যে তাঁদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। বাংলা ও ইংরাজী পত্রিকার সাথে মুসলমানদের যোগ কোথাও দেখা যায় না। উর্দু ও ফারসীতে কয়েকখানি পত্রিকা মুসলমানগণ প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু ভাষার ব্যবধান পেরিয়ে সেগুলিও সমাজমনকে আলোড়িত করতে পারেনি। আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসভা, হিন্দুসভা প্রভৃতি যেগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিতে মুসলমানদের যোগদানের কথা নয়, কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতিমূলক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল (যেমন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমিতি ইত্যাদি), সেগুলিতেও মুসলমানেরা যোগদান করেননি। উইলিয়ম কেরীর 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টি কালচারাল সোসাইটি'তে (১৮২৩) ঢাকার নবাবের নাম পাওয়া যায়। 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন' বা 'ভূম্যধিকারী সভা'য় (১৮৩১) চারজন মুসলমান ছিলেন; এঁরা হলেন গোলাম নবী, মোহাম্মদ আমীর, হাবিবুল হোসেন এবং আমীনুদ্দীন।[১] 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৬) ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল দলে'র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই গোষ্ঠীর সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল না, অথচ প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী চিন্তার আদর্শ তারাই আমদানী ও প্রচার করে। উক্ত সভায় কোন মুসলমান সদস্য ছিল না, কিন্তু তাদের অপর সভা 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে (১৮৪৩) দুজন মুসলমান সদস্যের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন শাহজাদা জালালুদ্দীন ও মুনশী ফজলুল করিম।[২] 'বেথুন সোসাইটি'তে (১৮৫১)

১. সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয়—উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি, অনুশীলন, আশ্বিন, ১৩৭২
২. ঐ।

আবদুল লতিফকে সদস্য হিসাবে দেখা যায়। আবদুল লতিফ সোসাইটির বিভিন্ন সভায় যোগদান করতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।[১] তিনি পৃথক পৃথক সভায় দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। আবদুল লতিফের আগে অন্য কোন মুসলমান বুদ্ধিজীবীকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। নীরব থাকার প্রধান কারণ ছিল, হিন্দুগণ যেসব কারণে সভায় মিলিত হতেন, সেসব অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের মর্যাদা ও স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।[২] ১৮৩৫ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার কথা রটলে কলিকাতার মুসলমানগণ ৮৩১২ জনের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন।[৩] ১৮৩৭ সালে আদালতের ভাষা ফারসী তুলে দিলে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকে আপত্তি করেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পুরো সময়টা পর্যালোচনা করলে মুসলমান সমাজের নিষ্ক্রিয়তা, নির্জীবতা, নিশ্চলতার ছবিই ফুটে উঠে। এরূপ অবস্থায় সমাজের জাগরণ আশা করা বৃথা।

এই সময় কলিকাতার মুসলমান সমাজ নিষ্ক্রিয় ছিল বটে, কিন্তু গ্রামের মুসলমান সমাজ বেশ সক্রিয় ছিল। ২৪-পরগণায় তিতুমীর, (১৭৮২-১৮৩১) ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪—১৮৪০) ও দুধু মিঞা, (১৮১৯—৮২) এবং ওয়াহাবী নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বেশ জোরেশোরে আন্দোলন করেছিলেন। এসব আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব থাকলেও 'শ্রেণী সংগ্রামে'র একটা অন্তর্লীন রূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান নির্বিশেষে জমিদার-নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়।[৪] স্থানীয় জমিদাররা এঁদের দমন করতে পারেননি; ব্রিটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করে তিতুমীর লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন (১৮৩১)। তিনি ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সন্তান। সাধারণ কৃষকের সন্তান হাজি শরীয়তুল্লাহ ও দুধু মিঞা ফারায়েজী আন্দোলন করে জমিদার ও নীলকরদের চক্রান্তে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬—১৮৩১) 'ওয়াহাবী আন্দোলনে' বাংলার কৃষকেরা মুজাহিদ ও

১. বাংলার বিদ্বৎসমাজ, 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।
২. পূর্বোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২
৩. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 234
৪. হান্টার লিখেছেন, "In the present uprising around Calcutta in 1831, they broke into the houses of Mussalman and Hindu landholders with perfect impartiality."
The Indian Mussalmans, P. 107

অর্থ সংগ্রহ করে সীমান্তের সংগ্রামে প্রেরণ করত। 'সিপাহী বিদ্রোহে'ও এদের হাত ছিল। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এদের দমন করেন; অনেককে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে জেল, দ্বীপান্তর ও মৃত্যুদণ্ড দেন। এরূপ ব্যাপক ধরপাকড় ও বিচার-সালিসীর পর ১৮৭০ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের অবসান হয়।[১] সাধারণতঃ একটি আন্দোলনের সাথে অপর আন্দোলনের যোগসূত্র ছিল না; এগুলি দেশব্যাপী প্রচার লাভ করেনি, আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল; উপরন্তু শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পায়নি বরং বিরোধিতাই পেয়েছে।[২] ফলে এসব শ্রেণী-সংগ্রাম সাময়িকভাবে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শহরের বুদ্ধিজীবী সমাজ এসব আন্দোলন-কারীদের 'শ্রেণী-শত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এদের দমনে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের হাতকেই দৃঢ় করেছেন। তাঁরা সরকারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এদের 'ডাকাত', দেশদ্রোহী' বলেছেন।[৩] শহরের শিক্ষিত সমাজ যদি এদের সমর্থন দিতেন তা হলে 'নীলবিদ্রোহে'র (১৮৬০) মত এসব আন্দোলনেও সফলতা আসত। কেবল নীলবিদ্রোহে মধ্যবিত্তশ্রেণী কৃষককে সমর্থন দিয়েছিলেন। এর অবশ্য কারণ ছিল; নীলচাষে জমিদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন; তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তাঁদের অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংবাদপত্রে

---

১. ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরুত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করে গোপাল হালদার লিখেছেন, "ওহাবি প্রেরণা রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝড় তুলল। বিদ্রোহ হিসাবে সে এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমির খাঁনের ওহাবি মামলা সেদিনকার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরও স্বাধীনতা-স্পৃহাকেও প্রেরণা দেয়, হিন্দুদের মনেও ইংরেজ-বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। আর্থিক ক্ষেত্রেও বাঙলার ওহাবি আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত প্রজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেয়েছিল।"
গোপাল হালদার—বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৫, পৃঃ ৫২-৫৩

২. ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের বক্তব্য, "...a movement unsupported by the landlords, or the richer classes and discouraged by the State, spread far and wide embracing the large agricultural and manufacturing classes."
James Wise—The Muhammedan in Eastern Bengal, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol.LXIII, No. 1, 1894, P. 47
১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে'ও প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করা হয়:—In all cases it is the Ajlaf, or the lower class of the Muhammadans, who are most attracted by the preaching of the reformer (i.e. the Wahabis); the better classes generally hold aloof."
Census of India, 1901, Vol., Part 1, P. 373

৩. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, ডক্টর—সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ পৃঃ ১৩৭

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, নচেৎ রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর কৃষকের উপকার হচ্ছে বলে নীলচাষের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।[১]

নীচশ্রেণীর ও নিম্নবিত্তের সাধারণ হিন্দু এবং কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ মুসলমানের জীবন অন্ধকারেই ছিল। বর্ণ-বিত্তের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে নীচ ও গরীব শ্রেণীকে উপরে তোলার আন্দোলন কেউ করেননি। সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণে বিদেশী বণিক সরকার অপরিমিত শোষণ করেছেন! স্বদেশী উঠতি মধ্য-বিত্ত ও নব্য অভিজাত শ্রেণীচরিত্রের ধর্ম অনুযায়ী আত্মরতির সেবায় মগ্ন ছিলেন, অগণিত জনগণের দিকে ফিরে তাকাননি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ গঠন পর্ব ছিল; এ সময়ে শাসকের শ্রেণীস্বার্থের সাথে শাসকের আশ্রয়পুষ্ট মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ বাধেনি। কিন্তু গঠনপর্বের পরেই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগের ভাগাভাগি নিয়ে সংঘাত দেখা দেয়; তখনই ক্ষমতাহীন দুর্বল এই শ্রেণীর স্বদেশচিন্তা, স্বদেশপ্রেম, স্বদেশহিতৈষণা, স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়। প্রবলের বিরুদ্ধে শ্রেণী-দ্বন্দ্বে জনগণের সমর্থন লাভ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় তাঁরা গণমুখী চিন্তা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হন এবং স্বদেশবাসী হিসাবে তাদের সঙ্গী করে নেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এরূপ রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের পর সমাজের গতি-প্রকৃতি নতুন মোড় নেয়, নতুনভাবে আন্দোলন শুরু হয়। বিশ শতকে এর পুরো ফল ফলে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও মুসলমান মধ্যবিত্ত

যেহেতু 'বিত্তের' মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তের শ্রেণীকরণ, সেহেতু মার্কসের সমাজতত্ত্বের আলোকে এর সংজ্ঞা দাঁড়ায় "...a middle class in the literal sense of the term is interpreted...as a previleged upper minority feeding on surplus value and State favouratism and inexorably driving its victims into the ranks of the proleteriat."[২]

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিত্তের মালিক রাষ্ট্র: বিত্ত উৎপাদন করে রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণ। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই কর্মী—শ্রমশক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তি অনুযায়ী তাঁরা রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগ করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতি-

---

১. সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৯(২সং)।
২. Edwin R.A. Seligman (ed.)—*Encyclapeadia of Social Sciences*, Vol. 9 The Macmillan Company, Newyork, 1950, P. 407 (Reprinted).

গতভাবে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিরা বিত্তের মালিক, তাঁরা সমাজের উঁচু স্তরের লোক; সমাজের নীচের তলায় আছে শ্রমজীবী জনসাধারণ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যস্তরে 'প্যারাসাইট' বা পরানুজীবী সংখ্যালঘু মধ্যবিত্তশ্রেণী বিরাজ করে। সমাজে এদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সমালোচকের ভাষায়, "...the middle class includes within its ranks the middling size enterpreneur in industry and trade; the simple producer of goods, such as the artisan and farmer; the small shopkeeper and tradesman; and the official and salaried employee."[১]

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাতেও মধ্যবিত্ত ছিল। রাজতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজপুরুষ এবং পারিষদবর্গ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের তাঁরাই মালিক; তাঁদের নীচের তলায় ছিল বেতনভুক্ত ও অনুরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ভূম্যধিকারী ব্যবসায়জীবী একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী; এদের নীচে ছিল কায়িক শ্রমোপজীবী প্রজা সাধারণ। সামন্ত সমাজে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটি আকারে ক্ষুদ্র ছিল, কেননা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বেশী ছিল না। সামরিক, রাজস্ব ও বিচার বিভাগ ছিল বটে, কিন্তু এর কোনটিই আধুনিক যুগের মত জটিল ও ব্যাপক ছিল না। শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা শাসকগোষ্ঠীর বংশবদ হয়ে থাকত; প্রজাদের পণ্যে জীবিকা নির্বাহ করলেও প্রভুর স্বার্থে প্রজাদের উপর খবরদারি করত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রশাসন, ভূমি ও ব্যবসায় কেন্দ্রিক উক্ত মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না; কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কারণে তারা গ্রামে ছড়িয়ে থাকত; কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিস্তৃত না হওয়ায় রাজধানীতেও তাদের সংখ্যা বেশী ছিল না। ফলে তারা কোন এক জায়গায় একত্র হওয়ার সুযোগ পায়নি। এসব কারণে তারা দেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে কিংবা অর্থনীতি-রাজনীতিতে নিজস্ব প্রভাব ফেলতে পারেনি। সমাজে তাদের কোন স্বাধীন, গতিশীল সত্তা ছিল না।[২] সে যুগে এক 'দরবার-সংস্কৃতি', আর এক 'লোক-সংস্কৃতি' ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না। সামন্ত যুগের প্রাসাদকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং ভূমি ও কুটীরশিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতির স্থবিরতা ভেঙে দিয়ে যখন প্রশাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে ও কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, প্রসারতা ও গতিশীলতা আসে তখনই

১. *Encyclopeadia of Social Sciences*, Vol. 9, P. 407
২. বাংলার বিদ্বৎসমাজ, পৃঃ ৫৭

দেখা দেয় জটিল, সংকরধর্মী আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণী। নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের উদ্ভব ও বিস্তারের ফলে আগের তুলনায় এর আকৃতি বেড়ে যায়। প্রকৃতির দিক থেকেও অনেক পরিবর্তন ঘটে। এর গঠনে বহুমাত্রিক উপাদান থাকলেও শহর-নগরে একত্র বসবাসের ফলে জীবন ধারা, আচরণ পদ্ধতি, চিন্তাকর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধের একটি অভিন্ন শ্রেণী-ঐক্য গড়ে উঠে।[১] জাগ্রত, শিক্ষিত, উন্নত শ্রেণী হিসাবে একটি মার্জিত ও পরিশীলিত সংস্কৃতির উদ্ভব হয় যা কেতাদুরস্ত দরবার-সংস্কৃতি ও স্থূল রুচির লোক-সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। আঞ্চলিকতামুক্ত সকলের বোধগম্য ভাষা মৌখিক কথাবার্তার ও সাহিত্যের বাহন হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজে নেতৃত্ব দেয়। উদ্ভাবনীশক্তি ও মননশীল ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে কতক ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর পিছুটানও ছিল। উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় এ শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি; খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য তাকে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি-পতি ও ক্ষমতাশীলদের তাবেদারী করতে হয়। এরূপ পরনির্ভরশীলতার জন্য শ্রেণী-সংঘাত বা বিপ্লবের ঝুঁকি নিতে পারে না। এ-শ্রেণী মেধা বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, কুশলতা ও সৃজনশীলতার কারণে সমাজের সারভাগ হিসাবে সুবিধা ভোগ করে ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে উপর তলার প্রভুদের এবং নীচু তলার সর্বহারাদের মধ্যকার শোষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ার হিসাবেও কাজ করে।

সামাজিক শ্রেণী হিসাবে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের মূল উৎস যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য। বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরাই ইউরোপীয় সামন্ত-শাসনের অবসান ঘটান এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের কলকারখানা, ফার্ম, ব্যাংক, গিল্ড পার্টি, এজেন্সী চালাবার জন্য এবং রাষ্ট্র-যন্ত্রের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। ইংরাজ কর্তৃক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাই চালু ছিল। ভূমির রাজস্ব ছিল রাজভাণ্ডারের মূল উৎস। কৃষকের ঘর থেকে এই রাজস্ব আসত। তবে একথা ঠিক যে মোঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগে

---

১. বি. বি. মিশ্র লিখেছেন, "though heterogeneous and even mutually conflicting at times, exhibited in great measure an element of uniformity not only in their behaviour pattern and style of life, but also in their mode of thinking and social values."

B.B. Misra—*The Indian Middle Class*, Oxford University Press, London, 1961, P, 12.

মহাজনী কারবারে ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে একটি ধনিক শ্রেণীর হাত ক্রমশঃ শক্ত হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলার টাকশালের মালিক ছিলেন জগৎ শেঠ। উমি চাঁদ ছিলেন বিত্তশালী বণিক। এঁরা নবাবদের বিলাসিতায় ও যুদ্ধে অর্থ যোগাতেন, ইংরাজ কোম্পানীকেও ঋণ দিতেন। অর্থের পাহাড় বানিয়ে এঁরা সামন্তপ্রভুর কাছে সামাজিক উচ্চ মর্যাদা পেতেন না, ধনসম্পত্তির নিরাপত্তাও ছিল অনিশ্চিত। ফলে তাঁদের সাথে সামন্তশক্তির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, এক্ষেত্রে বণিক কোম্পানী তাঁদের সহায়ক হয়েছে।

বণিক সরকার কোম্পানীর দ্বারাই কলিকাতায় আধুনিক মধ্যবিত্তের পত্তন হয়। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও কোম্পানী ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতি বজায় রাখেন, প্রথমে এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করেননি। প্রশাসন ও বাণিজ্যের উপর তলায় সমাসীন থেকে দেশ শাসন ও শোষণ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে পুরাতন সামন্ত ব্যবস্থাকে ভেঙে না দিয়ে বরং টিকিয়ে রাখেন, কারণ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এঁদের সহযোগিতা আবশ্যক ছিল, উপরন্তু সামরিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এঁদের অনুগত করে রাখা সম্ভব হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিতে বংশ পরম্পরায় ভোগাধিকার দিয়ে জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরপর কতকগুলি রাজস্ব-নীতির প্রবর্তনের ফলে পুরাতন জমিদাররা ধ্বংস হন, তার স্থলে শহরের নব্য বিত্তবানরা জমিদারী কিনে ভূমির মালিক হন। কলিকাতার বিত্তবানদের এছাড়া পুঁজি বিনিয়োগের অন্য পথও ছিল না। বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া কোম্পানীর দখলে ছিল। ইংরাজ এদেশে কলকারখানা স্থাপন করতে চাননি, তাঁরা এদেশের কাঁচা মাল দিয়ে ম্যানচেস্টারের মিল চালাতেন। বহির্বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে সাহস করতেন না দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীরা। দ্বারকানাথ প্রথম বহি-র্বাণিজ্যে পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারেননি।[১] ফলে ভূমির দিকেই ঝোঁক বাড়ে। ভূস্বামী হয়ে অনেকে কৌলিন্যের মর্যাদা বাড়াতে অভি-লাষী হয়েছেন। ফলে দেশে সামন্ত-প্রভাব বজায় থাকল। ডক্টর নজমুল করিম মোঘল শাসনকে 'সামরিক সামন্ততন্ত্র' বলেছেন.[২] বণিক কোম্পানীর শাসনকে 'ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্র' বলা যেতে পারে। ইংরাজগণ রাজস্বনীতি, ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে রাজস্ব বিভাগকে সম্প্রসারিত করেন। ভূমিতে

১। বিনয় ঘোষ—বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১১৫

২ *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 36.

প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে কেনাবেচায় রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক হয়ে পড়ে। নতুন ভূমি উদ্ধার ও ভোগদখল নিয়ে প্রজায় প্রজায়, কি জমিদারে জমিদারে মামলার সংখ্যা বেড়ে যায়; ফলে দেওয়ানী আদালতের দায়িত্ব বাড়ে ও আইন ব্যবসায়ে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ে। উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, এ্যাটর্নি, মুন্সেফ, জাস্টিস, পেস্কার, ভেণ্ডার প্রভৃতি কর্মচারীর আবির্ভাব হয়।

ইংরাজগণ প্রশাসন ব্যবস্থায় বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। গভর্নর-জেনারেল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী; তিনি কার্যকরী সংসদের পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। গভর্নর-জেনারেলের অধীনে বিভাগগুলিতে ডিভিশনাল কমিশনার, জেলাগুলিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, থানায় পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর এবং গ্রামে চৌকিদার থাকবেন। চৌকিদার ছাড়া আর আর সব রাজকার্যের নিজস্ব দপ্তর আছে এবং সেগুলির বিভিন্ন কর্মচারী আছে। গভর্নর থাকেন রাজধানী কলিকাতায় রাজভবনে, কলিকাতায় একটি উচ্চ আদালতও স্থাপিত হয় (১৭৯১)।

ইংরাজ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসার যুগ পেরিয়ে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ আসে। ইংরাজগণ ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ইংরাজী ভাষা, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পদ্ধতি আমদানী হয়। মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে শিক্ষক-অধ্যাপক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসন কাজ চালাবার জন্য কর্মচারীও দরকার হয়। একটি বিপুল আকার শিক্ষা বিভাগ গড়ে উঠল যার প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা। শিক্ষা ব্যবস্থা তদারক করার জন্য প্রথমে 'জেনেরাল' কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' (১৮২৩), পরে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' (১৮৪৩) এবং তৎপর 'ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (১৮৫৪) গঠিত হয়। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী হিসাবে বহু লোক চাকুরীজীবী হলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, মুদ্রণশিল্প, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেশাদার-অপেশাদার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমদানী-রপ্তানীর সম্প্রসারণ ঘটে এবং নতুন নতুন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ম্যানেজার, এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কেরানী, সুপারভাইজার, এজেন্ট, পিয়ন, চাপরাশীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কাগজ, কাপড়, তেল, ধান, পাট, নীল প্রভৃতির ছোটখাট কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে শ্রমিক ও কর্মচারীর ভিড় জমে।

রেল, স্টীমার চালু হলে গার্ড, ড্রাইভার, টিকিট-চেকার, স্টেশন-মাস্টার, সারেঙ্গ, খালাসী, কুলি ইত্যাদি লোকের আবির্ভাব হয়।

ডাক-তার-টেলিফোন ইত্যাদি বিভাগে কর্মচারী নিযুক্ত হয়। এসব বিভাগের প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা। কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষীর দল সমবেত হয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী মিশ্র সমাজস্তর গড়ে তোলে যাকে শহরকেন্দ্রিক শ্রেণীসচেতন আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণী বলা হয়েছে। রাজধানী-শহর, শিল্প-শহর, বন্দর-শহর প্রভৃতি অঞ্চলে এক এক কাজের গুরুত্ব অনুসারে কর্মচারী ও শ্রমিকশ্রেণীর ভিড় হয়েছে ও শহরের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় শহরগুলিতে মধ্যবিত্তের গঠনে শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মী ও কর্মচারীর সংখ্যা বেশী; ভারতীয় শহরগুলিতে প্রধানত: সরকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচরী, শিক্ষক-ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে।[১] ডক্টর বি. বি. মিশ্র ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্লেষণ করে এগারটি গ্রুপ নির্ণয় করেছেন, সেগুলি হল:

(১) আধুনিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মার্চেন্ট, এজেন্ট, প্রোপ্রাইটর, সংশ্লিষ্ট পার্টনার, ডিরেক্টর ইত্যাদি।

(২) ব্যাংক, বাণিজ্য ও শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত উচ্চ কর্মকর্তা তথা ম্যানেজার, ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার এবং প্রযুক্তিবিদ।

(৩) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, জনকল্যাণ-মূলক সংস্থা. সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মচরী।

(৪) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ।

(৫) আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, অধ্যাপক, উচ্চ ও মাঝারি শ্রেণীর লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, ধর্ম প্রচারক ও পুরোহিত।

(৬) মাঝারি ধরনের জোতদার, খামার মালিক ইত্যাদি।

(৭) ভাল পসার আছে এমন দোকান, হোটেল ইত্যাদির মালিক এবং সেগুলিতে নিযুক্ত ম্যানেজার, একাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি কর্মচারী।

(৮) কৃষি খামারের মালিক এবং কর্মচারী।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্দ।

(১০) বিপুল সংখ্যক কেরানী, সহকারী এবং অনুরূপ কায়িক শ্রমহীন কর্মচারী।

১. *The Indian Middle Class*, P. 12

(১১) মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চ পদের শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অফিসার, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ।[১]

শাসন ক্ষমতায় আসার আগে বণিক কোম্পানীর সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রধানতঃ দোভাষী, কেরানী, গোমস্তা, দালাল, সরকার, মুৎসুদ্দী, মুন্সী, দফাদার, ঠিকাদার, দেওয়ান ইত্যাদির কাজ করতেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি দেশীয় কারিগর কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। বর্গী হাঙ্গামার সময় (১৭৪২) উপদ্রুত অঞ্চলের ধনী লোকেরা নিরাপত্তার জন্য কলিকাতায় আগমন করে বসবাস শুরু করেন।[২] কোম্পানী কর্তৃক দেশের শাসন ভার গ্রহণের পর কলিকাতা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে, ফলে সেখানকার প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ পদগুলিতে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার ছিল, অধঃস্তন পদগুলি দেশীয় কর্মচারী দ্বারা পূরণ করা হত। ক্রমে ক্রমে দেশের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন শিল্পের (বিশেষ করে যন্ত্রশিল্পের) আমদানী না হওয়ায় দেশীয় লোকের কাছে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও চাকুরী ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। কেরানী, মুন্সী, পিয়ন, চাপরাশী চাকুরীর কাজে বাঙালীরা কলিকাতায় সমবেত হয়। ক্রমে এদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয়, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সংখ্যা বাড়ে, পরে কিছু কিছু উচ্চ পদ লাভের সুযোগ ঘটে; আইন, ডাক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতি স্বাধীন পেশারও উদ্ভব হয়। এদের সমন্বয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠে। দেশের মফস্বল শহরগুলিতে কলিকাতার আদর্শেই মধ্যবিত্তের বিকাশ হয়; গ্রামাঞ্চলে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত ভূস্বামী, তালুকদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার, জোতদার, দাদনদার, মহাজন, জমিদারী আমলার সমন্বয়ে মধ্যবিত্তের একটি প্রবাহ কমবেশী পূর্বকাল হতেই ছিল। ব্যবসায়িক, পেশাগত এবং ভূমিসম্পৃক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই তিনটি ধারা আধুনিক মধ্যবিত্তের প্রধান উপাদান ছিল। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে যে ভাবে মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ষে সে ভাবে হয়নি। উভয়ের মধ্যে উপাদানের দিক থেকেও পার্থক্য আছে। বাণিজ্য দ্বারা ইউরোপে যখন ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় তখন সেখানে মধ্যবিত্ত বলতে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল। এই বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত যন্ত্রশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতি হন। ইউরোপীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী মুখ্যতঃ সেই শিল্প ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

১. *The Indian Middle Class*, PP. 12-13

২. *Muslims of Calcutta*, P. 15; বাঙলার সংবাদপত্র ও নবজাগরণ, ৮৫

আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান আমলেও একটা ধনী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী শ্রেণী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ইউরোপীয় ধনিক শ্রেণীর মত রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী ছিলেন না। এজন্য তাঁরা ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মত সরাসরি কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ইংরাজদের সহযোগিতায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হল, তা প্রধানতঃ প্রশাসনিক চাকুরী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল।[১]

আমরা পূর্বে দেখেছি, ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের পতনে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার ১৭৯৯ সালে মহীশূরের পতনে টিপু সুলতানের রাজপরিবার এবং ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতনে শাহ ওয়াজিদ আলীর নবাব পরিবার কলিকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব পরিবারের সাথে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী, দাসদাসী ও আশ্রিত বাৎসল্যজনেরও আগমন ঘটে। ১৭৮০ সালে স্থাপিত কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচার কার্যে দক্ষ কর্মচারী তৈরি করা। রাজভাষা ফারসী ও আদালতে মুসলমান আইন বলবৎ থাকায় মুসলমানদের একটি শ্রেণী রাজকার্য পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ সদর আমীন, আমীন, কাজি-অল-কুজ্জাত, কাজি, মুফতি, মুনশী, মৌলবী, উকিল, মুহুরী, নকলনবিশ, অনুবাদক, জেলর, দারোগা প্রভৃতির কাজে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল।[২] ধর্মপ্রচার ও শিক্ষকতার পেশায় আর একটি শ্রেণী নিযুক্ত ছিলেন। কতকগুলি ছোট-খাটো ব্যবসায় বাঙালী-অবাঙালী মুসলমানের একচেটিয়া দখলে ছিল, সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভূমির সাথেও তাদের একটা অংশ যুক্ত ছিল। হিন্দুর সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও মধ্যবিত্তের সব স্তরে তাদের স্থান ছিল। কিন্তু যখন একদিকে মধ্যবিত্তের গঠনের পালা চলছে এবং অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ, নতুন জীবনধারার সৃষ্টি হচ্ছে তখন হিন্দু ও মুসলমানের বিকাশ একমুখী হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের গতি যে প্রায় বিপরীত মুখী ছিল, সেকথাও পূর্বে আলোচনা করেছি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মুসলমানের নতুন যাত্রা শুরু হয়। আধুনিক জীবনের প্রধান 'জীয়ন-কাঠি' ছিল ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা ; সেই ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজের নবচেতনা জাগ্রত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলমান সমাজকে সেই পথ অনুসরণ করতে হল। রামমোহন রায় (১৭৭৩-১৮৩৩)

১. *The Indian Middle Class*, P. 5 (Preface).

২. *British Policy and the Muslims in Bengal*, P. 47

ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, জন ডিগবীর অধীনে সেরেস্তাদারের চাকুরী করার সময় তিনি ইংরাজী শিখেন, ১৮১৫ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন এবং কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনে একটা নতুন পথের সন্ধান দেন। কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ১৮৫৯ সালে আলীপুরে বদলী হয়ে আসেন; ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করে কলিকাতার শরীফ মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।

কলিকাতা ও কলিকাতার বাইরে বাংলার যে কয়টি অভিজাত পরিবার ছিল, সেগুলি আধুনিক যুগের গতি-প্রকৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিল। পরিবারের সদস্যগণ আরবী-ফারসী ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত মনে করতেন এবং সেসব ভাষাতেই সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। ফারসী ভাষার ক্লাসিক মর্যাদা ছিল; ফারসী সাহিত্যও উন্নত মানের ছিল। প্রথমে যে ইংরাজী বিদ্যা শিখানো হত, তা মূলতঃ সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। এক চাকুরীর সুবিধা পাওয়া ছাড়া ইংরাজীর প্রতি শরীফ মুসলমানেরা অন্য কোন আকর্ষণ অনুভব করেননি। প্রথম দিকে অফিস-আদালতে ফারসী চালু থাকায় চাকুরীর কারণে ইংরাজী শিক্ষার তাগিদও ছিল না। শিক্ষার প্রতি মোহ ও ইংরাজী শিক্ষার তাগিদের অভাব—এই উভয়বিধ কারণে তাঁরা পূর্বপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ ও চিন্তার জগতে মগ্ন ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর তাঁদের মনে ক্ষোভ থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল; এর উপর ইংরাজদের হাতে মুসলমান শক্তিগুলির একের পর এক পতনে তাঁদের মর্মজ্বালা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা থেকে সমস্ত অভিযান চালান হত।[১] উত্তর ভারতের মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে গভীর প্রতিক্রিয়া হয়। আফগান সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা করে এ দেশের কোন এক উর্দু পত্রিকায় লেখা হয় যে, আফগানরা ব্রিটিশ সিংহকে লাথি মেরে আরব সাগরে নিক্ষিপ্ত করবে।[২] সুতরাং ইংরাজদের সাথে তাদের সদ্ভাব ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসে।

---

১. ১৭৯৯ সালে মহীশূরের পতন, ১৮৪৩ সালে সিন্ধুর আমীরদের পতন, ১৮৫৫ সালে আফগানিস্তানের পরাজয়, ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতন, ১৮৫৭ সালে দিল্লীর পতন হয়। শিখ ও মারাঠার পরাজয়ে মুৎসুদ্দী হিন্দু শ্রেণীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি; ব্রিটিশ সৈন্যের কাছে শিখদের পরাজয়ে কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উল্লাস প্রকাশ করেন।

২. পূর্বোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২

কলিকাতার উঠতি 'বাবু শ্রেণী'র ও ধনিকশ্রেণীর মনে এ ধরনের বিরোধ বা প্রতিক্রিয়া বিশেষ একটা ছিল না। ইংরাজ বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা সভা, পার্টি, উৎসব করতেন। বার্মা ও শিখ যুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত ইংরাজ বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। টিপু সুলতানের পতনের পর একজন হিন্দু রাজাকে সিংহাসনে বসানো হলে কলিকাতার হিন্দুগণ কোম্পানীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১] শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দ যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন মুসলমান সমাজের পক্ষে সেসব আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কুলীনপ্রথা ইত্যাদি মুসলমান সমাজের সমস্যা ছিল না। সরকারের সাথে দাবীদাওয়ার ব্যাপারে হিন্দু নব্য সম্প্রদায় যে সুর তুলেছেন, সেগুলি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল: যেমন ফারসীর স্থলে ইংরাজীকে রাজভাষা করা, সরকারী চাকুরীতে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের অগ্রাধিকার দেওয়া, চাকুরী নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি। উগ্রপন্থী ইয়ং বেঙ্গলরা তাঁদের মুখপত্র 'রিফর্মার', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়ারে' এসব ব্যাপারে জোর আন্দোলন করেছে।[২] সুতরাং হিন্দুদের সাথে একত্রে মিলে আন্দোলন করাও সম্ভব হয়নি। বস্তুতপক্ষে কলিকাতার শরীফ শ্রেণী জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমশ: নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। সরকারী অর্থে পরিচালিত সর্ব প্রাচীন কলিকাতা মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী শিক্ষার অঙ্গন করে তাঁরা আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। ১৮২৩ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার প্রস্তাব উঠলে পর মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮২৬ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের ইতিহাসে আবদুল লতিফ ও ওয়াহিদুন্নবী মাত্র দুজন জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করতে সক্ষম হয়। ঐ সময়ের মধ্যে হুগলী কলেজ থেকে সৈয়দ ওয়ারেস আলী ও মুসা আলী জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ করেন। সৈয়দ ওয়ারেস আলী ছিলেন সৈয়দ আমীর আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উক্ত চার ব্যক্তি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হয়েছিলেন।[৩]

---

১. পূর্বোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২
২. ঐ।
৩. সৈয়দ মর্তুজা আলী—মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৭২

আবদুল লতিফ ১৮৪৯ সালে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি ১৮৫৩ সালে ১০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল ভারতের বর্তমান অবস্থায় মুসলমান ছাত্রের জন্য ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা এবং সে-শিক্ষার গ্রহণ-যোগ্য পদ্ধতি।[১] এডুকেশন কাউন্সিলের তদানীন্তন সেক্রেটারী এফ. জে. মোয়াট আবদুল লতিফকে এ ব্যাপারে উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেন। ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধ এসেছিল। বোম্বাই এর জনৈক আরবী-ফারসী শিক্ষক (সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ) ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পান।[২] বাংলার ছোটলাট স্যার জে. পি. গ্রান্টের নির্দেশ ক্রমে আবদুল লতিফ ১৮৬১ সালে হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট প্রদান করেন।[৩] তিনি ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তার করা।[৪] আবদুল লতিফের পর সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব হয়; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ. বিএল এবং বিলাত থেকে ব্যারি-স্টারী পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। এটি মূলতঃ রাজ-নৈতিক সংগঠন হলেও এর কর্মসূচীতে সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী ইংরাজী শিক্ষার পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীর সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮) ইংরাজী শিক্ষার সপক্ষে সারা উত্তর ভারতে এক প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৭৫ সালে 'আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করে তাঁর আন্দো-লনকে বাস্তব রূপ ও ভিত্তি দান করেন। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি; সন্দেহপরায়ণ ইংরাজ শাসকের মনোভাব যাতে কঠোরতর না হয় সেজন্য তাঁরা উভয়ে নীলকণ্ঠের মত বশ্যতার হলাহল পান করে বিদেশী শাসকের পক্ষাবলম্বন করেন; তাঁরা চেয়েছেন স্বজাতির পক্ষ

১. Enamul Huq (edited)—*Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents,* Samudra Prakashani Dacca, 1968, P. 179

২. ঐ, পৃঃ ১৮০

৩. ঐ, পৃঃ ১৯৭৩

৪. দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

হয়ে বিরূপ শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে। ভারতবর্ষের মুসলমান জাতির ভাগ্যাকাশে হতাশার যে ধূম্রাচ্ছন্ন মেঘ জমেছিল, তার আবরণ ভেদ করে নবীন সূর্যের উদয় হল। একটি ম্রিয়মান, সুপ্তিমগ্ন জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল এবং নতুন আশায় বুক বেঁধে কাজ করার প্রেরণা লাভ করল।

মুসলমান সমাজের গোঁড়া ও সংস্কারপন্থী একটি অংশ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ এদেশকে 'দারুল হরব্' (শত্রুভূমি) ঘোষণা করে 'জেহাদ আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। বিধর্মী শাসিত রাষ্ট্রে ধর্মপালনে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হলে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ করা ইসলামে নির্দেশ আছে। সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন (১৮২৬), পরে তাঁর অনুসারীদের সাথে কোম্পানীর সংঘর্ষ হয়।[১] সৈয়দ আহমদ শহীদের সীমান্ত যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ থেকে চাঁদার অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরিত হত।[২] সৈয়দ আহমদ শহীদ আবদুল ওয়াহাবের (১৭০৩-১৭৯২) আদর্শে ইসলামীকরণ উদ্দেশ্যে খাঁটি শরীয়ত অনুযায়ী ধর্মকর্ম করার মত প্রচার করেন; এর নাম ছিল 'তরিকায়ে মহম্মদীয়া'। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে অ্যাখ্যাত হয়। অপর কোন জাতির ভাষা ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নীতিগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থকেরা ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ঐ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা 'হারাম' (নিষিদ্ধ) বলে প্রচার করেন। বাংলাদেশে ওয়াহাবীপন্থী ও গোঁড়া মোল্লাশ্রেণী ঐরূপ মনোভাবের দ্বারা লালিত হয়ে ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। গ্রামদেশে এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কোন সংস্কার ছিল না।[৩] তবে তাঁদের সংস্কৃতির ভাষা ফারসীর প্রতি মোহ এবং সমৃদ্ধ ফারসী সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে

১. শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদের অভিযোগ ছিল যে, শিখদের অত্যাচারে শিখরাজ্যে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারে না, সেখানে গো-বধ নিষিদ্ধ, মুসলমান মেয়েদের ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং মুসলিম-শিখ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য এক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ জায়েজ (সিদ্ধ)। অমলেন্দু দে—বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৭

২. *The Indian Mussalmans,* P. 67

৩. *British Policy ana the Muslims in Bengal,* PP. 189-90

গর্ব ছিল।[১] প্রথম দিকে চাকুরীর কারণেও ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি, ফারসী শিখলেও চাকুরী পাওয়া যেত। ইংরাজী ভাষার প্রতি তাঁদের অনাগ্রহ বা বিমুখতা ছিল সত্য, কিন্তু বিরোধিতা ছিল না। যখন ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা দেখা দিল, তখন নানা কারণে অনেক পরিবার দরিদ্র হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ইংরাজী শিক্ষা শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল। শহরে পাঠিয়ে ব্যয়বহুল ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।[২] যাঁদের সামর্থ্য ছিল তাঁরা নেতৃত্বের অভাবে দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। জীবিকার জন্য ইংরাজী শিক্ষা যখন আবশ্যক হয়ে উঠল এবং আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বও পাওয়া গেল তখন শরীফ পরিবারে ঐ শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় এবং ইংরেজী চর্চা শুরু হয়।

---

১. পাদরী জেমস লঙের অভিমত, "খুব সম্ভব কারণেই মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করে। এই দুটো ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল।" বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ১৫৬ (জেমস লঙের ১৮৬৯ সালে লেখা 'সোস্যাল কনডিশন অব দি মহামেডানস' প্রবন্ধের বরাত দিয়ে তিনি ঐ উক্তি করেছেন।) অবশ্য, বনেদী মুসলমান সম্পর্কে এ-উক্তি প্রযোজ্য, যাঁদের বেশীর ভাগই অবাঙালী ছিলেন। ১৮৮০ সালে সঈদ (দেলওয়ার হোসেন আহমদের ছদ্মনাম) 'দি ফিউচার অব দি মহামেডানস অব বেঙ্গল' নামক পুস্তিকায় ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ না করার পিছনে প্রায় অনুরূপ যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর অভিমত, "This aversion to English education is traceable to pride of race not felt by the Hindus, to their possession of a rich literature of their own, to their greater religious bigotry and partly to their poverty." *The Calcutta Review*, Vol. LXXII, No. CXLIV, 1881, P. V

১৮৮১ সালে 'এডুকেশন রিপোর্টে' হান্টার মন্তব্য করেন,' "A candid Mahomedan would probably admit that the most powerful factors are to be found in pride of race. a memory of by-gone superiority, relegious fears and a not unnatural attachment to the learning of Islam."

W. W. Hunter—*Report of the Indian Education Commission*, 1883.

স্কুল ইন্সপেক্টর আব্দুল করিম তাঁর 'এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্মের দিক থেকে হিন্দুদের মত মুসলমানদের তেমন ভয় ছিল না, কেননা ইসলামের নীতিগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস সহজে বিচলিত হওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, "...ancient conquering race cannot easily divert itself of the traditions of its nobler days. The Musalmans, confident of the implicity of their system of education, continued to pursue their old studies." *Mohammedan Education in Bengal*, P. 6

২. ২৫ এপ্রিল, ১৮৫২ সালের এক 'মন্তব্যপত্রে 'সিসিল বিডন লিখেছেন, মুসলমানের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে তাঁরা তাঁদের সন্তানের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন; হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সেরূপ অর্থদৈন্য ছিল না।

সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ জাতির সেই সুপ্ত চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের স্থির লক্ষ্য ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই মোহের আবরণ ছিন্ন হয় এবং পরিবারে ঐ শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় এবং ইংরাজী চর্চা শুরু হয়। একটি হতোদ্যম জাতির নবজন্ম সম্ভাবিত হয়। উইলিয়ম এ্যাডাম প্রমুখের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মুসলমান সমাজে শিক্ষার একটা ধারা প্রবহমান ছিল; কিন্তু সে-শিক্ষা প্রধানতঃ মোল্লা তৈরির শিক্ষা ছিল।[১] হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণীর মূল পেশাই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা। মুসলমান সমাজে ধর্মশিক্ষা আবশ্যক ছিল, এজন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল বেশী। মোল্লাশ্রেণীর সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। পঠন-পাঠন ও লিখন-লিপিকরণ সম্মানিত বৃত্তি ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজহস্তে কোরান নকল করতেন। অনেকে বলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজে একটা 'সাধারণ অনীহা' ছিল[২] কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। সুতরাং তাদের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। যে শরীফ শ্রেণীর মধ্যে গৃহকর্ম ও ধর্মকর্মের জন্য শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ছিল, সে শ্রেণীকে নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল। সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী যখন সেই মন্ত্রে ডাক দিয়েছেন, তখন সমাজের মানুষের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। গোঁড়া শ্রেণীর কাছ থেকে সামান্য বাধা এসেছিল বটে, কিন্তু তা দুরতিক্রম্য ছিল না। তাঁদের প্রধান সংগ্রাম করতে হয়েছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে, গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং একটি সুষুপ্ত জাতির মোহ ভঙ্গ হতে দেরী হয়নি।

---

১. এ্যাডাম ১৮৩৮ সালের শিক্ষা বিষয়ক তৃতীয় রিপোর্টে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূমে বাংলা, হিন্দী, ফারসী, আরবী, ইংরাজী শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি তালিকা দিয়েছেন:

ভাষা	মুর্শিদাবাদ শিক্ষায়তন	মুর্শিদাবাদ ছাত্র হিন্দু	মুর্শিদাবাদ ছাত্র মুসলমান	বর্ধমান শিক্ষায়তন	বর্ধমান ছাত্র হিন্দু	বর্ধমান ছাত্র মুসলমান	বীরভূম শিক্ষায়তন	বীরভূম ছাত্র হিন্দু	বীরভূম ছাত্র মুসলমান
বাংলা ও হিন্দী	৬২+৫	৯৯৮	৮২	৬২৯+০	১২৪০৮	৭৬৯	৪১১+১	৬১২৫	২৩২
ফারসী	১৭	৬১	৪১	৯	৪৪৮	৪৫১	৭১	২৪৫	২৪০
আরবী	২	১	৬	১১	৪	৬৮	২	০	৫
ইংরাজী	১	১০	২	৩	১১২	৬	২	৬৩	০

কাজী আবদল মান্নান, ডক্টর—আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, পৃঃ ৫২৯ (২ সং)।
স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, এদেশে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য বরাবর ছিল। সেজন্য হিন্দুর সংখ্যা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়।

২ *Hindu-Muslim Relations in Bengal, P. I*

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত 'মন্তব্য পত্রে'র 'অভিসেচনতত্ত্ব' অনুযায়ী সমাজের উপর তলায় ইংরাজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। লক্ষ্য ছিল, উচ্চ বর্ণের লোকেরা শিক্ষা পেয়ে পরে তাঁরা স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন। বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী গৃহীত হয়; এবং ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ইংরাজী বিদ্যালয় কেবল কলিকাতা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতএব কলিকাতার ভদ্র ও ধনী পরিবারের সন্তানরা এ শিক্ষার সুযোগ পায়। ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের 'ডেসপ্যাচে'র প্রস্তাব অনুসারে ভারতের শিক্ষা বিষয়ে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। ভারতের দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ছিল ডেসপ্যাচের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একটি আলাদা 'শিক্ষা বিভাগে'র উপর শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা। এর আগে 'শিক্ষা পরিষদে'র উপর শিক্ষা তদারকের দায়িত্ব ছিল। উডের ডেসপ্যাচে আরও বলা হয় যে, বিদ্যায়লয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্কুল স্থাপন করতে হবে, সরকারী কলেজ ও স্কুলগুলি যথাযথভাবে তদারক করতে হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে সেগুলির সংখ্যা বাড়াতে হবে। মধ্য-স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 'থোকদান প্রথা' (গ্র্যান্ট ইন-এড) প্রবর্তন করতে হবে।[১] প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেখানে স্বল্পবিত্তের সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। ১৮৫০ সালে এদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়, ফলে পাটচাষের পমিাণ বাড়ে এবং পাটের দামও বাড়ে। অর্থকরী ফসলের জন্য মুসলমান কৃষকের হাতে নগদ টাকা আসে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে। আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এ সময় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন।

---

১. সি. ই. বাকল্যাণ্ড শিক্ষা বিষয়ক উডের ডেসপ্যাচকে 'ভারতের শিক্ষার সনদ' বলেছেন। লর্ড ডালহাউসির অভিমত, এতে 'সারা ভারতের শিক্ষার পরিকল্পনা' প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বভারতীয় ঐক্য ও সমন্বয় সাধিত হয়।
C.E. Buckland—*Bengal under the Lieutenant Governors* (1854-98). Vol. 1, Calcutta, 1961, P. 7.

তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলির শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে সেগুলিতে ইংবাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় এ্যাংলো-আরবী ও এ্যাংলো-ফারসী বিভাগ পূর্ব থেকে চালু ছিল। ১৮৭৪ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায় রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা খোলা হয়। মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল। মহসীন ফাণ্ডের টাকা থেকে ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়, ৯টি জেলা-স্কুলে ফারসী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং স্কুল ও কলেজের মুসলমান ছাত্রদেব বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ ফাণ্ড থেকে প্রদান করা হয়।[১] ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী বিভাগে এফ. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাথে ঐ বিভাগ যুক্ত করা হয় যার ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রেসিডেন্সীতে ক্লাস করার সুযোগ পায়।[২] মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের মনোভাবেব পরিবর্তন হয় এবং একটি পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার হার বাড়ানো যায় তার জন্য সরকার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করা হয় এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রের পড়ার সুযোগ হয়; পূর্বে হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে পেত না। ১৮৭১ সালে বড়লাট লর্ড মেয়োর (১৮৬৯-৭২) সাথে এক সাক্ষাতের সুযোগে আবদুল লতিফ ভারতের মুসলমানের শোচনীয় দুরবস্থা ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কথা বলেন। তিনি মহসীন ফাণ্ডের অপব্যবহারের প্রতিও বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট ঐ বছর মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের এবং বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩] স্পষ্টতঃই প্রস্তাবটিতে উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটেছে। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করার জন্য ১৮৮২ সালে হান্টারকে সভাপতি করে 'এডুকেশন কমিশন' গঠিত হয়। হান্টার মুসলমান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবদুল লতিফ কমিশনে সাক্ষ্য দেন এবং একটি লিখিত 'স্মারকলিপি' প্রদান করেন। সৈয়দ আমীর আলীও সাক্ষ্য দেন। তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র

১. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, P. 216

২. Muhammad Azizul Haq—*History and Problems of Muslim Education in Bengal*, Calcutta, 1917. ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম কৃত অনুবাদ—বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃঃ ৪৫

৩. *The Proceedings of the Government of India in the Home Department* (Education) No, 300, Simla, 7 August 1871.

পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড রিপনকে (১৮৮০-৮৪) যে 'স্মারকলিপি' দিয়েছিলেন, সেটিও কমিশনের কাছে প্রেরিত হয়। এসব সাক্ষ্য, স্মারকলিপি ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশন 'মুসলিম শিক্ষা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (১৫শ অধ্যায়) প্রস্তাবাকারে ১৮টি সুপারিশ পেশ করেন।[১] ১৮৮৫ সালে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ, এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ব্যক্তিগত বিভিন্ন আবেদনপত্র একত্রে বিবেচনা করে বড়লাট লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশনের যথাক্রমে ৮,১১,১৪ ও ১৬ সংখ্যক সুপারিশ গৃহীত হয়। শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের সরকারী চাকুরীতে পৃথকভাবে সুবিধা দানের প্রস্তাবটি (১৭-সংখ্যক সুপারিশ) পক্ষপাতিত্বের কারণে সরকার নাকচ করে দেন।[২] স্যার আজিজুল হক হান্টারের ১৭ দফা সুপারিশসমূহকে বাংলার মুসলমানের শিক্ষা-অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।[৩] সৈয়দ আমীর আলী ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে মুসলিম অধিকারের 'ম্যাগনা কার্টা' হিসাবে অভিনন্দিত করেন।[৪]

মুসলমান নেতৃবৃন্দের শিক্ষা-আন্দোলন, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে মুসলমান সমাজে পূর্বে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা ক্রমশঃ অপসারিত হয়, এবং প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষার হার পরিমিত না হলেও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যার আজিজুল হক 'হিস্টরি এণ্ড প্রবলেমস অব মুসলিমস এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯১৭) গ্রন্থে ১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন; তালিকাটি এরূপ[৫]:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা	হার
ইংরাজী কলেজ	২৭৩৮	১০৬	৩.৮
প্রাচ্য কলেজ	১০৮৯	১০৮৮	৯৯.১
উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩৭৪৭	৩৮৩১	৮.৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৭৯৫৯	৫০৩২	১৩.২

১. W. W. Hunter—*Report of the Indian Education Commission,* 1883

২. ১৭-সংখ্যক সুপারিশটি ছিল এরূপ : "That the attention of the Local Government be invited to the question of proportion in which the patronage is distributed among educated Mahomedans and others."
Report of the Indian Education Commission, 1883.

৩. বাংলা দেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ ৪০

৪. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ১৭৫

৫. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ ৩৭-৩৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা	হার
দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৬৪৪১	৭৭৩৫	১৩.৭
দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৮০৯৩৭	২১৭২১৬	২৪.৬
উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	--	—
মাধ্যকি ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	৮.৯
শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্র (নর্মাল স্কুল)	১০০৭	৫৫	৫.৫
শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ-কেন্দ্র	৪১	—	—
অপরিদর্শিত বেসরকারী বিদ্যালয়	৫৭৩০৫	২৫২৪৪	৪৪.০

তিনি আরো বলেছেন যে, ১৮৭১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ২৮১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২৬১১০৮ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।[১] সহকারী স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম বিএ তাঁর 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে ১৮৯০-৯১ সালে বাংলার মুসলমান বিদ্যার্থীর কিরূপ অবস্থা ছিল তার একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি এরূপ[২]:

সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা	হার
আর্টস কলেজ	৫২৩২	২৯৩	৫.৬
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	৭৮৭২৭	৮২৬৫	১০.৫
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	৬১০০০	৮৮৮৪	১৪.৫
মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৬৭৭৪১	১০৩২৯	১৫.২
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮৯৫০	২৬৬৮৮	১৯.৩
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭৭৬৩২	২৭১২২২	২৭.৭
প্রফেশনাল কলেজ	১৪৯৩	৫২	৩.৫
টেকনিকাল স্কুল	২৭২২	৪২৭	১৫.৩
ট্রেনিং স্কুল	১৯৮৩	২২০	১১.১
মাদ্রাসা	২৪২৬	২২৭৯	৯৭.৯
সর্বমোট	১৩৩৬৮৮৬	৩২৮৬৪৯	২৪.৫

১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ ৩৮

২. *Mohammedan Education in Bengal,* See Appendix.

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তা নীচের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে নির্ণয় করা যায়:[১]

বৎসর	এমএ	বিএ(অনার্স)	বিএ(পাশ)	বিএল	এফএ/আইএ	এন্ট্রাস
১৮৮৫	১	১	৯	৩	১২	৪৪
১৮৮৬	২	১৩	২৬	৯	—	—
১৮৮৭	৩	১১	২১	৪	৩১	৫১
১৮৮৮	২	৫	১৬	৬	১৯	১১৩
১৮৮৯	৩	৭	২৩	৩	—	৫৪
১৮৯০	২	৬	২২	৮	৫৭	১২৫
১৮৯১	২	৬	১২	১২	১৬	১১০
১৮৯২	৪	৭	১৫	৮	৪৭	৮৫
১৮৯৩	--	৬	২৪	৩	৩৫	১৭২
১৮৯৪	৪	৮	২৭	৩	৩১	১৩৪
১৮৯৫	৪	৫	২৩	২	৫৯	১৫৩
১৮৯৬	২	৫	২১	১৫	৫৩	১৪১
১৮৯৭	৩	৪	১২	১২	৫২	২৪১
১৮৯৮	৩	৮	২২	৬	৬৬	১৭৮
১৮৯৯	৩	৮	২৮	৭	৬৮	২০৩
১৯০০	৫	৯	৩১	৬	৫৯	২৫৩
১৯০১	৩	৬	২১	৮	৫২	২০৯
১৯০২	৩	৪	২৩	১০	৭৯	২৫৮
৯০০৩	৫	৪	২১	৬	৬৫	১৭৬
১৯০৪	৫	৬	১৬	১৬	৭০	১৩৩
১৯০৫	২	৬	২৮	৭	৪৬	১৮০

প্রথম এমএ (ইতিহাস) পাশ করেন সৈয়দ আমীর আলী ১৮৬৮ সালে হুগলী কলেজ থেকে। ১৮৭১ সালে আলী রেজা খান (আরবী) আগ্রা কলেজ, ১৮৭৭ সালে আমজাদ আলী (আরবী), আশরাফ আলী (আরবী), রাজা হোসেন (ফারসী) যথাক্রমে বেনারস ও মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন।

১. এমএ, বিএ, (অনার্স ও পাশ) এবং বিএল-এব সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ সালে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডার (২য় খণ্ড) থেকে সংকলিত হয়েছে। এফ এ, আই এ এবং এন্ট্রান্সের সংখ্যা আজিজুল হকের পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পরিশিষ্ট জ) থেকে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সব কলেজের মুসলমান ছাত্র গণ্য করা হয়েছে। তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রেঙ্গুন প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল।

১৮৮২ সালে হ.সমতুল্লাহ (আবরী) মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। ১৮৮৫ সালের আগে আর কোন মুসলমান ছাত্র এমএ পাশ করেননি। প্রথম বিএ পাশ করেন হুগলীর আহমদ (পরে দেলওয়ার হোসেন আহমদ নাম গ্রহণ করেন) প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬১ সালে। ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হন। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় মুসলমান গ্রাজুয়েট শ্রীহট্টের মোহাম্মদ দায়েম। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৮৬৬ সালে তৃতীয় গ্রাজুয়েট আবদুল আজিজ। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাশ করেন। এরূপে ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৬৯ সালে প্রথম বিএল গ্রাজুয়েট হন আমীর আলী ও ওবায়দুর রহমান। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট ল গ্রাজুয়েট হন ১৬ জন। ১৮৭৮ সালে সৈয়দ হোসেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি পাশ করেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আর কেউ ঐ ডিগ্রী পাননি। লাইসেন্সিয়েট ইন ল ডিগ্রী পান ১৮৬৯ সালে ১ জন এবং ১৮৭৩ সালে ৪ জন। ১৮৭১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত এম এলএস ডিগ্রী পান ১৭ জন। ১৯০০ সালে তোফায়েল আহমদ ও ১৯০৩ সালে এস. এম. আবদুল আজিজ বি. ই. ডিগ্রী এবং ১৮৯০ সালে আবদুর রহমান এল. ই. ডিগ্রী পান। উক্ত তিন জন কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যাতত্ত্বটি ডিগ্রী অনুযায়ী সাজালে এরূপ দাঁড়ায়:[১]

এম এ	৬৭
বিএ (অনার্স)	১৩৬
বিএ (পাশ)	৫০২
বিএল	১৬৮
লাইসেন্সিয়েট ইন ল	৫
এম বি	১
এম এল এস	১৭
বি ই	২
এল ই	১
সর্বমোট	৮৯৯

১. এই সংখ্যার মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি আছে, কারণ একই ব্যক্তি বিএ, বিএল, এমএ পাশ করেছেন। এই সংখ্যার মধ্যে কতজন বাঙালী মুসলমান আর কতজন অবাঙালী মুসলমান তা সঠিক বলা যায় না।

এর সঙ্গে ধরতে হয় বিলাত-ফেরত কয়েকজন ব্যারিস্টারকে। এই সংখ্যায় বাঙালী-অবাঙালীর মিশ্রণ আছে, দু'দশজন রাজ পরিবার ও ধনী পরিবারের সন্তানও আছে, তবে এর অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই।[১] এন্ট্রান্স থেকে ব্যারিস্টার—এই নব শিক্ষিতদের সমন্বয়েই আধুনিক মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন ও বিকাশ হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ধর্মীয় শিক্ষার একটি ধারা মোল্লা-মুনশীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি সরকারী-সওদাগরী অফিসে চাকুরী করেছেন, কোর্ট-কাচারীতে আইন ব্যবসায় করেছেন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন, বই-পুস্তক লিখেছেন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, সভা-সমিতি গঠন করেছেন, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও অন্যান্য আন্দোলন করেছেন। এভাবেই সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা এসেছে। ১৮৮২ সালে মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীতে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার একটি তালিকা নিম্নরূপে দেওয়া যায়ঃ[২]

কলিকাতা

পদ	মুসলমান	হিন্দু	খ্রিস্টান	মোট
পররাষ্ট্র বিভাগ	১	১৪	৩৯	৫৪
স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ	১	২৩	৩৯	৬৩
আইন, রাজনীতি ও চাকুরী-নিয়োগকারী বিভাগ	২	৬৪	১৬	৮২
রেভিনিউ বোর্ড	১	৮৮	২৪	১১৩
কম্পট্রোলার-জেনেরাল অফিস	৫	২২৬	৩৪	২৬৫
পোস্ট-মাস্টার জেনেরাল অফিস	৩৭	২৩৪	৬৫	৩৩৬
ডাক বিভাগ (বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জন্য)	২২	৭৬৩	৭	৭৯২
ডাক বিভাগ (বাংলার পূর্বাঞ্চলের জন্য)	৯	১৫১	৩	১৬৩
ডাক বিভাগ (বিহার ও উড়িষ্যা)	৩৭	৩৫৩	১৯	৪০৯

---

১. ১৮৬৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো-আরবী বিভাগে অধ্যয়নরত ১১৫ জন ছাত্রের কুলগত পরিচয় ছিল এরূপঃ জমিদার ৩৩, তালুকদার ৩৭, মুনশী ১৩, ব্যবসায়ী ৬, কাজী ৬, মুন্সেফ ৩, দারোগা-শিক্ষক-উকিল-আয়মাদার ইত্যাদি —অবশিষ্ট। এ্যাংলো-ফারসী বিভাগের ২৮০ জন ছাত্রের কুলগত পরিচয় ছিলঃ জমিদার-জোতদার ১০২, ব্যবসায়ী ৪৪, শিক্ষক-মুনশী ২৯, মোক্তার ২২, নকলনবিশ ২০, সরকারী কোর্ট অফিসার ১৩, ডাক্তার ৯, কেরানী ৮, অনুবাদক ৮, সরকারী পেন্সনভোগী ৮, পুলিশ অফিসার ৫, রুটি প্রস্তুতকারী ১, অপেশাজীবী ৫।
Selections from the Records of the India, Home Deptt., Calcutta 1886, PP. 22, 31.

২. তালিকাটি ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত 'স্মারকলিপি' থেকে সংকলিত K. K. Aziz—*Ameer Ali : His Life and Works*, Karachi, PP. 29—31.

পদ	মুসলমান	হিন্দু	খ্রীস্টান	মোট
জেনেরাল রেজিস্ট্রেশন	১	৬	৩	১০
শিক্ষা বিভাগ	৩৮	৪২১	১১৪	৫৭৩
হাইকোর্ট	৯২	১৩১	২০	২৪৩
লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার অফিস	১	১১	১	১৩
ছোট আদালত	১	১৮	৮	২৭
সার্ভেয়র-জেনেরাল অফিস	১০	১৮	৫৫	৮৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	২২	১৫৩	৪১	২১৬
ছোট আদালতের জজ ও সাবঅর্ডিনেট জজ	৩	৪৪	৯	৫৬
মুন্সেফ	১৪	২৪৭	—	২৬১
পুলিশ বিভাগ	৯	৩৮	১১৮	১৬৫
জনকল্যাণ বিভাগ	১৭	২১৭	১৬৭	৪০১
চিকিৎসা বিভাগ	৩	২৪	৯৮	১২৫
জনশিক্ষা বিভাগ	৬	৯৮	৫৩	১৫৭
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	৩	১৮	৪	২৫

মফস্বল (বিবিধ পদ)

	মুসলমান	হিন্দু	মোট
বগুড়া	৩৩	৯১	১২৪
বর্ধমান	১৪	১১৭	১৩১
ফরিদপুর	৩০	৩৩৬	৩৬৬
হাওড়া	৮	২০৬	২১৪
মুর্শিদাবাদ	৩৯	৩৪৩	৩৮২
ময়মনসিংহ	২০	৩২৪	৩৪৪
মেদিনীপুর	৩৯	৪৬০	৪৯৯
পাবনা	২৬	১৭৯	২০৫
রাজশাহী	৫৭	২৮৭	৩৪৪
বরিশাল	৩৪	৩৮৯	৪২৩

তালিকায় বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা বেশী, অন্যান্য বিভাগে সংখ্যা খুবই নগণ্য। তালিকার অপর বৈশিষ্ট্য, শহর অপেক্ষা মফস্বলে নিয়োগের সংখ্যা বেশী। হিন্দু কর্মচারীর ক্ষেত্রে সেরূপটি

হয়নি। তাঁদের সদর-মফস্বল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য আছে। মুসলমান শিক্ষিতগণ কর্মব্যপদেশে কর্মস্থলে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিলেন, শহরে কেন্দ্রীভূত হতে পারেননি। মুসলমানের সংগঠনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী না হওয়ার পেছনে এটা একটা প্রধান কারণ ছিল। অর্থাৎ আধুনিক প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির মূল শক্তিকেন্দ্র যে নগরের শ্রেণী-সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, সেটি দানা বাঁধবার সুযোগ পায়নি।

ভূমির সাথে যুক্ত ছোট জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, গাঁতিদার, জোতদার, ইজারাদার, নায়েব-গোমস্তা-তহশিলদার-কেরানী প্রভৃতি আমলা ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত। মুসলমান বড় জমিদার বলতে কয়েকজন মাত্র ছিলেন: যেমন ঢাকার খাজা পরিবার, বগুড়ার নবাব পরিবার, ধনবাড়ীর চৌধুরী পরিবার, শ্রীহট্টের মজুমদার পরিবার, শায়েস্তাবাদের মীর পরিবার প্রভৃতি। অধিকাংশ জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিক। উত্তরাধিকার আইনের জন্য মুসলমান জমিদারীগুলি ভাগ হয়ে ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হয়। জোতদার, তালুকদার, দাদনদার প্রভৃতি নিজ হস্তে কৃষিকাজ করেন না, প্রজার বা ক্ষেত-মজুরের উৎপাদনে ভাগ বসান। জমিদার-পত্তনিদারগণ প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করেন; জোতদার-দাদনদারগণ ভাগচাষী, বর্গাদার প্রভৃতির শ্রমোৎপাদিত ফসল ঘরে তোলেন। বড় জমিদার পত্তনিদারদের নিয়োগ করে তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূমির উপরে ব্যক্তির স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমির মালিক জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শহরের ধনী ব্যক্তিরা অথবা সরকারী পদস্থ কর্মচারীরা জমি কিনে তালুকদার, ইজারাদার নিয়োগ করতেন, তাঁরাই ভূমির সাথে যোগাযোগ রাখতেন, নব্য ভূস্বামিগণ শহরে বাস করতেন। এভাবে ভূমিজ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।[১] তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। লর্ড হেস্টিংসের যুগে বড় জমিদারীর সংখ্যা ছিল কমবেশী ১০০; একশ' বছর পরে ছোটবড় জমিদারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৪২০০।[২] ১৮৫৫ সালে কাউন্সিল সদস্য জে. পি. গ্রান্ট বলেন যে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমির মালিক ছিলেন তালুকদার-পত্তনিদারগণ।[৩] ১৮৭১-৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্ব-উপস্বত্বভোগী ও

---

১. *The Indian Middle Class,* PP. 123, 133-34,

২. *Bengal Administration Report of* 1872-73, P. 73

৩. *The Indian Middle Calss,* P. 137

কর্মচারীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার নিম্নরূপ একটি তালিকা দেওয়া যায়[১] :

কৃষক	৬৩৯১০৭৪	জোতদার	১৯৫৬৪
জমিদার	৪২৬১৮	গাঁতিদার	৩৮২৪
ইতমামদার	৫৮৬	হাওলাদার	৯৩৪৩
ঠিকাদার	৩০৩	গোমস্তা	১৮৪০২
ইজারাদার	৩৩৫৪	তহশিলদার	১০৫৪৬
লাখেরাজদার	২৩০৭০	পাটোয়ারী	১৩৭৬
জায়গীরদার	৩৬৫	পাইক	১৪৭৯৭
ঘাটোয়াল	৬৬৮	জমিদারের ভৃত্য	১১০৩০
আয়মাদার	২০০৪	দফাদার	২০২
মকরারীদার	৯৯৩৩	দেওয়ান	১০৪
তালুকদার	৯৬০৫০	মণ্ডল	১৬২০
পত্তনিদার	৩৩০২	নায়েব	৫৮১
খোদকস্ত প্রজা	৭৫৫২	এস্টেট ম্যানেজার	২১
মহলদার	১১২৮		

হিন্দুর সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও তাঁদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার মত ছিল না। বরং গ্রামজীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে তাঁরাই সমাজের কর্ণধার হিসাবে কাজ করেছেন। প্রয়োজনে তাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুধু মিঞা মধ্যবিত্ত জোতদারের সন্তান ছিলেন ; ওয়াহাবী আন্দোলনে বাংলার কৃষকের ঘর থেকে মুজাহিদ (স্বেচ্ছা-বাহিনী) ও চাঁদার অর্থ সীমান্ত-শিবিরে যেত। শহরের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অনেক আগে গ্রামের জোতদার-তালুকদারগণ কৃষকদের সংগঠিত করে 'শ্রেণীশত্রু'র বিরুদ্ধে লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। অবশ্য উভয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলাদা ছিল বলেই এরূপ সম্ভব হয়েছে।

শহরকেন্দ্রিক মুসলমান ব্যবসায়িক মধ্যবিত্তের গঠন সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি। দর্জি, ট্যানারি, বই বাঁধাই, বই বিক্রয়, খালাসী-সারেঙ্গ প্রভৃতি কাজে বাঙালী মুসলমান নিযুক্ত ছিল। হোটেলওয়ালা, বাবুর্চি, খানসামা, ভিস্তি, কোচ-ওয়ান, কসাই, ফলবিক্রেতা, খুচরা ব্যবসায়ী অবাঙালী ছিল। বোম্বাই-গুজরাট-করাচীর মেমন, খোজা, বোহরা প্রভৃতি শ্রেণীর বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। কোন কোন ব্যবসায়িক সংগঠনে দুচার জন মুসলমান ব্যবসায়ীর নাম উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও শোনা যায়, কিন্তু সে সংযোগ ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক স্বার্থে, সমাজ-

১. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬

সেবা কিংবা কোন আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সমবেত হননি।[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এর কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তাঁরা সভা-সমিতিতে সমবেত হয়েছেন কেবল চাঁদা-দাতা সদস্য হিসাবে নন, তাঁদের কার্যকলাপে সামাজিক সংহতিচিন্তা ও পরোপচিকীর্ষাবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। মাদ্রাসা, স্কুল, ছাত্রাবাস, এতিমখানা মসজিদ নির্মাণে ও পরিচালনায় তাঁদের অনেকে অংশ গ্রহণ করেছেন। কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রাবাস এলিয়ট হোস্টেল (১৮৯৬) নির্মাণে অনেক জমিদারের সাথে অনেক ব্যবসায়ী চাঁদা দিয়েছেন। ঐ মাদ্রাসায় তাঁদের সন্তানেরা লেখাপড়া করছে, ১৮৬৯ সালের ছাত্রদের কুল-পরিচিতির তালিকায় তা দেখা যায়।

বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের সহিত তুলনায় মুসলমান মধ্যবিত্ত কেবল ক্ষুদ্রাকার ছিল না, গঠনগত উপাদান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পার্থক্য ছিল। এর সাথে কালগত পার্থক্যের কথাও স্বীকার করতে হয়। ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়: "আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে দ্রুত গতিতে শ্রেণীচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনীর উল্লেখ হয়ত নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রায় একশ' বছর ধরে বাঙলার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে এসেছে, বাঙালী মুসলমানের জীবনে সে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন—উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মেতিহাসের আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে স্বতন্ত্র করেছে। মুসলমান আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দ্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরাজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎ পরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলতঃ তা ধ্বংস হয়নি। ব্যবসায় বা শাসনক্ষেত্রে তারা শাসক শ্রেণীর একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসাবে পণ্য বিতরণ, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং এর ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। মুসলমান শাসক ও তাঁদের সহযোগী শ্রেণীর যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া

১, সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয় লিখেছেন, হিন্দু উদ্যোক্তাগণ কোন কোন সভার বা প্রতিষ্ঠানের ধর্ম-বর্ণহীন সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য উচ্চ কুল ও উচ্চ বিত্তের মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। এক চাঁদা দেওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোন কাজ ছিল না।
পূর্বোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২

অন্য জীবিকা ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। ...হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের মধ্যে চিরকালই একটা না একটা ছিল) মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তত সহজে ও তত দ্রুত তৈরী হতে পারেনি। . রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে উন্নতশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মুসলমানের নেই এবং নেই বলেই এদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও (বিভাগোত্তর কালে) সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারেনি। বাঙালী মুসলমান এখনও বুর্জোয়ার মত পরিবর্তন বিমুখ বা আত্মপরিতৃপ্ত হয়ে উঠেনি।"[১] ডক্টর হবিবুল্লাহর এই দীর্ঘ উক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল: (ক) হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি প্রাচীন ভিত্তি আছে, (খ) তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, (গ) অর্থনৈতিক সচলতা আছে। এর সাথে আরও দুটো বিষয় যোগ করা যায়--যথা, (ঘ) হিন্দু মধ্যবিত্তের কাঠামোগত সুশৃঙ্খল ও অবিমিশ্র রূপ আছে এবং (ঙ) আবহমানকালের দেশীয় ঐতিহ্য আছে। বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের বয়স কম, জন্মকালে এটি একটা মিশ্র উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে, আলোচ্য যুগ পর্যন্ত এর অর্থনৈতিক সচলতা অক্ষুণ্ণ থাকেনি, এবং সেই সূত্রে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হয়নি, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে উপাদানগত তারতম্য ঘটেছে এবং সর্বোপরি এর ঐতিহ্যিক ভিত্তির মধ্যে ভিন্নতা আছে। এক কথায়, বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত ঐ সময় পর্যন্ত পরিণত ও স্থিতিশীল ছিল না।[২]

১. সমাজ, সংস্কৃতি ইতিহাস, পৃঃ ১৫৯-৬০

২. মধ্যযুগের মুসলমান মধ্যবিত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে গোপাল হালদার স্থিতিশীলতার অভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "মুসলিম কোন কারণে (যেমন রাজকার্যের, বিচার, দপ্তর, ফৌজের ছোট আমলা হয়ে, ব্যবসায়সূত্রে) মধ্যবিত্তের কোঠায় উঠলে সহজেই অভিজাতের পদবীতেও উঠে যেতে পারত। হিন্দু ছোট কর্মচারী বা বৃত্তিধারীরা (দোকানী, পশারী ও কবিরাজ, পণ্ডিত, ছোট মুন্সি, কেরানী কায়স্থ প্রভৃতি) অত সহজে সে পর্যায়ে উঠতে পারত না। দ্বিতীয়ত, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ও অনেকাংশে মুসলমানী জীবনযাত্রাপদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তকে টেনে নিচে নামিয়ে আনত।" (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, পৃঃ ৪৬)। আমরা এর সাথে পূর্বোক্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ করতে পারি, সেখানে একজন 'জোলা' ভাগ্যোন্নয়ন দ্বারা প্রথমে 'শেখ' ও পরে 'সৈয়দ' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। (বর্তমান অধ্যায়ের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আমরা পূর্বে বলেছি, সপ্তম শতকের দিকে মনু হিন্দু সমাজকে পেশার দিক থেকে চারটি বর্ণে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এক এক বর্ণের এক এক ধর্ম: যথা, "প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ। তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের ধর্ম—যজন, অধ্যযন, দান ও কৃষিবাণিজ্যাদি। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ধর্ম—উক্ত বর্ণ-ত্রয়ের সেবা ; তাহাতে জীবিকা নির্বাহ না হইলে বাণিজ্য।"[১] বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রায় ছিল না ; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের মানুষ বসবাস করত। এই পেশাগত বর্ণভেদ পরে ধর্মগত সংস্কার লাভ করলে স্বাভাবিক রক্ত মিশ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্রাহ্মণ সন্তানের কুলগত পরিচয় হয়েছে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সন্তানের বৈশ্য, শূদ্র সন্তানের শূদ্র। বর্ণগত ধর্মগুণে ব্রাহ্মণ পুরোপুরি এবং বৈশ্য আংশিক মধ্যবিত্তের চরিত্র পেয়েছে, যাঁরা বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চা, দান-ধ্যান করতেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত সামাজিক এই কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা জীবিকার ও জীবনযাপনের জন্য বৈশ্যের একাংশ এবং শূদ্রের সর্বাংশের সেবা পেয়ে এসেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে আর্যরক্ত ; বিদেশাগত আর্যগণ দেশীয় অনার্যদের সহিত তুলনায় দৈহিক ও মানসিক গঠনে এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় উন্নততর জাতি ছিলেন। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্ম গুণে সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন, সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন। যুগের পরিবর্তন অনুযায়ী তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পরিবর্তন হয়েছে এবং এরূপ হয়েছে বলেই তাতে সচলতা ও গতি এসেছে। কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করেন না বলে তাঁরা রাজপুরুষের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। হিন্দু আমলে সংস্কৃত, মুসলমান আমলে ফারসী, ব্রিটিশ আমলে ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যা রপ্ত করে ধর্ম-কর্ম, রাজকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন। যখন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন তখন বেশী আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছেন, যখন পৃষ্ঠপোষকতা পাননি, তখন সুবিধা কম ভোগ করেছেন—এইটুকুই পার্থক্য, নচেৎ বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক সমুন্নতির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর পূর্বোক্ত রূপ, গুণ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই। এরই পাশাপাশি বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের রূপ-প্রকৃতির বিচার করলে পার্থক্যটা সহজে ধরা পড়ে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, মধ্য-

১ সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত—সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ। কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৫১৮ (৮সং)।

যুগে রাজকার্য, ভূমি ও ব্যবসায়ে লিপ্ত যে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে বিদেশাগত মুসলমান (আরব-তুরস্ক প্রভৃতি সেমিটিক ও তাতার রক্ত-ধারাজাত), স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং বিবাহের মাধ্যমে উভয়ের সংমিশ্রণজাত মুসলমান এই ত্রিবিধ উপাদান আছে। ধর্মের ভাষা আরবী, সংস্কৃতির ভাষা ফারসী এবং মাতৃভাষা রূপে বাংলা (অংশত উর্দুও) চর্চা করেছেন। তাঁরা আরব-পারস্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন এবং ভাব ও আধ্যাত্মিক জীবনে তার মধ্যেই অবগাহন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করেছেন এবং সেই সূত্রে উভয় ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ধারা রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আবার দেশীয় ভাষা, দেশীয় ভাবধারা, ঐতিহ্য বর্জন করারও আন্দোলন হয়েছে। উনিশ শতক পুরো এবং বিশ শতকেও বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা হবে এ নিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছে। উনিশ শতকে ইসলামীকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশীয় ভাবধারা ও কৃষ্টি বর্জন করার প্রশ্ন উঠেছে। মুসলমান আমলে এ শ্রেণী যেরূপ আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলে তা পাননি। রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদল হলে নিজেদের অদূরদর্শিতা ও অন্যান্য সংস্কার এবং নতুন শাসকশ্রেণীর প্রশাসনিক নীতির দরুন এ শ্রেণী কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাও আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। কোম্পানী আমলের প্রথম একশ' বছর এই পতন ও ধ্বংসের পালা চলে। রাজকার্য, ভূমি ও অন্যান্য পেশার সুযোগ লাভ করে যে শরীফ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন হয়েছিল কোম্পানীর আমলে তাঁদের একটা বড় অংশ গ্রামে শ্রমজীবী কৃষক ও ক্ষেত-মজুরে পরিণত হয়েছেন, আর একটি ক্ষুদ্র অংশ কমবেশী পূর্ব পেশায় টিকে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। আর্থিক দিক থেকে এই পরিবর্তনকালে মুসলমান সমাজে রক্তধারার আবার পরিবর্তন হয়। শরীফ-অশরীফের মিলন-মিশ্রণে সমাজে এক সংস্কার ছাড়া ধর্মগত কোন বাধা ছিল না; আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে শরীফ শ্রেণী কৃষক-মজুর-মাঝি-মাল্লার সমপর্যায়ে আসে এবং এরূপ অবস্থায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈবাহিক লেনদেন চলে। এতে সামাজিক স্তর অবনমিত হয়।[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে

১. দেলওয়ার হোসেন আহমদ 'দি ফিউচার অব দি মহামেডানস অব বেঙ্গল' (১৮৮০) গ্রন্থে বলেছেন যে, বহিরাগত শরীফ মুসলমান ও ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের আন্তঃবিবাহে পূর্ব শ্রেণীর দেহ, মন ও নীতির দিক থেকে অবনতি ঘটে, এমন কি তারা নিম্নশ্রেণীর সমপর্যায়ে নেমে আসে।

The Calcutta Review, 1881

ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে তাঁদের কুল পরিচয় যাই থাক, আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শরীফ শ্রেণীর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১] এজন্য দেখা যায় যে, অনেক শিক্ষিত বাঙালী উর্দু পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। উর্দু ও ফারসী চর্চা করতেন যাঁরা, তাঁরাই নিজেদের বনেদী শরীফ বলে দাবী করতেন। যাঁরা নব্যপন্থী তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সেকুলার শিক্ষার পক্ষপাতী, আর যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী। মোল্লাশ্রেণী গতানুগতিক ধর্মশিক্ষার প্রতি অনুগত ও তাতেই আবদ্ধ। মধ্যপন্থী সংস্কারবাদীরা দেশীয় ভাষা ও ভাবের উপর আরবীয়-ইরানীয় প্রভাব মিশিয়ে ইসলামী বর্ণ ও চরিত্র দেওয়ার কথা বলেছেন।[২] ফলে সংকরধর্মী মানুষের মিশ্রধর্মী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। দোভাষী পুথিতে এর একটা ধারা খুব সহজে চোখে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মুসলমান উঠতি মধ্যবিত্তের এইরূপ পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্বসংকুল মিশ্র রূপ বিদ্যমান ছিল। ডক্টর নজমুল করিম বলেন, "The Bengal Muslim Middle Class, like its Hindu counterpart, had its roots in agrarian set-up, but unlike its counterpart, began to be recruited from various Muslim social classes as the 19th century was to a close and this feature began to get more opportunities in jobs, etc. with the first partition of Bengal (1905) and introduction of reserved quota for Muslim in Government Service."[৩] হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের এই বিষম উপাদান ও অসম বিকাশের জন্য উভয় শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ দেখা দেয়। এটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিবর্তন ধারার অনিবার্য ফল। এর সঙ্গে যখন শ্রেণীস্বার্থ উজ্জীবিত হয়েছে তখন উভয়ের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি নিজ নিজ পথ ধরেছে। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকৃত বীজ এখানে নিহিত আছে। আর্থিক সুবিধা ও প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির

---

১. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 257.

২. সৈয়দ আমীর আলী প্রগতিশীল নব্যপন্থী, আবদুল লতিফ রক্ষণশীল মধ্যপন্থী এবং মোল্লাশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়াপন্থী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও ঠিক এ ধরণের স্তর দেখা যায়। মীর মোশাররফ হোসেন প্রগতিবাদী, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী উদারপন্থী সংস্কারবাদী এবং মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়াপন্থী ছিলেন।

৩. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal,* P. 257

প্রশ্নে শ্রেণীস্বার্থ যত মাথা চাঁড়া দিয়েছে, ততই ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, ভাষা, ভাব, সংস্কৃতি প্রভৃতির বেড়াজাল রচিত হয়েছে এবং দুটি প্রতিযোগী, প্রতিবাদী, বিবদমান শিবিরের জন্ম দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শাসক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক স্বার্থ। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার এমন কিছু করবেন না, যাতে তাঁর শাসন ও শোষণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং ঔপনিবেশিক শোষণবাদী অর্থনীতিতে একই সঙ্গে ত্রিমুখী স্বার্থের দ্বন্দ্ব বেধেছিল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অন্যত্র না থাকায় বাঙালী মধ্যবিত্তের চাকুরীর উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছিল। পুঁজিহীন নিঃস্ব মুসলমান সমাজে সেটা আরও বেশী করে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই মুসলমান নেতাদের ক্রমাগত দাবী উঠছিল যে, বাংলার মোট লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান, অতএব লোকসংখ্যার অনুপাতে তাদের চাকুরীতে স্থান দিতে হবে। লর্ড রিপনকে প্রদত্ত 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র ১৮৮২ সালের 'স্মারকলিপি'তে এ বিষয়টার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, মুসলমানদের পুঁজি নেই যে তারা ব্যবসায় করে বা শিল্পোৎপাদনের অনুসন্ধান করে; তাদের শিক্ষাও এমন উন্নত নয় যে, প্রতিযোগিতায় প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে পাল্লা দেয়; এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল মুসলমানদের জন্য চাকুরীতে নিয়োগের যোগ্যতাবলীর শর্ত শিথিল করা এবং তাদের বিশেষ সুবিধা দান করা।[১] বলা বাহুল্য, উচ্চ শিক্ষিত অধিক অগ্রসরমান হিন্দুগণ সাধারণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকুরীর দাবী করতেন। উভয়ের স্বার্থের সংঘর্ষ এখানেই। এরূপে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়। হিন্দু রাজনীতিবিদরা চাইতেন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুসলমান রাজনীতিবিদরা চাইতেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় কংগ্রেসে' (১৮৮৪) যোগদানের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন সন্দেহ, মনোমালিন্য ও কোন্দল চলেছিল। সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত কংগ্রেসে হিন্দুগণের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়, এই অভিযোগ থেকে মুসলমান কংগ্রেসকে ভাল চক্ষে দেখেনি। কংগ্রেসের শুরু থেকেই মুসলমান নেতাদের সন্দেহ ছিল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী যোগদান করেননি। বাংলা পত্র-পত্রিকায় মুসলমান লেখকগণ

১. *Ameer Ali His Life and Works,* PP. 35-36

অনুরূপ কণ্ঠ তুলে বলেছিলেন যে বাংলার মুসলমান একটি অনগ্রসর জাতি, অগ্রসর হিন্দু জাতির সাথে রাজনীতি করে ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হওয়া মুসলমানদের পক্ষে আত্মঘাতী ব্যাপার হবে; আগে শিক্ষাদীক্ষায় উপযুক্ত হয়ে তবে মুসলমানদের রাজনীতি করা সঙ্গত হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যেমন, অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও তেমনী দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মেলামেশা করেনি। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু সভ্য সংখ্যাই সর্বাধিক, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান সভ্য সংখ্যাই সর্বাধিক। শহর-মফস্বল সর্বত্রই একই রূপ। এটা তখন প্রায় ধরেই নেওয়া হত যে, মুসলমানের প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং হিন্দুর প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে গঠিত, অতএব উভয়ের একত্রে মেলা-মেশা চলে না। সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে আদান-প্রদানেও দূরত্ব রচিত হয়েছে। হিন্দুগণ 'শিবাজী উৎসব' (১৮৯৫) উদ্‌যাপন করে মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেন। মুসলমানগণ গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের পক্ষে আন্দোলন করে হিন্দুর প্রাণে আঘাত দেন। এসবই শ্রেণীস্বার্থের ভেতরকার দ্বন্দ্বের ফল—কোনটি প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব, কোনটি পরোক্ষ দ্বন্দ্ব। আগেই বলেছি, শাসক ইংরাজ তাঁর ঔপনিবেশিক স্বার্থে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বন্দ্বে বিরোধ-নিষ্পত্তির চেয়ে বিরোধ-বৃদ্ধির বেশী কৌশল করেছেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যার একটি প্রত্যক্ষ ফল। প্রশাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা যতই বলা হোক, বঙ্গ ভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে বেশী ক্রিয়া করেছে, তা ধ্রুবের মত সত্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম মধ্যবিত্তের কর্মধারার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্ব-শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে ইংরাজী ভাষার প্রচলন ও আধুনিক বিদ্যা-শিক্ষার বিস্তার। আবদুল লতিফ এ ব্যাপারে প্রথম প্রবক্তা ছিলেন; তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল 'শরীফ শ্রেণী' যার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোক আছেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারী, সওদাগরী চাকুরীর সংস্থান করা যাতে করে মুসলমান পরিবারে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছে তা কাটিয়ে উঠতে পারে। তিনি মক্তব-মাদ্রাসায় আরবী-ফারসী শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে আরবী-ফারসী না জানলে শরীফ সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। শরীফ শ্রেণীর পারিবারিক ভাষা উর্দু, আবদুল লতিফ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুর সপক্ষে ওকালতি করেন। আবদুল লতিফের সমর্থক গোষ্ঠীরও ঐরূপ মনোভাব ছিল। তাঁরা ইংরাজী শিক্ষাকে যে অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেভাবে প্রাচীন শিক্ষাধারার সমর্থন

দিয়েছেন, এবং মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে বর্জন করেছেন, তাতে তাঁরা যে প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তা বলা যায় না। সমাজে নতুন বিপ্লব ঘটানোর কথা তাঁরা ভাবেননি; ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলার হিন্দু সমাজের অন্তর্জীবনে ও বহির্জীবনে যে ভাববিপ্লব এনেছিল, 'লতিফ-গোষ্ঠী'র মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। তিনি মহামেডান লিটারেরী সোসাইটিতে যাঁদের একত্রিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপতিও ছিলেন। তাঁরা মধ্যযুগীয় খানদান, চালচলন, ভাববিলাসিতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের গৌরব মর্যাদা ও সম্মানের সূত্র খুঁজতেন, অন্য কথায় তাঁরা পুরান আভিজাত্যের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 'লতিফ-গোষ্ঠী'র শিক্ষা-আন্দোলনে এরূপ পিছুটান ছিল। সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র মাধ্যমে শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু তিনিও সমাজবিপ্লব আনতে পারেননি। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন, তবে উর্দু ভাষাকে বাঙালীর মাতৃভাষা করতে চেয়েছেন কেননা উর্দু ভারতীয় মুসলমান সমাজে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসাবে কাজ করবে। সর্বস্তরে ইংরাজী শিক্ষার জন্য তিনি জোর ওকালতি করেন। তিনি আজীবন ইংরাজী চর্চা করেছেন: আইন, ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ক তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত হয়। কিন্তু তাঁরও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ছিল। আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও 'আবেদন-নিবেদনে'র রাজনীতি করেছেন; ইংরাজদের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে স্বজাতির অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন; তবে দাবী-দাওয়ার সে প্রশ্ন ক্ষুরধার ছিল না। রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েও তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি। মুসলমান সমাজের দুরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল, এজন্য তিনি সমাজের সমকালীন সমস্যার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সহিত তাঁর মতাদর্শের মিল ছিল, যার জন্য তিনি ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তার কথা ভেবেছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেননি। ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রীস্টানদের আক্রমণাত্মক সমালোচনায় তিনি আহত হয়েছিলেন। উইলিয়ম মুইর-এর 'লাইফ অব মহামেডান' (১৮৬৯) গ্রন্থের প্রতিবাদে সৈয়দ আহমদ হজরত মহম্মদের জীবনী লিখেছিলেন; আমীর আলী ইসলামের শরীয়তী আদর্শের মাহাত্ম্য, ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ করে এবং আরবের প্রথম যুগের মুসলমানের গৌরব ও বীরত্বের কাহিনী রচনা করে ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। 'আমীর-গোষ্ঠী'র মধ্যে উদীয়মান নব্য শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ছিল। ডক্টর নজমুল করিম 'লতিফ-গোষ্ঠী'কে 'ওল্ড এলিট' এবং

'আমীর গোষ্ঠী'কে 'নিউ এলিট' বলেছেন।[১] আমীর আলীর পিতা অযোধ্যা থেকে কটক হয়ে এসে হুগলীতে হেকিমী চিকিৎসা করতেন; তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। বৃত্তির টাকার উপর নির্ভর করে ওয়ারেস আলী ও আমীর আলী দুই সহোদর লেখাপড়া করেন এবং প্রখর মেধাশক্তির গুণে উচ্চ রাজপদ লাভ করেন। আমীর আলী হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। ব্যক্তি জীবনের এই পটভূমি যাঁর এবং যিনি জীবনে ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ কায়েমী স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারে না।[২] সুতরাং কাণ্ডারীহীন সমাজের মুখপত্র হয়ে আবদুল লতিফ ও আমীর আলী অধঃপতিত মানুষের মতিগতি ফিরিয়েছিলেন বটে কিন্তু সমাজচিত্তে আমূল পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বীজ বপন করতে পারেননি।

আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর অনুসারীর একটা ক্ষুদ্র অংশ দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন পুরাতন মৃত আভিজাত্যের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরাই প্রথমে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩) এবং পরে 'প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩) স্থাপন করে তাঁদের আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের চিন্তা-ধারার প্রধান গুণ ও অভিনবত্ব হল এই যে বাংলা ভাষাকে বাঙালীর মাতৃভাষা হিসাবে গণ্য করে তারই মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার করা। ইংরাজী, বাংলা ও আরবী সকল প্রকার শিক্ষার প্রসারে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁরা শিক্ষা সমিতি গঠন করেছিলেন। কলিকাতার চৌহদ্দি পেরিয়ে তাঁরা গ্রামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং গ্রামের মানুষকে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলওয়ার হোসেন আহমদ পুরোপুরি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে ধর্মীয় ও সামাজিক আইন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করেন। উত্তরাধিকার আইন, মহাজনী কারবার,

১. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 300

২. ডবলিউ, এস, ব্লান্ট আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে বলেন যে, আবদুল লতিফ, আমীর আলীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সরকারের সুদৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল, যার জন্য তাঁরা কেউ সমাজকর্মী হিসাবে উপরে উঠে আসতে পারেননি। তাঁর ভাষায়, "Neither Amir Ali nor Abdal-Latif would afford to come forward as champion as all their prospects depended on the Government."
Wilfred Schwen Blunt—*India Under Ripon—A Private Diary*, London, 1909, P. 109.

বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি একাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন।[১] এঁদের সাথে বাঙালী লেখক ও সম্পাদক যোগ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন এবং কর্মসূচী প্রণয়নে সাহায্য করেন। তবে এ আন্দোলনও বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। দুটি অধিবেশন খুব গুরুত্বের সাথে হয়েছিল তারপর এল দেশবিভাগ, নতুনভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার। শিক্ষা-সমিতির আন্দোলনে দু'এক বছরের মধ্যে ভাটা পড়ে যায়। শিক্ষা-সমিতির আন্দোলনেও কর্মীদের বিপ্লবী মনোভাব ছিল না। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন উৎসাহী প্রগতিশীল যুবক ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যাঁদের সাথে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীল লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। এজন্য কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেও শিক্ষা-সমিতির আন্দোলনে সাড়া জাগান ফল পাওয়া গেল না।

ব্যক্তি-প্রচেষ্টার সাথে যৌথ-প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলেছিল যার ফলে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম হয়। মুসলমানের প্রথম সংগঠন কলিকাতার 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৫), পরে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মফস্বল শহরগুলিতেও এসবের আদর্শে অনেক সভা-সমিতি স্থাপিত হয়। মুসলমান সমাজে মানুষের মনে অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা, সংহতিবোধ এবং সমাজমুখী চিন্তাধারা জাগ্রত হয় এসব সংগঠনের মাধ্যমে। সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ সমকালীন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলির সমাধানের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্মসূচী ছিল। কোন কোনটিতে রাজনৈতিক চিন্তারও প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান সমাজের সমস্যার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। এগুলিতে হিন্দু সদস্য প্রায় থাকতেন না এবং হিন্দু-মুসলমানের যৌথ চিন্তা ও কর্মের স্থানও ছিল না। মিলনের ডাক অপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণের প্রয়াস ছিল বেশী। বিশেষ করে, গো-বধ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি সভা-সমিতি সে-বিষয়ে খুব সোচ্চার ছিল; অন্য অন্য বিষয়েও সমিতিগুলি মুসলমান সমাজের অধিকারের সপক্ষেই আন্দোলন করেছে।

---

১. Delawar Hosaen Ahmed—*The Future of the Mohammedan of Bengal* (1880), *Essays on Mohammedan Social reform* (1889), *Mohammedan Law of inheritance* (1896)

বাঙালী মুসলমানের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা এ পর্বেই শুরু হয়। এর আগে শিক্ষিত লোকেরা বাংলা ভাষা শিখতেন না, বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উর্দু-ফারসী। তবে তাঁরা উর্দু-ফারসীতেও অধিক অগ্রসর হয়েছেন, এমনও নয়। আবদুল লতিফের জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবদুল গফুর উর্দু কবি ছিলেন।[১] তাঁর পিতা কাজী ফকির মোহম্মদ ফারসীতে ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। উর্দু বাঙালীর মাতৃভাষা নয়, মাতৃভাষা ছাড়া জাতীয় চিন্তা-চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষিত শ্রেণীর আরবী-ফারসীর মোহের ঘোর কাটতেই প্রায় সত্তর বছর কেটে যায়। এ সময়ের মধ্যে অল্প শিক্ষিত একটি শ্রেণী যা রচনা করেছেন তা 'দোভাষী পুথি' বা 'বটতলার সাহিত্য' নামে পরিচিত। এগুলি বাংলা ভাষার সাথে আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের মিশ্রণে রচিত কৃত্রিম পদ্য সাহিত্য। মীর মশাররফ হোসেন প্রথম বলিষ্ঠ গদ্য লেখক। তিনি যথেষ্ট উদারতা ও যুক্তিশীলতাকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তখন চারদিকে অন্ধকার জমে আছে, মন পিছনে পড়ে আছে, স্বার্থচিন্তা ও ধর্মান্ধতার পাকে সমাজের গতি অচল, স্থবির। লেখকের মুক্তচিন্তার ডাকে সমাজ সাড়া দেয়নি, বরং তাঁকে টেনে নিজ গহ্বরে নিয়ে গেছে। তিনি 'গো-জীবন' (১৮৮৭) লিখে সমাজের কাছ থেকে 'কাফের ফতোয়া' পান, এবং মামলায় জড়িয়ে পড়ে বিপদগ্রস্ত হন। কাজেই তিনি ঐ পথ ছেড়ে 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩), 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৭) 'এসলামের জয়' (১৯০৮) প্রভৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিশুদ্ধ শিল্প সাহিত্য, সুস্থ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার মত সমাজের অবস্থা ছিল না। মশাররফ হোসেনের ঈষৎ পরে টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, যশোহরের মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, নদীয়ার শেখ জমিরুদ্দীন, বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ২৪-পরগণার শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ গদ্য লেখকের আবির্ভাব হয় যাঁরা প্রধানতঃ রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক কালে ঢাকার কায়কোবাদ, শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক, রংপুরের শেখ ফজলুল করিম, মেদিনীপুরের শেখ ওসমান আলী প্রভৃতি কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ছিলেন যাঁরা সুস্থ চিন্তা করেছেন সমাজের আবেগ অনুভূতিতে ভারসাম্য আনার জন্য। তবে তাঁরাও মুসলিম সমাজের মুক্তি চেয়েছেন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের

---

১. দিল্লীর উর্দু কবি গালিব আবদুল গফুরের কাব্যের প্রশংসা করেন। তিনি তিনখানি দীওয়ান সহ মোট ষোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গফুরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'তাজকিরায়ে সুখনে শুআরা'। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী করতেন।
মনিরুদ্দীন ইউসুফ—উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ২০৫-০৬

মধ্য দিয়ে। মুসলমানের অতীত গৌরব, ইসলামের মহিমা কীর্তন করে তাঁরা পাঠকের মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সুতরাং লক্ষ্যের দিক থেকে রক্ষণশীলদের সাথে তাঁদের বিশেষ তফাৎ ছিল না। শুধু বলা যায় যে, তাঁরা গোঁড়ামিমুক্ত ছিলেন। সেকুলার ভাবাদর্শে লেখনি ধারণ করেনি সেযুগের মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিও। পত্র-পত্রিকা যৌথকর্ম সাধনের ও যুক্তচিন্তা প্রকাশের একটি উত্তম ক্ষেত্র। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণই সাময়িকগুলি চালাতেন; কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতাকর্ম একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৮৪), 'সুধাকর' (১৮৮৯), 'ইসলাম-প্রচারক' (১৮৯১) প্রভৃতি পত্রিকার সাথে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ সম্পাদক জড়িত ছিলেন। তাঁরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন করেন, তার মূলবৃত্ত ছিল 'ইসলামীকরণ'। কেউ কেউ আবার প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র ও ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে জাতীয় প্রেরণার উৎস খুঁজে পেলেন, বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাস প্রায় উপেক্ষিত হল: সমকালের বাস্তব সমস্যাগুলিকেও যুক্তিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গি ও সহনশীল মনোভাব নিয়ে তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করেননি। ফলে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বেশী; তখনকার হিন্দুনেতা ও সাহিত্যসেবীদের কাছ থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে উদারতা ও মিলনের বাণী উচ্চারিত হয়নি। খ্রীস্টান পাদরীগণ মিশননীতির উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মকে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রাজনীতির স্বার্থে মুসলমানের ইতিহাসকে বিকৃত করে আলোচনা-সমালোচনা করতেন; হিন্দু সমাজের উঠতি নব্য বুদ্ধি-জীবীদের মনে তার প্রভাব পড়ে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁদের মনের দুয়ার খুলেছিল যার জন্য তাঁরা শতাব্দীর গোড়াতেই ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন। একে তো সমাজের বুকে নানা গলদ জমে ছিল, তার উপর খ্রীস্টান মিশনারীদের কাছ থেকে আঘাত এসেছিল। ফলে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন তাঁদের মধ্যেও দেখা দেয়। খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁরা এক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবাদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতির উপর জোর দেন। তখন বাংলা সাহিত্যের তাঁরাই ছিলেন প্রধান রূপকার; তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে, তাঁরা আরব-ইরানের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের ধর্ম-সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে এ-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিল না। ক্রমে তাঁদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং একটি শ্রেণী-

সচেতন নব্যসমাজের উদ্ভব হয়। প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাঁদের বিরোধ ছিল না, বরং ব্রিটিশ শাসনের সাথে সহযোগিতা করে ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগকে তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এজন্য শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তোষণনীতি তাঁদের মধ্যেও ছিল। শাসককে অসন্তুষ্ট করে আর্থিক সুবিধাগুলি (যা ক্রমে কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়) ত্যাগ করতে তাঁরা পারেন না। কিন্তু এ অবস্থাও বেশী দিন টিকেনি। সমাজে উঁচু তলার মানুষের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী, মর্যাদা তাঁরা পান নি।[১] সাহেবরাই সব বড় চাকুরী ও ক্ষমতার পদগুলিতে সমাসীন; বাঙালী নব্য শিক্ষিত যুবকেরা তার ভাগীদার হতে চান। আবার রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতারও অংশীদার হওয়ার দাবী উঠতে থাকে। ফলে ইংরাজ শাসকের সাথে বাঙালীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এরূপ চেতনা ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কেবল নেটিভ বলে তাঁর পদোন্নতি হয়নি। আই. সি. এস. পাশ করেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকুরী হয়নি। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের এই সংঘাত-সংঘর্ষ সাহিত্যে রচনায় প্রতিফলিত হয়। নব জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ-প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা নতুন ভাববিপ্লব নিয়ে এলেন। সরাসরি ইংরাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার মত সমাজসংহতি, রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলন তখন গড়ে উঠেনি; অতএব তাঁরা লেখনির মাধ্যমে তাঁদের সংগ্রামী মনোভাবকে তুলে ধরলেন। দুই শক্তির দ্বন্দ্ব দেখাতে ভারতবর্ষে মুসলমান আমলের ইতিহাস ছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর লেখক ইতিহাসের মধ্যেই তাঁদের সংগ্রামী অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজেছেন। তাঁরা ইতিহাসের উপাদানের জন্য নির্ভর করলেন ইংরাজ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থগুলির উপর। পাঠান ও মোঘল আমলের মারাঠা, রাজপুত, শিখ, জাঠ, অমেঠি প্রভৃতি জাতির বীরত্বকাহিনী কাব্য-উপন্যাস-নাটকের বিষয়বস্তু হল। বাংলার প্রতাপাদিত্য, সীতারামের সামান্য ক্ষমতা ও সামান্য ইতিহাস অসামান্য হয়ে উঠল। ইতিহাসের সত্যাসত্য যাচাই করার প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন হয়নি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে তার। তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বড় ছিল। তাঁদের চিন্তায় পৃথিরাজ, রাণাপ্রতাপ সিংহ, জয়সিংহ, শিবাজী নায়ক হলেন, আলাউদ্দীন, আকবর, আওরঙ্গজেব শত্রু হলেন; এটি যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সামন্ত-

১. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১১-১২

বাদী শক্তির লড়াই ছিল, এই সত্য চাপা পড়ে যায়। মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু শক্তির পুনরভ্যুত্থানের এই ধারাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি; বরং তাঁদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সর্বত্র। ইংরাজের 'সুয়োরানী-দুয়োরানী নীতি'র কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হিন্দুর উদীয়মান শক্তির পরিচয় পেয়ে শাসক-গোষ্ঠীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আশ্রিতবাৎসল্যের দিন গেছে। সুতরাং এখন অপর একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়কে 'পুশ' করার প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়কে সুযোগ সুবিধা দিয়ে শাসননীতি-শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে এ সময়। আবদুল লতিফ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ও ভাবাদর্শ ভিন্ন ছিল। মুসলমান সমাজের যে অবস্থা তাতে তাকে রক্ষা করাই দায়, তাকে সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না ভেবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েও আবদুল লতিফ, আমীর আলী হিন্দু সমাজের সংগ্রামী ভাবান্দোলনের সাথে মিশতে পারেন নি। আবদুল লতিফ বলেন যে স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক হতে ইসলাম-বিরোধী বিষয়গুলি দূর করতে হবে, গ্রামের মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে হবে কিন্তু সে-বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দের আমদানী করতে হবে। আমীর আলী সরকারী অনুগ্রহ বণ্টনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দাবী করেন। মুসলমান সমাজপতিদের এরূপ মনোভাবকে পুঁজি করে মুসলমান লেখক-সাংবাদিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; ঠিক ঐ সময় হিন্দু সমাজ-নেতা ও সাহিত্যিকগণের মনোভাবের উল্টো ধারা চলছে। ফলে প্রতিক্রিয়া হলো বেশী, বলতে গেলে এই প্রতিক্রিয়া থেকেই মুসলমান পরিচালিত বাংলা সাময়িক পত্রগুলির জন্ম। এজন্য সমাজ, ধর্ম, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেখানেই ভুল তথ্য আছে বা আঘাত-আক্রমণের সুর আছে সেখানেই প্রতিবাদ হয়েছে। একদিকে এই প্রতিবাদের স্বর তুলে এবং অপরদিকে সমাজ সংগঠনে হিন্দুয়ানি উপাদান বর্জন করে সে স্থলে ইসলামী উপাদান আমদানী করে 'জাতীয় সাহিত্য' নির্মাণের আন্দোলন করেছেন তাঁরা।[১] সামাজিকভাবে মিলতে না পারলে সাহিত্যেও মিলন হয় না। রবীন্দ্রনাথ সেযুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের কথাটি এভাবে বলেছেন, 'আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারু শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানার মত তাঁহাদের হঠাৎ হিন্দুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ি-

১. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

য়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজপত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গালা শিখিতেছেন এবং বাঙ্গালা লিখিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই একপক্ষ হইতে ইট এবং অপর পক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।"[১] অবশ্য কিছু কিছু হিন্দু-মুসলমানের মিলনসূচক প্রবন্ধ ছাপা হত; একটি পত্রিকা 'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭) মুনশী গোলাম কাদের মাগুরা থেকে প্রকাশ করেছিলেন। আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত 'আহমদী' (১৮৮৬) পত্রিকার উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিখিলনাথ রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রোথিতযশা লেখক মিলনের ডাক দিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলের কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়। জাতির সংগঠন ও জাগরণের কাজে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁরা কেউ কেউ চেয়েছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে ইসলামী ভাবাদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে। মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দুর পুনর্জাগরণ এবং হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুসলমানের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়—এ বিষয়টি ঐ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনকারীরা ভেবে দেখেননি। তবে খণ্ডিত হলেও তাঁরা যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পরিবর্তন এনেছেন, একথা সত্য। এর অপর নাম 'রিভাইভালিজম'। রেনেসাঁসের প্রধান ধর্ম যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন ও সেকুলার চিন্তা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা—এখানে সেগুলি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ধর্মবুদ্ধি ও স্বার্থচিন্তা স্থান পেয়েছে। ইসলামের ধর্মনীতি অধিক সুসংগঠিত এবং রক্ষণশীল। এজন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও আদর্শ নিয়ে বিভেদ ও বিবাদ কম হয়েছে; বরং তাঁরা বাঁচার তাগিদে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে অল্প সময়ে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। এরূপ মত পোষণ করে বি. বি. মিশ্র বলেন, "...the traditional orthodoxy of Islam and the time-lag in the Western education of Muhammadans made revivalism a relatively stronger force in that community, and this was reinforced by the economic decline of the Muslim community."[২] জাতির ভাগ্যবিপর্যয় ও দুর্গতির সাধারণ শত্রু যে বিদেশী শাসক, এটা যথাসময়ে এবং ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে হিন্দু ও মুসলমান যুক্তভাবে রাজনৈতিক

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হিন্দু ও মুসলমান, সাধনা, চৈত্র ১৩০১

২. *The Indian Middle Class*, p. 17

ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিপ্লব না করে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছেন, সে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক স্বার্থে স্বতন্ত্র পথেই গেছে, সমগ্র জাতির অভিন্ন স্বার্থে তা পরিচালিত হয়নি। অর্থাৎ 'বাঙালী জাতীয়তাবাদে'র আদর্শে তাঁরা সম্মিলিত হননি। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রধানতঃ শহরের শিক্ষিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; বৃহত্তর জনগণকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিখণ্ডিত ও দ্বিধাগ্রস্ত আংশিক জাগরণকে সমগ্র জাতির জন্য নবজন্ম বা রেনেসাঁস বলা যায় না, একে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তা ও মুসলিম জাতীয়তার রিভাইভালিজম বা পুনরভ্যুত্থান বলাই যুক্তিসংগত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

একটি মানব সমাজে বিপ্লব, বিবর্তন বা পুনর্জাগরণ আসে হয় কোন প্রখর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহামানবের চিন্তাশক্তির প্রভাব ও সফল কর্মপ্রয়াসের ফলে, যেমন যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ দ্বারা হয়েছে ; আর না হয় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে অর্থনৈতিক আধিপত্য এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে গেলে যেমন পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্রের অবসানে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে ছোট ছোট সামন্ততন্ত্র ছিল। আঠার শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্যের প্রভাব পড়তে থাকে। ঐ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্যুত্থান হয়। ইংরাজগণ এদেশের মাটিতে শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলে এবং বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে ইউরোপের তুল্য অর্থনৈতিক বিপ্লব আনতে পারতেন, কিন্তু বণিক সরকার ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পপণ্যের আমদানী-কারী উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা সমাজ ব্যবস্থাতে কোন গুরুতর পরিবর্তন আনেননি, বরং সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি ও উপনিবেশিক শোষণ-নীতি টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের সামন্তশ্রেণীকে লুপ্ত হতে দেননি। তাঁরা পুরাতন সামন্তদের ধ্বংস করেন, পাছে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ ব্রিটিশ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়[১], পুরাতন সামন্তদের উৎখাত করে নতুন বশংবদ সামন্তপতির সৃষ্টি করেন। ফলে ভারতবর্ষে অর্থনীতি বা সমাজ কাঠামোর দিক থেকে কোন গুরুতর পরিবর্তন আসেনি। কেবল ধীর গতিতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এদেশের নবোত্থিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষের মধ্যে মানসিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এসেছে যাকে 'ভাববিপ্লব' বলা যায়। শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে উনিশ শতকের গোড়ায় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে এই বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে, নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের হিন্দুরা ঐরূপ সুযোগ

---

১. বণিক সরকার যে মুঘল আমলের জমিদারদের ধ্বংস কামনা করেছিল, তার প্রমাণ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিবরণীতে পাওয়া যায় : "বড় বড় জমিদার তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাঁদের প্রভাব নষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।"—
Introduction to the Fifth Report.

সুবিধা পায়নি বলে তাদের মধ্যে কোনই আলোড়ন, আবর্তন জাগেনি। অনুরূপ ভাবে মুসলমান সমাজও পিছিয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা গ্রহণ করে একটি নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারাই ক্রমশ স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করে তোলার আন্দোলন করে। একই শাসকের শাসন-নীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বিরাজ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণহিন্দুর তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শরীফশ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ এই নব-দীক্ষিত, নব-জাগ্রত মধ্যবিত্তের অনুপস্থিতি। কিভাবে, কাদের দ্বারা, কত হারে, মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে, আমরা প্রথম অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। এখানে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনের উত্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উনিশ শতকের এই গঠনমূলক পর্বে তাঁদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারলে মুসলিম নবজাগরণের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গতি ও মাত্রা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবে। সত্যকার সমাজকর্মী নেতার সংখ্যা খুব বেশী হবে না, এককভাবে নেতৃত্বদানের শিরোপাও কাউকে দেওয়া যাবে না, কিন্তু প্রথমে একটি কণ্ঠস্বরের সাথে আর একটি কণ্ঠস্বর এবং তৎপরে দুটি, তিনটি করে আরও কণ্ঠস্বর মিলে সমস্বরের সৃষ্টি করেছে। সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যৌথভাবে উচ্চস্বরও ধ্বনিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এরূপ পদ্ধতিতে ব্যক্তির প্রয়াস সমষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট আকারে ও প্রকৃতিতে দানা বেঁধেছে। যেহেতু সমাজের এই পরিবর্তন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বদ্ধদশা থেকে মুক্তির দিকে সেহেতু একে 'নবজাগরণ' আখ্যা দেওয়া যায়।

ঐ সময় কি হিন্দু কি মুসলমান সমাজে কোনরূপ আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বাইরের বৈরিশক্তি ও ভেতরের বিরোধীশক্তির সাথে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর ফলে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত একেবারে ভেঙে পড়ে। অজ্ঞতা, অশিক্ষার কারণে সামাজিক রীতিনীতি, অসৎ আচার-আচরণ, কুসংস্কার, কুনীতি সমাজ জীবনে প্রবেশ করে সমাজ দেহকে পঙ্গু করে ফেলে। এদিকে ব্যবসায়, শিল্প, মহাজনী, চাকরী-বাকরী দ্বারা অর্থ উপার্জনের পথ প্রায় বন্ধ, সেগুলি অধিকাংশই শাসক ইংরাজ ও শিক্ষিত বর্ণহিন্দুর দখলে চলে যায়।[১]

---

১. Bimanbihari Majumdar, Doctor—*Indian Political Associations and Reform of Legislature* (1818-1917), Firma K.L. Mukhopadhaya, Calcutta, 1965, p. 220.

১,৫০০ টাকা ও তার উর্ধ্বে উচ্চ পদে ইউরোপীয় শাসক ও ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের স্থান ছিল এরূপ :

সাল	মোট পদ	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান
১৮৬৭	২১৮২	২০০৮(৯৩·৮%)	৯৯(৪·৫%)	৩৫(১·৬%)
১৯০৩	৩৮৬০	৩২৫৪(৮৪·৩%)	৫০৮(১৩·১%)	৯৮(২·৬%)

সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ বলেছে, ইংরাজী ভাষা 'কুফরে কালাম' —সে ভাষা শিক্ষা 'হারাম'; পাশ্চাত্য বিদ্যা 'এলমে দেকিন'—সে বিদ্যা অর্জন অসিদ্ধ। আবার কোন কোন শ্রেণীর মানুষ ভারতবর্ষকে 'দা'রুল হরব' বা শত্রুভূমি মনে করে ওহাদের নীতি অনুসরণ করেছে। নিতান্ত দায়ে ঠেকে সামাজিক বাধা, ধর্মীয় কুসংস্কার ঠেলে কেউ যদি লেখাপড়া শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, সে দেখেছে শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি; শিক্ষালাভ করে কর্মজীবনেও বাধা—হিন্দুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। সেকালের পত্র-পত্রিকা ও নথিপত্র থেকে জানা যায়, নিজেদের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা ও আমলাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানদের অনেক জমিদারী হাতছাড়া হয়ে গেছে। এক কথায়, সমাজের তখন ভরাডুবি অবস্থা। প্রায় সব দিক থেকে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে কয়জন ব্যক্তি সমাজের নবজাগরণের আন্দোলন শুরু করেছিলেন, একটি জাতির ইতিহাসে তাঁদের দানের গুরুত্ব অনেক। মধ্যবিত্ত পরিবারের কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। কেউ কেউ পুরাতন ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, শক্তিহীন, অভিজাত রাজপরিবারের সান্নিধ্য কামনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি ছিল নিতান্ত শিখণ্ডীর মতই। কলিকাতাতে ইংরাজদের অনুগ্রহভাজন বৃত্তিধারী মহীশূর পরিবার, অযোধ্যা পরিবার, মুর্শিদাবাদ পরিবার ও অন্যান্য অভিজাত পরিবারভুক্ত লোক ছিলেন। তাঁরা সরকারের সাথে যোগরক্ষাকারী, সভাসমিতির কর্মকর্তা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য দানকারীর ভূমিকা নিলেও কেউ নেতৃত্ব দিতে পারেননি। ঢাকার নবাব পরিবারও তাই। ঐ পরিবারের সন্তান নবাব আবদুল গণি (১৮১৩-৯৬), নবাব আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১) প্রচুর বিত্তের মালিক, তাঁরা দানখয়রাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, ভোগ বিলাসিতায় আরও বেশী; সমাজের উপরে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সরকারী মহলেও তাঁদের উচ্চ মর্যাদা; তথাপি উনিশ শতকের নতুন ভাবাদর্শ, চিন্তাবৃত্তি, জীবনচেতনা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে আসেননি। এদিক থেকে কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, দেব পরিবার, সিংহ পরিবার, দত্ত পরিবার, মল্লিক পরিবার, কি ঘোষ পরিবারের সাথে অনেক তফাৎ আছে।

মুর্শিদাবাদের বনেদী নবাব ও ঢাকার উপাধিপ্রাপ্ত নবাব যেটুকু করেছেন, সেটুকু নিজেদের শিক্ষার জন্যই করেছেন, অন্য শ্রেণীর শিক্ষার জন্য তাঁরা তেমন মাথা ঘামাননি।[১] এজন্য উকিলের সন্তান আবদুল লতিফ ও হেকিমের সন্তান সৈয়দ আমীর আলীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ সবাই মধ্যবিত্তের সন্তান। গ্রামের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার ছিলেন, তাঁরাও লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করেননি। দু'একজন উচ্চ শিক্ষালাভ করলেও সমাজ সেবার কাজে এগিয়ে আসেননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা বি-এ, কি এম-এ ডিগ্রী নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দশ-পনের জনের বেশী জমিদারপুত্র পাওয়া যায় না।[২] অর্থের অভাব না থাকলেও তাঁরা যে লেখাপড়া শিখেননি, তার মূল কারণ চেতনাহীনতা ও ভোগ-বিলাসিতা। তবু নতুন যুগের নতুন ডাকে তাঁরা কেউ কেউ সাড়া দিয়েছেন; সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, আবদুল মজিদ চৌধুরীর মত জমিদার কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে একথা সত্য, জমিদাররা নব্যচিন্তার জন্মদাতা নন, তাঁরা শিক্ষিতদের চিন্তাধারার সহায়কশক্তি হিসাবে কাজ করেছেন মাত্র। বস্তুতঃ গ্রামের বিত্তবান জমিদার শ্রেণীর সাহায্যে শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্মচারী-বুদ্ধিজীবীরা মিলে নবজাগরণের বীজ বপন করেছিলেন। তাঁদের পারিবারিক পটভূমি, ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের পরিচয় থেকে জানা যায়, তাঁদের শক্তির সীমাবদ্ধতা ছিল, কোথাও পশ্চাৎ-মুখিতা, কোথাও মতবিরোধ, কোথাও বা শ্রেণীচরিত্র হিসাবে ঝুঁকি না নেওয়ার প্রবণতা। এজন্য সমাজের অগ্রগতি ছিল মন্থর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপ্লব অবশ্যই আসেনি, এ ছিল কেবল সমাজগতভাবে স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও স্বাধিকার চিন্তার নবোন্মেষ। সে-সূত্রেই সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের

---

১. নবাব আবদুল গণি পুত্র আহসানুল্লাহকে লিখিত এক পত্রে ঢাকার 'রইস বাসিন্দাদের' আধুনিক শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন। তারা লেখাপড়া শিখে নিজেদের অবস্থা জানতে পারলে নবাব পরিবারের নেতৃত্ব টিকবে না বলে ঐ পত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। নবাব এস্টেটের ওয়াকফ জমিদারীগুলির কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় আবুল হুসেন ঐ পত্র-খানির সন্ধান পান এবং সমকালের এক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন (১৯২১-২২)। কামরুদ্দীন আহমদ--বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ঢাকা, ১৩৮২, পৃঃ ৩৪

২. কুমিল্লার আবদুর রসুল, মেদিনীপুরের আবদুর রহিম, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী, দেলদুয়ারের আবদুল করিম ও আবদুল হালিম গজনভী ভ্রাতৃদ্বয়, ঢাকার আলাউদ্দীন আহমদ, বীরভূমের মোহাম্মদ সামসুজ্জোহা, জহিরুদ্দীন আহমদ, বর্ধমানের আবুল কাসেম, ত্রিপুরার মকবুল আলী প্রমুখ জমিদারপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী পেয়েছিলেন।

সূচনা হয়। হুমায়ুন কবীর বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম মানসকে 'নেতিধর্মী' বলেছেন।[১] নেতিধর্মী মানসিকতা কিছু গড়তে পারে না। কিন্তু এ যুগের ঐ শ্রেণীর মানসচিন্তায় গড়ার আবেগ, আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে। স্বসমাজের সমস্যা তাঁরা বড় করে দেখেছেন। সেটা যে ক্রমশ: ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতির বাতাবরণে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ লাভ করে, তা সত্য। তবে এর গঠনমুখী প্রবণতাকে অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন বলে উনিশ শতকের হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের মত একে 'মুসলিম রিভাইভ্যালিজম' নামে আখ্যায়িত করা যায়। এখানে কতিপয় জমিদার ও নবাশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাঁরা সমাজের নবজাগরণের ও পুনর্গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জমিদার

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩—১৯২৯)

সেকালের বাংলার জমিদারগণের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। ময়মনসিংহের ধনবাড়ী ছিল তাঁর আবাসভূমি। দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে তাঁর অধিক সম্পর্ক ছিল। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫) ও 'প্রচারক' (১৮৯৯) পত্রিকাদ্বয় তাঁর অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। 'মিহির ও সুধাকর' মুদ্রণের জন্য স্ত্রী আলতাফুন্নেসার নামে তিনি কলিকাতায় 'আলতাফী প্রেস' স্থাপন করেন।[২] পত্রিকাটি তাঁকে 'বিদ্যোৎসাহী জমিদার' বলে উল্লেখ করেছে।[৩] 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা 'স্বধর্মপরায়ণ ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার' বলে তাঁর প্রশংসা করেছে।[৪] মুসলমান লেখকের লেখা বিদ্যালয়ের পাঠ্যোপযোগী পুস্তকের অভাব ছিল। তিনি ঐরূপ পুস্তক রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করেন এবং মুদ্রণে আর্থিক সাহায্য দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এবং কাজী ইমদাদুল হক

---

১ বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ ভাগ, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৪৪ (২সং), পৃ: ৬৩৬

২. লেখক সংঘ পত্রিকা, জৈষ্ঠ ১৩৬৮

৩. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭

৪. ইসলাম প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলিকে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। ইসলামী সংস্কৃতি ও ভাবধারা নিয়ে রচিত পুস্তক স্কুল-পাঠশালায় পড়ান হয় না, এরূপ একটি অভিযোগ মুসলমান সম্প্রদায়ের ছিল। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদীর 'সুরিয়া বিজয়' (১৩০২) গ্রন্থখানি 'অশেষ গুণালঙ্কৃত ধর্মপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, উদার হৃদয়, দানশীল, মুসলমান জমিদার কুলরত্ন জনাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র নামে উৎসর্গ করা হয়।[১] নদীয়ার কবি দাদ আলী তাঁর 'সমাজ শিক্ষা' (১৯১০) পুস্তকখানি সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ লিপিটি ছিল এরূপ:

সৈএদ নবাব আলী খান বাহাদুর
পতিত সমাজে রক্ষাকারী, তুমি শূর।
দীন দাদ আলী, তব সুশিব ভিখারী
তোমার অশিব নাশ করিবেন বারি।[২]

নদীয়ার আর এক কবি মোজাম্মেল হক তাঁর 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) গ্রন্থখানি 'অনারেবল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী'কে উৎসর্গ করেন। কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) কাব্যের প্রথম খণ্ড 'ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'কে উৎসর্গ করেন।[৩]

কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। তিনি 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র (১৯০৫) একজন সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (১৯০০) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র সভায় বাংলাদেশে মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ক একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।[৪] ১৯১২ সালে যে 'আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি' গঠিত হয়, তিনি তার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিচ্ছেদের জোর সমর্থক ছিলেন। ১৯০৬ সালের 'সিমলা ডেপুটেশনে'র একজন সদস্য ছিলেন এবং ঐ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম লীগে'র প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের

---

১. 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।
২. গোলাম সাকলায়েন—কবি দাদ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
৩. কায়কোবাদ রচিত মহাশ্মশান কাব্যের 'উৎসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য।
৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩৮২-৩৮৩

সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি 'খিলাফত আন্দোলনে' (১৯২১) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৬ সালে 'খান বাহাদুর', ১৯১৭ সালে 'নবাব' এবং ১৯২৪ সালে 'সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করেন। তিনি 'ঈদুল আজহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরিফ' (১৯০৩) নামে দুখানি বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) এবং 'প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ' (১৯০৬) নামে দুখানি শিক্ষা সংক্রান্ত ইংরাজী পুস্তিকাও আছে।

আলী নওয়াব চৌধুরী

ত্রিপুরার (বর্তমান কুমিল্লার) পশ্চিমগাঁও-এর আলী নওয়াব চৌধুরী বনেদী জমিদার ছিলেন।[১] তাঁর পূর্ব পুরুষ আমীর মির্জা হুমায়ুন খান হোমনাবাদ জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ুন খানের পিতা প্রিন্স মির্জা জাহানদার ত্রিপুরা জয় করেন। বিরাট জমিদারী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। পশ্চিমগাঁও-এর জমিদারীর মালিক হন আলী নওয়াব চৌধুরী। তিনি 'শাহাজাদা মির্জা আওরঙ্গজেব' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রাসাদের নাম ছিল 'খুরশিদ মঞ্জিল'। তিনি কুমিল্লায় দরিদ্র বালকদের জন্য ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি সাধারণ পাঠাগারও স্থাপন করেন। এছাড়া, তাঁর স্থানীয় বহু দানকর্মও আছে। এরূপ জনহিতকর কাজের জন্য সরকারের নিকট থেকে তিনি ১৮৯৭ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।[২] 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'র একজন উৎসাহ দাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐ সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন (১৯০৪) তাঁরই গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসাবে অধিবেশনের গুরু দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়।[৩]

---

১. ময়মনসিংহের ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর সাথে ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও-এর জমিদার আলী নওয়াব চৌধুরীকে অনেকে এক করে ফেলেন, যেমন ডক্টর সুফিয়া আহমদ এরূপটি করেছেন (মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৮৯)। কিন্তু তাঁরা আলাদা ব্যক্তি; দুজনেই সমসাময়িক ছিলেন; সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রতিপত্তি অধিক ছিল। তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'নবাব' উপাধি পান। আলী নওয়াব চৌধুরী কেবল 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।

২. *Who's Who in India*, Vol. V, 1911, p. 29

৩. কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২

আবদুল মজিদ চৌধুরী (জন্ম ১৮৫৭)

তিনি রংপুর জেলার মহীপুরের জমিদার ছিলেন। এটি অত্যন্ত বনেদী পরিবার ছিল। এগার শতকে জমিদারীর পত্তন হয়। আবদুল মজিদের পিতার নাম ছিল শেখ জিয়াউল্লাহ চৌধুরী। তিনি সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। আবদুল মজিদ রংপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। তিনি রংপুর জেলার এবং বাইরের অনেক সভা-সমিতির সাথে জড়িত ছিলেন। 'রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশন' ও 'রংপুর ইসলাম মিশনে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে তিনি ঐগুলি পরিচালনার দায়িত্বভার দীর্ঘদিন বহন করেছিলেন। সমিতির মাধ্যমেই তিনি রংপুর মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন।[১] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'সোলতান' (১৩০৯) পত্রিকাখানি আবদুল মজিদ চৌধুরী ও মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। 'দামেস্ক হেজাজ রেলওয়ে'র জন্য তিনি অর্থদান করেন। সমাজে শিক্ষা বিস্তারেও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। এ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে সরকারের সাথে তাঁর পত্র বিনিময় হয়। তিনি নীচের দিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন, তবে সেগুলির শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার কামনা করেছিলেন। ফারসী-উর্দুর সাথে বাংলাভাষা শিক্ষার কথাও বলেছেন।[২] তিনি একটি স্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে সেগুলির ব্যয়ভার বহন করতেন। 'প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, "অদ্য আমরা খান বাহাদুর সাহেবের (আবদুল মজিদ চৌধুরীর) দাতব্য ডাক্তারখানা, মাদরাসা এবং স্কুল (মধ্য বাঙ্গালা) দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। স্কুলে প্রায় ৫০/৫৫ জন ছাত্র উপস্থিত দেখিলাম। এই সকল ছাত্রের সকলি প্রায় মোসলমান। যে সকল মোসলমান কপ্নি পরিয়া বেড়ায়, খান বাহাদুর সাহেব তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন।"[৩] তিনি রংপুরের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী

টাঙ্গাইলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করটীয়াস্থ পন্নী পরিবারের বিশেষ অবদান আছে। সাদত আলী খান পন্নী, তৎপুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী

১. মোতাহার হোসেন সুফী—তসলিমুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ৫৬
২. *Muslim Community in Bengal* (1884-1912), pp. 34-35
৩. প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮

খান পন্নী এবং তৎপুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, পত্রিকা, প্রেস, সমিতি প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন। করটীয়ার 'মাহ্‌মুদীয়া প্রেস' হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারীর কাগজপত্র, দলিল, রেকর্ড মুদ্রিত করার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হলেও এখান থেকেই মোহাম্মদ নইমুদ্দীন 'আখবারে এসলামীয়া' (১২৯১) পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। এতে মাহমুদ আলীর আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পুরামাত্রায় ছিল। এছাড়া, মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের অনূদিত কয়েকখানি গ্রন্থ মাহমুদীয়া প্রেস থেকে মাহমুদ আলী খান পন্নীর 'অনুমত্যানুসারে' ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। 'করটীয়া মাহমুদীয়া হাইস্কুল', 'করটীয়া সাদত কলেজ' এই পন্নী পরিবারেরই দান। দেলদুয়ারের গজনভী পরিবারের সহিত তুলনায় রক্ষণশীল হয়েও পন্নী পরিবার বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। মেয়রাজ-উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিম প্রণীত 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রন্থখানি 'হাফেজ মাহমুদ খান চৌধুরী'র নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

মীর মোহাম্মদ আলী

মীর মোহাম্মদ আলী ফরিদপুরের পদমদীর জমিদার ছিলেন। সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। তিনি 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭২) নাটকখানি মীর মোহাম্মদ আলীর নামে উৎসর্গ করেন। শেষ বয়সে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'সুধাকর' (১৮৮৯) পত্রিকার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র ১৮৮৯ সালের কার্যনির্বাহক কমিটি'র সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র (১৮৭৬) প্রথম থেকেই সদস্য ছিলেন। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৮) এবং সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন এ্যাক্টের (১৮৭৭) প্রতিবাদে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক আনন্দমোহন বসু এক সভার (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯) আয়োজন করেন। নবাব মীর মোহাম্মদ আলী ঐ সভার সভাপতি হন।[১] সরকারী মহলেও তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৭৬ সালে বাংলার 'ব্যবস্থাপক সভা'র সভ্য মনোনীত হন। সমাজ সেবার জন্য ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে 'নবাব' উপাধি পান। তিনি মৃত্যুকালে জমিদারীর একটা মোটা অংশ

১. Nirmal Sinha—*Freedom Movement in Bengal* (1818-1905), p. 353 ; *Muslim Community in Bengal* (1884-1912). p. 164

সৎকার্যে দান করে যান। ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয়, আরবী-ফারসী মাদ্রাসা, দাতব্য ঔষধালয় এবং অতিথিশালা নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যয়ের জন্য এই দানের ব্যবস্থা করেন।[১]

সৈয়দ এরফান আলী

বীরভূমের জমিদার সৈয়দ এরফান আলী সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র হুগলী শাখা ও বীরভূমের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮৯৮ সালে লাহোরে যে 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' হয় তাতে সৈয়দ এরফান আলী বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।[২] কলিকাতা মাদ্রাসায় একশত টাকার 'উডবার্ন পদক'টি তিনি দান করেন। যে ছাত্র আরবীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া, মাদ্রাসার হোস্টেল নির্মাণেও মোটা টাকার চাঁদা দেন।[৩] তিনি 'পবিত্র বাক্য' নামে হজরত মোহাম্মদের নীতিশিক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।[৪]

আবদুস সোবহান চৌধুরী

বগুড়ার নবাব সৈয়দ আলতাফ আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী খুব প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তিনি সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। নবাব-জমিদারগণ আভিজাত্যের গৌরবে সেযুগে সচরাচর এরূপটি করতেন না। আবদুস সোবহান চৌধুরী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র বগুড়া শাখার সভাপতি ছিলেন। বগুড়ার মাদ্রাসাটি তিনিই স্থাপন করেন।[৫] বগুড়া শহরে উকিল-ঘর নির্মাণের জন্য ৫00 টাকা অর্থ সাহায্য দান করেন।[৬] 'বগুড়া তাহিরন্নেসা মহিলা হাসপাতালে'র খরচ চালাবার জন্য

১. *The Moslem Chronicle,* 5 December 1896
২. ঐ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৮
৩. ঐ, ৮ মে ১৮৯৭
৪. ঐ, ২ জানুয়ারী ১৮৯৬
৫. ঐ, ৯ জানুয়ারী ১৮৯৭
৬. আখবারে এসলামীয়া, শ্রাবণ ১৩০২

তিনি বাৎসরিক ৩০০ টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমিদান করেন। তাছাড়া, ছোটলাট উডবার্নের (১৮৯৮-১৯০২) বগুড়া পরিদর্শনের স্মৃতিরক্ষার্থে বগুড়া শহরে 'উডবার্ন আলতাফন্নেসা পার্ক' নামে একটি উদ্যান নির্মাণে ৫০০০৲ টাকা দান করেন।[১] ব্যক্তিগত গুণাবলী ও জনহিতকর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট থেকে 'নবাব' উপাধি পান (১৮৯৩)।[২]

করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫—১৯২২)

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম ছিলেন শিক্ষানুরাগিনী ও সাহিত্যিকমনা। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁরই সহোদরা বোন ছিলেন। বেগম রোকেয়া তাঁর 'মতিচুর' (২য় খণ্ড, ১৯২১) গ্রন্থখানি করিমুন্নেসার নামেই উৎসর্গ করেন।[৩] রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের তাঁদের পিতা ছিলেন। আবদুল করিম গজনভী (১৮৭২-১৯৩৯) ও আবদুল হালিম গজনভী (১৮৭৪-১৯৫৮) করিমুন্নেসার দুই কৃতি সন্তান ছিলেন। মাতার ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় তাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত 'আহমদী' (১২৯৩) পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ তাঁরই অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়। বেগম রোকেয়া 'লুকানো রত্ন' প্রবন্ধে বলেছেন যে, করিমুন্নেসা খানম কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা 'সাবের বংশের জনৈকা কন্যা' এরূপ অনুক্ত নামে 'কলিকাতার কোন হিন্দু পরিচালিত পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল।[৪] সম্পূর্ণ উর্দু পরিবারে লালিত পালিত হয়ে তিনি নিজ চেষ্টায় বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। তিনি 'দুঃখ তরঙ্গিনী' ও 'মানস বিকাশ' নামে দুখানি গ্রন্থ (অপ্রকাশিত) রচনা করেন।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁরই এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন (১৮৮৪-১৮৯২)। তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫) গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ 'করিমুন্নেসা খাতুনে'র নামে উৎসর্গ করেন।[৫]

১. *The Moslem Chronicle, 29 September,*
২. *Who's Who in India,* Part V. p. 27
৩. আবদুল কাদির সম্পাদিত—রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ৭
৪. ঐ, পৃঃ ২৮৭
৫. 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

৭—

ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪—১৯০৪)

ত্রিপুরার হোমনাবাদের জমিদার ফয়েজুন্নেসা চৌধুরাণী বিদ্যানুরাগিনী ও সাহিত্যানুরাগিনী ছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশে' তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করে লেখা হয়: "অদ্য আমরা আমাদিগের পূর্ব বাঙ্গালার একটি মুসলমান মহিলারত্নের পরিচয় দান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।...ইনি যেমন বিদ্যানুরাগিনী ও বিষয়-কার্য্যে পারদর্শিনী সেইরূপ সৎকার্য্যেও সমুৎসাহিনী। বাহিরে ইঁহার আড়ম্বর মাত্র নাই।...শুনিলাম ইঁহার আবাস স্থানে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন, এখানেও (ঢাকা) সেইরূপ বিনাড়ম্বরে নিরুপায় দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন।"[১] তিনি 'ঢাকা প্রকাশ'কে নগদ অর্থ সাহায্য দান করেন। কলিকাতার 'সুধাকর' (১২৯৬) ও 'ইসলাম প্রচারক' (১২৯৮) পত্রিকা দুটিকেও আর্থিক সাহায্য দান করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কুমিল্লা সদর হাসপাতালের 'মহিলা ওয়ার্ড' তাঁর আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হয় (১৮৯৩)।[২] লেখিকা হিসাবেও তাঁর পরিচয় আছে। তাঁর 'রূপজালাল' (১৮৭৬) একটি রূপক জাতীয় রচনা এবং 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭) ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ।[৩] তাঁর 'সঙ্গীতসার' ও 'সঙ্গীত লহরী' নামে আরও দুখানি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ দুটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এগুলি তাঁর সঙ্গীত-প্রীতির সাক্ষর বহন করে। ঐ সময় মুসলিম গৃহে সঙ্গীত চর্চা একটা অভাবনীয় বিষয় ছিল। বিদ্যালয় স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ, মসজিদ ও মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সমাজোন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহায়তা দানের জন্য তিনি 'নবাব' (১৮৮৯) উপাধি পান। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। সপত্নী কোন্দলের কারণে তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি।

তিনি কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র একজন সদস্যা ছিলেন।

আবদুর রহিম বক্স পেস্কার

আবদুর রহিম বক্স পেস্কার জলপাইগুড়ির জমিদার ছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি শহরের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র (১৮৯২) সভাপতি ছিলেন। তিনি নইমুদ্দীনকৃত কোরানের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণে ১৫০ টাকা দান করেন।[৪] শিক্ষা ও

---

১. ঢাকা প্রকাশ, ৫ মাঘ ১২৮১
২. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস—জেলার কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, নকীব, কুমিল্লা, ১৯৭৫
৩. ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী—তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালা প্রেস, ঢাকা, ১৮৮৭
৪. আবদুল কাদির—মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬

সমাজের জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে 'খান বাহাদুর' (১৮৯৯) উপাধি পান।

তিনি 'ওয়াকফনামা' (১৯০৪) নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মীয় কার্যে প্রায় আঠার হাজার টাকার সম্পত্তি 'ওয়াকফ' করেন। সেই দানস্বত্ব ও ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার নিয়মকানুন এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "...আমি নিজ জীবদ্দশায় স্বীয় চেষ্টাতে ও পরিশ্রমে, নিজে অনেক উপার্জন করিয়াছি; ...আমি সরলভাবে স্বেচ্ছাপূর্বক সুস্থ শরীরে স্থির জ্ঞানে বিজ্ঞ ধার্মিকগণের পরামর্শানুযায়ী শরা-শরীফের বিধান মতে আমার স্বোপার্জিত নিজ স্বত্ব দখলি নিম্ন তফসিলের লিখিত সম্পত্তিসমূহ রাহে লিল্লা ওয়াকফ করিলাম। ইহার আনুমানিক মূল্য ১৮০০০ মবলগে আঠার হাজার টাকা। উক্ত সম্পত্তিতে আমার মালিক স্বরূপ যে স্বত্ব স্বামিত্ব দখল অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে স্থগিত হইয়া তৌলিয়ত (ওয়াকফ) অর্পিল।"[১] ১৬ ফাল্গুন ১৩১০ সনে উক্ত 'ওয়াকফনামা' তৈরী হয়। এই ওয়াকফনামা থেকেই জানা যায় যে, রহিম বক্সের পূর্বপুরুষ নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ার অন্তর্গত বল্লভপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা মুনশী খান মোহাম্মদের পেশা ছিল 'টি-প্ল্যানটারি ও লাখেরাজদারি'।[২]

মোহাম্মদ বখত মজুমদার (১৮৬৭—১৯৩৬)

তিনি শ্রীহট্টের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি লোকাল বোর্ডের সদস্য, অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁর পিতা সৈয়দ বখত মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের সহায়তা করে সরকারের সুদৃষ্টিতে পড়েন। সৈয়দ বখত মজুমদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মক্কা নগরীতে সেরিফ কাউন্সিলর ছিলেন, তিনি তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে সম্মানিত উপাধি পেয়েছিলেন (১৮৭৯)।[৩] বিপিনচন্দ্র পাল আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬) শ্রীহট্ট পরিদর্শনে এসে সৈয়দ বখত মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৪] মোহাম্মদ বখত মজুমদার শ্রীহট্টের জনহিতকর কাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। মুরারি কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি অর্থদান

১. আবদুর রহিম বক্স পেস্কার—ওয়াকফনামা, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ১-২
২. ঐ, পৃঃ ১
৩. নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী—শ্রীহট্ট-প্রতিভা, পৃঃ ২৫
৪. বিপিনচন্দ্র পাল—সত্তর বছর

করেন। 'মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার' প্রবর্তিত হলে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি কাউন্সিলে শ্রীহট্ট জেলার বঙ্গভুক্তির বিরোধিতা করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন দিতেন, যার পুরস্কার স্বরূপ তিনি 'খান বাহাদুর' (১৯০৯) উপাধি পান।[১]

আলিমুজ্জামান চৌধুরী (মৃত ১৯৩৬)

তিনি ফরিদপুর জেলার বেলগাছির জমিদার ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালে হুগলী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি প্রধানতঃ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন; লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। ১৮৯৯ সালের লক্ষ্ণৌ এবং ১৯০০ সালের লাহোরের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে তিনিই একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯০১ সালের অধিবেশনেও তিনি প্রতিনিধি ছিলেন।[২] তিনি 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে' কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। তিনি পরবর্তীকালে 'ভারত ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য হন। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রথমে 'খান বাহাদুর' ও পরে 'সি. আই. ই.' উপাধি পান।[৩]

... ...

এছাড়া শিক্ষামূলক ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে অল্পবিস্তর দান অনেক জমিদারই করেছেন। ত্রিপুরার জমিদার রয়েজুদ্দীন মোহাম্মদ, আলী হায়দার নামে একটি যুবকের বিলেতে পড়ার জন্য এককালীন ৭০০৲ টাকা দান করেন।[৪] মুর্শিদাবাদের পাটকা বাড়ির জমিদার কাজী মোহাম্মদ হোসেন রেজা 'মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা' নিজ ব্যয়ে পরিচালনা করেন। তিনি ঐ মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন।[৫] চট্টগ্রামের পরাগলপুরের জমিদার রহমতুল্লাহ চৌধুরী সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে 'পরাগলপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তিনি চট্টগ্রম মাদ্রাসার অনেক ছাত্রের ব্যয়ভারও গ্রহণ করেন।[৬] চট্টগ্রামের অপর জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ

---

১. শ্রীহট্ট-প্রতিভা, পৃঃ ২৫
২. *Muslim Community in Bengal*, pp. 388, 391
৩. মোয়াজ্জিন, বৈশাখ ১৩৪৩
৪. মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন, ১৩০৮
৫. *The Moslem Cyronicle*, 12 September 1896
৬. ঐ, নভেম্বর ১৮৯৬

খান একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ২০০০৲ টাকা মূল্যের জমি দান করেন।[১] জলপাইগুড়ির বাকালির জমিদার জিয়ান মোহাম্মদ নিজ ব্যয়ে 'বাকালি ইসলামিয়া মাদ্রাসা'র প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ফরিদপুরের হাতুড়িয়ার জমিদার চৌধুরী গোলাম আলী স্কুল গৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। বরিশালের সরকারী এন্ট্রান্স স্কুলের পাকা দালান তাঁরই অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হয়।[৩] বাঁকুড়া জেলার বোলের 'বিদ্যোৎসাহী' জমিদার মোহাম্মদ তৈয়ব (মৃত ১৯০১) বোলে একটি এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন।[৪] জলপাইগুড়ির জমিদার রহিমুন্নেসা ও বর্ধমানের কুসুমপুরের জমিদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম 'মিহির ও সুধাকর' প্রকাশে অর্থ সাহায্য দেন।[৫] ফরিদপুর জেলার গোপালপুরের জমিদার সৈয়দ আবদুর রউফ চৌধুরী স্বধর্মপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। তিনি নিজ বাড়িতে একটি এন্ট্রান্স স্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।[৬] মুর্শিদাবাদের তালতার জমিদার মোহাম্মদ আবদুল আজিজ শেখ জমিরুদ্দীনকে পুস্তক প্রকাশে অর্থ সাহায্য দেন; তিনি নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। খুলনার ধামালিয়ার জমিদার আবদুল আহাদ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; শেখ জমিরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বী-দিগের মন্তব্য' (১৯০০) পুস্তকখানি আবদুল আহাদের নামে উৎসর্গ করেন।[৭] হুগলীর জাহানাবাদের ভূম্যধিকারিণী কমরন্নেসা বিবি 'মুসলমান ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা এবং বাৎসরিক ফতেহা ইত্যাদির জন্য বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ওয়াকফে সমর্পণ' করেন।[৮] শায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন বরিশাল সরকারী স্কুলের ছাত্রাবাস (বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং) নির্মাণে অর্থ সাহায্য দান করেন।[৯]

১. ইসলাম-প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০
২. ঐ, বৈশাখ, ১২৯৯
৩. Loknath Bose—*The Chiefs, Nobles and Zemindars*, p. 298
৪. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭
৫. মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য, পৃঃ ৩১১
৬. প্রচারক, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৮
৭. ঐ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
৮. সুধাকর, ৬ পৌষ ১২৯৬
৯. *The Moslem Chronicle*, 28 February 1895

নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি

আবদুল লতিফ (১৮২৮—১৮৯৩)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বাংলার মুমূর্ষু নিমজ্জমান একটি সম্প্রদায়কে হতাশা, বঞ্চনা এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে দু'জন সমাজকর্মী মনীষী তাঁরা হলেন আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। ঠিক ঐ সময় উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-৯৮) আবির্ভাব। তাঁদের চিন্তার ব্যাপ্তি ও কর্মের বিস্তৃতির তারতম্য আছে, তবে তাঁরাই প্রথম ভারতীয় মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগীয় অবক্ষয়, পশ্চাদপদতা ও অসাড়তার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে জাতির কাছে আধুনিক জীবনের স্বাদ ও মূল্য পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রাম ছিল আবদুল লতিফের পৈতৃক আবাসভূমি। পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ (মৃত ১৮৪৪) কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল—তিনি 'জমিউল তাওয়ারিক' (১৮৩৬) নামে একখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেকালের আর পাঁচটি ভদ্র পরিবারের সন্তানদের মত আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। এখানে প্রাচ্য ভাষার সাথে নিম্নবৃত্তিমানের ইংরাজী শিক্ষারও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে ১৮৪৬ সালে মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৯ সালে আলিপুরের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে নব গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭০ ও ১৮৭৩ সালেও ঐ সভার সদস্য হন। তিনি ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেন। ১৮৬৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬৩-৯৩ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষক বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। এছাড়া, ১৮৬১-৬৫ সালে কলিকাতার আয়কর কমিশনের ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং ১৮৭০ সালে 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে'র সদস্যভুক্ত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারী চাকুরীতে নিষ্ঠা ও দক্ষতা প্রদর্শন করা, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা এবং শাসক শ্রেণীর প্রতি পুরোমাত্রায় আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে 'সি. আই. ই.' এবং ১৮৮৭ সালে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতির পরিবর্তন ঘটে। এটি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অভ্যুত্থান হলেও সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে ব্রিটিশ সরকারের

ধারণা হয়েছিল যে, এ বিদ্রোহের পেছনে রাজক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা একটা লক্ষ্য ছিল। অত্যধিক বঞ্চনা ও হতাশ্বাস থেকে তারা এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা না দিলে আবার বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। কি করে মুসলমান সমাজের উন্নতি করা যায়, তাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করা যায় এবং দারিদ্র্যদশা দূর করা যায়, তার সদেচ্ছা নিয়ে তাঁরা বাংলা থেকে আবদুল লতিফ এবং উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমদকে নির্বাচন করেছিলেন। ঐ সময় তাঁরাই ছিলেন ইংরাজী জানা ব্যক্তি; উভয়েই বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ পুরুষ ছিলেন। তাঁরা সরকারের মনোভাব বুঝে এই সুযোগের পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হলেও ওয়াহাবী আন্দোলন আরও কিছুকাল চলেছিল। আবদুল লতিফের প্রথম কাজ হল ইংরাজদের প্রতি স্বধর্মাবলম্বীদের যে বিরূপ মনোভাব রয়েছে, তা দূর করে সরকারের প্রতি তাদের অনুগত করে তোলা। মুসলমানরা চরম আর্থিক দৈন্যে ভুগছে তার কারণ সরকারী চাকরী-বাকরী না করা; তারা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ না করলে সে সুযোগ পাবে না। অতএব তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচী হল স্বসমাজের মানুষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করা। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের টেকা দায়। এজন্য তাঁর তৃতীয় কর্মপন্থা হল সরকারের নিকট থেকে মুসলমানদের জন্য তুল্যমূল্যভাবে নয়, বিশেষভাবে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। সাংগঠনিক চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চতুর্থ কর্মসূচী হিসাবে সভাসমিতি স্থাপন করেন। সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র শ্রেণীবৈষম্য ছিল, মানুষের মধ্যে অকর্মণ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যমহীনতা, প্রেরণাশূন্যতা বিরাজ করছিল। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র এক সময় সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ শত। এই পাঁচ শত সদস্য সমাজের অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই এসেছিলেন। সোসাইটির বার্ষিক সম্মিলনে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হত। এঁরা সকলেই উচ্চবিত্তের, উচ্চকুলের ও উচ্চ পদমর্যাদার লোক ছিলেন না। উচ্চ-বিত্তের সাথে মধ্যবিত্তের মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল সোসাইটির মাধ্যমে। 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পুরা পনের বছর কলিকাতার মুসলিম সমাজকে এই সোসাইটি আলোড়িত করে রেখেছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবের ফলে হোক অথবা কাটমোল্লাদের প্রচারের ফলে হোক, 'কুফরে কালাম' ইংরাজী ভাষা ও 'এলমে বেদিন' পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি এক শ্রেণীর মানুষের বিরূপ মনোভাব ছিল। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল। মক্তব-মাদ্রাসায় গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। তৃতীয়তঃ অত্যধিক দারিদ্র্যহেতু ব্যয়বহুল আধুনিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। চতুর্থতঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্থান খুব কম ছিল। পঞ্চমতঃ মুসলমানদের আরবী-ফারসী শিক্ষার প্রতি মোহ ছিল বেশী, ধর্মশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা বা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল না। শিক্ষা-আন্দোলনে নেমে আবদুল লতিফকে এরূপ পঞ্চবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা ও আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষা শিক্ষার তিনি নিজেও সমর্থক ছিলেন, তবে এর সাথে অধিক পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হোক তা তাঁর কাম্য ছিল।

এজন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা ১৮৬১ সালে হুগলী মাদ্রাসা ও ১৮৬৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে বলেছেন। ধর্মশিক্ষার জন্য মহসিন ফাণ্ড ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলমান হোস্টেল নির্মাণ, বিদ্যার্থীদের বৃত্তিদান ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হোক—এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে এবং সোসাইটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপিতে সরকারকে জানিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর অভিপ্রায় ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ইংরাজী কবিতা আছে, তার উল্লেখ করে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসবের ফল কিছু না কিছু ফলেছে। মহসিন ফাণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা চট্টগ্রামে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে (১৮৭৪)। এর সাথে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়। উচ্চ শিক্ষার্থে সরকারী খরচে প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৪) স্থাপিত হলে সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মাদ্রাসা সংলগ্ন 'এলিয়ট হোস্টেল' (১৮৯৬) নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর জীবিতকালেই গৃহীত হয়। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী-ফারসী বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। হুগলী মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে মাদ্রাসার ইংরাজী-আরবী বিভাগকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী করার সুপারিশ করেছিলেন, সরকার সেটি নাকচ করে দেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় কেবল ভদ্র পরিবারের ছেলেরা পড়ার সুযোগ পেত, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কলিঙ্গায় একটি শাখা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ২৮,০০০৲ টাকার বৃত্তি-তহবিল গঠিত হয়।

আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে ভারতের মুসলমানদের কাছ থেকে ফারসীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা ও তার গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা'। ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বোম্বাই-এর ইংরাজী শিক্ষক আবদুল ফাত্তাহ পুরস্কার (১০০৲ টাকা) পেয়েছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধেও কিছু লেখা এসেছিল, তাঁরা শুধু ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতাই করেননি, পুরস্কারদাতাকে ইসলামের শত্রু বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষতঃ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি অতিবাহিত করেছি।" মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মাধ্যমে তিনি একাধারে মুসলমানদের একত্র করে তাদের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন, অন্যধারে যৌথভাবে সরকারের কাছে সমাজের দাবী দাওয়া পেশ করেছেন; উপরন্তু 'প্রদর্শনী মেলা', 'সম্বর্ধনা সভা' ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের সাথে নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে মুসলমানদের প্রতি শাসকদের সহানুভূতি বাড়িয়েছেন। আবদুল লতিফ অত্যধিক রাজভক্তি দেখিয়েছেন; তাঁর কর্ম প্রয়াস আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারে-কাছেও যাননি, রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রেখে তিনি শিক্ষা-সংস্কার চেয়েছেন। উইলফ্রেড স্কয়েন ব্লান্ট তাঁকে 'প্রাচীনপন্থী নেতা' বলেই

উল্লেখ করেছেন। আবদুল লতিফের চিন্তাধারা ও কর্মধারার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে এ ধরনের মন্তব্য করা হয়। তাঁর সম্পর্কে এগুলি প্রযোজ্য সত্য, তবে একথাও সত্য যে, তিনি যা করেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, সমাজের স্বার্থের জন্যই করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মনোবল যে তাঁর ছিল, তা সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে (১৮৫৪) নীলকরদের বিরোধিতা করার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তখন 'নীলদর্পণ' (১৮৫৮) নাটকাদি লেখাই হয়নি। এরূপ মনোভাব হয়ত বজায় থাকতো তাঁর, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী আন্দোলনের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া আঁচ করে তিনি মনোভাব পরিবর্তন করেন। ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে (১৮৫৪-৫৯) সন্দেহ করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহে কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রগণ জড়িত ছিল। এ জন্য মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও তিনি বড়লাটের কাছে করেছিলেন। রাজভক্ত আবদুল লতিফের অনুরোধে বড়লাট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ১৮৭০ সালে মৌলভী কেরামত আলীকে আহ্বান করে এনে সোসাইটির সভায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বক্তৃতার মৌলিক বিষয় ছিল—ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' নয়, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকে ধর্মকর্ম করতে বাধা নেই। আর বাধা যখন নেই (রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী) তখন ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'। আবদুল লতিফ উক্ত বক্তৃতার ধারাবিবরণী নিজে প্রণয়ন করে তার পাঁচ হাজার কপি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ইংরাজ শাসকের সন্দেহ তবু দূর হতে চায় না। ১৮৭১ সালে পরপর দুটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে তাঁদের সন্দেহবহ্নি আরও জ্বলে উঠে। ঐ সালে উইলিয়ম হান্টারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, ভারতের মুসলমানরা ধর্মের কারণে রানীর শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বাধ্য কিনা। উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান আইনে রাষ্ট্রনেতা হিসাবে নারীর শাসন অচল ও অবৈধ। 'আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, আর দে বাউণ্ড ইন কনসেন্স টু রিবেল এগেন্স্ট দি কুইন' (১৮৭১) গ্রন্থখানি হান্টারের এই তদন্তের ফল। এসব ঘটনা আবদুল লতিফের চোখের সামনে ঘটেছে। এরূপ অবস্থায় তিনি সরকারের বিরোধিতা করতে পারেন না। তিনি সরকারের মনরক্ষা করে চলেছিলেন, অধঃপতিত একটি সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। একথা স্মরণ রেখেই আবদুল লতিফের 'রাজভক্তি' ও 'তোষণনীতি'র সমালোচনা করতে হবে। স্মরণীয় যে, প্রথম দিকে একই পন্থা সৈয়দ আহমদও গ্রহণ করেছিলেন।

আবদুল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি চালু রেখে ধর্মশিক্ষা ও প্রাচ্য বিদ্যার সপক্ষে ওকালতি করেছেন; এতে তিনি মধ্যযুগীয় গোঁড়ামিকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু সমাজের চাপেই তা করেছেন; সমাজকে আঘাত না করে সমাজের সাথে আপোষ করে সমাজের গতিমুখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। এর অধিক করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবদুল লতিফের সীমাবদ্ধতার কথা বলে 'সোম প্রকাশে' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮) লেখা হয়: "বঙ্গদেশে এমন অনেক মুসলমান দৃষ্ট হয়, যাঁহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে, কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যরূপে কোন কাজ করিতে সাহসী হন না। মৌলবী আবদুল লতিফের সদৃশ ব্যক্তিদিগেরও অগত্যা গোঁড়ার দলে মিশ্রিত হইতে হইয়াছে; তাঁহারা ভীরু স্বভাব নহেন, কিন্তু কি করেন গোঁড়ার দল

এত পুষ্ট যে, বিপরীত চেষ্টা করিতে গেলে আপনাদিগকে অপদস্ত হইতে হয়।" উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৩ সালে ইংরাজী প্রচলের সপক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে অনেক লেখক তাঁকে 'ইসলামের শত্রু' বলে অভিহিত করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হলে, তিনিও সমাজের কাছ থেকে বাধা পেয়েছিলেন।

'এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা' (১৮৬১) শীর্ষক একটি তদন্ত রিপোর্ট, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভায় পঠিত দুটি প্রবন্ধ 'দি নেচার অবজেকশন্স এণ্ড এডভ্যানটেজেস অব পিরিয়ডিক্যাল সেন্সাস' (১৮৬৫), 'এ পেপার অন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৮৬৮), 'দি মহামেডান ল' অব ম্যারেজ এণ্ড ডাওয়ার (১৮৭৫), 'পেপার অন দি প্রেজেন্ট কনডিশন অব দি ইণ্ডিয়ান মহামেডানস এণ্ড দি বেস্ট মীনস ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট' (১৮৮০) প্রভৃতি মূল্যবান রচনা তাঁর আছে। 'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ' (১৮৮৫) ও 'এ শর্ট একাউন্ট অব মাই হাম্বল এফর্টস টু প্রমোট এডুকেশন, এস্পেস্যালি এমং দি মহামেডানস' (১৮৮৬) শীর্ষক দুখানি আত্মজীবনীমূলক পুস্তিকা আবদুল লতিফ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ভাল জেনেও বাংলা গ্রন্থ লেখেননি, উচ্চ শ্রেণীর জন্য উর্দুভাষা শিক্ষার পক্ষে অভিমত দিয়েছিলেন, কেবল নিম্নবিত্তের লোকেরা বাংলা শিখবে। বাংলার প্রতি তাঁর এরূপ মনোভাব পোষণের যে কারণই থাক, তা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়নি; এতে বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কলিকাতার ক্ষয়িষ্ণু, ভগ্ন, জরাগ্রস্ত সামন্তবৃত্তের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে যদি বাংলার জনগণের সাথে একাত্মতা স্থাপন করতে পারতেন, তবে তাঁর কর্মের অধিক সুফল ফলত।

আবদুল লতিফের চারপুত্র—ব্যারিস্টার এ. এফ. এম. আবদুর রহমান খান বাহাদুর, এ. কে. এম. আবদুস সোবহান খান বাহাদুর, এ. এফ. এম. আবদুল ওয়াহাব ও এ. এফ. এম. আবদুল আলী। তাঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[১]

ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২—১৮৮৬)

তিনি মেদিনীপুর শহরের বিখ্যাত 'সোহরাওয়ার্দী' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে তিনি প্রথমে আরবী ও ফারসীতে শিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে নিজ চেষ্টায় উত্তম ইংরাজী রপ্ত করেন। ইংরাজী ভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর প্রথম চাকুরী হয় ভাইসরিগ্যাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগের প্রধান মুনশী হিসাবে, তারপর হুগলী কলেজে এ্যাংলো-আরবীর অধ্যাপক হন

১. তথ্যপঞ্জী :—

(১) *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents,* Dacca, 1968
(২) *Muslim Community in Bengal* (1884-1912), Dacca 1974 p. 18
(৩) *Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century,* Calcutta 1910, pp. 111-139

(১৮৬৫)। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলীর (মৃত ১৮৭৩) সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৭৪ সালে ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। এখানে কবি কায়কোবাদ ও খান বাহাদুর আবদুল আজিজ তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ঢাকার নবাব আবদুল গনি ও নবাব আহসানুল্লার সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তিনি সৈয়দ আহমদের আলিগড় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সালে 'বেসিপ্রকাল ইনফ্লুয়েন্স অব মহামেডান এণ্ড ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে চার্লস ট্রিভলিয়ান ঘোষিত পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬৫ সালে সেটি ছাপা হয়। হুগলীতে অবস্থান কালে তিনি ও আমীর আলী একত্রে সৈয়দ কেরামত আলীর 'মখজুল উলুম' ফারসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তিনি সৈয়দ আহমদের 'তহজিবুল আখলাক' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর কবিতার সংকলন 'দিওয়ান-ই ওবায়দী' ১৮৮৬ সালে মুদ্রিত হয়। ইংরাজী ব্যাকরণের আদর্শে 'দস্তুরি ফারসী আমোজ' (১৮৭৭) নামে একখানি ফারসী ব্যাকরণ রচনা করেন। কলিকাতার 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন' (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) পত্রিকায় 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শীর্ষক ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ঢাকার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঢাকার 'সমাজ সম্মিলনী' (১৮৭৩) নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাছাড়া 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন। তিনি একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের পক্ষে তিনি আন্দোলন করেন।

ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর জ্ঞান সাধনা ও সমাজ সেবার পুরস্কার স্বরূপ সরকার তাঁকে 'বাহরুল উলুম' (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৮৭২-১৯৬৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫০০৲ টাকা দান করে পিতার স্মরণে 'বাহরুল উলুম ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী' নামে একটি পদক সৃষ্টি করেন। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রকে এটি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আবদুল আজিজের 'ওবেদী বিয়োগ' (১৮৮৪) কবিতা পুস্তিকা ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'ওবেদী' কবিতা তাঁর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করে লেখা হয়। সৈয়দ আমীর আলী আত্মজীবনীতে ওবায়দী সম্পর্কে লিখেছেন, "He (Obaidullah) was a scholarly man conversant with English.. He

(৪) *Nawab Bahadur Abdul Latif C.I.E.,* Published by Thacker Spink and Co., calcutta.

(৫) বিনয় ঘোষ—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ২৩৫

(৬) শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ—মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, সি. আই. ই., মানসী, আশ্বিন ১৩২৪

was a man of worthy of respect, but he had one failing, common in India, of relating ordinary gossip without giving one weight to its consequences."

ওবায়দুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৭০-১৯৩৫) মুসলিম আইন সম্পর্কে গবেষণা-নিবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন (১৯০৮)। হাসান সোহরাওয়ার্দীও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে প্রথম এফ. আর. সি. এস. ছিলেন।[১]

আবদুল জব্বার (১৮৩৭—১৯১৮)

বর্ধমান জেলার জমিদারের সন্তান আবদুল জব্বার ১৮৫৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন থেকে শুরু করে পরবর্তী ৩০ বছর তিনি নানা সম্মানিত পদে বৃত ছিলেন। তিনি সাথে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৮৯-৯৪) হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৮৪, ১৮৮৬ ও ১৮৯৩ সালে মোট তিনবার সদস্য মনোনীত হন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরে তিনি ভূপালের প্রধান মন্ত্রী (১৮৯৭-১৯০২) নিযুক্ত হন। 'নবাব' উপাধি সেখানেই পান। নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯০০ সালে সোসাইটির সভাপতি হন। তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। এসব ব্যাপারে তিনি আবদুল লতিফকে সমর্থন দিতেন। চাকুরীতে নিষ্ঠা ও সরকারের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই.' (১৮৯৫) উপাধি পান।

ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবদুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬) তাঁর পুত্র এবং বিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল কাসিম তাঁর ভাগ্নেয় ছিলেন। আবদুল জব্বার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে সম্মানের আসন পেয়েছিলেন। রামপ্রাণ গুপ্ত 'নবনূরে' (আশ্বিন ১৩১০) প্রেরিত একখানি পত্রে বলেন, 'বঙ্গদেশে বহু শিক্ষিত মুসলমান আছেন, তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজনও বটেন, কিন্তু আবদুল জব্বার সাহেবই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন।"

---

১. তথ্যপঞ্জী :—

(১) Syed Martuza Ali—*Personality Profile,* Dacca, 1965, pp. 40-42

(২) Syed Razi Wasti (edited)—*Mamoirs and other Writiugs of Syed Ameer Ali,* Lahore 1968, p. 21

(৩) অমলেন্দু দে—বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৪

(৪) মহম্মদ আবদুল কাইউম—ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সাম্মিলনী, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪

আদালত খান (১৮৪৪—৯৪)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুনশী আদালত খান একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানসাধক ছিলেন। সরকার ১৮৫৪ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তুলে দিয়ে 'বোর্ড অব একজামীনার্স'-এর অধীনে সিভিলিয়ানদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আদালত খান ১৮৬২ সালে বোর্ড অব একজামীনার্সের অফিসে মুনশী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ফারসী ও হিন্দী বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি অধ্যাপক হিসাবে চাকুরিরত অবস্থায় ১৮৯৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন। দক্ষ শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইউরোপেও প্রচার লাভ করে। বাংলার ছোটলাট আদালত খানকে প্রদত্ত একটি 'প্রশংসাপত্রে' (২ ডিসেম্বর ১৮৭৯) বলেন, "Professor (Adalat) Khan have been working with officers of Her Majesty's Army and Indian Civil Service for the last 17 years. He is well-known among the officers throughout the length and breadth of Hindustan and his reputation as an oriental Scholar has travelled by this country (England)".

আদালত খান ঢাকার মানিকগঞ্জের নিকটবর্তী দাদরখি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জুলফিকার খান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাচ্যশাখার গ্রন্থাগারিক ছিলেন। দাদরখির এই 'মুনশী পরিবারে'র বিত্তে-বিদ্যায় সুনাম ছিল। আসালত খান, আল্লাহদাদ খান, আদালত খান ও আকবর খান—চার ভ্রাতাই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। আদালত খান কলিকাতা মাদ্রাসায় ও প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়া করেন। প্রতিযোগিতামূলক 'উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা' পাশ করে তিনি উক্ত মুনশীর পদ লাভ করেন।

নিরলস জ্ঞান চর্চা আদালত খানের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি আত্মপ্রচারকামী ছিলেন না। সভা-সমিতিতে বেশী একটা যাতায়াত করতেন না। বই পড়ে এবং বই লিখে তিনি বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করতেন। তাঁর রচনার দুটি ধারা—পাঠ্য পুস্তক ও অভিধান। পাঠ্যপুস্তকগুলি সবই ইংরাজী ভাষায় অনূদিত। এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতেও আদালত খানের পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। তিনি যেসব গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, সেসবের নাম মূল ভাষাসহ নিম্নে দেওয়া হল :—

(১) বেতাল পচিশি (১৮৬৪), ব্রজভাষা।
(২) বোস্তাঁ (১৮৬৮), ফারসী (সাদী)।
(৩) বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৭০), বাংলা (বিদ্যাসাগর)।
(৪) রামায়ণ (২য় সর্গ, ১৮৭১), হিন্দী (তুলসী দাস)।
(৫) প্রেম-সাগর ও বাগ ও বাহার (১৮৭৫), ফারসী।
(৬) ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বাগ ও বাহার (১৮৭৭), সংকলন।
(৭) গুলিস্তাঁ (১৮৮০), ফারসী।
(৮) ইকদ-ই গুল (১৮৮৩), ফারসী (গুলিস্তাঁ ও আনোয়ার সুহেলি থেকে সংকলিত)।

(৯) গুলে বকাওলি, উর্দু।
(১০) তোতাকাহিনী, উর্দু।
(১১) বাহার-ই-দানিশ, ফারসী।
(১২) আলিফ লায়লা, আরবী।
(১৩) চাহার দরবেশ, হিন্দী।

'A Vocabulary of words for the higher standards in Hindustani Persian and Bengali' (1872) নামে ত্রি-ভাষার অভিধান তিনি সংকলিত করেন। আদালত খানের 'A vocabulary of thousand words in five languages' (১৮৮০, ৩য় সংকলন) নামে বাংলা, ইংরাজী, ফারসী, উর্দ ও হিন্দী পঞ্চ ভাষার একখানি অভিধান জর্জ গ্রীয়ার্সনের 'লিঙ্গুস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এটি প্রথম অভিধানেরই সম্প্রসারিত সংস্করণ। এসব গ্রন্থ থেকে আদালতের ভাষাজ্ঞান কত বিস্তৃত ছিল, তা সহজেই বুঝা যাব। তাঁর পাঠ্য-পুস্তকগুলি ছাঁচে-ঢালা ছিল না, টীকা-টিপ্পনী দিয়ে তিনি সেগুলিকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। ভারত ও আরব-ইরানের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, জাতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল তা অনুবাদকর্ম ও টীকা-টিপ্পনী থেকে বুঝা যায় 'দি ইকদ্-ই-মনজুম' নামে তিনি সাদীর বোস্তাঁর যে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন, তাতে পাশ্চাত্য আদর্শে গবেষণার নিদর্শন আছে। গ্রন্থে সংযুক্ত শেখ সাদীর জীবন বৃত্তান্তটি লেখকের মৌলিক গবেষণার ফল। বিষয়-জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানের জন্যই একপটি সম্ভব হয়েছে। তাঁর যুগে এরূপ ভাষাজ্ঞান দুর্লভ ছিল।

সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮—১৯২৩)

কুমিল্লা জেলার পেরাকান্দি গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সিরাজুল ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তির গুণে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পিতা কাজী মোহাম্মদ কাজেম রাজস্ব দারোগা ছিলেন। তিনি ১৮৬৭ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ ও ১৮৭৩ সালে বিএল পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিনি ঢাকা কলেজের (১৮৭৩) প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট। সরকার গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদ এবং বেসরকারী নানা সভা-সমিতির সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৯৩ ও ১৯০২ সালে দুবার 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সহকারী সম্পাদক (১৮৮৫) এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অনারেরী সদস্য ছিলেন (১৯০৩)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'হিতসাধিনী সভা'র সভাপতি ছিলেন। তিনি ঐ সভার পক্ষ থেকে সরকারকে লিখিত এক পত্রে চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংলা থেকে বিছিন্ন

করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ করেন। 'দি মুসলমান' (১৯০৬) পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেন।[১]

খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৯—১৯১৭)

'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ্' গ্রন্থের প্রণেতা খোন্দকার ফজলে রাব্বি মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বেগমজাদী শামসি জাহান ফেরদৌস মহলের প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপেও কাজ করতেন। পিতা আবদুল আকবর বাংলার নবাব নাজিমের চাকুরী করতেন। খোন্দকার ফজলে রাব্বি অতি অল্প বয়সে ঐ চাকুরীতে যোগদান করেন (১৮৬৬)। তিন বছর পর বিলাতে যান, সেখানে অবস্থানরত নবাব বাহাদুরের কেরানী হিসাবে। ১৮৭৪ সালে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে প্রথমে ম্যানেজার ও পরে দেওয়ান হন (১৮৮১)। তিনি মুর্শিদাবাদের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।[২]

হান্টার, রিজলি, বেভারিজ প্রমুখ ইংরাজ পণ্ডিত বাংলার মুসলমানদের দেশীয় তফসিলীভুক্ত ধর্মান্তরিত বংশধর বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফজলে রাব্বি মুখ্যতঃ এ মতের প্রতিবাদ করেই 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলায় তুর্কীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সুলতান, সুবেদার, নবাব, নাজিম, উজির, দেওয়ান, জায়গীরদার, জমিদার, আয়মাদার, তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর প্রধান প্রধান পরিবারের পরিচয় উদঘাটন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাঙালী মুসলমানদের উৎপত্তি আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত অভিজাত সম্প্রদায়ের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসতি স্থাপনের ফলেই হয়েছে। ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত মুসলমান আছে, তবে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি স্বয়ং 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল'

---

১. তথ্যপঞ্জী :—

(১) J.C. Dasgupta—*National Biography of India*, Dacca.
(২) A.K. Nazmul Karim—*The Modern Muslim Polical Elite in Bengal*, London, 1964 (unpublised Thesis)
(৩) *Consolidated Alphabetical Index to the Proceedings of the Goverment of Bengal* Political Department (1857-1908), Calcutta.

২. তথ্যপঞ্জী :—

(১) মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
(২) *The Moslem Chronicle*, 14 March 1895
(৩) *Muslim Community in Bengal*, p. 231
(৪) *Who's Who in India*, p. 105

(১৮৯৫) নামে গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করেন। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (১৮৭১) গ্রন্থে হান্টারের প্রধান বক্তব্য ছিল, ভারতের মুসলমানরা ধর্মের কারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাব পোষণ করত। খোন্দকার রাব্বি এ মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রকৃত কারণ ধর্ম-সংস্কার নয়, ব্রিটিশ শাসননীতির পরিবর্তন ধারার সাথে তাল রক্ষা না করে নিজেদের পূর্বতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকা এবং অমূলক আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষা প্রদর্শন করা।[১]

শেখ আবদুর রহিম 'হাফেজ' মাসিক পত্রে প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারী, ১৮৯৭) থেকেই 'বাঙ্গালার মুসলমান' নাম দিয়ে উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তিনি অনুবাদের ভূমিকায় লেখেন, "...গ্রন্থখানি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজে সাদরে গৃহীত, সমাদৃত ও সুখ্যাতির সহিত সমালোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতাদের জন্য উল্লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[২] আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত' (১৮৯৯) নাম দিয়ে ঐ গ্রন্থের অপর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।[৩]

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯—১৯২৮)

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সৈয়দ আমীর আলী প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা সৈয়দ সাদত আলী অযোধ্যার উন্নাও অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে উড়িষ্যার কটক ও পরে হুগলীর চুঁচুড়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হেকিমী চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, আমীর আলীকে বৃত্তির উপর নির্ভর করে অর্থকষ্টের মধ্যে লেখাপড়া করতে হয়েছে। আমীর আলী হুগলী জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার সরকার তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করেন, আমীর আলী প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পান। তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬৭ সালে বিএ, ১৮৬৮ সালে ইতিহাসে এমএ এবং ১৮৬৯ সালে বি এল পাশ করেন। ঐ বছর

১. *The Oregin of the Musalmans of Bengal*, Colcutta, 1895 pp. 106-19
২. হাফেজ, জানুয়ারী ১৮৯৭
৩. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী—বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত, ১৩০৬

স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলাতে পড়তে যান। ১৮৭৩ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা পাশ করেন। ঐ বছর কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ও ১৮৮৪ সালে 'টেগোর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৭৫-৭৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'মুসলিম আইনের অধ্যাপক হন। ১৮৬৪ ও ১৮৭৩-৮৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৯০-১৯০৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। বাংলার মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ১৯০৯ সালে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় এ সম্মান পাননি। তিনি ১৮৬৪ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৭৫ সালে 'নবাব' ও ১৮৮৭ সালে 'সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৮ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ সালে তিনি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যভুক্ত হন। হুগলীর ইমামবাড়ার সভাপতি হন ১৮৬৪ সালে। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ঐ পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯০৯ সালে লণ্ডনে মুসলীম লীগের শাখা স্থাপন করে সেটি নিজেই পরিচালনা করতেন। সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে (১৮৭৮-৯০) সৈয়দ আমীর আলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে শাখা স্থাপন করে একে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের সকল প্রকার স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সৈয়দ আমীর আলী সংগ্রাম করেছেন। সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে না নেমে, বরং সরকারের সম্পূর্ণ আনুগত্য মেনে নিয়েই তিনি আইন সঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বসমাজের দাবীগুলি তুলে ধরেন। সমাজের মানুষের আর্থিক, বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির জন্য ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার চেয়েছেন। সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের অধিক নিয়োগ কামনা করেছেন। ১৮৮২ সালে 'স্মারকপত্রে' এবং ১৮৮৪ সালে ১০ই মার্চ বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে লিখিত পত্রে আমীর আলী মুসলমানদের জন্য চাকুরীর সংরক্ষিত সুবিধা চেয়েছেন। বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে তিনি জানান, "......the unequal distribution of State patronage is the most important question of all; it has given rise to the greatest discontent and bitterness of feeling, and will continue to do so unless Govt. emphatically lay down the principle that in Bengal at least one-third of the State employment should be reserved for Mahommedans."[১]

ঠিক তোষণনীতি নয়, আপোষমূলক নীতির দ্বারা কার্যোদ্ধারের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। 'সিপাহী বিদ্রোহে'র পরে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' এবং কয়েকটি হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ডের (মুসলমান গুপ্তঘাতকের হাতে ১৮৭১ সালে বিচারপতি নরম্যান ও বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যু) ফলে ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত

১. Amir Ali to Private Secretary, Viceroy, 10 March, 1884 (British Museum, Indian State Papers 290/8) quoted in *The Emergence of Indian Nationalism* by Anil Seal (Cambridge, 1971), p. 312 (fn).

হওয়ার কথা নয়। সেজন্য সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তো দূরের কথা, কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত হতে চাননি। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই জাতীয় নবজাগরণ চেয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী এরূপ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা পছন্দ করতেন না। ইংরাজী শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা যায়, তবে ফল দ্রুত ফলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি এসোসিয়েশনকে এ উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলেন। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফের চিন্তাধারার সাথে সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাধারার এখানেই পার্থক্য। অবশ্য পরে সৈয়দ আহমদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ১৮৭২ সালে হান্টার বলেছিলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে তাদের দুরবস্থার কথা সরকারের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরে। একথা স্মরণ রেখে এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করে তিনি স্মৃতিকথায় (মেময়ার্স) লিখেছেন, "আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপত্তি দেখতে পাই। এজন্য আমি ১৮৭৮ সালে ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করি।"[১] তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে ছিলেন। কংগ্রেসে যোগদান না করেও তিনি ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনকে সফল করে তুলতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছিলেন। পরে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। হিন্দু নেতাদের জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি লীগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ সমর্থন করেন। লণ্ডনে লীগের শাখা স্থাপন করে সে আদর্শই প্রচার করতেন। মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসূত কোন কর্ম করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, এজন্য সে যুগের সাম্প্রদায়িক বিষ-কুণ্ডলী থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন।

জ্ঞানগর্ভ, তথ্য ভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন আমীর আলীর অবিস্মরণীয় কীর্তি। গ্রন্থগুলির পাতায় পাতায় তাঁর জ্ঞানানুশীলন, মনন-শীলতা ও বিচক্ষণতার ছাপ রয়েছে। ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে এগুলি রচনা করেন। উদ্দেশ্য একই—মুসলিম চিন্তার উৎকর্ষবিধান, আত্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধন এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দ্বারা সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ সম্ভাবিত করা। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা হারিয়ে ভারতের মুসলমান মানসিক দৈন্যে ভুগছে। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খ্রীস্টান, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে। অজ্ঞতা ও অক্ষমতা বশতঃ মুসলমানরাও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের উন্নত ধর্মাদর্শ, গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল, সেসব ভুলতে

১. Perceiving the complete lack of political training among the Moslem inhabitants of India, and the immense advantage and preponderance the Hindu organisations gave to their community, I had founded in 1878 the National Mahommedan Association."

K.K. Aziz—*Ameer Ali : His Life and Works*, Lahore 1968, p. 567

বসেছে। প্রতিবেশী হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম ও ভারতের পুরাণ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে পুনর্জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের সুর তুলেছেন; ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসাবে মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম, সাত শতকে সে ধর্ম প্রবর্তিত ও প্রচারিত হওয়ার পর থেকে আরব ও অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। অতীতের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস ও ইসলামের গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদের আদর্শ এদেশের নির্বীর্য, হতঃচেতন, হীনমন্য জাতির মনে প্রেরণা সঞ্চার করবে এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে তিনি হজরত মহম্মদের জীবনী, ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত ধর্মনীতি, আরবদের ইতিহাস, মুসলমান আইন বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে তাঁর গ্রন্থ আদৃত হয়েছিল। তাঁর তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিশীল রচনার দ্বারা খ্রীস্টান জগতের অনেক ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। বিশ্ববাসীর চোখে ইসলামের ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ আমীর আলী ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যানুভূতিতে বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক 'খিলাফত' প্রথা পছন্দ করতেন। এজন্য পাশ্চাত্ত্য শক্তি-বর্গের দুরভিসন্ধিতে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের রাজপদ এবং সেই সঙ্গে খিলাফত প্রথা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে আমীর আলী ইসমত পাশার কাছে লিখিত পত্র দ্বারা তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জামালউদ্দীন আফগানী কলিকাতায় এলে হিন্দু নেতাদের সহযোগিতায় আলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য ব্রিটিশ সরকার জামালউদ্দীনকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির অসহযোগিতায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারেননি। সৈয়দ আমীর আলীর অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরাজীতে রচিত; দু'একটি উর্দু গ্রন্থও আছে। তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থ এরূপ:

(ক) এ ক্রিটিক্যাল একজামিনেশন অব লাইফ এণ্ড টিচিং অব মহম্মদ, এডেনবার্গ, ১৮৭৩
(খ) পারসনাল ল' অব দি মহামেডান্স, লণ্ডন, ১৮৮০
(গ) মহামেডান ল' (টেগোর লেকচার্স), ক্যালকাটা, ১৮৮৪
(ঘ) স্পিরিট অব ইসলাম, লণ্ডন, ১৮৯১
(ঙ) লিগ্যাল স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম, লণ্ডন, ১৮৯১
(চ) এ শর্ট হিস্টরি অব দি সারাসিনস, লণ্ডন, ১৮৯৮
(ছ) ক্রিশ্চিয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট, লণ্ডন, ১৯০৬
(জ) ইসলাম, লণ্ডন, ১৯০৬

এছাড়া, 'কমেন্টারি অব দি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট' (১৮৯৮), 'কমেন্টারি অব দি বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট' (১৯০৪), 'কমেন্টারি অব দি সিভিল প্রসিডিয়র কোড' প্রভৃতি সমকালীন সমস্যা ভিত্তিক আইনের গ্রন্থ আছে। 'আইন-উল-হিদায়া' হানাফী আইনের হিদায়া গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। 'মেময়ার্স' (১৯৩১-৩২) নামে তাঁর আত্মজীবনীও রচিত হয়েছিল। 'ক্রুসেড' গ্রন্থের জবাবে 'জিহাদ' লিখেছিলেন। কোন কোন অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ সিদ্ধ, এতে তাই বর্ণিত হয়েছে।

তিনি কলিকাতার 'মডার্ন রিভিউ' ও লণ্ডনের 'দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'স্পিরিট অব ইসলাম' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ইসলাম অভ্রান্ত, অকৃত্রিম ও অপরিবর্তনীয় ধর্মমত, ইসলামের বিধিগুলিও সুগঠিত ও সর্বজনীন। সুতরাং যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—মূল তত্ত্ব হিসাবে তিনি এটাই প্রমাণিত করেছেন 'স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে। এর সাথে হজরত মহম্মদের সামগ্রিক জীবনকে আদর্শ হিসাবে মুসলমানদের অনুসরণ করা আবশ্যক বলে বিবেচনা করেছেন। মহম্মদ সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। বর্ণে বিত্তে ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। মুসলমান জাতির পতনের কারণ ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ না করা -- ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ও হজরত মহম্মদের জীবনাদর্শের অনুসরণ দ্বারাই মুসলমানদের পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "In the following pages I have attempted to give the history of the evolution of Islam as a world-religion ; of its rapid spread and the remarkable hold it obtained over the conscience and minds of millions of people within a short space of time. The impulse it gave to the intellectual development of the human race is generally recognised. But its great work in the uplifting of humanity is either ignored or not appreciated ; nor are its rationale, its ideals and its aspirations properly understood. It has been my endeavour in the survey of Islam to elucidate its true place in the history of religions. The review of its rationale and ideals, however feeble, may be of help to wanderous in quest of a constructive faith to steady the human mind after the strain of the recent cataclysm, it is also hoped that to those who follow the Faith of Islam it may be of assistance in the understanding and exposition of their convictions."[১]

সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাশীল কর্মধারা ও মননশীল রচনাবলী বাংলার মানুষের কাছে যদি সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হত, তা হলে হয়ত তিনি বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনে জোয়ার আনতে পারতেন। হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার পর থেকে ক্রমশঃ তাঁর জন-সংযোগ হ্রাস পায়। লণ্ডনে যাওয়ার পর থেকে ত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে রমেশচন্দ্র দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু নেতা সমাজের জন্য যা করতে পেরেছিলেন, সৈয়দ আমীর আলী তা ঐক্যপ্রতি করতে পারেননি। তাঁর মত একজন মনীষীকে পেয়েও মুসলমান সমাজে [illegible] আসেনি। তবে তিনি সমাজের বদ্ধমূল, রুদ্ধগতি অপসারিত করে অগ্রগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই দেশে ও দেশের বাইরে আমীর আলীর একটি বুদ্ধিদীপ্ত 'ভাবমূর্তি' গঠিত হয়েছিল। প্রথম দিকে ভাষাগত ব্যবধানবশতঃ আমীর আলীর চিন্তার ফসল সরাসরি দেশবাসীর কাছে পৌঁছেনি, তবে কিছুকাল পরে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের প্রচেষ্টায় বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে তা প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ

---

১. Syed Ameer Ali—*The Spirit of Islam* (a history of the evolution and ideals of Islam with a life of the Prophet), Christophers, London, 1955 (amplified and revised 8th edition). p. VII (Preface).

করে। রংপুরের শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'আরবজাতির ইতিহাস' নাম দিয়ে দুই খণ্ডে (১ খণ্ড, ১৩১৭ ও ২ খণ্ড, ১৩১৯) 'এ শর্ট হিস্টরি অব দি সারাসিনস' গ্রন্থের অনুবাদ করেন। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ পড়ে সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডন থেকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১) শেখ রেয়াজুদ্দীনকে লিখেছিলেন, "I was very pleased with the first part of the Bengali rendering of my short History of the Saracenes which appeared to me, so far as my limited knowlege of the Bengali language allows me to judge excellent."

'নবনূর' (অগ্রহায়ণ ১৩১২) পত্রিকায় মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ 'মুসলমানের সর্বনাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের উৎস সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "সুযোগ্য জাস্টিস আমীর আলী সাহেব ১৯০২ সালের আগষ্ট এবং ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় 'এ ক্রাই ফ্রম ইণ্ডিয়ান মুসলমান' এবং 'ইণ্ডিয়ান রেট্রোস্পেকশন এ্যাণ্ড [illegible]টিস' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বনাশের কথা অতি সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের মর্ম প্রকাশিত হইল।"

আমীর আলীর অবদানের কথা স্মরণ করে আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী লিখেছেন, "অনারেবল আমীর আলী সাহেবের পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা এবং স্বজাতির হিতচিন্তার কথা নূতন আর কি বলিব? ইনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহারথী এবং বিশেষ চিন্তাশীল।...'লাইফ অব মহম্মদ' এবং 'স্পিরিট অব ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে অসাধারণ ও জাতীয় জ্ঞানগৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, শতাব্দীর পরেও তেমন কেহ চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ স্থল।" শেখ আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীর নামে উৎসর্গ করেন।[১]

দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০—১৯১২)

হুগলী জেলার দাদপুর থানার বাবনান গ্রামের দেলওয়ার হোসেন আহমদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আহমদ, পরে ঐ নাম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স

১. তথ্যপঞ্জী :—

(১) K.K. Aziz (edited)—*Ameer Ali: His Life and Works.* Lahore, 1968.
(২) Syed Razi Wasti (edited)—*Memoirs and other Writings of Syed Amir Ali.* 1968
(৩) *Struggle for Independence,* Pakistan Publications, Karachi, 1958
(৪) Jagadish Saran Sharma—*The National Biographical Dictionary of India,* Starling Publishers Private Limited, New Delhi, 1972
(৫) হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
(৬) পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য— ভারতকোষ, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।
(৭) শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—আরব জাতির ইতিহাস, ২ খণ্ড, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৭, ১৩১৯

পাশ করে ১৮৫৮ সালে সিনিয়র স্কলারশিপ পান। ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রথমে আলিপুর কোর্টের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে ইনস্পেক্টর জেনারেল অব সাবরেজিস্ট্রেশন পদে উন্নীত হন (১৮৯৫)। সে যুগে এটি ছিল বাংলার মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত সর্বোচ্চ পদ। তিনি ১৮৯৩ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান। ১৯০০ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সরকারী কমিটি ও বেসরকারী সভা-সমিতির সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৮৮০ সালে 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্যভুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে 'সেন্ট্রাল টেকস বুক কমিটি'র সদস্য ছিলেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৯০৩) এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সহ-সভাপতি মনোনীত হন। তিনি ১৮৯৯ সালে বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন।

দেলওয়ার হোসেন আহমদ একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, সমাজকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর চিন্তার ফসল সেকালের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চমানের ইংরাজী প্রবন্ধে নিহিত আছে।[১] তিনি মুসলমান সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমান 'উত্তরাধিকার আইনে'র সংস্কার চেয়েছিলেন এজন্যে যে, সন্তান সন্ততির মধ্যে ধন-বণ্টনের জন্য মুসলমানরা তাড়াতাড়ি দারিদ্র্যে পতিত হয়। তিনি অন্য একটি প্রবন্ধে ইসলামের ধর্মনীতিরও সমালোচনা করেছিলেন। এজন্য সমাজে বিতর্কের ঝড় উঠে। বলা বাহুল্য, রক্ষণশীলরাই প্রতিবাদমুখর হন। ধর্মে ও সমাজে যা আছে, তাই উত্তম ও অভ্রান্ত এরূপ রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য সমাজে তাঁর যুক্তি ও চিন্তাকর্মের কোন সুফল দেখা দেয়নি। তবে তিনি বিদ্বৎ-সমাজ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন—এ প্রাইভেট ডায়েরী' (১৯০৯) গ্রন্থের লেখক উইলফ্রেড স্কেনে ব্লান্ট দেলওয়ার হোসেনকে 'সেন্সিবল ম্যান' বলেছেন। ব্লান্ট ১৮৮০-৮১ সালে কলিকাতায় এসে আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। দেলওয়ার হোসেন ব্লান্টের কাছে বাংলার মুসলমান সমাজের শোচনীয় দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথা ব্যক্ত করেন।[২] তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 'মোসলেম ক্রনিকলে'র (২ মে ১৮৯৬) মন্তব্য : — "A gentleman of wide reading, studious habits, and starling worth withal, quite and unobstrussive in nature, he is respected by all classes of people."

---

১. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এরূপ :
   (ক) দি প্রেজেন্ট ইকনমিক কনডিশন অব দি বেঙ্গল, দি আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট, ২৭ নবেম্বর ও ১১ ডিসেম্বর ১৮৭৭
   (খ) ল'অব টেস্টামেন্টারি সাকসেশন, দি মহামেডান অব ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৮২
   (গ) মহামেডান অব ইনহেবিটান্স, দি মোসলেম ক্রনিকল, ১৮ জানুয়ারী ১৮৯৬
   (ঘ) পপুলেশন এণ্ড ফুড, ঐ, ১৮ জানুয়ারী, ৫ আগস্ট ও ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬
   (ঙ) এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফর্ম, ঐ, ১১ জুলাই ১৮৯৬
   (চ) এ নোট অন দি মেমন বিল, ঐ, ২২ মে ১৮৯৭
২. Wilfred Scawen Blunt—*India under Ripon—A Private Diary*, London, 1909 p. 115.

আবদুল ওয়ালি (১৮৫৫—১৯২৬)

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য পদ লাভ, সোসাইটির সভায় প্রবন্ধ পাঠ এবং জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ করা দেশীয় পণ্ডিতের জন্য উচ্চ গৌরবের ও মর্যাদার বিষয় ছিল। আভিজাত্যের ও উচ্চ বিত্তের বলে নয়, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির গুণে আবদুল ওয়ালি এসিয়াটিক সোসাইটির সান্নিধ্যে যান এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জোহান ভ্যান ম্যানেন ওয়ালির স্মৃতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, যৌবনের সূচনা থেকেই তিনি জ্ঞান চর্চা পছন্দ করতেন। ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব গবেষণার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিগত ২৫ বছর ধরে তিনি প্রায় ২০টি প্রবন্ধ সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজের খরচে ইসলাম বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রধানতঃ ফারসী ভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ফারসী থেকে ইংরাজীতে এবং ইংরাজী থেকে ফারসীতে একাধিক বিষয় অনুবাদ করেন। তিনি কয়েকটি লেখায় ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের সমকক্ষতা অর্জন করেন। ···তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মনন চর্চা সোসাইটির চত্বরে কেন্দ্রীভূত ছিল। জীবনের শেষ ক'টি বছর তিনি সোসাইটির মাসিক সাধারণ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন।[১] সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থেকে আবদুল ওয়ালি একাগ্রচিত্তে জ্ঞানানুসন্ধান ও জ্ঞানানুশীলন করেছেন। তাঁর আবেদন ছিল মূলতঃ মস্তিষ্কে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা ভারতের হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, পুরাণের পুনরুদ্ধার করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভিতকে দৃঢ় করে তোলেন। আবদুল ওয়ালি ভারতের ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিতকে শক্ত করে তোলেন। এদিক থেকে আমীর আলীর সাথে তাঁর মিল আছে।

আবদুল ওয়ালি খুলনা জেলার শরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রউফ মুন্সেফ ছিলেন। তাঁর পিতামহ মোল্লা নঈম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পারস্য-আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফএ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়ার সময় তাঁর সহোদর ও অভিভাবক আবদুল মতিনের মৃত্যু হয়। আবদুল ওয়ালি পাঠ অসমাপ্ত রেখে রুরাল সাব-রেজিস্ট্রারের চাকুরী গ্রহণ করেন (১৮৮৪)। ১৯০২ সালে তিনি স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার হন, ১৯১০ সালে জেলা-সাব-রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। অতঃপর রেজিস্ট্রেশন অফিসের ইন্সপেক্টর হিসাবে ১৯১৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে তিনি ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' উপাধি পান।[২]

---

১. *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* for 1926, pp. CLXXIV--V.

২. Mohammad Sharif Hossain—An Introduction to the Life and Works of Maulvi Abdul Wali, *Folklore*, No. 2-3, January 1978, pp. 38-42

আবদুল ওয়ালির মূল প্রবণতা ছিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের দিকে। এজন্য ঐতিহাসিক চরিত্র, পুরাকীর্তি ও জাতিতত্ত্বের কথা বেশী আলোচিত হয়েছে। তবে সমকালের জীবনধারা, চেতনাপ্রবাহ ও সমস্যাবলী থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। জাতীয় জীবনের আবেগ, উদ্দেশ্য ও সমস্যাকে স্পর্শ করে, এমন রচনাও তাঁর আছে। ‘এথনোগ্রাফিক্যাল নোট্স অন দি মহামেডান কাস্টস্ অব বেঙ্গল’ (১৯০৪) এবং ‘দি কজ অব ব্যাকওয়ার্ডনেস অব দি মহামেডান অব বেঙ্গল ইন এডুকেশান’ (১৯০৭) প্রবন্ধ দুটি খুবই মূল্যবান। রিজলী, জেমস ওয়াইজ, খোন্দকার ফজলে রাব্বি, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ বাংলার মুসলমানের জাতিতত্ত্ব ও আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, আবদুল ওয়ালির রচনায় তার প্রতিধ্বনি আছে। শিক্ষা-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ‘অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের’ ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে লেখক পাঠ করেন। এটি পরিবর্ধিত আকারে মোসলেম ইনস্টিটিউট জার্নালে প্রকাশিত হয়। কোম্পানীর ভূমি-সংস্কার ও নতুন রাজনীতির প্রবর্তন এবং পুরাতন শিক্ষার স্থলে ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতি ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্তনের ফলে মুসলমান ধনী ও শিক্ষিত পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। অত্যধিক দারিদ্র্যের কারণে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ে বলে আবদুল ওয়ালি অভিমত ব্যক্ত করেন।[১] তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) অন কিউরিয়াস টেনেন্টস্ এণ্ড প্র্যাক্টিসেস্ অব এ সার্টেন ক্লাস অব ফকিরস্ ইন বেঙ্গল (১৯০০), (খ) মুণ্ডারি সংস্ (১৯০৭), (গ) দি বাহমনি ডাইন্যাষ্টি (১৯০৯), (ঘ) দি এন্টিকুইটিজ অব বার্ডওয়ান (১৯১৭), (ঙ) হিন্দুইজম একর্ডিং টু মুসলিম সুফিজম (১৯২৩), (চ) নোটিস অব আর্কিওলজিক্যাল রিমেনস্ ইন বেঙ্গল (১৯২৪), (ছ) আওরঙ্গজেবস রিলেশনস্ উইথ রাজপুতস্, মারাটাজ এণ্ড আদার্স (১৯২৫) ইত্যাদি।

ফারসী ভাষায় আবদুল ওয়ালির অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের উৎস ফারসী পুস্তক ও নথিপত্র। তিনি ফারসী ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন (ক) ফেসানা-এ-দিলফব (কলিকাতা, ১৮৭৭), (খ) ওয়াকায়ে তাসাল্লতে রাশিয়া বার এশিয়া ওয়া বিলায়েত খানাতে তুর্কিস্তান (আগ্রা, ১৯০০) প্রভৃতি। ফারসী ভাষায় দক্ষতা ও জ্ঞানের জন্য তিনি ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন’ থেকে ‘স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। আবদুল ওয়ালি উর্দু ও বাংলা ভাষা জানতেন। তাঁর বাংলা লেখার কোন নিদর্শন নেই। সেযুগে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীর সহিত তুলনায় মুসলমান বুদ্ধিজীবীর এখানে একটা বিরাট পার্থক্য ছিল। ইংরাজী-ফারসী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় সরাসরি উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে পারেনি।

---

১. Abdul Wali—The cause of backwardness of the Muhammedan of Bengal in education, *The Journal of the Moslem Institute,* Vol. 11 No. 4, April-June 1907, p. 294

হেমায়েতউদ্দীন আহমদ (১৮৬০—১৯৪১)

বরিশাল নিবাসী হেমায়েতউদ্দীন আহমদ শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিএ এবং ১৮৯১ সালে বিএল পাশ করেন। ঢাকা মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি বরিশাল জজকোর্টে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। তিনি বাকী জীবনে ঐ পেশাতেই নিরত ছিলেন। তিনি বরিশালের 'আঞ্জমনে হেমায়েত ইসলামে'র (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে শহরে যে 'বেল ইসলামিয়া হোস্টেল' নির্মিত হয়, তাতে তাঁর অবদানই ছিল সর্বাধিক। 'মিহির ও সুধাকর' (১ কার্তিক ১৩০৩) লিখেছে, 'বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং তাঁহার (হেমায়েতউদ্দীন) একান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উৎকৃষ্ট ফল। তিনি বোর্ডিং-এর জীবন ও বল।' ঢাকায় 'ডাফরিন হোস্টেল' নির্মাণেও তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তার ও অগ্রগতির জন্য তিনি নানা পন্থা অবলম্বন করতেন। প্রতি বছর যেসব মুসলমান ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিত, তিনি তাদের সন্ধ্যা-পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসাহিত করতেন। তাঁরই উদ্যোগ ও চেষ্টায় বরিশালের 'মাসনত আলী খান ইনস্টিটিউশন' (১৯১১) স্থাপিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল জেলা স্কুল কমিটির সম্পাদক ও ব্রজমোহন কলেজ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ঋণ ভারগ্রস্ত কৃষকদের মুক্তির জন্য বরিশালে 'কো-অপারেটিভ ব্যাংক' (১৯০২) স্থাপন তাঁর আর একটি মহৎ কীর্তি। 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র সহকারী সম্পাদক ও 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র মফস্বল সভ্য মনোনীত হন। বরিশাল শহরে তাঁর নামে একটি খেলার মাঠ ও একটি প্রধান সড়ক আছে।[১]

সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২)

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণ গ্রামের 'সৈয়দ পরিবারে' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসী 'দূরবীন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সৈয়দ শামসুল হোদা মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএল (১৮৮৬) পাশ করেন। ১৮৮৯ সালে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ফারসীতে এম এ পাশ করেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবী-ফারসী বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা করার পর ১৮৮৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন এবং ১৯১৭ সালে জজের পদে উন্নীত হন। একদিকে ওকালতি ও অন্যদিকে শিক্ষা, সমাজ

---

১. তথ্য পঞ্জী :—

(১) *Who's who in India,* Lucknow, 191?, pp. 83-84

(২) *The Moslem Chronicle,* 4 April 1895.

(৩) সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বরিশাল জেলা ইসলামিয়া হোস্টেল, বরিশাল, ১৯৪০

(৪) গুলবাগ; ১ম সংখ্যা, ১৩৫২, বরিশাল

ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। মুসলমান সমাজের দুঃস্থ জনগণের অনেক মামলা বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করতেন। শ্যামবাজারের 'টালা দাঙ্গা'য় অভিযুক্ত মুসলমান আসামীদিগের পক্ষ থেকে ওকালতি করেন। ইসলাম-প্রচারক (আশ্বিন ১২৯৮) লিখেছে, 'এই মোকদ্দমায় হাইকোর্টের মাননীয় স্বজাতিবৎসল উকীল জনাব মৌলবী সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ. বিএল সাহেব যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্নচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা মুসলমান মাত্রেরই অনুকরণীয়।'' তিনি ১৮৯৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর এবং ১৯০২ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ক 'টেগোর ল' অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সভাপতি মনোনীত হন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সদস্য ছিলেন। কলিকাতার 'কারমাইকেল হোস্টেল' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তিনি মূলশক্তি ছিলেন। মুসলমানদের জন্য কলেজ স্থাপনের আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন। এর ফলে ওয়েলেসলি স্ট্রিটের ইসলামিয়া কলেজের জন্য ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি কেনা হয়। কলিকাতার 'কড়েয়া মুসলিম বয়েজ স্কুল' তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। ঐ স্কুলের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের সুপারিশ করতেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। শিক্ষা বিভাগের চাকরীতে মুসলমানদের নিয়োগের জন্যও তিনি বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। এসব কর্ম প্রয়াস মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার বাংলা পত্রিকা 'সুধাকর' (মাসিক) এবং ইংরাজী পত্রিকা 'দি মহামেডান অবজারভার' (সাপ্তাহিক) প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি এক সময় 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে সেটি পরিচালনা করতেন। তিনি 'উর্দু গাইড প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ উত্তরাধিকার সূত্রেই জন্মেছিল। তিনি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৯২২ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি সুবক্তা ও তার্কিক ছিলেন। ছোটলাট আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে বাংলার প্রাদেশিক কার্যকরী সভার সদস্য মনোনীত করেন। এরূপ সম্মান বাঙালী মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম পান। ১৯১০ সালে পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় আইনসভার সদস্য হন। ঠাকুর আইন অধ্যাপক্ষ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রিন্সিপলস অফ ক্রাইমস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দেন। এতেই তিনি আইনবিশেষজ্ঞ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯৫ সালে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে 'ইণ্ডিয়ান পলিটিকস এ্যাণ্ড দি মহামেডানস্' শীর্ষক ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংলণ্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তাঁর লেখা মুদ্রিত হয়।

বহুমুখী কর্মসূচীর পুরস্কার স্বরূপ সৈয়দ শামসুল হোদা ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে ১৯১৩ সালে 'নবাব' ও ১৯১৫ সালে 'কে. সি. আই. ই.' উপাধি লাভ

করেন। মধ্যবিত্তের সন্তান হয়ে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির গুণেই তিনি পদমর্যাদা ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগে সহকারী মুসলিম পরিচালক ও মুসলিম শিক্ষা পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি তাঁর উদ্যোগের ফল। তিনি স্ত্রীর নামে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্রদের জন্য 'আসমাতুন্নেসা ছাত্রাবাস' স্থাপন করেন। গোকর্ণে 'ওয়ালী উল্লা উচ্চ বিদ্যালয়' স্থাপনেও তাঁর অবদান রয়েছে।[১]

আবদুস সালাম (১৮৬১—১৯৪১)

আবদুস সালাম যশোহর জেলার শীবগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ (১৮৮৩) এবং ইংরাজীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৮৯৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং পরে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৩-৮৪ সালে কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য, পরে ঐ সমিতির সম্পাদক হন।[৩] ১৮৯৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যভুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখে তিনি 'স্বর্ণপদক' পান (১৮৮২)। এর পর তিনি 'উবফি' ও 'সিঙ-নগর-ই-ছবি' নামে দুখানি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি গোলাম হোসেন সলিমের বিখ্যাত ফারসী গ্রন্থ 'রিয়াজ-উস-সলাতিনের' (১৭৮৬-৮৮) ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা। এটি প্রকাশ করে তিনি সেযুগের বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি 'রিয়াজউস সলাতিন অর এ হিষ্টরি অব বেঙ্গল' (১৯০৪) নাম দিয়ে এটি প্রকাশ করে। আবদুস সালাম অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "For my labours, such as they have been, I shall, however, feel amply rewarded if these pages in any measure contribute to awaken amongst my co-religionists in Bengal and enlightened consciousness of the historic past, coupled with an earnest longing in the present to avail themselves of the opportunity afforded by a progressive and beneficent Government for the future social and intellectual regenera-

১. তথ্য
   (১) Syed Martuza Ali—*Personality Profile*, Dacca, 1965, pp. 31-33.
   (২) মোহাম্মদ ইদরিস আলী—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৯৬৫
   (৩) মোশফেকা মাহমুদ—পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৫
   (৪) *The Moslem Chronicle*, 12 September 1895.
   (৫) ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮
   (৬) মিহির ও সুধাকর, ৩০ ভাদ্র ১৩১২
   (৭) নকীব, কুমিল্লা, ১৯৭৫
২. সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫ (২সং, শিব-শঙ্কর মিত্র সম্পাদিত), পৃঃ ৮৪৪
৩. মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৭

tion ; and also if they widen the mutual sympathies of the two great nationalities in Bengal by infusing sentiments of closer and more cordial comradeship, in that they have been fellow-traveller over the same tract for many long centuries and although not least, if they evoke the sympathetic interest."[১] সহধর্মিনী জান্নাতুন্নেসা বেগমকে তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

আবদুস সালামের ভ্রাতা আবদুল হামিদ বিএ ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'দি মোসলেম ক্রনিকলে'র সম্পাদক ছিলেন। 'মোসলেম ক্রনিকল' সে সময় মুসলমান সম্পাদিত একমাত্র ইংরাজী পত্রিকা ছিল। তিনি সেই সুবাদে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। সেকালের সমাজ ও শিক্ষা সংগঠনমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাহাওয়ালপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন।[২]

আবদুল আজিজ (১৮৬৩–১৯২৬)

নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার পরশুরাম থানার অন্তর্গত উত্তরগুথুমা গ্রামের অধিবাসী আবদুল আজিজ বিদ্যাবত্তা ও সৎকর্মের গুণে সমাজে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা আমজাদ আলী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের পেস্কার (পরে পার্সোনাল এ্যাসিস্টান্ট) ছিলেন। তিনি ইংরাজী জানতেন। আমজাদ আলী ও তমিজউদ্দীন পরস্পর বৈবাহিক ছিলেন।

আবদুল আজিজ ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন, ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সংগঠনশক্তির প্রকাশ ঘটে। হিম্মত আলী, হেমায়েতউদ্দীন, আবদুল মজিদ, জোহাদর রহিম জাহিদ, আবদুল আজিজ একত্রে মিলে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নোয়াখালীর 'আঞ্জুমনে আশাআতে ইসলাম' (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। স্কুল সব-ইনস্পেক্টর হিসাবে যখন চট্টগ্রামে ছিলেন তখন সেখানে 'মোসলমান শিক্ষাসভা' (১৮৯৯) স্থাপন করে তিনি এর সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। চট্টগ্রাম শহরের 'ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল' তাঁরই উদ্যোগের ফল। এছাড়া, 'কবিরুদ্দীন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী', 'ফ্রি ইসলামিয়া রিডিং রুম' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে ফেনী কলেজ (১৯২২) স্থাপনেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্রায় দুলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি জনহিতে ওয়াকফ করে যান।[৩] আবদুল আজিজ ১৮৮৮ সালে শিক্ষক হিসাবে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন; ১৯১০ সালে সাব-স্কুল-ইনস্পেক্টর পদ লাভ করেন। আবদুল আজিজের শিল্পীসুলভ মন ছিল। ওবায়দুল্লা আল ওবায়দী

১. *Riyazus Salatin or a History of Bengal* of Ghulam Hussain Salim by Maulvi Abdus Salam, Bengal Provincial Civil Service, Member of A.S.B. ..uthor of Translations of Urf and Sih-Nasr-i-Zahuri, Asiatic Society, Calcutta, 1904

২. মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৮৩

৩. হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃঃ ৩৭৪-৭৫ ; মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৯

সোহরাওয়ার্দীর স্মরণে 'ওবেদী বিয়োগ' (১৮৮৪) তাঁরই রচনা। ৮ পৃষ্ঠার এই শোক পুস্তিকাটি ঢাকার গিরিশ প্রেসে ছাপা হয়।[১] 'মায়াদনোল উলুম' (১৮৯২, ২য় সং) নামে আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। এটি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-বিধি সংক্রান্ত পুস্তক।[২] 'কবিতা কলিকা' (১৮৮৫) তাঁর অপর কাব্যগ্রন্থ।[৩]

কর্মদক্ষতা ও শিক্ষানুরাগিতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি সেযুগের সম্মানিত পদবী 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি মন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার ও তদভগ্নী শামসুননাহার মাহমুদের মাতামহ ছিলেন। তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নজরুল ইসলামের 'বাংলার আজীজ' কবিতাটি তাঁরই স্মৃতি উপলক্ষে রচিত।[৪]

আবদুল আজিজ নামে অপর এক ব্যক্তি ১৮৮৭ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি শিক্ষক হিসাবে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত উড়িষ্যার কটক কলেজে ছিলেন। তিনি 'আরব্য ও পারস্য মধুপাক' (১৮৯১) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আবদুর রহিম (১৮৬৭—১৯৫২)

তিনি মেদিনীপুরে ধনী জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে মেদিনীপুর সরকারী হাইস্কুল ও পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ কলেজ থেকে ১৮৮৫ সালে বিএ এবং ১৮৮৬ সালে ইংরাজীতে এমএ পাশ করেন। ভূপালের বেগম সাহেবা বিলাতে আইন পরীক্ষার্থীদের জন্য যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, আবদুর রহিম সে বৃত্তিলাভ করে বিলাত গমন করেন। ১৮৯০ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। আবদুর রহিম ১৯০০-০৩ সাল পর্যন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহাল ছিলেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। তিনি ঐ সময় মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা দেন, সেগুলি পরে 'প্রিন্সিপলস্ অব মহামেডান জুরিস্প্রুডেন্সেস' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে সিমলা ডেপুটেশনে তিনি একজন প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছর ঢাকায় মুসলিম লীগের পত্তনে ও লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর দান অগ্রগণ্য ছিল। ১৯০৮ ও ১৯১৫ সালে দু'বার মাদ্রাজের

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ১৮৮৫
২. ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১
৩. হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃঃ ৩৭২
৪. মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৩৪

হাইকোর্টের পিউনী জজ নিযুক্ত হন। এরপর বাংলা সরকারের কার্যকরী সভার সদস্য (১৯২১-২৫), প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৬), কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য (১৯৩৩) ও সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে করাচীতে মৃত্যু বরণ করেন।

বরাবর উচ্চপদে সমাসীন থাকার ফলে তাঁর গণসংযোগ বড় একটা হয়নি। ১৮৯৬ সালে স্থাপিত কলিকাতার 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে ঐ এসোসিয়েশনের কর্মসূচী প্রতিপাদনে তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তিনি 'কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা' নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উক্ত সভার মাধ্যমে তিনি কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি 'আদর্শ মক্তব' স্থাপন করেন। মক্তবে শিক্ষার মাধ্যম উর্দু ভাষা গৃহীত হওয়ায় 'মিহির ও সুধাকর' আবদুর রহিমকে আক্রমণ করে। আবদুর রহিম বাংলা লিখেছেন, এমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। তিনি বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্বে ও অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান নবজাগৃতির একজন প্রবক্তা হিসাবে কাজ করেছেন।[১]

আবদুর রসুল (১৮৭০--১৯১৭)

একজন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক তরুণ নেতা হিসাবে ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের ভাবমূর্তি আজও অম্লান। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি তথা স্বাধীনতা লাভ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান স্বপ্ন ছিল। বাঙালী জাতীয়তাবোধ তাঁর মধ্যে স্ফূরিত হয়েছিল যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থা রাখতেন; তিনি ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করেননি; হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে

১. তথ্যপঞ্জী

(১) ভারত কোষ (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, পৃঃ ৩০০-০১

(২) *The Moslem Chronicle*, 23 May 1896 (Supplementary).

(৩) মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯

(৪) *Struggle for Independence*, p. 49

দুর্বল এবং জাতীয় চেতনাকে খণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র হিসাবে তিনি এটাকে দেখেছিলেন। এজন্য তিনি স্বসমাজের স্বার্থবাদী মানুষের কাছে নিন্দার ভাগী হন।

আবদুর রসুল কুমিল্লার গুণিয়াউকের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাম রসুল প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। আবদুর রসুল অল্প বয়সে পিতাকে হারান, মা সন্তানকে সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব নেন। এ সময় তাঁরা কিশোরগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। আবদুর রসুল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ঐ বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। তিনি ১৮৯২ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন; ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ডের সেন্ট জোনস কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯৮ সালে এমএ পাশ করেন। ঐ বছর তিনি মিডল টেম্পল থেকে বার-এট-ল ও বি সি এল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯৮ সালেই তিনি দেশে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার গুণে অল্প সময়েই আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরাজী পত্রের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন (১৮৯৯-১৯০২)। কলিকাতার ইংরাজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' (স্থাপিত ৬ ডিসেম্বর ১৯০৬) আবদুর রসুলের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থানুকূল্য ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। তিনি সময় সময় ঐ পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধও রচনা করতেন। সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ন রেখে পত্রিকাখানি সেযুগে সমাজের জাগরণের বিশেষ দায়িত্ব পালন করে গেছে। আবদুর রসুল বিদেশী মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। জীবনের মধ্যগগনে অকাল মৃত্যু হলে তাঁর আদর্শ চিন্তা ও কর্মে ছেদ পড়ে। হিন্দু-মুসলমান দুটি জীবন-প্রবাহকে একত্রে বেঁধে দেওয়ার স্বপ্নও দূরীভূত হয়।[১]

সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০--১৯৩৪)

কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন একজন উৎসাহী বুদ্ধিজীবী হিসাবে কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

১. তথ্যপঞ্জী :—

(১) মুক্তবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ১০৫-১১৩

(২) *Who's Who in India,* 1911, p. 127

এটা তাঁর কর্মোদ্দীপনা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৮৮৯ সালে রিপন কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' ও ইউনিয়নের আশ্রয়ে গঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সম্পাদক হিসাবে গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিশেষ করে, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' তাঁরই উদ্যোগে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জন্ম লাভ করে। সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-সমূহ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে সমিতির নামযুক্ত প্রচারপত্রটি (ইংরেজী ও বাংলা) তিনিই প্রণয়ন করেন। পুস্তিকাটির উপর ভিত্তি করে মির্জা আবদুল ফজল 'নবনূরে' (শ্রাবণ ১৩১০) মন্তব্য করেন, "এই অধঃপতিত সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে তিনি (ওয়াহেদ হোসেন) যেরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কতকটা কৃতকার্যতার আশা করা যাইতে পারে। এজন্য তিনি সমগ্র মুসলমান সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।" কলিকাতার 'মুসলিম গার্লস মাদ্রাসা' (১৮৯৭) নামে প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অপর্যাপ্ত দান ছিল। 'মোসলেম ক্রনিকলে'র (১৬ জানুয়ারী ১৮৯৭) অভিমত, তাঁরই উদ্দীপনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। কলিকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি কাজ করতেন। কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিন' (১৩১৭) নামক প্রতিষ্ঠানটি তাঁর ও শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ কতিপয় সমাজ সেবকের প্রযত্নে স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের সেবা করে কারাবরণ করেন। এরপর স্বরাজ্য দলে যোগদান করে তিনি বাংলা কাউন্সিল ও কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' (১৯০২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে ৫ জন মুসলমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, ওয়াহেদ হোসেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। 'তালিমে উর্দু' নামে উর্দু শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক এবং ইংরাজীতে ইসলাম ধর্মমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। আইনের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি তিন বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনাথনাথ দেব পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ তিনটি ছিল যথাক্রমে 'Theory of Sovereignty in Islam (1931), Administration of Justice in Moghal India (1932) ও Lebour Lagislation in British India (1937)। শেষের পুরস্কার ছিল মরণোত্তর। তিনি

স্যার সৈয়দ আহমদের মৃত্যু উপলক্ষে 'অশ্রুপহার' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকও প্রণয়ন করেন।*

আবু নসর ওহীদ (১৮৭৭-১৯৫৩)

আবু নসর ওহীদ মুখ্যতঃ একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ জাবিদ বখত ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। 'কবি' হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। শ্রীহট্টের সরকারী হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন (১৮৯২)। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আরবীতে এমএ পাশ করেন। তিনি প্রথমে শ্রীহট্টের সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে কলিকাতা মাদ্রাসা ও গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যাপক হন (১৯২১)। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ১৯২১ সালে এডুকেশন সার্ভিসে উন্নীত হন। ঐ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়াস চালিয়ে যান। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী এমন যে, মাদ্রাসা শিক্ষার শেষে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। ইংরাজী শিক্ষার অভাব ও পাঠ্যবস্তুর অসমতার জন্যই এরূপটি হত। এজন্য আবু নসর ওহীদের প্রথম চেষ্টা হল কিভাবে মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধান করা যায়। তিনি তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ব্লুমফীল্ড ফুলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং 'রিফর্মড মাদ্রাসা স্কীমে'র প্রস্তাব দেন। তাঁর এই নতুন চিন্তাধারা কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী ও সৈয়দ শামসুল হোদা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। আবু নসর ওহীদ মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য ঐসব দেশ ভ্রমণ করেন।

---

* তথ্যপঞ্জি

১. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা
২. এস. ডব্লিউ. হোসেন - বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন, কলিকাতা, ১৯৩৩
৩. *Muslim Community in Bengal*, p. 91.
৪. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১২৫
৫. বুলবুল, ৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৩
৬. *The Calendar* (Calcutta University) 1942, p. 184.

১৯০৭ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৮ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম. হুগলী মাদ্রাসায় পরীক্ষামূলক ভাবে 'নিউ স্কীম' পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এর পশ্চাতে আবু নসর ওহীদের অবদান ছিল বেশী। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের চাহিদা মিটাতে পারছে না, সেযুগের দু'একজন প্রগতিশীল চিন্তানায়কের মত তিনিও তা উপলব্ধি করেন এবং এর সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন। তিনি বহু শ্রম স্বীকার করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এটাই তাঁর জীবনের জ্ঞান-সাধনা ও তাঁর চিন্তাকর্মের প্রধান কীর্তি। মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগী করে 'বাকুরাতুল আদাব' ও 'মিরকাতুল আদাব' নামক দু'খানি আরবী প্রাইমার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা, ইংরাজী, ফারসী ও আরবীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৯০১ সালে 'শামসুল ওলামা' উপাধিতে ভূষিত হন।*

মির্জা সুজাত আলী বেগ

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতাপশালী দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খানের বংশধর মির্জা সুজাত আলী বেগ মুর্শিদাবাদের সাহেবজাদী বেগম শামসিজাহান ফেরদৌস মহলের দেওয়ান ও সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সেকালের কলিকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৯ সালের 'মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন'কে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য জনমত গঠনে ও চাঁদা সংগ্রহে তিনি এবং সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে কবি মোজাম্মেল হক 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন. সেটি পুস্তিকা আকারে ১৩০৬ সনের ১৩ পৌষ ছাপা হয়। পুস্তিকাটি মির্জা সুজাত আলী বেগকে উৎসর্গ করা হয়। কবির ভাষায় 'উপহার' পত্রটি এরূপ: "সর্বগুণ নিলয় স্বজাতি হিতপরায়ণ মহামনস্বী মাননীয় শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর মৌলবী মির্জা সুজাত আলী বেগ কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারী মহোদয়ের সুকোমল করকমলে এই অকিঞ্চিৎকর জাতীয় সঙ্গীত আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ সমর্পিত।"[৩] কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রেও

---

* তথ্যপঞ্জি

১. শ্রীহট্ট-প্রতিভা পৃঃ ২৪১-৪২

২. মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৩৫-৪৪

৩. মোজাম্মেল হক—জাতীয় সঙ্গীত, কলিকাতা, ১৩০৬, 'উপহার' অংশ দ্রষ্টব্য

তাঁর দান আছে। মির্জা সুলতান আলী বেগ ১৮৯৯ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি এক সময় পারস্যে ভারত সরকারের কনসাল নিযুক্ত হন।

হামিদউদ্দিন আহমদ

হামিদউদ্দীন আহমদ ১৮৭৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 'লাইসেন্সিয়েট ইন ল' পাশ করেন। তিনি ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন; ময়মনসিংহ কোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ময়মনসিংহ শাখার অনারারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথমে কংগ্রেসের রাজনীতি করতেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন। পরে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তিনি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। সৈয়দ আহমদের সাথে এ-ব্যাপারে তাঁর পত্রালাপ ছিল।[১] ঢাকায় 'কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন সাব-কমিটি' গঠিত হয়। নবাব পরিবারের খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ এর সভাপতি ছিলেন। তাঁরা ১১ নভেম্বর, ১৮৮৮ সালে ঢাকার নবাব বাড়িতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। হেমায়েত উদ্দীনের মত হামিদউদ্দীন মুসলমান সমাজের আঞ্চলিক নেতৃত্ব দেন। ময়মনসিংহ শহরে হামিদউদ্দীন আহমদের নামে একটি রাস্তা আছে।

সৈয়দ ওসমান আলী

সৈয়দ ওসমান আলী কলিকাতার বিদ্বৎসমাজের একজন উৎসাহী কর্মী ও সংস্কৃতিসেবক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন সভাসমিতি ও পত্র-পত্রিকার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র সদস্যভুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সদস্য হিসাবে সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কলিকাতায় 'এলিয়ট হোস্টেলে'র গৃহ নির্মাণে ১০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। তিনি সাহিত্যিক ও সম্পাদক শেখ আবদুর রহিমের আত্মীয় (মামা শ্বশুর) ছিলেন।[২] পত্রিকা সম্পাদক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবেও তাঁর নাম ছিল। তিনি 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাখানি শেষের দিকে (১৯০৮) সম্পাদনা করেন। ঐ পত্রিকায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ইংরাজী সাপ্তাহিক 'দি মোসলেম ক্রনিকলে'র ম্যানেজার ছিলেন।

১. *Hindu-Muslim Relations In Bengal*, pp. 117-18

২. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড, পৃ: ২০৭

৩. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১২

বজলুর রহিম

নোয়াখালী পরশুরাম থানার গুতুমা গ্রামের অধিবাসী বজলুর রহিম ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৫ সালে বিএ এবং ১৮৮৭ সালে বিএল পাশ করেন। তাঁর পিতা তমিজউদ্দীন নোয়াখালীর মোক্তার ছিলেন। বজলুর রহিম ঐ জেলার সরকারী উকিল ছিলেন। তিনি নোয়াখালীর 'আঞ্জুমনে আল আতে ইসলামে'র (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন।[১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও ধর্ম প্রচার করা এই আঞ্জুমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ১৯০০ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান। ফজলুল করিম, বজলুর রহিম, আবদুল ওদুদ ও শামসুদ্দীন আহমদ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, চারজনেই গ্রাজুয়েট হন।[২] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফজলুল করিম ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে বিএ ও ১৮৮৫ সালে বিএল পাশ করেন। তিনি মুন্সেফ ছিলেন। আবদুল ওদুদ সেন্ট জেভি-য়ার্স কলেজ থেকে ১৮৯৫ সালে বিএ পাশ করেন। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শামসুদ্দীন আহমদ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯০২ সালে বিএল পাশ করে প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে ইনস্পেক্টর জেনেরাল অব রেজিস্ট্রেশন হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ মাসুদ আলিগড়ে পড়াশুনা করে সব-রেজিস্ট্রার হন।[৩]

কাজী মোহাম্মদ আহমদ

শ্রীহট্টের দুল্লভপুর নিবাসী কাজী মোহাম্মদ আহমদ একজন শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে নিজ গ্রামে একটি মধ্য বঙ্গ-বিদ্যালয় ও মৌলভী বাজারে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি শ্রীহট্টের 'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। একজন বক্তা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। বাংলা, উর্দু, ফারসী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'শ্রীহট্ট দর্পণ' (১২৯২) বাংলা ভাষায় রচিত শ্রীহট্টের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।[৪] এটি শ্রীহট্টের জমিদার হামিদ বখত মজুমদারের উর্দু ভাষায় রচিত 'আযশ-এ-হিন্দ' (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। তাঁরা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন।

১. *The Moslem Chronicle*, 12 December, 1896.
২. হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃঃ ৩৭২
৩. ঐ, পৃঃ ১৫৭
৪. মুক্তবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ১১১
৫. শ্রীহট্ট প্রতিভা, পৃঃ ১৮

গজনফর আলী খান (১৮৭২-১৯৬৯)

তিনি শ্রীহট্ট শহরের নিকটবর্তী বিরাইপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পরে এফএ পাশ করে বিলাতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। গজনফর আলী খান রাজকার্যে প্রবেশ করে বাংলার বাইরে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হুসঙ্গাবাদ ও নাগপুর বিভাগের কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। ১৯১২ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং পল্লী উন্নয়ন ও অন্যান্য সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। স্কুল স্থাপন, কূপ খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, তাতকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাঁর সমাজ সেবার নিদর্শন। অকৃতদার এই উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি রাজনীতির দিকে না গিয়ে সমাজসেবার মধ্যেই আত্মতৃপ্তির সন্ধান করেছিলেন।

মোশাররফ হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৬)

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার চিওড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাজী মকরম আলী। ১৮৯৮ সালে বিএ পাশ করেন। জলপাইগুড়িতে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চা বাগানের মালিক খান বাহাদুর রহিম বক্সের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনি নিজেও চা বাগানের মালিক হন। নিজে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন বলে বিদ্যার মূল্য দিতেন। কলিকাতার 'ইসলামিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠায় তাঁর আর্থিক অবদান আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লিটন বৃত্তি' তারই দানে সৃষ্ট। স্বগ্রাম চিওড়ায় ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে স্ত্রী ফজলুন্নেসার নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি একাধিকবার বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন। ১৯২৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪২ সালে বাংলা সরকারের মন্ত্রী হন। তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'নবাব' উপাধি পান।[১]

---

১. নকীব ১৯৭৫, পৃঃ ৩৫

সভা-সমিতি

সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে। 'একতাই বল', 'ঐক্যে জয়, ভেদে পতন' ইত্যাদি প্রাচীন প্রবাদগুলি সংঘবদ্ধতার আদর্শ প্রচার করে। ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্য সীমিত, সমষ্টির শক্তি ও সামর্থ্য সীমাহীন। ব্যক্তি-চিন্তা সমষ্টি-চিন্তার মধ্যে সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনবোধ থেকে মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মেষ হয়। তখন থেকে আধুনিক ধরনের সমাজসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরাজী শিক্ষিত রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) প্রথম 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) স্থাপন করেন। পরের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হিন্দু শিক্ষিত-সমাজে বহু সভা-সমিতি গড়ে উঠে। বাংলার মুসলমানদের প্রথম সংগঠন "আঞ্জমানে ইসলামী" বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন' ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হয়। আঞ্জমানের উদ্যোক্তাগণ প্রায় সকলেই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। অধিকার-সচেতনতা ও আত্ম-নিরাপত্তার মনোভাব থেকে যে হিন্দু-মুসলমানের সভাগুলির জন্ম হয়েছিল, তা সেগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়। ঔপনিবেশিক ও অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসক-শাসিতের সম্পর্ক হয় অধিকার-হরণ ও অধিকার-দাবীর সম্পর্ক। অধিকার-বঞ্চিত ব্যক্তিত্ব আহত হলে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথ বেছে নেয়, কেননা বলবান শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি দ্বন্দ্বের মধ্যে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নয়, সমাজের অভ্যন্তরের বৈরী শক্তিগুলির বিরুদ্ধেও যুক্তশক্তির সাহায্যে সংস্কার, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। মানুষের কল্যাণমুখী কোন কিছু গড়ার কাজেও সংঘশক্তির প্রয়োজন হয়। এক কথায়, ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনার সমন্বয়ে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শে আধুনিক সভা-সমিতি, সংঘ-সমাজ গঠিত হয়েছে। নানা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এগুলিই ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার, আত্মরক্ষার কবচ, আত্মপ্রকাশের উৎস ও ভাবসম্মিলনের কেন্দ্র।

যত দূর জানা যায়, স্যার উইলিয়ম জোনসের 'এসিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এতে প্রথম দিকে

ভারতীয়দের স্থান ছিল না।[১] রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র পরপরই এদেশে সভা-সমিতির জোয়ার আসে। প্রথম পঞ্চাশ দশকের মধ্যে কেবল কলিকাতাতে বহু সংখ্যক ও বিবিধ বিষয়ক সমিতি গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৩), রাধাকান্তদেবের 'ধর্মসভা' (১৮২৮), ডিভিয়ান ডিরোজিওর 'একাডেমিক সভা' (১৮২৮), 'ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮২৯), 'জ্ঞান-সন্দীপন সভা' (১৮৩০) 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন' (১৮৩১), 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' (১৮৩৬), তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৮), 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (১৮৫০), বেথুন সোসাইটি' (১৮৫১), 'ফ্যামিলি লিটারেরী ক্লাব' (১৮৫৭) ইত্যাদি ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।[২] নব জাগরণের যুগে ধর্ম-শিক্ষা-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জন্য এসব সভাসমিতির দ্বারাই হয়েছে। নব অধ্যাত্মবাদ, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতাস্পৃহা, যুক্তিবিদ্যা, মানবতাবোধ প্রভৃতি আধুনিক ভাবনা ও আদর্শচিন্তা এসব সভাসমিতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। সুতরাং আধুনিক জীবনস্পন্দন ও জাগরণ উল্লাসের বাহক হিসাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা, বই পুস্তক প্রভৃতির মত সভাসমিতির গুরুত্বও কম নয়। বিশেষ করে, বিকাশোন্মুখ যুগে এ ভূমিকা ছিল অধিক তাৎপর্যবহ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার মুসলমান সমাজের আত্মবিকাশের মাধ্যম হিসাবে মুসলমানের সমিতিগুলিও সমভাবে ক্রিয়া করেছে। সমকালের সমাজের ভাবধারা ও গতিধারা উপলব্ধি করার জন্য এগুলির পরিচয় জানার আবশ্যকতা আছে। ১৮৫৫ সালে 'আঞ্জমনে ইসলামী' স্থাপনের সময় থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা ও মফস্বলে যতগুলি সভা, সমাজ, ক্লাবের সন্ধান পাওয়া গেছে, এখানে সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ক্রীড়া বিবিধ বিষয়কে অবলম্বন করে সমিতিগুলি গঠিত হয়েছে। তবে শিক্ষা-সমাজ-ধর্ম বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। আরবী-ফারসী-উর্দুর মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা এবং ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দো-

---

১. ১৮২৯ সালের পূর্বে কোন ভারতীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হতে পারেননি। ঐ বছর রামকমল সেন সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। ১৮৩২ সালে তিনি নেটিভ সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। *The Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol 1, No. 12, December, 1832, p. 559.

২ গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭২ (২য়) ; বিনয় ঘোষ—বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলিকাতা, ১৩৮০

লনের কাজ সমিতিগুলি করেছে। অনৈসলামিক রীতিনীতি, ধর্মান্ধতা, নীতিহীনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করে শরীয়তধর্মের আদর্শ প্রচার করে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন করেছে। কলিকাতার সমিতিগুলি ভাষার প্রশ্নে ফারসী-উর্দুর প্রতি সমর্থন দিয়েছে, কিন্তু মফস্বলের অধিকাংশ সমিতি বাংলা ভাষার সপক্ষে প্রচার চালিয়েছে। ইংরাজী বিধর্মীর ভাষা, বাংলা হিন্দুদের ভাষা —এ ধরনের মনোভাব সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছিল, অনেক সমিতি এরূপ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছে। অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে বৃত্তি, পদক, পুরস্কার দিয়ে বিদ্যার্থীদের উৎসাহিত করা হয়েছে। কোন কোনটি সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। শরীরচর্চা ও দেহগঠনের দিকে জোর দিয়ে ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে। বিতর্কমূলক সভাগুলিতে যুক্তিবিদ্যার চর্চা হয়েছে, প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়েছে। কোন কোনটি স্বতন্ত্র জাতিত্বের প্রশ্ন তুলে সমাজের স্বার্থ উদ্ধার ও অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে। এভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। জাতীয়তার প্রশ্নে প্রথমে সর্বভারতীয় মনোভাব থাকলেও ক্রমশঃ বাঙালী জাতীয়তার কথা উঠেছে। ভাষার ক্ষেত্রে এটি বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। সমাজের ভেতরকার অপশক্তিগুলিকে ধ্বংস করে সমাজকে মুক্তির ও প্রগতির পথ দেখানোর কাজ সমিতি দ্বারা এভাবেই এগিয়েছে। ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার ও প্রতিবন্ধকতার আশানুরূপ ফল এ-পর্বে ফলেনি সত্য, তবে নির্জীব, নিস্তেজ, নিশ্চল জাতির অধঃপতনের গতিরোধ করে সেজাতিকে সচেতন করে তোলার সাফল্য অবশ্যই অর্জন করেছে। আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা ও ঐক্যবদ্ধচেতনা সমিতিগুলির মাধ্যমেই জাতীয়জীবনে প্রথম সঞ্চারিত হয়। এগুলি উচ্চনীচ শ্রেণীগত ব্যবধান দূর করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। উচ্চবিত্তের নবাব-জমিদারেরা মধ্যবিত্তের শিক্ষিত শ্রেণী এবং শিক্ষিত শ্রেণী নিম্নবিত্তের সাধারণ শ্রেণীর সাথে মিশেছেন। অর্থাৎ সামাজিক সেতুবন্ধের কাজটা এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। আত্মমুখী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব সমাজমুখী ও সমষ্টিকেন্দ্রিক রূপ লাভ করেছে। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ কলিকাতায় এলে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ও 'ইণ্ডিয়া সাইক্লিষ্ট এসোসিয়েশনে'র যৌথ উদ্যোগে তাঁর কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দেলওয়ার হোসেন আহমদ ও মির্জা সুজাত আলী বেগ এতে নেতৃত্ব দেন। নবাব আহসানুল্লাহ তাঁদের বলেছিলেন যে, শুধু শরীর গঠন নয়,

সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।[১] অংশতঃ রক্ষণশীল, অংশতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে সমিতিগুলিকে ১. সমাজ, ২. ধর্ম, ৩. শিক্ষা, ৪. সাহিত্য সংস্কৃতি, ৫. রাজনীতি, ৬. বিজ্ঞান ও ৭. ক্রীড়া এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। কেবল শাখাগুলিকে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে এবং সমনামের সমিতিগুলিকে একত্র করে আলোচনা করা হয়েছে। কলিকাতার সমিতির সংখ্যা বেশী। মফস্বলে মেদিনীপুর, হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় একাধিক সমিতি ছিল। সমিতিগুলির আলোচনায় প্রবেশ করলে সহজে বুঝা যায় যে, কি সদর, কি মফস্বল কোন স্থলে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রয়াস নেই; কোন কোন সভার হিন্দু-মুসলমানের একত্র মিশবার পক্ষে বাধা ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুর সভায় মুসলমান ও মুসলমানের সভায় হিন্দু বড় একটা যোগদান করেননি। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে (৮ ধারায়) মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যের সমান অধিকার ছিল না। হিন্দু মেলার কর্মসূচী এমনই ছিল যে, তাতে মুসলমানরা যোগদানের উৎসাহ বোধ করতেন না। সমিতির নামের সাথে 'মুসলমান', 'ইসলাম' 'হিন্দু', 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত করে স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান স্বসমাজ ও স্বশ্রেণীর স্বার্থে প্রকাশ্যভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছে। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়ের পরিচালিত প্রায় প্রতিষ্ঠানের গতিধারা ছিল একই—জাতিস্বার্থে প্রায় দ্বিমুখী। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় একত্রে মিলতে পারেনি। সমাজ বিকাশের এই গতিধারাটি সভাসমিতিগুলিতে যত স্পষ্ট ধরা পড়েছে, অন্যক্ষেত্রে ততখানি নয়। সমাজ-মানসের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুধাবনে সভাসমিতিগুলির এরূপ গুরুত্ব থাকায় আমরা এখানে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

আঞ্জমন ইসলামী

আঞ্জমন ইসলামী বা মহামেডান এসোসিয়েশন বাংলা কেন, ভারতের মুসলমানের প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান। আঞ্জমনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মৌলবী

১. *The Moslem Chronicle*, 18 March, 1899.

মোহাম্মদ মজহার। তাঁর পিতা কাজী গোলাম সোবহান ছিলেন সদর আদালতের 'কাজী-অল-কুজ্জাত'। মোহাম্মদ মজহারের তালতলার বাড়িতে ১৮৫৫ সালের ৬ই মে তারিখে আঞ্জমন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রথম সভা হয়; সভায় শহরের অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে 'আঞ্জমন ইসলামী' নামকরণ করে উক্ত সমিতি স্থাপন করা হয় এবং নিম্নের সদস্য সমন্বয়ে একটি 'কার্যনির্বাহক কমিটি' গঠন করা হয়:—

সভাপতি—কাজী ফজলুর রহমান, কাজী-অল-কুজ্জাত
সহ-সভাপতি—কাজী আবদুল বারি, কাজী, কলিকাতা সদর আদালত
সম্পাদক—মোহাম্মদ মজহার ও মোহাম্মদ আবদুর রউফ।
সদস্য—মোহাম্মদ ওয়াজিহ, আবদুস সামাদ, আবদুল লতিফ, আবদুল সত্তার, ফজলুল করিম, গোলাম ইসহাক, রহমত আলী, আহমদ, মোওয়াদ, আবদুল হামিদ ও গোলাম ইয়াহিয়া।[১]

ভারতের মুসলমানের মঙ্গল সাধন আঞ্জমনের উদ্দেশ্য হবে বলে ঐ সভায় ঘোষণা করা হয়। ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় আঞ্জমনের কাজ পরিচালনা করা হবে। আঞ্জমনের প্রতি জনগণের সমর্থন আছে, এই মর্মে মত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র বিলি করার এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২]

আঞ্জমন ইসলামীর জন্মের ২৩ দিন পরে 'সোম প্রকাশে' (২৯ মে, ১৮৫৫) 'মুসলমানের সভা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়—"নগরবাসি সম্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত রক্ষণার্থে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইংরাজী পত্রে পাঠ করিয়া যে প্রকার

১. দূরবীন (ফার্সি সাপ্তাহিক) ৯ ও ৭ মে, ১৮৫৫, পৃষ্ঠা ৩
কাজী আবদুল বারি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা সদর আদালতে ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত কাজী পদে রত ছিলেন। মোহাম্মদ মজহার মুসলমান আইন-অভিজ্ঞ ছিলেন। মোহাম্মদ ওয়াজিহ ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান আরবী অধ্যাপক। মোহাম্মদ আবদুর রউফ ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনা বিভাগের 'প্রধান অনুবাদক' ছিলেন। আহমদ (পরবর্তী নাম দেলওয়ার হোসেন আহমদ) হুগলীর অধিবাসী ছিলেন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট (১৮৬১)। গোলাম ইয়াহিয়া বীরভূমের প্রধান সদর আমীন (১৮৪৩-৫৫) ছিলেন।
Selections from the Records of the Govt. of India, Home Dept., Calcutta 1886, pp. 23, 49, 75

২. দূরবীন

সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরাজ ও বাঙালির মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের উপকার হইতেছে ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সদ্ভাবের ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মণ্ডলীর মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে; কিন্তু কি পরিতাপ। যবন জাতির মধ্যে একাল পর্যন্ত কোন প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তাঁহাদিগের কার্যবিষয়ে যবন-জাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষবাসি যবনগণকে অসভ্য বলেন। --এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহা-দিগের মঙ্গলোদ্দেশে কোন প্রকার সভা না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম; অধুনা নগরবাসি সদ্বংশ ও সাধিষ্ঠান যবনেরা আমাদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন। এইক্ষণে আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীনা সভা চিরস্থায়ী হউক এবং নগরীর ও অন্যান্য স্থানের যবনগণে তাহার প্রতি বিহিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানপূর্বক স্বজাতির সম্মান বৃদ্ধি করুন।"[১] 'সোমপ্রকাশে' উল্লিখিত 'মুসলমানদের সভা' যে 'আঞ্জমন ইসলামী' তাতে সন্দেহ নেই। 'নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরী'তে (১৮৫৬) 'আঞ্জমনে ইসলামী'র উল্লেখ আছে।[২] সে-যুগে সভা-সমিতির উপযোগিতা কি ছিল, তা 'সোমপ্রকাশ' 'যবনদের' এক প্রকার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের একরূপ সমিতির আবির্ভাবে পত্রিকাটি উল্লাস প্রকাশ করেছেন এবং সমিতিকে উৎসাহ দিয়েছেন। ১৮৫৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-শন' (১৮৫১) এক প্রস্তাবে আঞ্জমন ইসলামী বা মহামেডান এসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে আঞ্জমনের সহযোগিতা লাভ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[৩]

১৮৫৩ সাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদ লাভের বছর। কলিকাতার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ১৮৫৩ সালে এক সভার প্রস্তাবের মাধ্যমে আইন ও শাসন সংক্রান্ত দাবী-দাওয়ার একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদান করেন। ঐ আবেদনপত্রে ভারতবর্ষের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'বিধান পরিষদ'

---

১. বিনয় ঘোষ---সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ: ৭৭৫

২. *New Calcutta Directory*, 1856. pp. 78-79

৩ Bimanbihari Majumdar---*Indian Political Association and **Reform** of Legislature (1818-1912)* Firma, K. L. Mukhapadhay, Calculta 1956 p, 221.

গঠনের প্রস্তাব ছিল : পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবে বলে দাবী করা হয়। স্যার হ্যালিডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য আছে, সুতরাং উপযুক্ত ভারতীয় নেতা থাকলেও কোন একজন ব্যক্তিকে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত করা কঠিন হবে। লর্ড এলেনবরা হ্যালিডের মত সমর্থন করেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের দুটি পৃথক পরামর্শ-সমিতি গঠন করার প্রস্তাব দেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'কে ভারতের মুসলমানরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করতেন না; তাঁরা হ্যালিডের মতের পোষকতা করে নিজেদের উপযোগী 'মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কলিকাতার 'মহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপনের প্রকৃত পটভূমি ছিল এটাই।[১] সুতরাং আঞ্জমন ইসলামী প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, যদিও উদ্যোক্তারা একে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করেছেন।[২]

'আঞ্জমন ইসলামী' সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল বলে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মত আঞ্জমন ইসলামীও 'সিপাহী বিদ্রোহ' সমর্থন করেনি, বরং উভয় প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথক সভা করে এর নিন্দা করে। সিপাহী বিদ্রোহ দমন কার্য শেষ হলে 'আঞ্জমন ইসলামী' ১৮৫৮ সালের ১৪ই নভেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়াকে 'অভিনন্দনবাণী' প্রেরণ করে।[৩] সরকারের আনুগত্য লাভ এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আঞ্জমনের কর্মসূচীতেও এর স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "No measures should on any occasion be adopted that might in any measure appear inimical to British Government."[৪] নব্যশিক্ষিত হিন্দুগণ চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চ সরকারীপদে দেশীয়দের নিয়োগের জন্য আন্দোলন করছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৮৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল এবং রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে ১৮৫৩ সালে ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় মিলিত হন। মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিলেন। এ আন্দোলন তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে তারা এসব সভায় যোগদান করেননি, বরং পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮ পৃ. ৩৩১-৩৭

২. দূরবীন, ২২ মে ১৮৫৫

৩. *Indian Political Associations and Reform of Legislature*, p. 221.

৪. সুরেশচন্দ্র [illegible]—উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি, অন্বেষণ, আশ্বিন ১৩৭২

আঞ্জুমনের সংগঠনসূচীতে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "It percludes all idea of any union with Hindoo Association, which altogether repudiates the principal."[১] এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহই একমাত্র ভরসা ছিল। হিন্দুদের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী কোন আন্দোলনে যোগদান করা তাঁদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'আঞ্জুমন ইসলামী'র কয়েকটি শাখা ছিল, কলিকাতার লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৩) স্থাপনের আগেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে, মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আবদুল লতিফ আঞ্জুমনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মহম্মদ ওয়াজিদ, কাজী আবদুল বারি, মোহাম্মদ আবদুর রউফ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্যভুক্ত হন।

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৩)

১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফের ১৬ তালতলা লেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলিকাতার 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'এ ব্রিফ হিস্টরি অব দি মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি অব ক্যালকাটা' নামক একখানি অনুষ্ঠানপত্র থেকে জানা যায়, ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলগিন সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবদুল লতিফকে উৎসাহিত করেছিলেন। 'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ' (১৮৮৫) নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আবদুল লতিফ সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "Being fully aware of the prejudice and exclussiveness of the Mahomedan Community and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo Society, I founded the Mahomedan Literary Society in April, 1863."[২]

---

১. সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয়—উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি, অনুষ্টুপ, আশ্বিন ১৩৭২

২. Nawab Abdool Luteef Khan Bahadur—*A Short Account of My Public Life*, Calcutta, 1885 (Reprinted in *Nawab Bahadur Abdul Latif: His writings and Related Documents* by Enamul Haque, Samudra Prakashani, Dacca, 1968, pp. 167-68.

উদ্বোধনী সভার সভাপতি ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগের প্রধান মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজিহ। আবদুল লতিফ কলিকাতার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের কাছে এ ধরনের সভা-সমিতির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে একটি ফারসী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতের ব্যবস্থাপক বিভাগের অনুবাদক মোহাম্মদ আবদুর রউফ, তাঁর সহকারী আবদুল হাকিম এবং সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াজিহ ঐ একই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওয়াহাবী মতবাদের কতকগুলি বিধিনীতি অস্বীকার করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন মাদ্রাসার একজন ছাত্র। প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজিহ রচনা করেছিলেন। কাজী আবদুল বারি এবং মৌলবী হাফিজ আজিম আহমদ (ধর্মনেতা) প্রথম থেকেই সোসাইটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[১]

'সোসাইটি'র প্রথম বার্ষিক সভা হয় ১৮৬৪ সালের ১০শে মে। সভায় সোসাইটির গঠনতন্ত্র তৈরি হয়। নিম্নরূপ একটি 'কার্যনির্বাহক কমিটি' গঠিত হয়:

পৃষ্ঠপোষক	—	স্যার সিসিল বিডন (ছোটলাট, ১৮৬৭-৭১)
সভাপতি	—	মোহাম্মদ ওয়াজিহ
সহ-সভাপতি	—	কাজী আবদুল বারি ও হাফিজ আজিম আহমদ
সম্পাদক	—	আবদুল লতিফ।[২]

মাসিক সভা: সোসাইটির মাসিক সভার নিয়ম ছিল। প্রথম এক বছরের উল্লেখযোগ্য সভা ছিল দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ সভা। ১৩ই মে তারিখের দ্বিতীয় সভায় ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং সংবাদপত্রের উপর প্রবন্ধ পড়া হয় ও আলোচনা হয়। ৭ আগস্ট তারিখের পঞ্চম সভায় টেলিগ্রাফ বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল এফ জি. তীসে 'ইলেকট্রিসিটি' ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফে'র উপর ইংরাজীতে প্রবন্ধ পড়েন। আবদুল লতিফ তার উর্দু তর্জমা করেন। ৬ অক্টোবর তারিখের ষষ্ঠ সভায় আলীগড়ের বিখ্যাত নেতা সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষে 'স্বদেশ প্রীতি ও জ্ঞানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৬ই মে তারিখের দশম সভায় ডক্টর কানাইলাল দে (রায় বাহাদুর) 'দহনক্রিয়া'র উপর বক্তৃতা করেন। পরের বছরগুলিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দান অথবা প্রবন্ধ পাঠ করেন জে, গিব,

১. *A Quarter of the Mahomedan Literary Society of Calcutta* (A Resume of its works from 1863 to 1889) ; *Nawab Bahadur Abdul Latif : His writings and Related Documents*, pp 140-55.

২. ঐ, পৃ: ১৪৪-৪৫

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড ই. লাফোঁ, ডক্টর এইচ. ডব্লিউ. ম্যাককান, ডক্টর সি. এইচ. উড, ডক্টর এ. এফ. আর. হোর্নলে, এইচ. উডরো, ডক্টর জে. এ. পি. কোলস, রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ডল, মহেন্দ্রলাল সরকার, তারাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ। শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য আবদুল লতিফ এগুলির উর্দু তরজমা করতেন।[১]

বার্ষিক মেলা : তৃতীয় বছরে সোসাইটি একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও ভাববিনিময়ের জন্য 'বার্ষিক মেলা'র আয়োজন করে। ১৮৬৫ সালের ১৩ মার্চ তারিখে কলিকাতার টাউন হলে প্রথম বার্ষিক মেলা হয়। ছোটলাটসহ হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি মেলায় যোগদান করেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিল্প দ্রব্য ঐসব মেলায় দেখান হত এবং সেগুলির ব্যবহার-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বুঝান হত। ১৮৬৭ সালের ২ মার্চ তারিখের ঐরূপ বার্ষিক মেলায় ভারতের বড়লাট স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯) উপস্থিত হয়ে সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্পাদক আবদুল লতিফকে এক সেট 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ও একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। ঐসময় স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলীর (ছোটলাটের সচিব) প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে (২১শে এপ্রিল ১৮৬৭) বলা হয়, "By founding the Mahomedan Literary Society ... you have successfully led the Mahomedans, not only of Bengal, but of India generally to look beyond the narrow bounds of their own system and to explore those accumulated treasures of thought and feeling which are to be found embodied in the English language ... you have materially promoted a good understaning between this class of the community and their rulers and fellow subjects."[২] মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির উদ্যোগে পরবর্তী বছরগুলিতে নিয়মিত বার্ষিক মেলা হয়েছে; ডিউক অব এডিনবার্গ, লর্ড মেয়ো থেকে শুরু করে সিয়ামের রাজা ও রাজকন্যা, হোলকার, ইনদোর, জয়পুর, পাতিয়ালা, উলওয়ার, পুন্নাহ ও কুচবিহারের মহারাজা ও ভূপালের বেগম সাহেবা সেগুলিতে যোগদান করেন।[৩] সোসাইটির উদ্যোক্তাগণ এরূপ মেলার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের

১. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His writtings and Related Documents*, p. 148
২. *Op. Cit.*, p 170
৩. *Ibid.*, p 149

লোকের মনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল, শিক্ষার আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সংবর্ধনা সভা : ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য আছে এটি প্রমাণ করার জন্য সোসাইটি ভারতের বড়লাটের ও বাংলার ছোটলাটের কর্মভার গ্রহণ ও দায়িত্বভার ত্যাগের সময় সংবর্ধনা সভাও এবং বিদায় সভার আয়োজন করত। ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয় বড়লাট লর্ড মেয়োকে (১৮৬৯--৭২)। অনুরূপভাবে আর্ল অব নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬), আর্ল অব লিটন (১৮৭৬-৮০), মার্কুইস অব রিপন (১৮৮০--৮৪), মার্কুইস অব ডাফরিন (১৮৮৪--৮৮) এবং মার্কুইস অব ল্যাণ্ডসডোন (১৮৮৮-৯৪) সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২৫ বছরের ব্যবধানে সোসাইটি ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে (১৮৬৭-৭১) জর্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১-৭৪), রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭), এ্যাসলে ইডেন (১৮৭৭-৮২), রিভার্স থমসন (১৮৮২-৮৭) এবং স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলীকেও (১৮৮৭-৯০) সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কর্মত্যাগ কালে তাঁরা যখন চলে যান তখন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিদায়-অভিনন্দন জানান হয়। ১৮৭৭ সালে ইংলণ্ডের রানী 'ভারতেশ্বরী' উপাধি লাভ করলে সোসাইটি দিল্লীতে অভিনন্দনবাণীসহ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ১৮৭২ সালে ওয়েলসের রাজকুমার রোগমুক্ত হলে সোসাইটি 'শুকরিয়া' সভার আয়োজন করে। ১৮৭৫ সালে কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে ওয়েলসের রাজকুমার ও কনটের ডিউককে অভ্যর্থনা জানান হয়। আবদুল্লাহর হাতে কলিকাতার বিচারপতি জে. পি. নরম্যান (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭১) এবং শের খানের হাতে বড়লাট লর্ড মেয়ো (৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২) নিহত হলে সোসাইটি শোকসভার আয়োজন করে এবং ঐরূপ হত্যাকাণ্ডের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে।[১] সংবর্ধনা সভাগুলিতে যে সমস্ত মানপত্র পাঠ করা হত, সেগুলিতে মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া থাকত। এসব কারণে অনেক শাসক শ্রেণীর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সোসাইটি সক্ষম হয়।

বিশেষ ধর্ম সভা : ইংরাজ সরকারের সন্দেহ ভ্রান্তি ও অবিশ্বাস দূর করে তাঁদের কাছ থেকে আনুগত্য ও সহানুভূতি পাবার জন্য 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮-৫০

তারিখে সোসাইটির উদ্যোগে একটি সভা হয়। জৌনপুরের বিখ্যাত মৌলবী কেরামত আলী সভায় বক্তৃতা দিতে আহূত হন। তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে, খ্রীস্টানধর্মাবলম্বী ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকলেও ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' (শত্রুভূমি) নয়, 'দারুল ইসলাম' (শান্তি বা মিত্রভূমি)। সুতরাং শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ ধর্মনির্দেশের পরিপন্থী। তিনি মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সভায় একই মতের সমর্থন করে মৌলবী ফজলি আলী ফারসীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; আরব থেকে আগত শেখ আহমদ ইফেন্দি আনসারী, সভাপতি কাজী আবদুল বারি, আবদুল লতিফ, আবদুল হাকিম, আবদুর রউফ প্রমুখ বক্তাও বিভিন্ন যুক্তি সহকারে কেরামত আলীর মতের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।[১] ধর্মনীতিতে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা সংগত কিনা এ নিয়ে সারা ভারতে মুসলমান সমাজে দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ওয়াহাবীরা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। 'দারুল হরবে'র কথা তাঁরাই প্রচার করেন। উন্নত ও শক্তিশালী ইংরাজদের বিরুদ্ধে দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণের সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ আত্মঘাতী ও ধ্বংসমুখী। আবদুল লতিফ ও তাঁর সহকর্মীরা এটা অনুধাবন করে ঐরূপ একটি মীমাংসা-বাণী কামনা করেছিলেন। আবদুল লতিফ কেরামত আলীর বক্তৃতাসহ সভার পুরো ধারাবিবরণীর পাঁচ হাজার কপি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এমন কি, মক্কায় পাঠিয়ে মুফতির কাছ থেকে সমর্থন সূচক ফতোয়া আনা হয়েছিল।[২] সোসাইটির এই প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়, "Thus the Mahomedan Literary Society were able to remove such misconception from the minds of the Ruling Authorities, as well as restore confidence among their own community in the good faith of the Government. It may here be added that the Society succeeded to a great extent in disabusing the minds of their co-religionists of many false notions, which were unfavourable to their material improvement; and that while the Society advocated the cause of English education, never did they encourage the

১. *Abstract of Proceedings of Mahomedan Society of Calcutta at a Meeting held on Wednesday 23 November 1870* (Lecture by Moulvi Keramat Ali), Calcutta, 1871.

২. *Muslim Community in Bengal*, p. 172.

adoption by their co-religionists of customs and habits inconsistent with the principles of Islam."[১]

মৌলবী কেরামত আলীর বক্তৃতার যে বিবরণী ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়, তাতে ঐ সময়ে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের একটি তালিকা সংযুক্ত হয়। তালিকাটি এরূপ :

পৃষ্ঠপোষক—স্যার উইলিয়াম গ্রে (ছোটলাট)
সভাপতি—কাজী আবদুল বারি
সহ-সভাপতি—আব্বাস আলী খান
সম্পাদক—আবদুল লতিফ
সদস্যবৃন্দ—প্রিন্স মোহাম্মদ রহিমুদ্দীন (মহীশূর পরিবার), শেখ এসাউদ্দিন কার্তাগ, মির্জা আহমদ বেগ, মোহাম্মদ কাসিম আলী খান, [illegible] আবদুর রউফ, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মর্তুজা [illegible], ডাক্তার মীর আশরাফ আলী, সৈয়দ আউলিয়া আহমদ ও মীর লতাফত হোসেন।[২]

শিক্ষাসূচী : শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রেও মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৮৬৯ সালে স্যার উইলিয়ম গ্রে কলিকাতা মাদ্রাসার পশ্চাৎমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে একে কিভাবে পুনর্গঠিত করা যায় সে-সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। সি. এইচ. ক্যাম্বেল (প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার), জে. সাটক্লিফ (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ) ও আবদুল লতিফ ঐ কমিটিতে ছিলেন। সোসাইটি একটি সাধারণ সভায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কমিশনকে প্রদান করে। সোসাইটির অধিকাংশ সুপারিশ কমিশন গ্রহণ করেন।[৩] ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনের কাছেও সোসাইটি বক্তব্য পেশ করেছিল। মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে এরূপ আশঙ্কার কথা জানিয়ে সোসাইটি জনশিক্ষা পরিষদের গৃহীত নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা করে। ধর্মীয় শিক্ষা ও দান কার্যের জন্য প্রদত্ত যেসব ওয়াকফ সম্পত্তি আছে, সেগুলি

---

১. *Abstract of Proceedings of the Mahomedan Literary Society of Calcutta* at a meeting held on Wednesday, the 23rd November, 1870 (Lecture by Moulvi Keramat Ali), Calcutta 1871, pp. 151-152.

২. *Ibid.*

৩. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His writings and Related Documents*, p. 152

যাতে দাতাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা ও সৎকার্যে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে সোসাইটি সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করে।[1] উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য সোসাইটি কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করে। ১৮৮৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। তাঁর স্মৃতিকে ধারণ করে রাখার জন্য ২০৲ টাকা করে দুটি বার্ষিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া, সোসাইটি ও সোসাইটির ১১জন সদস্যের প্রদেয় চাঁদার টাকায় (প্রায় ১৭,০০০৲ টাকা) আরও কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার ঘোষিত হয়।[2] ঐ সময় লর্ড রিপনকে দেওয়া এক সম্মানপত্রে আমীর আলীর নেতৃত্বে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের' মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী প্রস্তাবের নিন্দা করা হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার সপক্ষে সুপারিশ জানান হয়।[3]

ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন : শিক্ষার মত সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেও সোসাইটি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। স্বসমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সোসাইটি হয় সরকারের কাছে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছে, অথবা সরকারের অভিপ্রায় অনুক্রমে তার কাছে আপন মতামত ব্যক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রস্তাবিত মোহামেডান 'ল অব টেস্টামেন্টারি এণ্ড ইনটেস্টেট সাকসেশন' বিষয়ক বিল সম্পর্কে সোসাইটি সরকারের কাছে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। মুসলমান বিবাহে যে 'কাবিননামা' রীতি আছে তাতে সরকার 'টিকিট-কর' আরোপ করলে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি এর বিপক্ষে আপত্তি জানিয়ে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে; সরকার তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।[4]

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির গৌরবময় ইতিহাসের প্রথম পঁচিশ বছরের ফল হল শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক এসব কর্মসূচী। ১৮৮৯ সালে সোসাইটির সম্প্রসারিত কার্যনির্বাহক কমিটির গঠনটি ছিল নিম্নরূপ :

পৃষ্ঠপোষক—স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলি (ছোটলাট)

সভাপতি—প্রিন্স মোহাম্মদ রহিমুদ্দীন (মহীশূর পরিবার)

সহ-সভাপতি—প্রিন্স মির্জা জাহান কদর বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার) ও প্রিন্স মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার (মহীশূর পরিবার)।

১. *op. cit.*, p. 153
২. *Ibid.*, p. 152
৩. *Report of the India Education Commission* 1883, p. 307
৪. *op. cit.*, pp. 152-53

সম্পাদক—নবাব আবদুল লতিফ

সদস্যবৃন্দ—প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ (অযোধ্যা পরিবার), প্রিন্স মির্জা মোহাম্মদ জাহ আলী বাহাদুর (ঐ), আব্দুল জব্বার, খান বাহাদুর, প্রিন্স মোহাম্মদ ফরখুন্দ শাহ (মহীশূর পরিবার), প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ (ঐ), হাজি সৈয়দ সাদিক ইস্পাহানি, মির্জা মোহাম্মদ বাকর শিরাজী, নবাব আহমদ হাসান খান, মোহাম্মদ আবদুর রউফ, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, আবদুল গণি, কাসিম আরিফ, ফজলুল হক, হাফিজ মোহাম্মদ হাতিম, মীর লতাফত হোসেন, কলিমুর রহমান, আলী বক্স, মোহাম্মদ নুরুল আলম।[১]

১৮৮৫ সালের 'মেমোন বিল', ১৮৯১ সালের 'সহবাস-সম্মতি বিল' ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি মুসলমান আইনের দিক থেকে নিজ মতামত সরকারকে জ্ঞাপন করে।[২]

১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যু হলে পর মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির কর্মোৎসাহে ভাটা পড়ে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার এ. এফ. এম. আবদুর রহমান সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। পিতার মত কর্মদক্ষতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি পুত্রের ছিল না। তিনি সোসাইটির পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। পূর্ব রীতির অনুসরণে রাজন্যবর্গের আগমন ও বিদায় উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক সভা করার মধ্যে সোসাইটির কর্মসূচী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৮৯৫ সালে ছোটলাট চার্লস এলিয়টকে (১৮৯০—৯৫) বিদায়, আর্ল অব এলগিনকে ১৮৯৪ সালে অভ্যর্থনা ও ১৮৯৮ সালে বিদায় উপলক্ষে সভার আয়োজন হয়। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জনকে ও ১৯০৫ সালে লর্ড মিন্টোকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। লর্ড কার্জন ঐ সভায় বলেছিলেন, "It will be the utmost pleasure and with profound respect that I shall receive from you during my tenure of office any representation that you may care to address to me, and I confidently rely upon such communications to assist me in the task of Government, as well as to broaden both my acquintancy and my sympathics with the Mahomedans of the Eastern World."[৩]

---

১. *op. cit.*, p. 139

২. *The Moslem Chronicle*, 22 May 1897

৩. *A Brief History of Mahomedan Literary Society of Calcutta*, 1922.

এর সঙ্গে বার্ষিক মেলাও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। ১৯০১ সালে জনশিক্ষার পরিচালক স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার (১৮৯৯-১৯০৩) মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি যে ছয়জন সদস্যের মতামত জানতে চান তাঁদের মধ্যে নবাব আবদুর রহমান ছিলেন একজন।[১] তিনি মাদ্রাসা পাঠ্যসূচী সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে রায় দেন।[২]

১৯০০ সালে সোসাইটির 'কার্যনির্বাহক কমিটি' ছিল এরূপ:

পৃষ্ঠপোষক—স্যার জন উডবার্ন (ছোটলাট)

সভাপতি—আবদুল জব্বার, খান বাহাদুর, সি. আই. ই.

সহ-সভাপতি- প্রিন্স কমর কাদের মির্জা আবেদ আলী বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার), নবাব কাদের সৈয়দ হোসেন আলী মির্জা বাহাদুর (নিজাম পরিবার), নবাব সৈয়দ মহম্মদ শুজাউল মূলক আশিফউদ্দৌলা জয়নুল আবেদিন, খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ (ঐ), আবদুল হাই শামসুল উলমা, জুলফিকার আলী শামসুল উলমা, সৈয়দ মোহাম্মদ খান বাহাদুর, সাহেবজাদা আহমদ হোসেন খান (মহীশূর পরিবার)।

সম্পাদক—এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, খান বাহাদুর

সহকারী-সম্পাদক—আহমদ, শামসুল উলমা ও মীর্জা আশরাফ আলী, শামসুল উলমা।

সদস্যবৃন্দ—প্রিন্স মীর্জা করবাতুল আইন বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার), প্রিন্স মীর্জা মোহাম্মদ নকিম বাহাদুর (ঐ), সাহেবজাদা মোহাম্মদ ফরিদুন শাহ (মহীশূর পরিবার), সাহেবজাদা ওয়ালি মোহাম্মদ শাহ (ঐ), শামসুল উলেমা আতাওর রহমান, শামসুল উলেমা বেলায়েত হোসেন, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (বরিশাল), খান বাহাদুর খোন্দকার ফজলে রাব্বি (মুর্শিদাবাদ), খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরী (ত্রিপুরা), আগা মীর্জা মোহাম্মদ বাকের শিরাজী, আগা সৈয়দ হোসেন শুস্তারি, আগা

১. অন্যান্য ব্যক্তি ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমজাদ আলী, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আমীর হোসেন, ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট আবদুল মুনিম, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ করিম আগা।
Muslim Community in Bengal, pp. 36-39.

২. *The Moslem Chronicle*, 12 January 1901.

হাজী আলী মোহাম্মদ জাফর, হাজী শেখ মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, হাজী আহম্মদ ইব্রাহিম, সৈয়দ মেহদী হাসান খান ওরফে বাদশাহ (বোহরা), শেখ মোহাম্মদ আলী, গোলাম হোসেন আরিফ, চৌধুরী মোহাম্মদ এরশাদ আলী খান (রাজশাহী), জিল্লুর রহমান (তালিবপুর), আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুস সোবহান (বীরভূম), আবুল ফাত্তাহ মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ (চাপরা), আবু মঈন মোহাম্মদ আজুদ্দীন (শাহবাজপুর), এ. কে. ফজলুল হক, এম-এ, বি-এল, মাহমুদ বিএ, বি-এল, কাজী আবদুল বারি, কাজী হাফিজ মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, ইকরাম আলী খান, আবদুল্লাহ, ডাক্তার মীর্জা মোহাম্মদ মাসুম ও এ. কিউ. এম. নূরুল আলম (ফরিদপুর)।[১]

১৯২২ সালে সোসাইটির ইতিহাস সম্পর্কিত একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে সোসাইটির পতনশীল অবস্থার কথা বলা হয়েছে।[২] ১৯২৩ সালের সংশোধিত সমিতি-তালিকায় দেখা যায়, ঐ সময় সোসাইটির সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪২ জন। নবাব আবদুল লতিফের অপর পুত্র ব্যারিস্টার এ. এফ. এম. আবদুল আলী ছিলেন সম্পাদক। আবুল কাসিম এম. এল. এ. সভাপতি ও এ. কে. ফজলুল হক সহ-সভাপতি ছিলেন। ঐ নথিতে বলা হয় যে, সোসাইটি যদিও কাজ করছে না, তথাপি এটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।[৩]

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মসূচী, কার্যনির্বাহক কমিটি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা থেকে আমরা নিম্নরূপ মন্তব্যগুলি করতে পারি:

(ক) সোসাইটি পুরোপুরি শিক্ষা ও সমাজমূলক প্রতিষ্ঠান। ওয়াহাবীদের বিরোধিতা করা ও ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করার পেছনে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক মনোভাব কাজ করেছে।

(খ) পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী ভাষা, ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির যে মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে সোসাইটির জন্ম হয়েছিল, তা অনেকাংশে সফল হয়েছে।

---

১. *Abstract of the Proceedings of an Extra-ordinary Meeting of the Committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta*, 9th June, 1930, p. 1.

২. *A Brief History of the Mahomedan Literary Society of Calcutta*, 1922.

৩. *Revision of the List of Associations recognized by the Government*, 1923, p. 5.

(গ) সোসাইটি অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থকেই বরাবর প্রাধান্য দিয়েছে; সেখানে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের কথা তেমন গুরুত্ব পায়নি।

(ঘ) সোসাইটি ইংরাজীর সাথে ফারসী ও উর্দু ভাষার চর্চা করেছে; বাংলা ভাষার চর্চা তো দূরের কথা, উল্টো ঐ ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। এটি সোসাইটির চরম অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

(ঙ) শাসক শ্রেণীর আনুগত্য লাভের জন্য সোসাইটি তোষণনীতি গ্রহণ করেছে। বিনিময়ে স্বসমাজের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে।[১] স্বাধীনতা স্পৃহা একেবারেই প্রকাশ পায়নি; সাম্রাজ্য-বাদী শাসনকে শুধু মেনেই নেয়নি, তাকে মদদও যোগিয়েছে। সোসাইটির ইংরাজী নামকরণ ইংরাজ-প্রীতিরই লক্ষণাক্রান্ত।

(চ) মুসলমান সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থেকে কতকগুলি সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান দিয়েছে এবং সে-সূত্রে অংশতঃ মুসলমানদের জাগ্রত ও একত্র করতে সমর্থ হয়েছে।

(ছ) ধর্মশিক্ষার সাথে আধুনিক অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রচার করেছে। অবশ্য আরবী-ফারসীর মাধ্যমে ধর্ম ও প্রাচ্যবিদ্যার সাথে ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় সাধন করতে পারেনি।[২]

(জ) সাধারণভাবে স্বজাতির স্বার্থের কথা ভাবলেও 'জাতীয়তা' সম্পর্কে সোসাইটির কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তবে ভারতীয় মুসলমান জাতীয়তার অস্ফুট অভিব্যক্তি ছিল।

(ঝ) মুর্শিদাবাদ, অযোধ্যা, মহীশুর প্রভৃতি রাজবংশের বৃত্তিভোগী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সন্তানগণ সোসাইটির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁরা সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা পুরাতন মূল্যবোধ

---

১. "লিটারারী সোসাইটি চেয়েছিলেন ইংরেজদের পক্ষপুটে থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে।" বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস, পৃঃ ৮৮

২. সৈয়দ আহমদ এরূপ সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা গবেষণা কর্মের মাধ্যমে তিনি ইউরোপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক।

নিয়ে চলতেন, নতুন যুগের প্রাণস্পন্দন তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। এই পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব দ্বারা সোসাইটি প্রভাবিত হয়েছে।

(ঞ) সোসাইটির কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ কলিকাতা শহরের উপর তলার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে শহরের ও মফস্বলের অনুরূপ কোন কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে অনুপ্রাণিত করেছে।[১]

(ট) শাসক শ্রেণীর ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক অবিশ্বাস দূর করে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সোসাইটি সেতুবন্ধের কাজ করেছে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই সোসাইটির বড় সাফল্য।

(ঠ) প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকায় নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কোন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বোধিত করতে পারেনি। বরং সামন্তবাদী মনোভাব নিয়ে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উপেক্ষাই করেছে। সোসাইটির পতনের এটিই অন্যতম কারণ।[২]

(ড) সোসাইটির সংগঠনশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। কোন 'মুখপত্র' বের করা, অনুবাদ করা বা বই পুস্তক প্রকাশ করার দিকে একেবারেই নজর দেয়নি। এমন কি, সভার ধারাবিবরণীগুলি সংগ্রথিত করার চেষ্টা করেনি। কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সোসাইটি গড়েনি। এটি সোসাইটির চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টির অভাবকেই সূচিত করে।

(ঢ) নামের সাথে মহামেডান শব্দ ধারণ করলেও সোসাইটিতে হিন্দু-খ্রীস্টান বিদ্বান ব্যক্তিও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। সমকালীন

১. সৈয়দ আহমদ আবদুল লতিফের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৬৩ সালে কলিকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে 'গাজীপুর সায়েন্টিফিক সোসাইটি' স্থাপন করেন। আবদুল লতিফ এর কার্যকরী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। কলিকাতা মাদ্রাসা লিটারেরী ক্লাব, মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি, কোহিনুর সাহিত্য সমিতি (ফরিদপুর), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ইত্যাদি সোসাইটির অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটিতে শিক্ষিত যুবকদের স্থান প্রথম দিকে তো ছিলই না, ১৯০০ সালেও এদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। এদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা আরও কম ছিল।

সভাসমিতিগুলিতে সচরাচর এরূপটি দেখা যেত না। এদিকে থেকে সোসাইটির একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

(ণ) ভাষাগত দূরত্ব ও ব্যবধান থাকায় এবং বাঙালীর স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় সোসাইটির ফল জাতির জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়নি।

(ত) স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব পোষণ না করলেও সেকালে অন্যদের স্বাতন্ত্র্য-কামী চেতনার প্রতিবাদ বা প্রতিকার সোসাইটি করেনি।

(থ) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ না থাকায় জাতির কাছে সোসাইটি সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনামা তৈরি করতে পারেনি।

(দ) সোসাইটি ইসলামপন্থী ছিল, এটিই তার মৌলিক পরিচয়। বলা যায়, স্মরণ করে রাখার মত এটিই তার ভাবমূর্তি।

মাদ্রাসা লিটারেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব (১৯৭৫)

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় 'কলিকাতা মাদ্রাসা লিটারেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ সালে। এটি ঐ মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান ছিল। সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানানুশীলন এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ক্লাব বিতর্ক-সভার আয়োজন করে সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যার উপর আলোচনা করত। 'দি মাদ্রাসা লিটারেরী বাজেট' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা 'ক্লাবের সদস্যগণের সম্পাদনা'য় প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা ১৮৭৫ সালের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার 'মিনার্ভা প্রেস' থেকে মহেন্দ্র নাথ সোম কর্তৃক এটি মুদ্রিত হয়।[১]

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৮)

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপনের পনের বছর পরে কলিকাতার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয় (১২ মে ১৮৭৮)। এটি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; তবে সমাজ ও শিক্ষা এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ ১৮৮৩ সালে এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে এতে বলা হয়, "The Association has been formed with the object of promoting, by all legitimate and constitutional means, the well-being of

১. *Bengal Library Catalogue.* 1st. Quarterly Report, 1877.

the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal adherence to the British Crown. Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims of the political regeneration of the Indian Mahomedans by a moral revival, and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims."[১]

মুসলমানদের অবস্থার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরার মতো প্রতিনিধিমূলক কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। এজন্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের স্বার্থ ঠিক মতো প্রতিফলিত হত না। ভারতের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। স্বসমাজের এই শূন্যতা ও অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যারিস্টার সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঐ বছর কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্বভার তিনি নিজ স্কন্ধেই তুলে নেন। পাটনার নবাব আমীর আলী সভাপতি ও সৈয়দ আমীর হোসেন সহ-সভাপতি হন। ১৮৮৩ সালে শাখা-এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়, তখন নামের আগে 'সেন্ট্রাল' শব্দ যুক্ত হয়।

গঠনতন্ত্র: ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই একটি সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক প্রতিবেদনে গঠনতন্ত্রের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২০টি মুখ্য ধারা ও ১৮টি উপধারার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা এরূপ:

মুখ্যধারা: এসোসিয়েশনের একজন সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক ও দুজন সহকারী সম্পাদক থাকবেন। (১)

২৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহক কমিটির উপর এসোসিয়েশনের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকবে; কমপক্ষে ৫ জনের উপস্থিতিতে সভার 'কোরাম' হবে। (৬)

---

১. *Rules and Objects of the Central National Mahomedan Assaciaton and its Branch Associations with the Quinqunnial and Annual Reports and List of Members.* Thomas S. Smith City Press, Calcutta, 1885, p. 11.

কার্যনির্বাহক কমিটি একজন অমুসলমানকে স্বাভাবিক নিয়মেই সাধারণ সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থজড়িত প্রশ্ন ছাড়া তিনি অন্যত্র সাধারণ সদস্যের মত ভোট দানের অধিকার পাবেন। (৮)

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের সকল আদান-প্রদান ইংরাজীর মাধ্যমে করবেন। (১৭)

যুগ্ম-সম্পাদক মাতৃভাষায় ঐরূপ আদান-প্রদান করবেন। (১৮)

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় ধারাবিবরণী ও হিসাব-পত্র দাখিল করবেন। জুলাই মাসে এরূপ সভা হবে। সভা কার্যনির্বাহক কমিটির ঐ ধারাবিবরণী ও হিসাবপত্র বৈধ বিবেচনায় অনুমোদন করবেন।

উপধারা : বিশেষভাবে মুসলমানের ও সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলের জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি যে-কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সহযোগিতা করতে পারবেন। (৭)

মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি মাঝে মাঝে বক্তৃতার আয়োজন করবেন, এতোদ্দেশ্যে সময় ও স্থান তাঁরা স্থির করবেন। (৮)

শাখা এসোসিয়েশনের সভাপতি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের অনারেরী সহ-সভাপতি হিসাবে গণ্য হবেন এবং কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁরা কার্যনির্বাহক কমিটির অথবা এসোসিয়েশনের সাধারণ অথবা বিশেষ যে-কোন সভায় ভোট দিতে পারবেন। (৯)

শাখা-এসোসিয়েশনগুলি স্থানীয় বিষয় ও নিজস্ব অর্থ-সমস্যা স্বাধীনভাবেই পরিচালনা করবেন। তবে মুসলমান জনসাধারণের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এবং সরকারের কাছে জাতীয় স্বার্থে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁদের ভাবধারার আদান-প্রদান করতে হবে এবং ঐ প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভাব্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের মাধ্যমেই করতে হবে। (১১)

শাখা এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হবেন।[১] (১৩)

---

১. *Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association and its Branch Associations with the Quinquinnial and Annual Reports and List of Members,* Thomas and Smith City Press. Calcutta, 1885, pp. IV-IX.

এসোসিয়েশনের শুরুতে (১৮৭৮) সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০ জন, পাঁচ-ছয় বছরের মাথায় তা ৭০০ জনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে যে সদস্যতালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, বাংলা, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং ইংলণ্ডের অধিবাসী এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। লণ্ডন ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতি ম্যানিং এর জীবন-সদস্য ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে বাংলায় বগুড়া, চট্টগ্রাম, হুগলী, জাহানাবাদ এবং বাংলার বাইরে ভাগলপুর, পাটনা, গয়া, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে শাখা খোলা হয়। তাছাড়া 'মীরাট সমিতি', 'অমৃতসর আঞ্জুমানে ইসলাম', '[illegible] সমিতি', 'বদাউন মহামেডান সোসাইটি', 'লক্ষ্ণৌ রিফর্ম এসোসিয়েশন', '[illegible] আঞ্জুমানে ইসলাম' কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের আদর্শে ও অনুকরণে স্থাপিত হয়। এগুলির সহিত কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিল।[১] ১৮৮৩-৮৪ সালে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিল এরূপ:

সভাপতি—প্রিন্স মোহাম্মদ ফারুক শাহ (মহীশূর পরিবার)

সহ-সভাপতি—নবাব মীর মোহাম্মদ আলী, জমিদার (বাদমর্দী, ফরিদপুর), সৈয়দ আমীর হোসেন, খান বাহাদুর (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) ও হাজী নূর মোহাম্মদ।

সম্পাদক—সৈয়দ আমীর আলী এমএ

যুগ্ম-সম্পাদক—কবিরুদ্দিন আহমদ, খান বাহাদুর

সহকারী সম্পাদক—সিরাজুল ইসলাম বিএ, বিএল ও ফখরুদ্দীন হায়দার।

সদস্যবৃন্দ—মোহাম্মদ ইউসুফ বিএ, দীন মোহাম্মদ, গোলাম সারওয়ার, অনুবাদক (কলিকাতা হাইকোর্ট), সৈয়দ মোজাফফর হোসেন (সায়েস্তাবাদ, বরিশাল), মির্জা মোহাম্মদ খলিল শিরাজী, আগা শেখ মোহাম্মদ জিলানী, জহিরুদ্দীন আহমদ ডাক্তার, হাজি আবদুল্লাহ্ দপ্তরমান, শাহ মীর লতাফত হোসেন, মোক্তার (কলিকাতা হাইকোর্ট), শালিগ্রাম সিংহ, কে. এম. চট্টোপাধ্যায়, হাকিম মোহাম্মদ সাজ্জাদ, আবদুস সালাম এমএ, আবদুল হাসান খান, আসরাফউদ্দীন আহমদ, মতওয়াল্লী (হুগলী ইমামবাড়া) ও আবুল খায়ের এমএ, অধ্যাপক (কলিকাতা মাদ্রাসা)।[২]

---

১. *Op. cit.*, pp. 3-4

২. *Ibid.*, pp. 14-15

কর্মসূচী : প্রথম পাঁচ বছরের কর্মসূচীকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা—সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য, আইন ও রাজনীতি।

সমাজ : এসোসিয়েশন শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে, কিন্তু অর্থাভাবে অল্পকালের মধ্যে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। শহরের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নভাব দূর করার জন্য সামাজিক মিলন-উৎসবের আয়োজন করে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানরা অযথা অপব্যয় করে। এসোসিয়েশন এ ব্যয়-সংকোচের অভিযান চালায় এবং শাখা-এসোসিয়েশনকে অনুরূপ কাজে উৎসাহিত করে। উপরিউক্ত বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবদুস সালাম বি-এ ঐরূপ প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পান।[১]

শিক্ষা ও সাহিত্য : স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের উন্নতির জন্য এসোসিয়েশন প্রচার চালায়। ১৮৮০ সাল থেকে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার দান করে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে আসছে। ফারসী কাব্যের উপর প্রবন্ধ লিখে [illegible] একটি স্বর্ণপদক পান। ১৮৮২ সালে ১৭ জানুয়ারী তারিখের পুরস্কার বিতরণী সভায় লর্ড রিপন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতির সম্মান স্বরূপ ঐ বছর থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য চারটি 'রিপন স্কলারশিপ' দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ছাত্রদের সাহায্য দানের জন্য ১৫,০০০৲ টাকার একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। নবাব খাজা আহসানুল্লাহ (জীবন সদস্য) ৩,০০০৲ টাকা, প্রিন্স মোহাম্মদ ফারুক শাহ (সভাপতি) ১,০০০৲ টাকা, হাজি নূর মোহাম্মদ (সহ-সভাপতি) ১,০০০৲ টাকা চাঁদা দিতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ঐ বৃত্তি দেওয়া হয়।[২] কলিকাতা মাদ্রাসাকে কলেজ স্তরে উন্নীত করার জন্য এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই চেষ্টা করে এসেছে। ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৪ সালের জুলাই মাসে মাদ্রাসার লিটারেরী ক্লাব এ বিষয়ে এসোসিয়েশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। [illegible] বাধা দেওয়ায় নারীশিক্ষার বিষয়টি প্রায় অচল অবস্থায় ছিল। এসোসিয়েশন একটি 'স্ট্যান্ডিং কমিটি' গঠন করে এবং প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের কাছে গ্রহণযোগ্য এর একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করে।[৩]

---

১. *Op. cit.*, pp. 5-6

২. *The Moslem Chronicle*, 21 March 1895.

৩. *Op. cit.*, pp. [illegible]

আইন : এসোসিয়েশন ১৮৭৭ সালের ১০ ধারা আইনের দোষত্রুটি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী 'কাজী বিল' সম্পর্কেও এসোসিয়েশন অভিমত জ্ঞাপন করে। মুসলমানদের একটি পুরাতন ও প্রয়োজনীয় এজেন্সির স্বপক্ষে উক্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন খসড়া বিলের প্রতিও এসোসিয়েশনের দৃষ্টি পড়ে। বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হবে না পূর্বের মত ঐচ্ছিক থাকবে এ নিয়ে মতভেদ ছিল। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের এই বিতর্কে এসোসিয়েশন একটি মধ্যপন্থার পরামর্শ দেয়। অ-রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহে কতকগুলি প্রতিবন্ধক-সূচক শর্ত আরোপের কথা বলা হয়। সরকার শেষ পর্যন্ত বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন বিলটি নাকচ করে দেন।[১]

রাজনীতি : এসোসিয়েশন বড়লাট লর্ড রিপনকে সংবর্ধনা ও ছোটলাট স্যার এ্যাসলি ইডেনকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। ১৮৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবর্ধনা কালে লর্ড রিপনকে এসোসিয়েশন ২৮টি অনুচ্ছেদের একটি দীর্ঘ 'স্মারকপত্র' প্রদান করে।[২] এটি মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্তীকালে সরকারের গৃহীত নীতিসমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

স্মারকপত্র : বস্তুত: এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আমীর আলীর সুচিন্তিত অনুধাবনের ফল ১৮৮২ সালের এই 'স্মারকপত্র'। তিনি যথার্থ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ছিলেন বলে যুগের স্পন্দনটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহিত্য, সভা-সমিতি, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, পত্র পত্রিকা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির সহায়তায় যে জাতীয়তাবাদ ও পুনর্জাগরণের জোয়ার এসেছে তিনি তার অন্তর্লীন মর্মস্থর উপলব্ধি করেছিলেন। স্বসমাজের মৃতপ্রায় অবস্থার প্রেক্ষাপটও তাঁর জানা ছিল। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর বর্তমান নমনীয় ও সহানুভূতিপূর্ণ নীতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। [illegible] পরিস্থিতিতে সমাজ-স্বার্থে হাল ও পাল কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারই পূর্ণ রূপ এই স্মারকপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষার পশ্চাদ-বর্তিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাসভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে প্রতিবন্ধক স্বরূপ এগুলির অবসান কামনা করেছেন এবং তৎসঙ্গে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করেছেন। একজন উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবী হিসাবে যে আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক

১. *Op. cit.*, p. 9

পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়নের আদর্শে এসোসিয়েশনের লক্ষ্য নিরূপিত করেছিলেন এই স্মারকপত্রে অনেক কিছুর সীমাবদ্ধতার মধ্যে সে ভাবটি স্পন্দিত হয়েছে। মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের অনুগত কিন্তু বর্তমান দুর্গতির জন্য তাদের ক্ষোভ আছে, ইংরাজ শাসকদের গৃহীত নীতির জন্য মুসলমানদের দুরবস্থা, সুতরাং তাদের অবস্থার উন্নতি শাসকশ্রেণীর সহানুভূতির দ্বারাই সম্ভব—স্মারকপত্রের এটাই মূল সুর। তিনি প্রধানতঃ শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ-সুবিধা চেয়েছেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। দারিদ্র্যহেতু ব্যয়বহুল ইংরাজী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য একাধারে মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, মুসলমান অঞ্চলে মুসলমান শিক্ষক ও ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেন, অন্যধারে মহসিন ফাণ্ডের ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির টাকা কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে—একরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, প্রশাসন-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ সর্বত্র মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। মুসলমান যোগ্যপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তার বঞ্চনার জন্য চাকরি পাচ্ছে না, এ অভিযোগ স্মারকপত্রে করা হয়। কেউ চাকরী পেলেও অনেক সময় তাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র হয়। কলিকাতা ও মফস্বলে সরকারী উচ্চ চাকরিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানের সংখ্যা কিরূপ ছিল তার একটা তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে, মুসলমান না জনসংখ্যার অনুপাতে না শিক্ষার অনুপাতে উচ্চ চাকরীতে স্থান পেয়েছে। ইংরাজী শিক্ষায় মুসলমানরা পশ্চাদ-পদ, সুতরাং প্রতিযোগিতায় তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। এক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের জন্য চাকরিতে নিয়োগ পদ্ধতির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না হলে অধিক পরিমাণ চাকরী পাওয়া সম্ভব হবে না। দেশের, খয়রাতি সম্পত্তিগুলির সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা করে সেগুলির অর্থ শিক্ষা খাতে নিয়োজিত করার জন্য একটি এবং মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপর একটি কমিশন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ ঐ স্মারকপত্রে করা হয়েছে। স্মারকপত্রে বিহারে নাগরীর পরিবর্তে আরবী লিপি রাখা এবং আদালতের ভাষারূপে উর্দু চালু রাখার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে। মুসলমানদের দুরবস্থা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিজনক নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থেরও পরিপন্থী হবে বলে উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে।[১]

১. *Memorial of the National Mahomedan Association*, Calcutta, February 1882 (Reprinted) in *Ameer Ali : His Life and Work*, edited by ...

কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের এই স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়নি, ভারত সরকার এর নকল প্রাদেশিক সরকার ও শিক্ষা-বিভাগ, সভা-সমিতি ও হান্টার কমিশনের কাছে পাঠান। এঁদের মতামতের ভিত্তিতে এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফরিনের এক শিক্ষা প্রস্তাবে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন : কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন অধিকাংশ ডেপুটেশন দিয়েছে বড়লাট ও ছোটলাটের কাছে তাঁদের আগমন ও বিদায়কালীন সংবর্ধনার সময়। ১৮৮৭ সালের ১২ নভেম্বর করাচীতে এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল লর্ড ডাফরিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার কথা ব্যক্ত করে। ১৮৮৮ সালের ২৪ মার্চ কলিকাতায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনায় তিনি স্বীকার করেন যে, ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানদের অসন্তোষজনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, তাঁদের দুরবস্থা দূর করার সংগ্রামে তাঁরা সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন সৈয়দ আমীর আলী।[১] ১৮৮৮ সালে ২২ ডিসেম্বর তারিখে নব নিযুক্ত বড়লাট ল্যান্সডোনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১২০ জনের এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রিন্স ফারুক শাহ। তিনি এক মানপত্রে ভারতীয় মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরেন। বড়লাট প্রত্যুত্তরে জানান যে, মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে সম্পদের ভাগ পাচ্ছে না; তিনি বলেন যে, সংঘশক্তির অভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে না পারার দরুন তারা সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[২]

সভা : কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের ১৮৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক ধারাবিবরণীতে সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০০। আগের বছর ৬০০ ছিল। ১৮৮৩ সালের পঞ্চম বার্ষিক ধারাবিবরণীতে চাঁদাদাতা সভ্যদের একটি তালিকাও পাওয়া যায়। ৩৬০ জন সদস্যের এই তালিকায় মুসলমান ছাড়া হিন্দু, খ্রীস্টান, পার্সী (মোট ২৯) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আছেন। বিত্ত ও বিদ্যার দিক থেকে শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, এতে প্রধানতঃ নবাব' রাজা, জমিদার শ্রেণীর সামন্তপতি

১. Ram Gopal—*Indian Muslims, A Political History (1858-1947)*, Asia Publishing House, Calcutta 1964 (Reprinted), pp. 80-81.

২. *Ibid*, p. 81.

আছেন এবং সরকারী কর্মচারী, আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আছেন। পেশার দিক থেকে নিম্নরূপ একটি তালিকা নির্ণয় করা যায়:[১]

অভিজাত শ্রেণী	সরকারী কর্মচারী	স্বাধীন পেশাজীবী	অন্যান্য	পেশা অজ্ঞাত
জমিদার ২৫ নবাব ৯ প্রিন্স ৯ রাজা ১	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ১৯ অনুবাদক, কেরাণী ১১ সব-রেজিস্ট্রার ১০ পুলিশ কর্মচারী ৮ মুন্সেফ-জজ-সাবজজ ১২ ডেপুটি কলেক্টর ৪ পেসকার ২ ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী-ম্যাজিস্ট্রেট ২ ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টর ১	উকিল ১৮ ব্যারিস্টার ৮ মোক্তার ৭ এটর্নি ৩ ডাক্তার ৬ হাকিম ২ স্কুল শিক্ষক ৫ অধ্যাপক ২	তালুকদার ১ দেওয়ান ২ মতওয়াল্লী ১ ব্যবসায়ী ১	১৭৩
৪৪	৭৭	৬১	৫	১৭৩

পুরাতন অভিজাত শ্রেণী (১২.৫%) অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (৮৭.৫%) সংখ্যা বেশী। কার্যনির্বাহক কমিটিতে এক প্রিন্স ফারুক শাহ ও জমিদার মীর মোহাম্মদ আলী ছাড়া অন্যরা মধ্যবিত্তের লোক। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির সাথে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের এখানেই একটা বড় রকম পার্থক্য ছিল। প্রফেসর এ. কে. নজমুল করিম এসোসিয়েশনকে উদীয়মান বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের 'মুখপত্র' বলে অভিহিত করেছেন।[২]

পরিণতি: ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের কর্মোদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করে সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তখন এসোসিয়েশনের সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। সৈয়দ আমীর আলী পর এসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন পাটনার সৈয়দ আমীর হোসেন (১৮৯৩)। দু-তিন বছরের মধ্যেই এসোসিয়েশনের সভ্যদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফলে এর পূর্বের মর্যাদা হ্রাস পায়। ১৮৯৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক সৈয়দ আমীর হোসেনকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র

১. *Muslim Community in Bengal*, pp. 225-26.
২. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, p. 300.

সংস্কারের প্রশ্নেও সভ্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।[১] 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' (১৮৯৬) অভিযোগ করে যে, সমাজের চোখে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন বিরক্তির কারণ হয়েছে, শহরের নেতৃবৃন্দ সভায় বড় একটা যোগদান করেন না।[২]

ঐ সময়ের দিকে সোসাইটি ও এসোসিয়েশন উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। 'মোসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয়—"......the only service of activity which has been characteristic of our Associations (i. e. MLS and CNMA) is to be seen in dancing attendance on Coming and retiring of Viceroys and Lieutenant Governors, and swallowing in silence bitter replies to unsolicited, unasked for fulsome addresses of welcome and farewell."[৩]

মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মধ্যে মতৈক্য অপেক্ষা মতবিরোধই বেশী ছিল। এর প্রধান কারণ আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। উভয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান উভয়ের কর্মস্থল কলিকাতা। আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ, আমীর আলী বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার। বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারা উভয়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েই তাঁদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। আবদুল লতিফ রক্ষণশীল সংস্কারক ছিলেন, আমীর আলী ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কারক। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার নিয়ে তাঁরা একমত হতে পারেননি। আবদুল লতিফ আরবী-ফারসী ভাষাসহ ধর্মশিক্ষা অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন, আমীর আলী ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সৈয়দ আমীর হোসেন মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমীর আলীর প্রস্তাবিত সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সুবিধার দাবি আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ যুক্তি-যুক্ত মনে করেননি। উইলফ্রেড স্কয়েন ব্লান্ট দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কথা বলেছেন: তাঁরা ভাষায়—"It is a pity they (i.e. Abdul Latif and Ameer Ali) hate each other so that they cannot join any common action."[৪]

---

১. *The Moslem Chronicle*, 26 December 1896.
২. *Ibid.*, 29 February 1896.
৩. *Ibid.*, 3 October 1896.
৪. *India under Ripon—A Private Diary*.

মীর মশাররফ হোসেন সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সাহিত্য-সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্মগত, আত্মগত, ব্যক্তি-গত, অব্যক্ত মনোমালিন্য' ছিল।[১] 'ইসলাম-প্রচারকে' সৈয়দ এমদাদ আলীও উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনৈক্যের কথা বলেছেন; সমাজের গভীরে এগুলির প্রভাব প্রসারিত হয়নি। তিনি লিখেছেন, "কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমাদের মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভা আছে, এই সভাসমূহের পাণ্ডারা নেতা, তাঁহারা যদি একযোগে হইয়া কার্য করেন, তবেই ত আমাদের নেতার অভাব পূরণ হয়। আমরা যেরূপ আদর্শ নেতার (সর্বজনমান্য নেতা) কথা বলিয়াছি, এ সমুদয় সমিতিতে কি তেমন কোন নেতা আছেন?"[২] তিনি যখন এই প্রবন্ধ লিখেন তখন মহা-মেডান লিটারেরী সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন আবদুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমীর হোসেন। উনিশ শতকের নব্বই দশকের দিকে প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল, ঐ দশকের কলিকাতা ও মফস্বলে স্থাপিত বিভিন্ন সভা-সমিতির অভিযোগের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষতঃ 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩) ও 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' (১৮৯৬) ঐগুলির লুপ্ত গৌরবের প্রশ্ন তুলে আপন আপন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে।

১৯২৩ সালের সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছিল। তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৭। এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর আবদুস সালাম।[৩]

কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের পূর্বাপর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের উপর সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করে নিম্নরূপ মন্তব্য করা যায়:

(ক) কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন মুখ্যতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তবে শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক সমস্যাও এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(খ) ইংরাজ-আনুগত্য ও রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ করে এসোসিয়েশন কোন রাজ-নৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেনি।

(গ) বাংলা ও ভারতের সকল শ্রেণী মানুষের, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের উন্নতির চিন্তা ও সাধনা এসোসিয়েশনের ব্রত ছিল।

---

১. মীর মশাররফ হোসেন—সৎপ্রসঙ্গ, কোহিনুর, ভাদ্র ১৩০৫

২. সৈয়দ এমদাদ আলী—বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব, ইসলাম-প্রচারক, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০

৩. *Revision of the List of Associations*, p. 4.

(ঘ) সংগঠনের দিক থেকে উদার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু স্বসমাজের স্বার্থের বাইরেও কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। সমাজ-গতভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও উন্নতি কামনা করলেও রাজ-নীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

(ঙ) এসোসিয়েশনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থকরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সাথেও সহযোগিতা করতে চেয়েছে (১৮৮৫), কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায়।

(চ) উদীয়মান প্রভাবশালী নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'মুখপত্র' হিসাবে এসোসিয়েশনের সংগঠনশক্তি ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশী ছিল।

(ছ) শাখা-এসোসিয়েশনের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও আদর্শাবলী সমাজের বিস্তৃত পটভূমিতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে এবং সেদিক থেকে সফল-কামও হয়েছে।

(জ) শাসকশ্রেণীর সাথে আপোষমূলকনীতি ও আবেদন-নিবেদনের মনো-ভাব বজায় থাকায় রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ হয়নি। এজন্য সমাজকে জাগাবার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(ঝ) 'জাতীয়তা'র প্রশ্নে এসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় চিন্তা থাকলেও পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। উর্দুভাষার সমর্থন দিয়েছে এবং ইসলামধর্ম ও মুসলমানদের অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করে মুসলিম-সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি কামনা করেছে। স্বয়ং আমীর আলী ঐরূপ সংস্কৃতির সাধনা করেছেন।

(ঞ) পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, কিংবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন নিজস্ব স্কুল গড়ে তুলতে পারেনি। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মত কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনেরও এখানে ব্যর্থতা।

শাখা এসোসিয়েশন ঃ এসোসিয়েশনের কর্মসূচীকে কলিকাতার বাইরে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শাখা-এসোসিয়েশনের পরিকল্পনা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজেদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা স্থান থেকে আবেদন তুলুক যে, তারা বঞ্চিত, দুর্গত ও অসন্তুষ্ট। নিজেদের অস্তিত্ব, অধিকার ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে সমাজের মানুষকে নিশ্চল, নিষ্কর্ম অবস্থা থেকে সক্রিয়, সরব ও জাগ্রত করে তুলতে পেরেছিল, এটাই এসোসিয়ে-শনের বড় সাফল্য। বাংলার ও বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে এসোসিয়েশনের

শাখা ছিল। ১৮৮৮ সাল অবধি ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে এর শাখা-সংখ্যা ছিল ৫২টি। রাম গোপালের মতে এগুলি হল: করাচী, শাহজাদপুর, শিকারপুর, লারকানা, সুক্কুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, হারদই, হিসার, গুজরাট, আম্বালা, লুধিয়ানা, বেরেলী, বদাউন, মোহন, এলাহাবাদ, আজমীর, লক্ষ্ণৌ, গাজীপুর, সুরাট, দিন্দিগল, বাঙ্গালোর, টুমকুর, ভিজাগাপত্তম, ভিজিয়ানাগ্রাম, সাসারাম, আররাহ, দিনাপুর, গয়া, পাটনা, ছাপরা, সেওয়ান, মজাফফরপুর, মতিহারি, ভাগলপুর, হুগলী, জাহানাবাদ, পাণ্ডুয়া, রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, বগুড়া, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শিলং, চট্টগ্রাম, দুমকা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও কটক।[১] ১৯০৯ সালে বাংলাদেশের শাখাগুলির নাম ছিল—বর্ধমান, পাবনা, রঙ্গপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, হুগলী, জাহানাবাদ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, গায়বান্ধা, চুয়াডাঙ্গা।[২] কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সাথে শাখা এসোসিয়েশনের সম্পর্ক কিরূপ থাকবে তা আমরা পূর্বেই গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য করেছি। পরবর্তীতে বাংলার কতকগুলি শাখা-এসোসিয়েশনের বিবরণ দিয়েছি।

(১) বগুড়া শাখা

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী রিপোর্টে (১৮৮৩) বগুড়ার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ মোট ৭৮জনের একটি সভ্য-তালিকা স্থান পেয়েছে। কার্যকরী কমিটির ঐ সময়ের গঠন রূপটি ছিল একপ:

সভাপতি—সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী
সহ-সভাপতি—শাহ নাজমুদ্দীন আবুল হোসেন ও সৈয়দ ওয়ালি উল্লা,
সম্পাদক—সমিরুদ্দীন ও মোহাম্মদ আবদুল করিম
সহকারী সম্পাদক—মোহাম্মদ ইসহাক মহসিন ও বাহাজুদ্দীন
কোষাধ্যক্ষ—খাজা আজিজুদ্দীন ও গোলাম মহিউদ্দীন
সদস্যবৃন্দ—খোন্দকার মফিজ উদ্দীন, আবদুর রশিদ, মানসুর রহমান খান, আমীরুদ্দীন, মোহাম্মদ হাসান মহসীন, মোবারক আলী খান ও নাসিরুদ্দীন আহমদ।[৩]

---

১. *Indian Muslim, A Political History*, p. 329 (Appendix)
২. *Muslim Community in Bengal*, pp. 179-80 (footnote).
৩. *Report of the Committee of the Central National Mahomedan Association for the Past Five years*, 15 April 1883, p. 41.

'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে (৫ জানুয়ারী ১৮৯৭) জনৈক পত্র-লেখক বলেন যে, বগুড়ার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক সমীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর এটি নির্জীব হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে মুসলমান সমাজে পরিবর্তন এসেছে এবং এসোসিয়েশনটি পুনর্গঠিত হয়েছে। পত্র-লেখক তৎকালীন সম্পাদক সাজ্জাদ আলীর নিকট বগুড়ার ধ্বংসমুখী মাদ্রাসাটিকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।[১] ১৯০৫ সালে বগুড়া 'জাতীয় মুসলমান সমিতির অনুষ্ঠানপত্র' শিরোনামে ৮ পৃষ্ঠার একটি নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। এটি শেখ জমিরুদ্দীন বগুড়ার 'বার প্রেস' থেকে প্রকাশ করেন।[২] ১৯২৩ সালেও বগুড়ার ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন সক্রিয় ছিল।[৩]

(২) চট্টগ্রাম শাখা

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রথম পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্টে চট্টগ্রাম শাখা-এসোসিয়েশনের ৬৪ সদস্যের একটি তালিকা স্থান পেয়েছে। জমিদার, সরকারী কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষক, ধর্মনেতা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ঐ তালিকার সদস্যভুক্ত হয়েছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইকরাম রসুল খান বাহাদুর সভাপতি এবং চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জুলফিকার আলী সম্পাদক ছিলেন।[৪]

(৩) খুলনা শাখা (১৮৯০)

'খুলনা জেলা মহামেডান এসোসিয়েশন' ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয়। 'সুধাকর' পত্রিকায় 'খুলনা মুসলমান সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভার (২ মার্চ ১৮৯০) সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'মুসলমান বোর্ডিং' স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সভার উদ্দেশ্য ছিল। জহুর আহমদ, লোতফর রহমান, আবদুল লতিফ, আতাওল হক সভায় বক্তৃতা করেন। বাগালিয়ার জমিদার আবদুল আহাদ সভায় উপস্থিত হতে না পেরে সমিতির হিতকার্যে ঐক্যমত জ্ঞাপন করে একটি পত্র প্রেরণ করেন।[৫]

(৪) হুগলী শাখা (১৮৮৩)

হুগলী জেলার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠার বছরে কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন এরূপ:

সভাপতি—প্রিন্স বশিরুদ্দীন

---

১. *The Moslem Chronicle*, 9 January 1897.
২. *Revision of the List of Associations* p. 41.
৩. *Bengal Library Catalogue*, 2nd Quarterly Report, 1905.
৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১-৫৪
৫. সুধাকর, ২ চৈত্র ১২৯৬

সহ-সভাপতি—প্রিন্স আমীরুদ্দীন ও নাজিরুদ্দীন আহমদ খান বাহাদুর
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—আশরাফ উদ্দীন আহমদ, মতওয়াল্লী, ইমামবাড়া
সহকারী সম্পাদক—ইজাদ বক্স বিএ, বিএল ও মির্জা মোহাম্মদ শরীফ
যুগ্ম সম্পাদক—মযহারুল আনোয়ার বিএ, বিএল, উকিল ও জমিদার
সদস্যবৃন্দ—আলী আহমদ, খান বাহাদুর, সৈয়দ আবদুল মোজাফফর, জমিদার, মির্জা রমজান আলী, আইনুদ্দীন আহমদ, প্রধান কেরানী, ইমামবাড়া, হাজি মোহাম্মদ শিরাজী, সৈয়দ আমজাদ আলী, অফিসার, ডাক বিভাগ ও আবদুল জলিল, শিক্ষক, হুগলী কলেজ।[১]

'১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় হুগলীর শাখা এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জেলার মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব রক্ষা করা এর লক্ষ্য।[২] ১৮৯০ সালে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরত থাকার যে অভিযান চালান হয় তাতে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের নির্দেশে হুগলীর শাখাও অংশ গ্রহণ করে।[৩]

১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে' অংশ গ্রহণ করার জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি পাঠান হয়:

মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর (সহ-সভাপতি), সৈয়দ আশরাফ-উদ্দীন আহমদ (সম্পাদক), মযহারুল আনোয়ার (যুগ্ম-সম্পাদক), সৈয়দ ইরফান আলী, জমিদার, বীরভূম, সৈয়দ খয়রাত আলী, মীর খয়রাত আলী, মীর হায়দার হোসেন, অফিসার, ইমামবাড়া, ইমদাদ আলী, জমিদার ও মোহাম্মদ আলী।[৪]

(৫) জাহানাবাদ শাখা

সম্ভবতঃ শাখাটি ১৮৮৫ সালের গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়। 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকায় (৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) বলা হয়। 'কলিকাতার জাতীয় মুসলমান সভার একটি শাখা সভা মেদিনীপুরে স্থাপিত হইবার জন্য কল্পনা হইতেছে।' 'মুসলমান বন্ধু'র পরবর্তী সংখ্যায় (১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'র খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, জাহানাবাদের কয়েকটি গ্রামের

---

১. *Op. cit.*, p. 65.
২. *Revision of the List of Associations*, p. 22.
৩. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 112.
৪. *The Moslem Chronicle*, 30 September 1899.

অধিবাসীরা মিলিতভাবে সভাটি স্থাপন করেন। রসুলপুরের ডাক্তার গোলাম হোসেন এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভাই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মহা-মেডান এসোসিয়েশনের শাখাভুক্ত হয়। তখন এর নামও পরিবর্তিত হয়। ১৮৯০ সালে ২০ মে সমিতির সম্পাদক গোলাম হোসেন চৌধুরী স্যার সৈয়দ আহমেদকে সম্বোধন করে একটি পত্র লিখেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বৃদ্ধির জন্য একটি বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন ছিল। সে বিলের সপক্ষে স্যার সৈয়দ আহমদ এক স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে এ-দায়িত্ব অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় মহামেডান এসোসিয়েশনের উপর। কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন শাখা-এসোসিয়েশনগুলিকে স্বাক্ষর সংগ্রহের নির্দেশ দেন। গোলাম হোসেন চৌধুরীর পত্রখানি ছিল তাঁর অঞ্চলের মুসলমানদের স্বাক্ষর-পত্র প্রেরণের বিষয় সম্পর্কিত।[১]

(৬) মেদিনীপুর শাখা (১৮৮৪)

সকল প্রকার ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে ও আইনসঙ্গত উপায়ে জেলার মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধান ছিল মেদিনীপুর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্থানীয় ভূস্বামী, শিক্ষিত ব্যক্তি, আইনজীবী, ডাক্তার, সর-কারী কর্মচারী, ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি এর সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতেন।[২] ১৮৯৫ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, শাখা-সমিতির ঐ সময়ে সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর ইকরাম রসুল এবং সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ আবদুর রহমান। ঐ সময় বাংলার ছোটলাট চার্লস এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং একটি স্মারকপত্রে মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া তুলে ধরা হয়। একটি মাদ্রাসা ও একটি স্কুল-বোর্ডিং-এর উন্নতিকল্পে অর্থ-মঞ্জুরি এবং চাকুরীতে মুসলমানদের যথাযথ নিয়োগের আবেদন জ্ঞাপন ছিল স্মারকপত্রের প্রধান বক্তব্য।[৩]

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট জন উডবার্ন (১৮৯৮-১৯০২) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

---

১. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 124.

২. *Revision of the List of Associat ions*, p. 26.

৩. *The Moslem Chronicle*, 14. February 1895.

এসোসিয়েশনের সম্পাদক ইকরাম রসুল 'অভিনন্দন-বাণী' পাঠ করেন। আবদুল বারি উর্দুতে এবং সদর কাজী বাহাউদ্দীন আরবীতে প্রশস্তি পাঠ করেন।[১]

(৭) রাজশাহী শাখা (১৮৮৪)

'রাজশাহী মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন নাটোরের জমিদার এরশাদ আলী খান চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন ইমামুদ্দীন। মুসলমান সমাজের উন্নতি এসোসিয়েশনের সর্বাত্মক লক্ষ্য ছিল। হিন্দু জমিদার ও গণ্য-মান্য ব্যক্তি পরিচালিত 'রাজশাহী সভা' (১৮৭৮) ছিল। রাজশাহী মহামেডান এসোসিয়েশন সংস্থাপনের পেছনে এই সভার প্রেরণা ছিল। ১৮৯১ সালে এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। তাঁরই উদ্যোগে এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবন তৈরী হয়; ডাক্তার সিরাজ উদ্দীন আহমদ গৃহ নির্মাণের ভূমি দান করেন।[২] এটি পরবর্তীকালে রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়'কে দান করা হয়।[৩]

(৮) রংপুর শাখা (১৮৮৭)

'রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন মহীপুরের শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী। 'মোসলেম ক্রনি-কলে' এটিকে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র শাখা রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতেশ্বরীর জুবিলী উৎসব (১৮৮৭) উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রযত্নে 'রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। পত্রিকায় বলা হয় যে, ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ঐ শাখা-সমিতি দুটি কাজে সফলতা লাভ করেছে, একটি রংপুর মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং অপরটি মাদ্রাসার একটি বৃহৎ দালান নির্মাণ। আবদুল মজিদ চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান উদ্দীন (জমিদার) ও সৈয়দ আবদুল হায়াত গোলাম হাফিজের আর্থিক সাহায্যে ঐগুলির নির্মাণ কার্য সম্ভব হয়। ১৮৯০ সালে স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলী মাদ্রাসা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।[৪]

'১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় রংপুরের শাখা-সমিতির স্থাপনের কাল আছে ১৮৮৭ সাল। ঐ তালিকায় বলা হয়েছে যে, রংপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের

---

১. *The Moslem Chronicle*, 25 August 1900.

২. সৈয়দ মূর্তাজা আলী—প্রবন্ধ বিচিত্রা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৩৬-৬৭

৩. কাজী মোহাম্মদ মিছের—রাজশাহীর ইতিহাস, ১ খণ্ড, কাজী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৬৫, পৃঃ ২১০-১১

৪. *The Moslem Chronicle*, 22 July 1899.

মুসলমান সমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলি আদায় করা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[১]

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে যোগদানের জন্য রংপুরের শাখা-সমিতি একটি সভার (৩ নভেম্বর ১৮৯৯) মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেন—তসলিমুদ্দীন আহমদ, বিএল, সরকারী উকিল সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, জমিদার, মোহাম্মদ আশফ খান, বিএল, মোহাম্মদ মোজাম্মল এল. এম. এস. আবদুস সোবহান, ইনকাম-ট্যাক্স এসেসর, তহসীনুদ্দীন আহমদ, মোক্তার, সমিরুদ্দীন আহমদ, জমিদার, নেসের উদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ খিলাফত উল্লাহ ও মনিরুজ্জমান।[২]

ঐ সময় সমিতির সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তাহা (জমিদার) ও সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, সম্পাদক তসলিমুদ্দীন আহমদ, সহকারী সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ মোজাম্মল এবং যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ আশফ খান।[৩]

সমিতির কেন্দ্র-শক্তির মূলে ছিলেন আবদুল মজিদ চৌধুরী। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করতেন, তবে সে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার চেয়েছিলেন। তিনি বাংলার সরকারকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, বাংলা পাঠশালার পুস্তকগুলিতে হিন্দুর দেবদেবতার কথাই বেশী, কোন মুসলমান পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষা দিতে চাইবেন না। ইসলাম ধর্মের কথা ফারসী, আরবী ও উর্দু পুস্তকে আছে, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ঐসব ভাষা শিক্ষা আবশ্যক বলে তাঁরা মনে করেন। তিনি ছোটলাট উডবার্নের (১৮৯৮-১৯০২) ঘোষিত শিক্ষানীতির সূত্র ধরে মক্তবগুলির জন্য সরকারী সাহায্য ও স্কুল-ইনসপেক্টর দ্বারা সেগুলি সময়মত পরিদর্শনের দাবী জানান। তাঁর অভিমত, মাদ্রাসার সহিত সম্পর্ক রেখে মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন, সরকারী অর্থ সাহায্য দ্বারা ছাত্রদের বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ দান এবং ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমান সব-ইনসপেক্টর দ্বারা মক্তব পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিলে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হবে।[৪] ১৯০৩ সালে সরকারের

১. *Revision of the List of Associations*, p. 39.
২. *The Moslem Chronicle*, 25 November 1899.
৩. *Muslim Community in Bengal* p. 39.
৪. Khan Bahadur Abdul Majid Choudhury to Government of Bengal, 30 November 1902, *Bengal Education Procedings*, September 1903.

কাছে প্রদত্ত একটি আবেদন পত্রে 'রংপুর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ঐ দাবীগুলির কথা পুনরায় তুলে ধরেন।[১]

মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা এসোসিয়েশনের মাধ্যমে জাগতে শুরু করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে (১৯০৩-০৫) প্রদত্ত এক 'অভিনন্দন-বাণী'তে। তিনি ১৯০৪ সালে জুন মাসে রংপুর পরিদর্শনে যান। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঐ জেলার কোন মুসলমান স্কুল-ইন্সপেক্টর নেই—এরূপ অভিযোগ করে ঐ শাখা-সমিতি ছোটলাটের কাছে একজন আরবী ফারসী অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করার দাবী জানায়।[২]

(৯) বর্ধমান শাখা (১৮৮৭)

'মোসলেম ক্রনিকলে' 'বর্ধমান মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সম্পাদকের একটি চিঠি (২০ মার্চ ১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। এতে উক্ত সমিতির এক সভায় গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। শহরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন, একটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং স্থানীয় সরকারী অফিসে মুসলমানদের চাকুরীতে নিয়োগের কথা প্রস্তাবগুলিতে বলা হয়েছে।[৩] '১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় 'বর্ধমান মহামেডান এসোসিয়েশনে'র উল্লেখ আছে। ঐ সময় এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন বিএল এবং সম্পাদক ছিলেন মৌলভী নাজিরুদ্দীন আহমদ বিএল। মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯০। বেশীর ভাগ সদস্য ছিলেন জমিদার যাঁরা মুঘল আমল থেকে মালিকানা ভোগ করে আসছেন। সামগ্রিকভাবে জেলার মুসলমান সমাজে আধুনিক ও ধর্ম শিক্ষা বিস্তার করা এবং সমাজের অভাব অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরা ও প্রতিকার করা এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল।[৪]

(১০) ময়মনসিংহ শাখা

আলিগড়ের সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উনিশ শতকের আট দশকের দিকে কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশেও গড়ে উঠে। এ ব্যাপারে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন ও তার শাখাসমূহ এক 'স্বাক্ষর অভিযান' শুরু করে। ময়মনসিংহের শাখা এসোসিয়েশনের অনারেরী সম্পাদক হামিদউদ্দীন আহমদ ঐ আন্দোলনের পরিস্থিতি জানিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্র লেখেন (৩১শে

১. *Muslim Community in Bengal*, p. 34.
২. *The Moslem Chronicle*, 2 July 1904.
৩. *Ibid*, 4 April 1895 (Supplementary).
৪. *Revision of the List of Associations*, p. 20.

অক্টোবর ১৮৮৮)। ঢাকার 'আঞ্জুমানে ইসলামীয়া'র সভাপতি সৈয়দ আবদুল বারি কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, সেকথা উল্লেখ করে হামিদউদ্দীন বলেন যে, তিনি ও অন্যান্য নেতা ঢাকার মুসলমান সমাজ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ আবদুল বারির প্রভাব দূর করার চেষ্টা করেছেন।[১]

(১১) পাবনা শাখা

১৮৯৯ সালের ১১ জানুয়ারী পাবনার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে পাবনা জেলা-স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং-এর উদ্বোধনী সভা হয়। পাবনার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবুল মাহমুদ সভায় বক্তৃতা দেন। উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণে প্রধান আর্থিক সাহায্য দান করেন পাবনার দুলাই-এর জমিদার ভ্রাতৃত্রয়—হোসেন জান চৌধুরী, কামিলউদ্দীন আবদুল গণি চৌধুরী ও আবদুল বাসেত চৌধুরী এবং নাটোর নবাব আহসানুল্লাহ্ ও ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ঐ সময় শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন আলিমুদ্দীন।[২]

জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে পাবনার শাখা-সমিতি ঘোর বিরোধী ছিল। সমিতির সদস্যগণের ধারণা ছিল যে, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বা জাতির সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে না। এটি মুখ্যতঃ হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান, কতিপয় উচ্চাভিলাষী বাঙালী হিন্দু এটি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সরকারী শাসনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, মুসলমানদের উন্নতিও তাঁরা চান না।[৩] সুতরাং কংগ্রেসে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে সংগত হবে না। উল্লেখযোগ্য যে, পাবনার ঐ শাখা-সমিতি সৈয়দ আহমদের 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে'র আদর্শ সমর্থন করত।[৪]

(১২) মালদহ শাখা (১৮৯০)

১৮৯০ সালে 'মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদহ জেলার মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক অবস্থার উন্নতি বিধান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল। এসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল আজিজ খান প্রেরিত একটি পত্র (২০ জুন ১৮৯৬) 'মোসলেম ক্রনিকলে'

---

১. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 117.
২. *The Moslem Chronicle*, 4 February 1899.
৩. *Indian Political Associations and Reform of Lagislature*, p. 229-
৪. *Ibid*., p. 229.

ছাপা হয়। তিনি লিখেছেন, ১৮৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এসোসিয়েশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জেলা শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। মালদহের 'বাইশ হাজারী' ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মতওয়াল্লীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে এসোসিয়েশন ব্যর্থ হয়। ফলে মাদ্রাসা স্থাপন সম্ভব হয়নি। এসোসিয়েশনকে ঢেলে সাজাবার জন্য ১৮৯৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর একটি সভা ডাকা হয়। কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র আদর্শে এটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। জমিদার চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান সর্বসম্মতিক্রমে এসো-সিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলা-প্রশাসক মিঃ প্রাইস অনারেরী সভা-পতি হন।[১] ঐ সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে জেলার শিক্ষাবিভাগে যাতে পরিমিত সংখ্যক মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করে সে-বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে সুপারিশ করা হয়। সরকারী বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এসোসিয়েশনের অনুরোধ সত্ত্বেও বোর্ড মুসলমান কর্মপ্রার্থীর বিষয় বিবেচনা করেনি, এ বিষয়ে অভিযোগ তোলা হয়।[২] ১৮৯৫ সালের ৮ মার্চে এসোসিয়েশনের 'কার্যনির্বাহক কমিটি'র একটি সভা হয়। তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়:

(১) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ১২ জন সদস্যের মধ্যে যাতে ৬ জন মুসলমান সদস্য নেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্যে বোর্ডের সভাপতির কাছে অনুরোধ করা হয়।

(২) 'বাইশ হাজারী'র মতওয়াল্লী ও 'শাহ হাজারী'র তত্ত্বাবধায়কের কাছে মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়। জেলার জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা সমাজের উন্নতির দিকে চরম অমনোযোগী বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। অবশ্য 'শাহ হাজারী'র তত্ত্বাবধায়ক কিছু মেয়াদী সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

(৩) জেলা-স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাস নেই। শহরের কোর্টের কিছু উকিল ও কর্মচারীর গৃহে 'জায়গীর' থেকে দূর অঞ্চলের ছেলেরা লেখাপড়া করে। মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য একটা স্থায়ী অর্থ-তহবিল গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়।[৩]

স্বসমাজের স্বার্থের প্রতি এসোসিয়েশনের প্রখর দৃষ্টি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ভাগলপুর বিভাগীয় কমিশনার ডব্লিউ. সি. ওলধাম (মালদহ তখন ঐ বিভাগের

১. *The Moslem Chronicle*, 11 July 1896.

২. ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ১৮৯৪ সালের ১৫ জুন তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, লোক-সংখ্যার সমতার ভিত্তিতে শিক্ষাবিভাগে হিন্দু-মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ঐ সময় নিয়োগের দায়িত্ব ছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে।

৩. *The Moslem Chronicle*, 11 July 1899.

অন্তর্ভুক্ত ছিল)-এর কাছে প্রেরিত এক দীর্ঘ আবেদনপত্রে (৮ অক্টোবর ১৮৯৬)। এতে তৎকালীন মালদহ জেলার মুসলমানদের বিবিধ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। জেলা বোর্ড, জেলা মিউনিসিপ্যালিটি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি—মুখ্যতঃ এই অভিযোগই প্রধান ছিল। অফিসে হিন্দু কর্মচারীর একচেটিয়া প্রাধান্য এবং চাকুরী নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের স্বজনপ্রীতির অভিযোগের কথাও বিবৃত হয়েছে।[১]

১৮৯৯ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট উডবার্ন মালদহ জেলা পরিদর্শনে গেলে তাঁকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে সমাজের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরে সরকারী অফিস-আদালতে মুসলমানদের চাকুরী সংস্থান ও মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের আবেদন জানান হয়।[২]

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে' অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য 'মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশনের'র একটি সভা (১১ ডিসেম্বর ১৮৯৯) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় এসোসিয়েশনের অনারেরী সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আবদুস সামাদ। মোক্তার মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন:

চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান, জমিদার (সভাপতি), আবদুল আজিজ খান, উকিল, (সম্পাদক), আবদুর রহমান খান, শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী, জমিদার, কাজী আজাহার উদ্দীন আহমদ, ডাক্তার, অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও হাজি আলিজান আফজা, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।[৩]

'১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকায় মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০। খান সাহেব আবদুল আজিজ খান তখনও সম্পাদক ছিলেন।[৪]

'মহামেডান এসোসিয়েশন' নামে বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। সেগুলি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের সহিত জড়িত ছিল, না স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল তা বলা যায় না। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের 'মহামেডান এসোসিয়েশন' ছিল এরূপ প্রতিষ্ঠান যার সহকারী সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ জাজুমান আলী (১৮৮৮)।[৫]

১. *The Moslem Chronicle*, 7 November 1896.
২. *Ibid.*, 19 August 1899.
৩. *Ibid.*, 23 December 1899.
৪. *Revision of the List of Associations*, p. 42.
৫. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 120.

জলপাইগুড়ির 'মুসলমান সভা' বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৯৪) প্রতিষ্ঠা করেন একিনুদ্দীন আহমদ। এটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। একিনুদ্দীন ঐ জেলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩ সালেও এসোসিয়েশনটির অস্তিত্ব ছিল; একিনুদ্দীন আহমদ তখন এর সভাপতি ছিলেন।[১]

'মিহির ও সুধাকরে' (২৮ জুন ১৯০১) বগুড়ার 'ধূপচাঁচিয়া মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সম্পাদকের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে বগুড়ায় মুসলমান স্কুল-পরিদর্শক নিয়োগের দাবী জানান হয়।[২]

'কুষ্টিয়া মহামেডান এসোসিয়েশনে'র অস্তিত্ব জানা যায় মোহাম্মদ আবদুল আজিজ প্রণীত 'সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত' (১৯০১) গ্রন্থ থেকে। উক্ত এসোসিয়েশন কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।[৩]

সমাজ সম্মিলনী সভা (১৮৭৯)

ঢাকার 'সমাজ সম্মিলনী সভা' ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা মাদ্রাসার (১৮৭৪) প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি ঢাকায় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর ছাত্র ছিলেন। আমীর আলীর কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার পরের বছর ওবায়দুল্লাহ ঢাকায় সমাজ সম্মিলনী সভা স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং ঐ সমিতির সদস্য ছিলেন। সুতরাং তিনি সভা স্থাপনের আদর্শ ও প্রেরণা সেখান থেকেই পেয়েছিলেন। ঢাকায় মুসলমানদের মধ্যে এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান। জাতীয় উন্নতি ও হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সাধন ছিল সমাজ সম্মিলনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য। 'ঢাকা প্রকাশে' (৭ বৈশাখ ১২৮৭) সমাজ সম্মিলনী সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে লেখা হয়, "পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ইদানীং হিন্দু মুসলমানদিগের ঐক্য সংস্থাপনার্থ স্থানে স্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী' নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।" নবাব আহসানউল্লাহ খান বাহাদুর সমাজ সম্মিলনী সভার সাহায্যার্থে ৩০০ টাকা দান করেন এবং ভবিষ্যতে ঐ সভার 'অভিভাবক' হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[৪]

---

১. *Revision of the List of Associations*, p. 37.

২. *Report of Native Papers in Bengal for the week ending*, 6 July 1901, p. 530.

৩. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ---সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত, মথুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, ১৯০১

৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৩ চৈত্র ১২৮৬

ঢাকার 'পূববঙ্গ বঙ্গভূমি' গৃহে মাঝে মাঝে এই সভার অধিবেশন হত। ১৮০০ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এরূপ এক সভায় একজন টোলের পণ্ডিত ও জনৈক সুশিক্ষিত মুসলমান 'জাতিসাধারণ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা' ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন।[১]

সমাজ সম্মিলনীর সভা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৮৩ সালে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপিত হলে সম্ভবতঃ এর অস্তিত্ব লোপ পায়।

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩)

ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সম্মিলনী'র 'প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী' (১৮৮৪) থেকে জানা যায়, এর প্রথম বছরের কার্যাবলী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্মিলনীর সম্পাদক আবদুল মজিদ ঐ কার্যবিবরণীতে লিখেন, "বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও সেই সময় সম্মিলনী কেবল শৈশবস্থায় থাকায় এবং স্থানীয় লোকসমূহ হইতে যথোপযুক্ত সহানুভূতি না পাওয়াতে বিশেষতঃ এককালে সেই উচ্চতর আশাসম্পন্ন হওয়া কষ্টকর বিধায় সভা গত বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন।"[২] ১৮৮৬-৮৭ সালে সম্মিলনীর বার্ষিক কার্যবিবরণী সম্বলিত একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয়। ঐ বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্রে লেখা হয়, "বিদ্যাশিক্ষাই মনুষ্যজাতির উন্নতির একমাত্র উপায়।...দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের নির্জীব মুসলমানবৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব। বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারেন, এই সকল গুরুতরকার্য সম্পাদনের জন্য 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের সভার কিয়দংশ জাতীয় পুরুষ শিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে। সম্প্রতি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতিতে আশান্বিত এবং মফস্বল সভ্যদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা

১. ঢাকা প্রকাশ, ১২৮৭,

২. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৮৩, পৃঃ ১
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪

এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি।"[১] স্ত্রী-শিক্ষা থেকে স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে সম্মিলনীর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রধানতঃ শিক্ষা-বিস্তার এবং তদ্দ্বারা সমাজ-উন্নয়ন সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা ছিল না, কিন্তু নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে ঘোরতর অবজ্ঞার ভাব ছিল। ভদ্র পরিবারে মেয়েদের সামান্য গৃহশিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা ছিল না। সমিতি ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করে তদনুসারে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাংলা ও উর্দু ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হত। প্রথম বছর ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও কলিকাতা থেকে মোট ৩৭ জন পরীক্ষা দেয় তাতে বাংলায় ২৩ জনে ২২ জন এবং উর্দুতে ১৪ জনে ১২ জন উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল এরূপ :

(১) বঙ্গবাসী যে-কোন মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়মিত দিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

(২) মহিলাগণ আপন আপন অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ব-স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

(৩) মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।[২]

মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্য বইয়ের অভাব ছিল। এজন্য মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ঢাকায় এলে সম্মিলনীর কর্মীরা তাঁকে দিয়ে 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১২৯০) গ্রন্থখানি লিখিয়ে নেন। পুস্তক মুদ্রণের আংশিক ব্যয়ভার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী বহন করে।[৩] ঢাকায় অবস্থানকালে সম্মিলনীর 'মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায়ে'র কাজেও তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি 'আমার সংসার জীবনে' (১৯৩৫) লেখেন, "ঢাকা শহরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধে বিশেষতঃ অক্লান্তকর্মী সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল আজিজ বিএ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেক দিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন।"[৪] নারী হোক, পুরুষ হোক, উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া সমাজের উন্নতির

১. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠান পত্র. ঢাকা, ১৮৮৭, পৃঃ ১-২
২. পূর্বোক্ত, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪
৩. মোহাম্মদ ইদরিস আলী—মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
৪. পূর্বোক্ত, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪

অন্য কোন উপায় নেই, এরূপ বিবেচনায় এবং সমাজের মঙ্গলচিন্তায় বিবেকের তাড়নায় সম্মিলনীর নব্যশিক্ষিত যুবকগণ ঐরূপ দুঃসাধ্যব্রতী কর্মসূচী নিয়েছিলেন। নওশের আলী খান ইউসফজয়ী তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, "---পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাঁহাদের মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সভা হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফল নিরতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে, বঙ্গের নানা জেলার মুসলমান বালিকাগণ তাহাদের সভায় গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।"[১] সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ প্রেরণা ও আদর্শ পেয়েছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার তৎকালীন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দীর কাছ থেকে। এ সম্পর্কে আলোকপাত করে হবীবুল্লাহ বাহার লিখেছেন, "আবদুল আজিজ, ফজলুল করিম, ফজলুর রহিম, আবদুল মজিদ প্রমুখ কয়েকজন মুক্ত প্রাণ, মুক্তবুদ্ধি যুবক ঢাকায় অধ্যয়ন করিতেন। একসঙ্গে এক বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন। --- বঙ্গ মুসলিমের অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কখন নীরবে অশ্রুপাত করিতেন, কখন বা উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিতেন। সুহরাওয়ার্দী বংশের মনীষী ওবায়দুল্লাহ ছিলেন ইঁহাদের গুরু।"[২] তিনি ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজ সম্মিলনী'র সম্পাদক ছিলেন।[৩]

প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্র থেকে সম্মিলনীর নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানা যায়—সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা ছিল ২ আনা, প্রতিষ্ঠার বছর সভ্যসংখ্যা ছিল ২৩ জন, পরের বছর ছিল ৪৩ জন, তৃতীয় বছর ১০২ জন। 'অধ্যক্ষ (কার্যনির্বাহক) কমিটি'র সদস্যগণ সাধারণ সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন। প্রথম বছর কার্যনির্বাহক কমিটি ছিল এরূপ :

সভাপতি—হিম্মত আলী, বিএ

সম্পাদক—আবদুল মজিদ

সহকারী সম্পাদক—হেমায়েতউদ্দীন আহমদ ও জোহাদর রহিম জহিদ

কোষাধ্যক্ষ—মকবুল আহমদ

---

১. নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃঃ ৪৩-৪৪

২. হবীবুল্লাহ বচনাবলী, পৃঃ ৩৭৩

৩. পূর্বোক্ত, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪

মফস্বল প্রতিনিধি—আজাদ আলী, মদস্বের হোসেন, সৈয়দ হজরত আলী
মোহাম্মদ ফাজেল, নওয়াজেস আলী ও মোহাম্মদ সাদেক।[১]

সম্মিলনীর মাসিক সভার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বছর ৪টি অধিবেশন হয়; ৪র্থ অধিবেশনে 'স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা' সম্পর্কে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ বক্তৃতা দেন। অধিবেশন হত ঢাকা কলেজে অথবা সম্মিলনীর দপ্তরখানায়। ঢাকার সাতরৌজালির মুনশী নূর বক্সের বাসায় ঐ দপ্তর ছিল।[২]

১৮৮৯ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকার মাদ্রাসাগৃহে সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাজী রাজিউদ্দীন আহমদ, তহরিরউদ্দীন আহমদ, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ, নেওয়াজ আলী, মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ ফাজেল প্রমুখ। মোহাম্মদ হাসান, আবদুল হালিম, হেমায়েতউদ্দীন, মোহাম্মদ-উল-আমিন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, অলিওর রহমান বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ গত বৎসরের কার্য-শৈথিল্য, কর্মচারী ও সভ্যগণের অমনোযোগিতার সমালোচনা করেন এবং সমাজের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।[৩] হেমায়েতউদ্দীন মাদ্রাসা কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সহানুভূতি ও বন্ধুভাব স্থাপন-উদ্দেশ্যে একটি 'ডিবেটিং ক্লাব বা আলোচনা সমাজ' গঠনের প্রস্তাব দেন।[৪] ১৮৮৮-৮৯ সালে সম্মিলনীর কার্যনির্বাহক কমিটির গঠনটি ছিল এরূপ:

সভাপতি—আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এমএ, ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

সহকারী সভাপতি—কাজী রাজিউদ্দীন, জমিদার ও সৈয়দ আওলাদ হোসেন, স্পেশাল সব-রেজিস্টার।

---

১. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৮৮৩, পৃ: ৯। ঐ বছর হিশমত আলী ঢাকা কলেজের বিএল, আবদুল মজিদ বিএ শ্রেণীর এবং হেমায়েতউদ্দীন ও জোহাদর রহিম জহিদ আরও নিচের শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। যশোহরের হিশমত আলী ১৮৮১ সালে হুগলী কলেজ থেকে বিএ, ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। নোয়াখালীর আবদুল মজিদ ১৮৮৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। বরিশালের হেমায়েতউদ্দীন ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিএ এবং ১৮৯১ সালে বিএল পাশ করেন। মেদিনীপুরের জোহাদর রহিম জহিদ ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯১ সালে রিপন কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। আবদুল আজিজ ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তারা সবাই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।

২. পূর্বোক্ত, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪

৩. সুধাকর, ২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৬

৪. ঐ।

সম্পাদক—আবদুল মজিদ বিএল, জজকোর্টের উকিল
সহকারী সম্পাদক—অলিওর রহমান, ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষক
সদস্য—সৈয়দ আমজাদ আলী (ডেপুটি পোস্ট মাস্টার, জেনারেল পার্সনাল এসিস্ট্যান্ট), আবদুস সালাম (ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপক), অধ্যাপক হাফেজ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক আবদুল মুনিম, আবদুল ওয়াজিদ বিএ (মাদ্রাসা শিক্ষক), জহুরুল হক বিএ (মুসলমান রেজিস্ট্রার কাজি) ও মোহাম্মদ হাসান বিএ (রেজিস্ট্রার অফিসের প্রধান কেরানী)।[১]

সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্রে প্রতি জেলায় 'শাখা সমিতি বা সহযোগী সমিতি' স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছিল। ঐরূপ কোন শাখা খোলা হয়েছিল কিনা এবং সম্মিলনী আর কত বছর সক্রিয় ছিল—এসব তথ্য জানা যায় না। তবে মোসলেম ক্রনিকলের সম্পাদকের নিকট ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর প্রেরিত একপত্রে (২৫ জানুয়ারী ১৯০৪) ঐ সম্মিলনীর সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ তারিখে সম্মিলনীর এক সভায় বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২] 'ঢাকা প্রকাশে' কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়, সেখানে সভার একটি প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে লেখা হয়, "মহসীন ফণ্ডের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত গভর্ণমেণ্টের নিকট বর্তমান প্রস্তাব (বঙ্গবিচ্ছেদ) প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।"[৩] ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে (১৬ অক্টোবর ১৯০৫) ঢাকার নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'মহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে পর মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অস্তিত্ব লোপ পায়।[৪]

নূর-অল ইমান সমাজ (১৮৮৪)

'নূর-অল ইমান সমাজ' রাজশাহীর একটি 'বিদ্যোৎসাহিনী' প্রতিষ্ঠান।[৫] মুহম্মদ আবু তালিব একে 'প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান' বলেছেন।[৬] মিহির ও সুধাকর

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, সাহিত্যিকী, বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৪, পৃঃ ১৮
২. *The Moslem Chronicle*, 30 January 1904
৩. মুনতাসির মামুন—বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব এবং পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা ৩-৪ সংখ্যা ১৩৮১-৮২
৪. Ahmad Hasan Dani—*Dacca*, Dacca, 1962, p. 123 (2nd. edition)
৫. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৪৬
৬. মুহাম্মদ আবু তালিব—মির্জা ইউসুফ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৪

'মোসলমান ধর্ম, মোসলমান জ্ঞান, মোসলমান বিজ্ঞান প্রচারক' সমিতি বলে অভিহিত করেছে।[১] 'সমাজে'র কর্মসূচী যে বহুমুখী ছিল, তা ঐসব মন্তব্য থেকে বুঝা যায়। একে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

ঠিক কোন সময় 'নূর-অল ইমান সমাজ' স্থাপিত হয়, তা নির্ণয় করা যায় না। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৮৯৫ সালকে 'সমাজে'র প্রতিষ্ঠার কাল বলেছেন।[২] মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেন, ১৮৮৪ সাল।[৩] ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন, "আঞ্জমানে হেমায়েতে এসলাম গঠনের ২।১ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-দেশীয় কতকগুলি আলেম, ফাজেল ও বিদ্বান লোক লইয়া নূর-অল ইমান সমাজ গঠিত হয়।"[৪] আঞ্জমানে হেমায়েতে এসলাম ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে নূর-অল ইমান সমাজের প্রতিষ্ঠার কাল দাঁড়ায় ১৮৯২ অথবা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। পরবর্তীকালে নূর-অল ইমান সমাজের মুখপত্র মাসিক 'নূর-অল ইমানে' 'ভাষা সম্বন্ধে নূর-অল ইমানের কৈফিয়ৎ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, "নূর-অল ইমান প্রথম চেষ্টায় দুগ্ধ-সরোবর নামক একখানি 'কওমী পুস্তিকা' প্রণয়ন ও প্রচার করে। ...অধুনা নূর-অল ইমান এই কাগজখানি বাহির করিতে হাত দিয়াছেন।"[৫] যেসব 'বঙ্গ দেশীয় আলেম, ফাজেল ও বিদ্বান লোক' নূর-অল-ইমান সমাজ গঠন করেন, তাঁদের নাম পরিচয় জানা যায় না। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'তে (১৮৯৫) 'অনুবাদক কমিটি'র সদস্যদের নাম আছে; তাঁরা যে ঐ সমাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'অনুবাদক কমিটি'তে ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (পরিদর্শক), আবু আলী (ঐ), মোহাম্মদ সাবের উদ্দীন আমীন (ঐ), মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (অনুবাদক), মুনশী মোহাম্মদ আলিম (নকলনবিস) ও খলরুজ্জমান খাঁ (সহকারী সম্পাদক)।[৬]

সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করে মিহির ও সুধাকরে লেখা হয়, "নূর-অল ইমান সমাজের পরিচালক মেম্বারগণ মোসলমান হৃদয়

---

১. মিহির ও সুধাকর, ২৫ আশ্বিন ১৩০৮
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৩১ (৪ সং)।
৩. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৪
ঐ সাল সম্পর্কে লেখক কোন তথ্যের উল্লেখ করেননি।
৪. আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩৪০
৫. নূর-অল ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭
৬. মীর্জা এম, এ, আজিজ—সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী মেরাজুদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪০

হইতে জঘন্য দোষগুলি দূর করিয়া তৎপরিবর্তে উজ্জ্বল গুণাবলী মনুষ্যত্ব ধর্ম উদ্ভাসিত করিতে, এসলাম সমাজে দিব্যালোক বিস্তার করিতে, মোসলমান ভ্রাতা-ভগিনীর হৃদয় একটি সাধারণ মিলনসূত্রে গাঁথিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়া যে সকল চেষ্টা করিতেছেন তন্মধ্যে পুস্তক পত্রিকার প্রচারকার্যাও একটি প্রধান কার্য।''[১] এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁরা কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যথা—সুশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক দ্বারা ইসলামধর্ম প্রচার, পত্রিকা প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। মির্জা ইউসুফের 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১) সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়া-ই-সাদৎ'-এর বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (৫ খণ্ড ১৮৯৫-১৯১৫) গ্রন্থের প্রকাশ ঐ সমাজের আর এক কৃতিত্ব। মির্জা ইউসুফ সমাজের সাহায্যেই গ্রন্থখানি অনুবাদ ও প্রকাশের উৎসাহ পান। প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজনবোধ থেকে পরিচালকগণ সমাজের মুখপত্র মাসিক নূর-অল-ইমান প্রকাশ করেন। পত্রিকার আখ্যাপত্রে লেখা হত 'নূর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত ও মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সঙ্কলিত'। পত্রিকাখানি 'সমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ' করা হত। নূর-অল-ইমানে প্রকাশিত 'সমাজের সাংগঠনিক কার্যবিবরণী' থেকে জানা যায়, সমাজের কর্মীরা মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা আদায় করে গরীব ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন এবং শিক্ষার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতেন।[২] মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বিশেষ আন্দোলন চালিয়ে রাজশাহী ও নওগাঁর মুসলমান ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন।[৩]

সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৮)

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র নামের অনুকরণে 'সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' ১২৯৫ সনে সাতক্ষীরায় স্থাপিত হয়। ৪ কার্তিক ১২৯৬ সনে অনুষ্ঠিত সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের এক বিবরণ 'সুধাকরে' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল 'ষাণ্মাসিক' দ্বিতীয় অধিবেশন; অতএব বছর খানেক আগে এটি জন্ম লাভ করেছিল। বিবরণটি সম্মিলনীর সম্পাদক কাজী আবদুল আজিজ ও জনৈক সদস্য মীর নূর আলী 'সুধাকর'-এ প্রেরণ করেন। সভার স্থানীয় জমিদার,

১. মিহির ও সুধাকর, ২৫ আশ্বিন ১৩০৮
২. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা পৃ: ১৪২
৩. সৈয়দ মর্তুজা আলী—উত্তর বঙ্গের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫

তালুকদার, মহাজন, দোকানদার ও কৃষক সাধারণ মিলে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক কাজী আবদুল আজিজ সভায় 'ষান্মাসিক রিপোর্ট' পাঠ করেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দেন। সভায় নিম্নরূপ তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

(১) সাতক্ষীরা প্রাণনাথ এন্ট্রেন্স স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণের ৩য় শ্রেণী হইতে পারসী বা উর্দু শিক্ষা দিবার জন্য একজন মৌলবী আগামী বৈশাখ মাস হইতে যোগ দিবেন।

(২) যে সকল মুসলমান ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে সভা বেতনের সাহায্য করিবেন।

(৩) সাতক্ষীরা সবডিভিসনের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের আমলা ও মক্কেলগণের নামাজ পড়িবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি যে ১২ × ১২ জমি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে একটি নামাজের স্থান প্রস্তুত হইবে।[১]

এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা (১৮৮৯)

'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা। ইসলাম ধর্ম প্রচার তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। মুনশী মেহেরুল্লার নীতি এবং সভার নামকরণ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রচারই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মেহের-চরিতে' (১৯৪১) এর সমর্থন পাওয়া যায়।[২] যখন যশোহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে যায়, তখন মুনশী মেহেরুল্লা কতিপয় সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন। তিনি শুধু খ্রীস্টান পাদরীদের বক্তৃতার জবাবে বক্তৃতা প্রদান নয়, খ্রীস্টান মিশনের অনুরূপ মিশন বা সমিতি স্থাপন করে সংগঠিত উপায়ে প্রচার কার্য চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়। শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "এই সময়ে তিনি (মেহেরুল্লা) যশোহরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক একটা আঞ্জমন স্থাপন করেন। এই আঞ্জমনের একটা বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে তিনি কলিকাতাস্থ মৌলবী মেযরাজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব ও মুনশী শেখ আবদুর রহিম সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া

১. সুধাকর, ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৬

২. শেখ জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরুল্লার ভাবশিষ্য ও সহকর্মী ছিলেন। মেহেরুল্লার মৃত্যুর ২ বছর পরে তার জীবনীগ্রন্থ 'মেহের-চরিত' রচিত হয়।

যশোহরে লইয়া গিয়াছিলেন।"[১] তিনি আরও উল্লেখ করেন, "এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই 'সুধাকর' মোসলেমগগনে উদিত হয়। ---যশোহর-ঘোবাস্থ খ্যাতনামা রইস সৈয়দ আহমদুল্লা সাহেবের বাসভবনে এই সভার বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা ক্ষেত্রেই বহু সংখ্যক মুসলমান ভ্রাতা সুধাকরের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন।"[২]

কলিকাতায় 'সুধাকর' সাপ্তাহিকের জন্ম ২৩ কার্তিক ১২৯৬। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ তারিখের সুধাকরে (১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা) 'যশোহর মুসলমান ধর্মোত্তেজিকা সভা'র উল্লেখ আছে। ঐ সংখ্যার একটি সংবাদে বলা হয়, "মৌলবি নৈমুদ্দীন সাহেবের সাহায্য জন্য 'যশোহর মুসলমান ধর্মোত্তেজিকা সভা' চাঁদা আদায় করিতেছেন।"[৩]

উপরের বর্ণিত তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সুধাকরের জন্মের কিছুকাল আগে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' স্থাপিত হয়। খুব সম্ভব, ১৮৮৯ সালের নভেম্বরের আগে কোন এক মাসে এর উদ্ভব হয়।

আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম(১৮৯১)

রাজশাহীর 'আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলামে'র প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। আঞ্জমনের একটি ছাপান 'অনুষ্ঠান-পুস্তিকা'য় বলা হয়েছে, "কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হইবে, কি প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে, কিসে ন্যায্য জীবিকার (হালাল রুজীর) পথ প্রশস্ত হইবে, কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় সাহায্য করা যাইবে, এই সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া গবর্নমেন্টের আইন সঙ্গত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্যে প্রচলন—ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য।"[১] অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যেই

---

১. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—মেহের চরিত, মোস্লেম হিতৈষী প্রেস, কলিকাতা, ১৩২৫, পৃঃ ৯

২. মেহের চরিত, পৃঃ ১০

৩. সুধাকর ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৬
উল্লেখযোগ্য যে 'গো-জীবন' নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের মধ্যে যে মকদ্দমা হয়, সেই মকদ্দমায় নইমুদ্দীন সাহেবকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য এই চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। সুধাকর-গোষ্ঠী এ-ব্যাপারে নইমুদ্দীন সাহেবকে সমর্থন দিয়েছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ের 'সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩৭০ (২ সং)।

আঞ্জমনের কর্মসূচী নিবেদিত। ইসলাম-প্রচারক (আশ্বিন ১২৯৮) একে 'ধর্মীয় সভা' বলে আখ্যায়িত করেছে।

পত্রিকায় লেখা হয়, "উত্তরবঙ্গের ধর্মবীর মৌলবী হাসেন আলী সাহেবের উপদেশে উত্তেজিত হইয়া রাজশাহীতে 'হেমায়েতে এসলাম সভা' স্থাপিত হইয়াছে; মালদহ জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ হেমায়েতে এসলামের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে সহায় হইয়াছেন।"[১]

বোয়ালিয়ার হেতাম খাঁ মসজিদে এর দুদিন ব্যাপী (১১ ও ১২ পৌষ ১২৯৮) যে অধিবেশন হয় তাতে রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ থেকে বহু সংখ্যক সভ্য সমাগত হন।[২] আবদুল আজিজ প্রণীত 'আরব্য ও পারস্য মধুপাক' নামে একখানি পুস্তক 'রাজশাহী আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম ও রঙ্গপুর নূরল ইমান সমাজদ্বয়ের সাহায্যে প্রকাশিত' হয়।[৩]

একই নামে বরিশাল, ডায়মণ্ডহারবার ও পুরুলিয়ায় সমিতি ছিল। বরিশালের আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম স্থাপিত হয় ১৮৯৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বরিশাল জজকোর্টের উকিল হেমায়েতউদ্দীন আহমদ। সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "বরিশাল জেলাবাসী মুসলমানগণের দুঃখ, দুর্দশা, নিরক্ষরতা ও নিশ্চেষ্টতা দর্শনে যৌবনেই খান বাহাদুর সাহেবের (হেমায়েত উদ্দিনের) মহৎ হৃদয় বিচলিত হয়। তিনি বুঝিলেন যে জেলাব্যাপী শিক্ষা-হীনতাই তাহাদের এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ। তাই এই ত্যাগী পুরুষ তাঁহার মনঃপ্রাণ কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন—স্বসমাজ ও স্বদেশ সেবায়, মুসলমানদের সর্ববিধ উন্নতি বিধান কল্পে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুরের খ্যাতনামা মৌলভী হাসান আলী সাহেবকে বরিশালে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার আহ্বানে এই মহাত্মা এ সহরে আসেন—ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কার মানসে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা ও উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়াই সহরস্থ মুসলমান জনসাধারণ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে 'আঞ্জমনে হেমায়েত ইসলাম' নামে এক শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দ্বারা এ জেলাবাসী মুসলমানদের সর্ববিধ উন্নতি বিধান। এই সমিতির সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা খান বাহাদুর মৌলভী হেমায়েতউদ্দিন আহমদ সাহেব ইহার সম্পাদক

---

১. ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ ১২৯৯

২. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃ. ৩৪০

৩. ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮

ও মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ সাহেব সভাপতি নিযুক্ত হন।"[১] ১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকায় বলা হয়েছে যে, বাকেরগঞ্জের মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন এবং সরকারের কাছে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য ছিল। ঐ তালিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরিশাল জেলার হজ যাত্রীদের টীকা দেওয়ার ব্যাপারে আঞ্জমান সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল।[২] ১৮৯৫ সালে 'পিলগ্রিমশিপ বিল' অনুসারে হজ যাত্রীদের প্রথম টীকা দানের নিয়ম চালু হয়। টীকা গ্রহণে অনেকের ধর্মগত আপত্তি ছিল।[৩] বরিশাল শহরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং নির্মাণের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য 'আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম' (১৮৯৫ সালে ফেব্রুয়ারীতে) একটি জনসভার আয়োজন করে। ঐ সভায় শায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন খান বাহাদুর ৫০০৲ টাকা চাঁদা দেন। তিনি ছিলেন ঐ সময় আঞ্জমনের সভাপতি।[৪] এই উদ্যোগের ফলে বরিশালের 'বেল ইসলামিয়া হোস্টেল' স্থাপিত হয় (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৫)। আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম সংগঠনটি আজও টিকে আছে।

আঞ্জমনে মঈনাল এসলাম (১৮৯৯)

এটি টাঙ্গাইলের আটিয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মসভা। এর সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। তিনি এবং সহযোগী গোলাম সরওয়ার ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করতেন। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র আদ্য অধিবেশনে (১৪ ও ১৫ এপ্রিল ১৯০৫) যোগদানের উদ্দেশ্যে আটিয়ায় আঞ্জমনের একটি সভা হয় (এপ্রিল ১৯০৫)। ঐ সভায় করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সভাপতিত্ব করেন। আঞ্জমনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন:

নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, জমিদার ও সব-রেজিস্ট্রার
তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, জমিদার
সাহেবজাদা ময়উদ্দিন আলী খান পন্নী

১. সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বরিশাল বেল ইসলামিয়া হোস্টেল, বরিশাল, ১৯৪০, পৃঃ ৫
২. *Revision of the List of Associations*, p. 32.
৩. *The Moslem Chronicle*, 22 August 1895.
৪. *Ibid.*, 24 February 1895.

দলিলউদ্দীন আহমদ, বিএ, গৃহশিক্ষক
মইনুদ্দীন আহমদ, সম্পাদক
মোতাহার আলী খান, করনীয়া হাই স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক।[১]

১২৯৭ সনে এটি স্থাপিত হয়।[২] ১৩০১ সনে প্রকাশিত মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব্য' থেকে জানা যায় যে, ঐ বছর আঞ্জমনের সভাপতি ছিলেন ওয়াজেদ আলী খান পন্নী।[৩]

রঙ্গপুর নূরল ইমান জামায়াত (১৮৯১)

'রঙ্গপুর নূরল ইমান জামায়াত' ১ শাবান ১৩০৮ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এটি একটি ধর্মবিষয়ক সভা। মুসলমান সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং ইসলাম ধর্মের সর্ব প্রকার উন্নতির চেষ্টা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত 'জামায়াতে'র সহকারী সম্পাদক খবরুজ্জমান খাঁ ২ আগস্ট ১৮৯১ সালে রঙ্গপুর থেকে একটি প্রচারপত্র 'ইসলাম-প্রচারকে' পাঠান। ইসলাম-প্রচারকের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হয়। তাতে 'জামায়াতে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে:

(১) এসলামধর্মের সারমর্ম সর্ব সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। পবিত্র কোরান শরিফ পাঠ করিয়া তাহার অর্থ, তফসির সকল ভাষায় সর্ব সাধারণকে শ্রবণ করান হইবে। বিধর্মীগণের অপরোপিত বাক্যে যুবকগণের মনে যে ধোকা বা শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা সদযুক্তি অবলম্বনে ভঞ্জন করা যাইবে। বালক-বালিকাগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধর্মবীজ বপন, উপদেশ বারি সেচন করিয়া যাহাতে সেই বীজ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত, ফলিত হইয়া উত্তরকালে সুশীতল ছায়া ও ফল দানে বালক-বালিকাগণকে অমৃতময় শান্তিসুখ প্রদান করে তাহার জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

(২) খোদাতালা তৌফিক দিলে নূরল ইমান এতদর্থে বেতনভোগী ওয়ায়েজ

---

১. মিহির ও সুধাকর, ২৮ বৈশাখ ১৩১১

২. ইসলাম-প্রচারকে (অগ্রহায়ণ ১২৯৮) এক সংবাদ-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১৫ চৈত্র ১২৯৮ আটিয়ার 'আঞ্জমনে নইমাল এসলামে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এ থেকে আঞ্জমনের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণীত হয়। ১২৯৭ সনের চৈত্র মাসের দিকে যদি এটি স্থাপিত হয়, তবে ইংরাজী সাল দাঁড়ায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

৩. মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব্য' দ্রষ্টব্য।

বা প্রচারক নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা মফঃস্বলের গ্রামে মসজেদে হাটে বাটে এসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

(৩) 'কেতাব চিরস্থায়ী উপদেশক, কেতাব অক্লান্ত প্রচারক' এইজন্য নূরল ইমান বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিবেন। এতদব্যতীত মুসলমান কওমের উপকার ও শিক্ষার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিবেন।

(৪) অন্যান্য স্থানের প্রচারক সমাজের সহিত নূরল ইমানের গাঢ় সহানুভূতি থাকিবে। বিলাতে ইংরেজগণের নিকট এসলামধর্ম প্রচার করিতে যে সকল ওয়ায়েজ বা প্রচারক প্রেরিত হইবেন, নূরল ইমান তাহাদিগকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।[১]

ঐ পত্রে জামায়াতের প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে যাঁর নাম করা হয়েছে তিনি হলেন আবদুল জলিল (রঙ্গপুর সরকারী ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক)। আবু আলী আহমদ আবেদ এবং ফরেজুল্লাহ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। প্রতি শুক্রবার জুমা মসজিদে নূরল ইমানের বৈঠক বসতো, এবং কোরান ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের শোনাতেন।[২] ঐ পত্রে ৫৯ জন চাঁদা দাতার একটি তালিকা আছে। যারা এক টাকা চাঁদা ও অন্য অন্য সাহায্য করেছেন তাঁদের 'হিতৈষী' সদস্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। তসলিমুদ্দীন বিএল, মহম্মদ নওশের (ডাক্তার), মহব্বত উল্লা (ইনস্পেক্টর), মুজিতউল্লা (উকিল), পীর বক্স (একাউন্টান্ট), সমিরুদ্দীন (মোক্তার) ও রহিম বক্স (দারোগা) এরূপ হিতৈষী-সদস্য ছিলেন।[৩] ১৮৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নূরল ইমানের একটি বিশেষ অধিবেশন মহীপুরের চৌধুরী আবদুল মজিদের জমিদার বাড়ীর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নূরল ইমানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের বুঝান হয়। সুশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক দ্বারা ধর্ম-প্রচার এবং ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও সমাজ-হিতকর গ্রন্থ প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর একটি শাখা সমিতি গঠন করা হয়। শাখাটির নাম হয় 'মহীপুর দায়রায় জমাত'। এর কর্মকর্তাদের নাম ছিল নিম্নরূপ:

সভাপতি—চৌধুরী আবদুল মজিদ, জমিদার, মহীপুর

সহ-সভাপতি—চৌধুরী মফিজউদ্দীন, জমিদার, মহীপুর ও শাহ নূরুল রহমান, জমিদার, মহীপুর

---

১. ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮
২. ঐ।
৩. ঐ, আশ্বিন ১২৯৮

সম্পাদক—শাহামতউল্লাহ ও শহর আলী
সহকারী-সম্পাদক—কসিমউদ্দীন ও জহুরউদ্দীন
অডিটর—আমিরউদ্দীন, হেড পণ্ডিত, মহীপুর স্কুল
রাইটার—গোলাম আলী।[১]

ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন দ্বারা মুসলমান সমাজের জাগরণ—'নূরল ইমান জামায়াতে'র কর্মকর্তাদের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছে।

কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন (১৮৯৩)

'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল নব্যশিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান। ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে এবং ১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করলে কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ও 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' পূর্বের গৌরব হারিয়ে ফেলে। সমাজে হতাশার সঞ্চার হয়। তখন সমাজহিতৈষী শিক্ষিত যুবকেরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সম্পর্কে আলোকসম্পাত করে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মোসলেম ক্রনিকলে' লেখা হয়,

"This Union composed of the flower of our rising generation, consisting of Moslem graduates and undergraduates. It is an energetic expression of the dissatisfaction with the present torpid state of the two Associations which exist, and which are not of that use, which they used to be in former days."[২]

'ইউনিয়নে'র কোন মুখপত্র অথবা বার্ষিক কার্যবিবরণী না থাকায় এর উদ্যোক্তাগণ কে ছিলেন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলা যায় না। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "আজ ৬।৭ বৎসর হইতে মাননীয় ইসলাম প্রচারক সম্পাদকসহ আমরা একটি জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং কলিকাতায় তাহার ভিত্তি স্থাপন পূর্বক ধীর মন্থরগতিতে কয়েকটা অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেও সমর্থ হইয়াছি। বর্তমান সময় 'শিক্ষা সমিতি' নামে যে সমিতির ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, তাহাও উক্ত সভারই উদ্যোগের মহান ফল।"[৩] এটি

১. ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮
২. *The Moslem Chronicle*, 12 Sept., 1895.
৩. মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী—ইসলাম ও মিশন, ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০;

যে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন'কে ইঙ্গিত করছে, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এর জন্মসূত্রের সহিত জড়িত ছিলেন। মোসলেম ক্রনিকলে (২২ আগস্ট ১৮৯৫) প্রকাশিত একটি পত্র থেকে জানা যায়, ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সোলায়মান ছিলেন ইউনিয়নের ঐ সময়ের সভাপতি। দশ বছর পর ইসলাম-প্রচারকে ইউনিয়নের ১১৭ জন সদস্যের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। ঐ তালিকা থেকে প্রধান কর্মকর্তাদের নিম্নরূপ নাম পাওয়া যায়:

সভাপতি—মির্জা শুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর

সহ-সভাপতি—দেলওয়ার হোসেন বিএ, খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা, এমএ, বিএল, জেড. আর. জাহিদ, এমএ, বিএল ও হাসিবুদ্দিন আহমদ, বিএল

সম্পাদক—ওয়াহেদ হোসেন, বিএল

যুগ্ম-সম্পাদক—এ. কে. মোহাম্মদ সঈদ

সহকারী সম্পাদক—আবদুর রশিদ বিএ ও মোহাম্মদ ফজল।[১]

ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বেগম ফেরদৌস মহল, সি. আই., মহীশূর পরিবারের প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ, সি. আই. ই. ও করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর নাম আছে। তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইউনিয়নের শহর ও মফস্বলের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছেন। প্রিন্স, নবাব, জমিদার, ব্যারিস্টার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, লেখক, সম্পাদক, পদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। তালিকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশী। বাঙালী অবাঙালী উভয় শ্রেণীর মুসলমান ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত ছিলেন। মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা, মর্যাদারক্ষা ও উন্নতিবিধান কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ শিক্ষাবিস্তারের দিকে অধিক ঝোঁক ছিল।

হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে একটি বিল আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। সেকালের পত্রপত্রিকায় বিলের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ উঠে। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে সদস্যগণ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাহাজের ভাড়া বাড়লে গরীব হজযাত্রীর পক্ষে হজব্রত পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং

১. ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

পুরুষ ডাক্তার দ্বারা নারীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করলে পর্দানশীনতার হানি হবে— মুখ্যত: এ-দুটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি 'প্রস্তাবপত্র' কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়। তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ সোলায়মান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেটি প্রেরণ করেন।[১]

দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয় ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ কলিকাতার বি. এন. ইনস্টিটিউসনে (কলেজ)। এতে সভাপতিত্ব করেন এইচ. ই. এ. কটন, ব্যারিস্টার-এট-ল। সৈয়দ শামসুল হোদা 'ইণ্ডিয়ান পলিটিকস এ্যাণ্ড দি মহামেডান' সম্পর্কে একটি চিন্তাশীল জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি ঐ বক্তৃতায় ভারতের মুসলমান সমাজের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান মনোভাবটি কি, সে-সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বিচার বিভাগে 'জুরিপ্রথা'র উপরও মন্তব্য করেন। ঐ সভায় মুসলমান সমাজ কেন পিছিয়ে আছে, সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের স্থান কিরূপ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয়।[২] স্কুল-ইনস্পেক্টর প্রিয়নাথ ঘোষ এমএ মুসলমানদের সম্পর্কে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করায় ইউনিয়নের সম্পাদক এর প্রতিবাদ করে মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) পত্র লিখেছিলেন। বাঙালী মুসলমানের একটা স্পর্শকাতর আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছিল, এ থেকে তা জানা যায়।

১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালের মোসলেম ক্রনিকলে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন 'উডবার্ন-মেডাল' নামে একটি রৌপ্যপদকের ব্যবস্থা করে নিবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। ঐ বছরের জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'দি কণ্ডিশন অফ দি মহামেডান অব বেঙ্গল, বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা'। প্রবন্ধ পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল ইউনিয়নের উপর; ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় বিজয়ী পুরস্কার পাবেন।

মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষা যুগোপযোগী নয়; ঐরূপ শিক্ষায় অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপচয় হচ্ছে; সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার প্রয়োজন। মাদ্রাসার শিক্ষা-সংস্কার দাবী করে একটি লিখিত প্রস্তাবপত্র সরকারের নিকট ইউনিয়ন প্রদান করে।[৩] ইউনিয়নের প্রতি বছর বার্ষিক সভার ব্যবস্থা ছিল।

১৯০২ সালে ইউনিয়ন ভারত সরকারের কাছে একটি 'প্রয়োজনীয় বিষয়ে দীর্ঘপত্র প্রেরণ' করে।[৪] পত্রটি ছিল 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে'র গৃহীত

১. *The Moslem Chronicle*, 22 August 1895.
২. *Ibid.*, 12 September 1895.
৩. *Ibid.*, 21 January 1899.
৪. মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৭

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। ১৯০২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের সভা হয়। কমিশনের প্রস্তাব কার্যকরী হলে মুসলমান মধ্যবিত্ত ও দুস্থ লোকের পক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে—এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১]

১৯০৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নকে ঐ সমিতির প্রসূতি বলা যেতে পারে। ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ সালে ইউনিয়নের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়; সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী। ঐ সভাতে ইউনিয়নের তৎকালীন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।[২] ঐ সভায় বিলীকৃত 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' শীর্ষক একটি প্রচারপত্র পরবর্তীকালে কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন কর্তৃক একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।[৩]

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৪)

ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ১৮৯৪ সালের ১৯ জানুয়ারী কলিকাতায় স্থাপিত হয়।[৪] দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি এ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব ও নবাব বেগম ক্লাবের সদস্য ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব এবং ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ এককালীন অর্থ সাহায্য দেন। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন সি. আই. ই. এবং সম্পাদক ছিলেন আবদুল গণি। তিনিই ছিলেন এ ক্লাব প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র শক্তি।

১৮৯৫ সালের ৯ জানুয়ারী কলিকাতা মাদ্রাসা হলে এর প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সৈয়দ আমীর হোসেন সভাপতিত্ব করেন। খান বাহাদুর আবদুস সালাম এমএ 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৫] ঐ সময় এনায়েত করিম বিএ, ক্লাবকে ১৫০৲ টাকা মূল্যের একটি

১. *The Moslem Chronicle*, 20 September 1902.
২. মির্জা আবুল ফজল—প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, নবনূর, শ্রাবণ ১৩১০
৩. সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন—প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা, ১১ নভেম্বর ১৯০৩; বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ, খ, ১৯০৪
৪. *The Moslem Chronicle*, 17 January 1895.
৫. ঐ।

'সিলভার কাপ' দান করেন।[১]

১৮৯৬ সালে মে মাসে ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয়। এসময় সভার ৩৪ জন অনারেরী ও ৫৬ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। সম্পাদক আবদুল গণির অক্লান্ত উৎসাহ ও তারুণ্যদীপ্ত কর্মদক্ষতার জন্যই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই অগ্রগতি বলে 'মোসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয়। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ ৫০৲ টাকা এবং ব্যারিস্টার এরাদত উল্লাহ ১০৲ টাকা ক্লাবকে দান করেন।[২] এ বছর আগস্ট মাসে 'দি ক্যালকাটা মান্থলি' শিরোনামে ক্লাবের একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। ক্লাবের সদস্যবৃন্দের প্রযত্নেই এটি জন্ম লাভ করে। আবদুল গণি স্বয়ং পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, খেলধূলা বিষয়ক লেখা স্থান পায়।[৩]

১৮৯৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ও 'ডায়মণ্ড জুবিলী রিডিং রুমে'র যৌথ উদ্যোগে ৬ ওয়ালিউর লেনের বাড়িতে একটি 'ডিবেটিং ক্লাবে'র উদ্বোধনী সভা হয়। সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল করিম বিএ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ ইয়াসিন বিএ 'পাবলিক স্পিকিং' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের, ভাগে-দুর রহিম জাহিদ এমএ, বিএল এবং স্বয়ং সভাপতি সভায় ভাষণ দেন। তাঁরা উক্ত 'বিতর্ক সভা' স্থাপনের পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। মোহাম্মদ মদিনউল্লাহ এর সম্পাদক এবং সাদাত আবদুল মাস্তদ বিএ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৪] ঐ সময় হিন্দুগণ পরিচালিত 'ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাব' ছিল। 'পলস কাপ' প্রতিযোগিতায় ঐ ক্লাবকে পরপর দুবার পরাজিত করে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব শহরে বেশ নাম করে।[৫] ১৮৯৮ সালে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ঐ সময় থেকে 'স্যার সৈয়দ আহমদ লীগ কম্পিটিশন কাপ'-এর প্রচলন করে। এতে প্রতিযোগিতাধর্মী পাশ্চাত্য খেলাগুলিতে ভারতের যে-কোন দল অংশ গ্রহণ করতে পারত।[৬]

মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৪)

কলিকাতার 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে'র প্রথম বার্ষিক সভায় (৯ জানুয়ারী ১৮৯৫) খান বাহাদুর আবদুস সালাম 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি

১. *The Moslem Chronicle*, 4 January 1896
২. *Ibid.*, 2 May, 1896
৩. *Ibid.*, 26 September 1896
৪. *Ibid.*, 21 August 1897
৫. *Ibid.*, 18 September 1897
৬. *Ibid.*, 30 January 1898

পাঠ করেন, তাতে এক জায়গায় মন্তব্য করেন, উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের সহিত তুলনায় বাঙালী মুসলমানদের দৈহিক শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। শারীরিক চর্চার উপযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়ে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে'র জন্ম হয় (১৮৯৪)। সম্ভবতঃ উক্ত ক্লাব এবং আবদুস সালামের মন্তব্যের কথা স্মরণ করে ঢাকার ছাত্র সমাজ 'মহামেডান এসোসিয়েশন স্পোর্টিং ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠা করে। এক সময় ঢাকা কলেজের ছাত্ররা উৎসাহিত হয়ে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপন করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট একটি 'স্পোর্টিং ক্লাব' (১৮৯২) পূর্বেই ছিল। বাংলার ছোটলাট চার্লস আলফ্রেড এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) ঢাকা পরিদর্শনে এলে ক্লাবের সদস্যরা তাঁর কাছে খেলার মাঠের জন্য লিখিত ভাবে আবেদন জানান।[১]

মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন (১৮৯৬)

মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন ১৮৯৬ সালের মে মাসে কলিকাতায় স্থাপিত হয়।[২] কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ব্যারিস্টার আবদুর রহিম এবং উকিল মোহাম্মদ ইউসুফের নামাঙ্কিত একটি 'বিলিপত্র' (সারকুলার) 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' নামে প্রচারিত হয়। তাতে 'এসোসিয়েশনে'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বিলিপত্রের প্রথম বাক্যটি ছিল এরূপ: "All educated Muhammadan gentlemen who have applied themselves to the question of the welfare and progress of their community have long felt the use of an organisation whose deliberations and actions will be guided by a sole regard to its true interests unhampered by any other consideration and which by its constitution will be able to faithfully represent the views of the Muhammadans and at the same time command the public in

১. *The Moslem Chronicle*, 11. July 1895

২. মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনের জন্মের ইতিহাস, এক বছর পরে 'মোসলেম ক্রনিকলে' এভাবে লেখা হয়—

"... the Reform Association was formed only that year on account of some differences between some prominent and educated members of the Central National Muhammadan Association and the Secretary Hon'ble Nawab Syed Ameer Hossain who objected to the proposal from a very large and influential section of its members to make the position of the Secretary liable to be vacated and filled by rotation and election and is make some other rules to improve the constitution of the Central National Muhammadan Association." *The Moslem Chronicle*, 26 December, 1897

general as well as of the Govt."[১] এসোসিয়েশন যাতে ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়, এবং সমাজের মানুষের যাতে কর্তৃত্ব থাকে সেজন্য কার্যকরী সংসদের (কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট) সদস্যগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ চিন্তা ও উন্নতি সাধনায় এসোসিয়েশন নিবৃত থাকবে। সরকারের ন্যায়সঙ্গত ও মঙ্গলানুগামী কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করবে, তবে সমাজস্বার্থের পরিপন্থী হলে তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে। কোন সভা-সমিতির সাথে এসোসিয়েশনের বিরোধ থাকবে না, বরং সমাজের উন্নতিমূলক কাজে কলিকাতা ও বাইরের যে-কোন সভা-সমিতির সাথে সহযোগিতা করে চলবে।[২]

এই বিলিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৬ সালের ১৭ মে খান বাহাদুর নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ-এর সার্কুলার রোডস্থিত দিলার মঞ্জিলে মহামেডান [illegible] এসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সূচক প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নবাব সৈয়দ আসগর আলী এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, খান বাহাদুর মোহম্মদ ইউসুফ, (উকিল হাইকোর্ট), নবাব নাসির জঙ্গ বাহাদুর, ব্যারিস্টার আবদুর রহিম, (এডভোকেট, হাই কোর্ট), আবদুল জোয়াদ বিএল (উকিল, হাইকোর্ট), মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর, বসিরহাট), ব্যারিস্টার এবাদতুল্লাহ, মোহাম্মদ তাহির বিএল (উকিল, হাইকোর্ট), মোহাম্মদ মোস্তফা খান বিএল (উকিল, হাইকোর্ট), আবদুল হামিদ বিএ (সম্পাদক, মোসলেম ক্রনিকল), আমীরুদ্দীন আহমদ বিএ, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (জমিদার, শায়েস্তাবাদ), [illegible]উদ্দীন আহমদ বিএ, এস. এ. এ. আসগর, মোহাম্মদ ইশফাক বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)। এঁদের মধ্যে নবাব সৈয়দ আসগর আলী এসোসিয়েশনের কার্যকরী সংসদের সভাপতি, মোহাম্মদ ইউসুফ সম্পাদক, আবদুর রহিম যুগ্ম-সম্পাদক এবং মোহাম্মদ মোস্তফা খান ও সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন সদস্য ছিলেন।[৩] সৈয়দ আসগর আলী সভাপতির দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণে এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি বলেন, সমাজের উন্নতির জন্য যৌথশক্তির প্রয়োজন আছে। বাংলা ও বিহারের মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা করার মত যথার্থ সমিতি নেই। স্বয়ং সরকার

১. *The Moslem Chronicle*, 16 May 1896
২. *Ibid.*.
৩. *Ibid.*, 23 May 1896 (Supplementary)

ও অমুসলিম জনগণের ধারণা হয়েছে, মুসলমানদের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করার প্রতিনিধিমূলক ও আস্থাশীল সমিতির অভাব আছে। ওয়াকফ সম্পত্তি, গো-হত্যা, সরকারী দপ্তরগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যাসমূহ এখনও বিরাজ করছে। 'জাতির ভরসা স্বরূপ' নব্যশিক্ষিত তরুণদের কাজে উৎসাহিত করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকবে এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে। এসোসিয়েশন সমাজের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করবে।[১]

সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ সভাপতির ভাষণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। আবদুর রহিমের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বার্মার সরকার বার্মায় গো-হত্যা নিষেধ করে আইন পাশ করেছেন। বার্মার মুসলমানরা ঈদ-উৎসবেও গো-কোরবানী দিতে পারবে না। রেঙ্গুনের মুসলমানগণ যাতে ঈদ-পরবে গো-কোরবানী করে তাদের ধর্মীয় আচার যথাবিধি পালন করতে পারে সে বিষয়ে একটি 'স্মারকপত্র' ভারতের বড়লাটকে দেওয়া হবে। ভারতের বড়লাট ঐরূপ আইন রদ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন—এরূপ অনুরোধ স্মারকপত্রে থাকবে। বার্মার সরকার রেঙ্গুনস্থিত মুসলমানদের প্রথাগত ধর্মীয় আচারপালনে তাদের ন্যায় সংগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছেন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে মোহাম্মদ ইউসুফের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২]

১৮৯৬ সালের ২৪ মে সমিতির আরও একটি সভা হয়। শ্রীরামপুরে রিষড়ায় গো-হত্যা নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। মুসলমানদের আবেদন নাকচ করায় শ্রীরামপুর মহকুমার অফিসারের মনোভাবের বিরোধিতা করে এবং পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান যাতে স্ব স্ব ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন সে বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করা ও শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মসজিদে সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগের ফলে মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারেনি, এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে হুগলীর জেলাপ্রশাসক ও বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে একটি 'ডেপুটেশন' পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সদস্য থাকবেন মোহাম্মদ ইউসুফ, আবদুর রহিম, মোহাম্মদ মোস্তফা খান, মোহাম্মদ এরাদতুল্লাহ, মোহাম্মদ ইশফাক, আবদুল হামিদ..

১. *Op. cit..*

২. *Ibid..*

সৈয়দ রফিউদ্দীন এবং নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ। সভার সিদ্ধান্ত-সমূহ বাংলার ছোটলাটকে জানাবেন এসোসিয়েশনের সম্পাদক। এটি ছিল সভার শেষ প্রস্তাব। ব্যারিস্টার জহিরুদ্দীন এবং মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ বিএল (উকিল, হাইকোর্ট) আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।[১]

ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রচলিত আইনের বিরোধিতা করে আদালত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিবাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ ভারতের বড়লাটকে প্রদানের জন্য ১৮৯৬ সালের আগস্টে 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনে'র সভা হয়। মুসলমানের আইন ও ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি করে একটি স্মারকপত্র বড়লাটকে দেওয়া হয়।[২] ওয়াকফ সম্পত্তির প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিলে যায় এবং লর্ড স্টেনলির ওকালতিতে ইসলাম ধর্ম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বলবৎ থাকে। লর্ড স্টেনলিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব এসোসিয়েশন গ্রহণ করে আগস্ট মাসে অপর একটি সভায়। এলিয়ট হোস্টেল ও মুসলমান ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে এসোসিয়েশনকে সহযোগিতা করার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি ছিল একরূপ:

"That a conference be held of the representatives of the Hindu and Muhammadan communities to arrive at an amicable solution of the question of the slaughter of cows during the Bakrid, and that a sub-committee consisting of the President, Secretary and and joint Secretaries, the editor of the Moslem Chronicle and Maulvi Muhammad Mostafa Khan be formed to make the necessary arrangements and to settle the details relating thereto."[৩]

মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারকে[৪] কেন্দ্র করে কলিকাতার প্রধানতঃ আইনজীবী-রাই 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং স্বসমাজের আইন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। গো-হত্যা সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন এজন্য যে, দেশের প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে

---

১. *The Moslem Chronicle,* 6 June 1896

২. *Ibid.,* 1 August 1896

৩. *Ibid.,* 29 August 1896

৪. নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর বংশধর ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। *Ibid.,* 26 December 1897

অসন্তোষ, দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণ-যোগ্য একটি যথাবিহিত সমাধান বের করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তি-দের সমন্বয়ে গঠিত এসোসিয়েশনের আলোচনা ছিল যেমন কেতাদুরস্ত তেমনি সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিপূর্ণ, উদারতাসম্পন্ন ও যুগোপযোগী। সেকালের মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদা মিটাতে অসমর্থ. এরূপ অসন্তোষ থেকে মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন জন্মলাভ করলেও এটি সমাজে খুব বেশী প্রভাব ফেলতে পারেনি। এটি কলিকাতার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অন্যত্র বিস্তার লাভ করেনি।[১] সমকালীন বাংলা পত্রপত্রিকায় এসোসিয়েশনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এসোসিয়েশন সক্রিয় ছিল বলে ডক্টর সুফিয়া আহমদ উল্লেখ করেছেন।[২]

আঞ্জমনে আশ-আতে ইসলাম (১৮৯৬)

১৮৯৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে নোয়াখালীর আমজাদ আলী পেস্কারের বাটীতে 'আঞ্জমনে আশ-আতে ইসলামে'র প্রথম উদ্বোধনী সভা হয়।[৩] তৎ-কালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের বিএ সভার সভাপতি ছিলেন। বেতনভোগী ধর্মপ্রচারক দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচার আঞ্জমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য ঐ সভার প্রথম প্রস্তাব ছিল একটি প্রচার-সমিতি স্থাপন করা। এই প্রচার-সমিতির ধর্মপ্রচারকগণ সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কাছে ইসলামের উচ্চ আদর্শ ও নৈতিকজ্ঞান প্রচার করে সততা ও উন্নতির পথ দেখাবেন। এমন কি, যেখানে ইসলামের প্রভাব ক্ষীণ অথবা একেবারেই নেই, সেখানে তাঁরা ধর্মপ্রচার করবেন।[৪] আঞ্জমনের দ্বিতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল শিক্ষা-বিস্তারে উৎসাহ দান করা : এতোদ্দেশ্যে আঞ্জমন একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের আশা পোষণ করে।

---

১. এসোসিয়েশনের সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণে এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ মন্তব্য করেছিলেন। *Op. cit.*, 23 May 1896 (Supplementary)

২. *Muslim Community in Bengal*, p. 183

৩. আশ-আত অর্থ প্রচার; আঞ্জমনে আশ-আতে ইসলাম অর্থ ইসলাম প্রচার সমিতি।

৪. *The Moslem Chronicle*, 12 December 1896
মোসলেম ক্রনিকলের ১৮৯৭ সালের ৮ মে নোয়াখালীর জনৈক ব্যক্তির (এস. ইউ. এ.) একটি পত্রে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা কোরানের নির্দেশ ত্যাগ করে জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং কোরানের ধর্মশিক্ষা দ্বারাই তাদের জাগাতে হবে। ধর্ম প্রচারকগণ এ শিক্ষা দিয়ে সমাজকে সহজে জাগাতে পারবেন।

আঞ্জুমনের উদ্বোধনী সভায় একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম হল এরূপ :

সভাপতি—বজলুর রহিম বিএল
সহ-সভাপতি—মোজাফফর আহমদ
সম্পাদক—আবদুল আজিজ (১)
সহকারী সম্পাদক—আবদুল ওয়াদুদ বিএ
হিসাব-নিরীক্ষক—আশরাফ আলী (১)
কোষাধ্যক্ষ—আশরাফ আলী (২)
সদস্যবৃন্দ—আব্বাস আলী এমএ, আবদুল কাদের বিএ, আবদুল মজিদ বিএল, আবদুল আজিজ বিএ, ওয়াহিদ উদ্দীন আহমদ, আবদুল হালিম ও আবদুল মজিদ।[১]

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা

'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা'র সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম। ১৮৯৬ সালে সরকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব উঠলে 'হিতসাধিনী সভা' এর প্রতিবাদ করে। সিরাজুল ইসলাম সভার পক্ষ থেকে বাংলার ছোটলাট ও ভারতের বড়লাটকে স্মারকপত্র প্রেরণ করেন। আসামীদের ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্য ভিন্ন; সেখানকার ভূমির রাজস্ব পদ্ধতির সাথে বাংলার ভূমির রাজস্ব পদ্ধতির মিল নেই। এরূপ ক্ষেত্রে আসামের সাথে চট্টগ্রামের সংযুক্তি এতদঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। ঐরূপ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য স্মারকপত্রে অনুরোধ করা হয়।[২]

১৯১৭ সালেও ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার অস্তিত্ব ছিল। ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের মৃত্যুতে (১ আগস্ট ১৯১৭) হিতসাধিনী সভার উদ্যোগে কলিকাতায় একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নবাব স্যার শামসুল হোদা এতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির ভাষণে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আবদুর রসুলের সাথে তাঁর মতভেদের কথা স্বীকার করে বলেন, "---আমি সব সময় তাঁর গুণগ্রাহী ছিলাম আর তাঁর মতামতের মূল্য দিতাম।"[৩]

---

১. *The Moslem Chronicle*, 12 December 1896
২. *Ibid.*, 11 January 1895
৩. আবুল ফজল (সম্পাদিত)—সাংবাদিক মজিবর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ১০৭

বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯)

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। 'বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা' সম্পর্কে একটি লিখিত ইংরাজী ভাষণ পাঠ করেন ময়মনসিংহের ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ভাষণটির ইংরাজী তরজমা 'ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শিরোনামে ১৯০০ সালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে 'দি মহামেডান সোসাইটি ফর ভার্ণাকুলার লিটারেচার' নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সঙ্গে তিনি যে 'সার সৈয়দ আহমদ মেমোরিয়াল ফাণ্ড কমিটি'র সম্পাদক ছিলেন, সেকথাও উল্লিখিত হয়েছে।[১] সুতরাং ঐ সময় 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র অস্তিত্ব ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলাম প্রচারকের সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ তাঁর আত্মজীবনীতে ঐরূপ 'সাহিত্য সমিতি'র উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে ও শেখ সাহেবের (শেখ আবদুর রহিম) সম্পাদকতায় কিছুদিন একটি সাহিত্য সমিতি চলিয়াছিল। আমরা অনেকে ইহার মেম্বর ছিলাম। ঐ সাহিত্য সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হইত।" সাহিত্য সমিতির সম্পাদক হিসাবে শেখ আবদুর রহিমের নাম এখানে পাওয়া যায়। মোহাম্মদ ইদরিস আলী একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, উক্ত সমিতি পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে (১৯১১) রূপান্তরিত হয়।[২] ১৩১১ সনের আষাঢ় মাসের 'নবনূরে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভাষণটি মূলতঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল।[৪] ঐ যুগে হিন্দু লেখকগণকৃত ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও অন্যান্য রচনায় কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে কলঙ্কিত ও হীনবীর্য করে চিত্রিত করা হচ্ছিল, সেগুলির প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যেই যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' স্থাপিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমিত হয়। পরবর্তীকালে হবীবুল্লাহ বাহার 'সাহিত্য সমিতির ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "শান্তিপুরের কবি মরহুম মোজাম্মেল

১. Syed Nawab Ali Chowdhury—*Vernacular Education in Bengal*, Calcutta, 1900
২. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৪
৩. ঐ।
৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩৮৩

হক সাহেবের একখানি কবিতা পুস্তকে কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সভা'র উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৩০৬ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। এর প্রথম সভাপতি নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। ১৩১১ সালের ১৯শে বৈশাখ কলিকাতা কাপালিটোলার নবাব বাটীর বিরাট দালান গৃহের বিশেষ অধিবেশনের যে রিপোর্ট মরহুম মোজাম্মেল হক সাহেব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নবাব সৈয়দ আমীর আলী সি. আই. ই. সাহেব। সভায় মাননীয় নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, নবাব বদরুদ্দীন হায়দার, ব্যারিস্টার এম. হোসেন, মওলবী আবদুল হামিদ বিএ, মওলবী আবুল কাসেম বিএ (বর্ধমান) প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।"[১] তিনি ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, "যে সভায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় সেই সভা বসিয়াছিল আন্তনি বাগানস্থিত (বর্তমান বলিয়া লজ) মওলবী আবদুর রহমান খাঁ সাহেবের বাড়ীতে। তাঁহার যতদূর মনে পড়ে মুনশী শেখ আবদুর রহিম, মুনশী মোহাম্মদ রেযাজউদ্দীন আহম্মদ, কবি দাদ আলী, মুনশী রওশান আলী চৌধুরী, কবি মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, মওলবী মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মুনশী আবুল হোসেন, মওলবী আবদুর রহমান খাঁ, মওলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলবী মুজিবর রহমান, সুফী আমীন উদ্দীন, মুনশী আসাদ আলী, মওলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মওলবী ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুনশী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মুনশী মেহেরুল্লা, মুনশী শেখ রেয়াজউদ্দীন, মওলবী আবদুল কুদ্দুস রুমী প্রভৃতি শতাধিক মুসলিম সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় মুনশী শেখ আবদুর রহিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"[২] হবীবুল্লাহ বাহার মোজাম্মেল হকের যে 'কবিতা পুস্তকে'র কথা বলেছেন, সেটির নাম হল 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৩১৯)। এই সংকলনের 'উদ্দীপনা' কবিতাটি 'সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র সভা উপলক্ষে রচিত হয়। 'উদ্দীপনা' সম্পর্কে কবি প্রদত্ত টীকায় লেখা হয়, "কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতির প্রথম বর্ষের (১৩০৬ সালের) বিশেষ কোন অধিবেশনে পাঠের জন্য সমিতির সুযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী মাননীয় নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেবের আদেশে লিখিত

১. হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃঃ ৪৮৯
২. ঐ, পৃঃ ৪৯০ (পাদটীকা)

হয়।"[১] এই উক্তি থেকে এবং হবীবুল্লাহ বাহারের বিবরণ থেকে স্পষ্টতঃই বলা যায় যে, সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ। অনেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'কে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক যুগ পূর্বে একই বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা তাঁরা লক্ষ্য করেননি। তবে একথা সত্য যে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মত বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি সুগঠিত ছিল না। সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' (ত্রৈমাসিক ১৯১৮) প্রকাশিত হয়। ১৯১৭-১৮ সালের কার্যনির্বাহক কমিটির যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই প্রথমোক্ত সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন।[২] মহামেডান লিটারেরী সোসাইটিতে বাংলা ভাষার চর্চা হত না। ঊনিশ শতকের নয় দশকের গোড়া থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী মুসলমানের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকগণ খুব সম্ভব সোসাইটির কার্যের প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মিক প্রেরণাবশেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' স্থাপন করেন।

সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৯৯)

কলিকাতার খিদিরপুরের এই প্রতিষ্ঠানটির পূর্বনাম ছিল 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া', ১৮৯৭ সালে সেটি স্থাপিত হয়। তখন এর রক্ষণশীল, ইসলামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যুগের প্রয়োজনে এটির সংস্কার সাধন প্রয়োজন হয় এবং উদ্যোক্তরা উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর পুনর্গঠন করে নামকরণ করেন 'সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন'। প্রিন্স কাদের মির্জা মোহাম্মদ আবেদ আলী, প্রিন্স মির্জা মোহাম্মদ জালাল, আবদুল হামিদ বিএ, আবদুল কাদের (আলিপুরের

---

১. সমিতির কর্মীদের উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন,

দিবা নিশি এঁরা প্রিয় স্বজাতির,
পরিণাম ভেবে হইয়া অধীর,
দীর্ঘ নিশ্বাসি ফেলে নেত্রনীর,
কাতর হৃদয়ে ব্যাকুল মনে।
কিসে তিরোহিত হবে দুরগতি,
সাধন করিতে কিসে সমুন্নতি,
তাহার চিন্তনে নাহিক বিরতি
দেখনা নিরত যতেক জনে।

মোজাম্মেল হক—জাতীয় ফোয়ারা, কলিকাতা, ১৯১১, পৃঃ ৬ (পাদটীকা)

২. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ২০৬-০৯

ভূতপূর্ব পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট), আব্বাস আলী প্রমুখ এর সাথে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন।

১৯০০ সালের ৪ নভেম্বর খিদিরপুরের আলবার্ট হাউসে এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রহিম (ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট)। সভায় প্রিন্স মির্জা দেলওয়ার জঙ্গ বাহাদুর, মির্জা সুজাত আলী বেগ, শেখ মোহাম্মদ আলী, আবদুল হামিদ (মোসলেম ক্রনিকল সম্পাদক), এস. বি. মিত্র বিএসসি, এমবি (লণ্ডন), বিজয়-কৃষ্ণ বসু বিএল, দাউদর রহমান এল. এম. এস. এমবি, আমিরুদ্দীন আহমদ বিএ, আবদুল লতিফ (ডাক্তার), মুসা খান (ডাক্তার), আবদুর রহমান (ডাক্তার), নূর মোহাম্মদ ইসমাইল, মীর সৈয়দ আলী, সৈয়দ ওসমান আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অতীত ইতিহাসসহ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করে শোনান হয়। ঐ রিপোর্টে এসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াসের উপর মন্তব্য করে বলা হয়: "The promoters deeply conscious of the failures of public bodies like these in the legitimate discharge of duties, have been ever anxious and solicitous to maintain consistantly with the spirit of progress in the community and the requisite safeguards against a too free door for democratic fads, a representative character. ..., though primarily to protect the interest of the Moslem community, its aims and objects are none the less catholic, and it will be always ready to co-operate in all movements for the general public weal."[১] এরূপ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যাপীড়িত দুর্গতদের এবং সাধারণ গরীবদের চিকিৎসার জন্য কমদান বাগান লেনে যে অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় ঐ সময় স্থাপিত হয়েছিল সেটিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি ডঃ মিত্র উত্থাপন করেন, সৈয়দ ওসমান আলী সমর্থন করেন। মুসলমান গোরস্থানের অবস্থার উন্নতির জন্য আর একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং তা গঠিত হয়।[২]

আঞ্জুমনে নুরুল ইসলাম (১৮৯৯)

আঞ্জুমনে নুরল ইসলাম যশোহরের মনোহরপুর গ্রামের একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। মহাতাবউদ্দীন (ডাক্তার) এর প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত আঞ্জুমনের প্রথম

১. *The Moslem Chronicle*, 10 November 1900
২. *Ibid.*.

নাম ছিল 'শুভকরী; পরে 'প্রভাকর' এবং শেষে 'আঞ্জমনে নূরল ইসলাম' নামটি নির্দিষ্ট হয়। 'মিহির ও সুধাকরে' এক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে লেখা হয়, "বর্তমান ১৩০৯ সালের ২৪শে শ্রাবণ শনিবার তারিখে ইহার আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে আমাদের পরম ভক্তিভাজন মোসলেমকুল শিরোরত্ন যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ সৈয়দ নূরল হোদা সাহেবের যশোহর অবস্থানের স্মরণচিহ্নের জন্য উক্ত 'প্রভাকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'নূরল ইসলাম' রাখা হয়।"[১] ঐ প্রতিবেদনের শুরুতে আছে, "প্রায় তিন বছর গত হইল যশোহর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাতাবউদ্দীন সাহেবের প্রযত্নে 'শুভকরী' নামে এক সমিতির সৃষ্টি হয়।"[২] এ থেকে আঞ্জমনের প্রতিষ্ঠার কাল দাঁড়ায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ।

'আঞ্জমনে নূরল ইসলামের' প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ মনোহরপুরে একটি 'নিম্ন প্রাথমিক স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা। অতি অল্পকালের ব্যবধানে ঐ স্কুলটিকে 'প্রভাকর' নাম দিয়ে 'মধ্য ইংরাজী স্কুলে' পরিণত করে, এবং তৎসঙ্গে 'মাদ্রাসা আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও পারশী ক্লাস' খোলার ব্যবস্থা করে। ৯ই মাঘ ১৩০৭ সনে আঞ্জমনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলীর নামানুসারে স্কুলের নাম রাখা হয় 'মাদ্রাসা কারামতিয়া'।[৩] বিখ্যাত বাগ্মী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মাদ্রাসার 'সেক্রেটারী' নির্বাচিত হন। ১৩০৮ সনের কার্তিক মাসে এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। খোন্দকার তোফেল উদ্দীন (উকিল) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, মৌলবী আবদুল করিম, মুনশী কাসেম আলী ও গণ্যমান্য অনেক হিন্দু-মুসলমান এ অধিবেশনে যোগদান করেন। উপযুক্ত স্থানে মাদ্রাসার নতুন

১. মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

২. ঐ। 'মাদ্রাসায়ে কারামতীয়া বিবরণী সম্বলিত সাময়িকপত্র' 'নূরল ইসলামে' সম্পাদক মুনশী মেহেরুল্লাহ অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়---"এই উদারচেতা, স্বধর্মরত, সর্বজনপ্রিয়, সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিচারক জজ বাহাদুর (সৈয়দ নূরল হোদা) যশোহরে থাকাকালীন মাদ্রাসার দরিদ্র সেক্রেটারীকে (মেহেরুল্লাহকে) সুমধুর ভাষায় 'ইসলাম মিশন স্থাপন' ও মাদ্রাসায় কারামতীয়ার উন্নতি বিধান করিতে উৎসাহ প্রদান পূর্বক স্বয়ং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ---তাঁহার যশোহরে আগমনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ 'নূরল হোদা'র নামের সংস্পৃষ্ঠ আমরা 'নূরোল ইসলাম সমিতি', নূরোল ইসলাম মিশন', ও 'নূরোল ইসলাম পত্রিকা'র সূত্রপাত করিলাম।" নূরল ইসলাম, ২ বর্ষ, ১৩০৮, যশোহর, পৃঃ ৮

৩. প্রাগুক্ত, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

গৃহ নির্মাণ ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মুনশী মেহেরুল্লা শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি তৎসঙ্গে শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ে একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। সমিতি ও মাদ্রাসার একজন উদ্যোগী সদস্য তাঁহা বখশ দেড় বিঘা জমি মাদ্রাসার গৃহনির্মাণের জন্য দান করেন।[১]

১৩০৯ সনের আশ্বিন মাসে আঞ্জমনের অপর একটি অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব নেওয়া হয়। 'মিহির ও সুধাকরে'র প্রতিবেদনের ভাষায় সেটি এরূপ: "যশোহরে গভর্নমেন্ট সার্কুলার অনুসারে পাঁচ জন স্কুল সব-ইনস্পেক্টরের মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও ২ জন মাত্র হিন্দু হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহার আর একটা পদ খালি হয়। কিন্তু স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের ষড়যন্ত্রে ঐ পদে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের জনৈক এন্ট্রাস ফেল কেরানী নিযুক্ত হন। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের ঐ কর্মের প্রতিবাদ এবং তাহার প্রতিকার জন্য সদাশয় কমিশনের দৃষ্টিগোচর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ও ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট পৃথক পৃথক দরখাস্ত পাঠান যাউক।"[২] এ অধিবেশনের অন্যান্য সিদ্ধান্ত ছিল (১) মাদ্রাসা চিরস্থায়ী করার উপায় নির্ধারণ, (২) পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধন, এবং (৩) নিকটবর্তী নদী, খাল পারাপারের জন্য সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ।[৩] লক্ষণীয় যে, 'আঞ্জমনে নূরল ইসলাম' শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হলেও স্বসমাজের স্বার্থের দিকে এর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এবং সেজন্য আঞ্জমন একটা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নও উত্থাপন করেছে। সামাজিক অবিচার এবং সরকারী আইনকে যুক্তি হিসাবে খাড়া করা হয়েছে। তা [illegible] সভ্যগণের এরূপ প্রকাশ্য দাবীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১. প্রাগুক্ত, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

২. মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯
প্রতিবেদনে পরে বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবটি শীঘ্রই পাঠানো হয়, বিভাগীয় কমিশনার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট এর জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৮৯৪ সালের ২৫ জুন তারিখের ৮০ ধারা মোতাবেক বাংলার 'জনশিক্ষা পর্ষদে'র বিজ্ঞপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যানুপাতে শিক্ষা বিভাগে এ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।
The Moslem Chronicle, 11 July 1896

৩. মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

মোসলমান শিক্ষা সভা (১৮৯৯)

শিক্ষামূলক এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ইসলাম-প্রচারকে' ঐ সভার বর্তমান অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। এতে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়: "এই জেলাতে (চট্টগ্রামে) মোসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ প্রদানার্থে মোসলমান শিক্ষাসভা স্থাপিত হইয়াছে।"[১] মোসলমান শিক্ষাসভা প্রতিষ্ঠার পর তিনটি কাজে সফল হয়েছে। ঐ পত্রের ভাষায় এগুলি হল:

(১) মোসলমান ছাত্রদিগের জন্য একটি ছাত্র নিবাস স্থাপন। স্বর্গীয়া শ্রীশ্রীমতি ভারতেশ্বরীর প্রতি সম্মানচিহ্ন স্বরূপ এই ছাত্র নিবাসের নাম 'চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোষ্টেল' রাখা হইয়াছে।

(২) একটি পাঠাগার স্থাপন। এই সভার ভূতপূর্ব সভাপতি লী সাহেব বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতাচিহ্ন স্বরূপ এই পাঠাগারের নাম 'লী ইসলামিয়া রিডিং রুম' রাখা হইয়াছে।

(৩) স্থানীয় জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ খাঁ মরহুম হোষ্টেল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য শহরের মধ্যভাগে সুপরিচিত জুমা মসজিদের পার্শ্বস্থ ২,০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের সুন্দর স্বাস্থ্যজনক অত্যুচ্চ পাহাড়টি বিনা মূল্যে সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদার দ্বারা প্রায় ৫,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।[২]

তা ছাড়া, শিক্ষা সভার বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়ের খতিয়ান আছে, সরকারের অনুদানের উল্লেখ আছে। সভার গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন—এজন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান হয়েছে। "উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ হইলে, সভা উপযুক্ত গরীব মোসলমান ছাত্রদিগকে মাসিক বৃত্তি এবং সাহায্য প্রদান করিয়া, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য এবং হাদিস তফসির শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। মাদ্রাসা, পুস্তিকালয় এবং অফিস গৃহের জন্য আরও ১০,০০০৲ টাকার আবশ্যক হইবে। ... মোসলমান ছাত্রেরই সম্মিলিত চেষ্টা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থাপন্ন এবং সহৃদয় মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর এই কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে।"[৩] আবেদনপত্রটি প্রেরণ করেছেন সভার সম্পাদক আবদুল

১. ইসলাম-প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০

২. ঐ

৩. ঐ

আজিজ বিএ। সভার সভাপতি হিসাবে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার সি. জে. এস. ফগুরের নাম এতে আছে। লী সাহেব ছিলেন ভূতপূর্ব সভাপতি সরকারের সাথে যোগসূত্র রেখে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্নয়নের নীতি পূর্বের সভাসমিতির মত মোসলমান শিক্ষাসভাও অনুসরণ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল আজিজের এই প্রয়াস মুসলমান সমাজের সেযুগের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণের আন্দোলনকেই সূচিত করে। আবদুল আজিজ ছিলেন সভার প্রধান প্রাণশক্তি। তিনি ঐ সময় চট্টগ্রামের জজকোর্টের 'মোক্তজম' ছিলেন।

মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৯)

ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নবাব পরিবারের খাজা মাহমুদ ইউসুফ, সম্পাদক আবদুর রহমান মাহমুদ। ক্লাবকে মুসলমান সমাজের দৈহিক, নৈতিক ও বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার অভিপ্রায় উদ্যোক্তাদের ছিল। 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক আবদুর রহমান মাহমুদ বলেছেন যে, খেলাধুলাই ক্লাবের একমাত্র লক্ষ্য নয়, জ্ঞানচর্চার জন্য পাঠ কক্ষ স্থাপনের উচ্চ লক্ষ্যও ক্লাবের আছে। কলিকাতার 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' থেকে প্রেরণা লাভ করে তারই আদর্শে ঢাকার 'মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবে'র পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা, তা ঐ পত্রে ব্যক্ত হয়েছে।[১]

কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা

"মিঃ আবদুর রহিম সাহেব কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত মহোদয় উক্ত সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য, মুসলমান ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা।"[২] 'কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা' শিরোনামে 'মিহির ও সুধাকরে'র একটি নিবন্ধে সভা সম্পর্কে উক্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্যারিস্টার আবদুর রহিম ১৯০০-১৯০৩ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দ অনুযায়ী জুলাই ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ হয়। সুতরাং ঐ সভাটি ১৯০০-১৯০২ এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল।

১. *The Moslem Chronicle*, 12 August 1899
২. মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯

১৩০৯ সনের আষাঢ় মাসে আবদুর রহিমের গৃহে ঐ শিক্ষা সভার একটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর এডওয়ার্ড ডেনিসন রস (১৯০১-১১)। এছাড়া, খান বাহাদুর দেলওয়ার হোসেন, শামসুল হোদা প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি 'আদর্শ মক্তব স্থাপন' সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষাসভা ঐ মক্তবকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য দেবে, তা স্থির হয়। ঐ উদ্দেশ্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট থেকে চাঁদাও সংগৃহীত হয়। অতঃপর মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। 'মিহির ও সুধাকর' লিখেছে, "মাননীয় আমীর আলী ... যাহাতে মক্তবে ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব ঔর্ধকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার অনুকূলে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে জজ সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইল। তৎপরে মি. রস সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে, কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলিবে। রস সাহেবের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।"[১] পরের সিদ্ধান্ত ছিল, মক্তবে প্রতিমাসে একটি করে বক্তৃতা হবে; প্রথম মাসে 'ইসলামনীতি' সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন রস সাহেব, দ্বিতীয় মাসে দেলওয়ার হোসেন আহমদ, তৃতীয় মাসে শামসুল হোদা।

রস সাহেব বাংলা ভাষা বিরোধী মন্তব্য করায় এবং ঐরূপ মন্তব্যযুক্ত প্রস্তাব সভায় 'সর্বসম্মতিক্রমে' গৃহীত হওয়ায় তাঁদের মনোভাবের জন্য ঐ নিবন্ধে ঘোর আপত্তি করা হয়। "আবদুর রহিম সাহেব বাঙ্গালা দেশের মুসলমান; তিনি এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ও উচ্চপদে সমাসীন হইয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণকে ভুলিয়া কতিপয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতার শিক্ষার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার উন্নতিকল্পে সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থী হইয়াছেন। ... কলিকাতাস্থ কথিত জননেতাগণ বঙ্গীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে যে-সকল কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ বিজড়িত তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উপকারের আশা কিছুমাত্রই নাই।"[২] বাঙালী মুসলমান ও অবাঙালী মুসলমানের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্য চেতনাটি এখানে লক্ষণীয়। একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মধ্যেকার উর্দুর প্রতি মোহ থাকলেও বাংলার প্রতি অনুরাগী লোকেরও আবির্ভাব হয়েছে। বাংলা ভাষা ও

১. মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
২. ঐ

বাঙালীর স্বার্থ সম্পর্কে তাঁরা কেবল অভিমানই পোষণ করেন না, তৎসঙ্গে তাঁরা আপোষহীন মনোভাবও পোষণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ভাষাপ্রীতির মধ্য দিয়েই বাঙালী মুসলমানের প্রথম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়।

মোসলেম ইনস্টিটিউট (১৯০২)

১৯২২-২৩ সালের মোসলেম ইনস্টিটিউটের বার্ষিক রিপোর্টে ইনস্টিটিউটের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে বলা হয়: "The Moslem Institute owes its origin to the intellectual activities of the young members of the Moslem community. As early as the year 1900 the two associations were formed in the immediate vicinity of the Calcutta Madrassah as cultural and educational centres of Moslem students in the various colleges in Calcutta. The two parent institutions were the Moslem Debating Society and the Society for Mutual Improvement of Youngmen Literary and Social Work. In the growing interest of its enthusiastic founders in the literary and social work which these institutions, were doing, Mr. H. A. Stark, the then Headmaster of the Calcutta Madrassah saw the possibility of a great institution, which could in time expand into an important centre of intellectual culture, social intercourse and healthy recreations if given right guidance and generous patronage, and consequently he brought about a fusion of both the organisations in 1902 "[১]

১৯০০ সালের গোড়ার দিক গঠিত দুটি প্রতিষ্ঠান—'মোসলেম ডিবেটিং সোসাইটি' এবং 'সোসাইটি ফর মিচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট অব ইয়ংমেন লিটারেরী এণ্ড সোস্যাল ওয়ার্ক'কে কলিকাতা মাদ্রাসার তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মি. এইচ. এ. স্টার্ক ১৯০২ সালে একত্র করে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা, সামাজিক মেলামেশা ও চিত্তবিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে মোসলেম ইনস্টিটিউটের গোড়াপত্তন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর পরই মুসলমান সমাজের অভিনন্দন এবং সরকারের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। মি. স্টার্ক এর প্রথম সভাপতি হন; ডক্টর ই. ডেনিসন রস প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং শামসুল উলেমা কামাল

১. *Report of the Moslem Institute*, Calcutta, 1922-23, p. 17

উদ্দীন আহমদ প্রথম অনারেরী সম্পাদক হন। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ছিলেন এ. এফ. এম. আবদুল আলী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ হাশিম, খান বাহাদুর আবদুল মুকতাদির, এ. এম. এফ. ওয়াহাব, এ. এম. রশিদ প্রমুখ।[১] এঁদের মধ্যে আবদুল আলী ও ওয়াহাব ছিলেন আবদুল লতিফের পুত্র। ওয়াহাব পরবর্তী দুবছর সম্পাদক হন। ১৯০৫-০৬ সালে সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক চৌধুরী। মোসলেম ইনস্টিটিউটের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য চর্চা। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে ইনস্টিটিউটের ইংরাজী মুখপত্র 'জর্নাল অব দি মোসলেম ইনস্টিটিউট' প্রথম প্রকাশিত হয়। এ. এফ. এম. আবদুল আলী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এটি চতুর্মাসিক পত্র ছিল। নব্যশিক্ষিত তরুণরা এতে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে মননশীল প্রবন্ধ লিখতেন। আবদুল আলী, হাসান শহিদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ হেদায়েত হোসেন, সৈয়দ আবদুল লতিফ, মৌলবী আবদুল লতিফ, এম. আবদুল হালিম, সৈয়দ আওলাদ হোসেন প্রমুখ জর্নালের প্রথম দিকের লেখক ছিলেন। পত্রিকাটি পরবর্তীকালে 'মুসলিম রিভিউ' (১৯২৬) নামে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য চর্চা ছাড়া অন্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল সাপ্তাহিক বিতর্ক, বক্তৃতা, সামাজিক মিলনসভা, বিশেষ সভানুষ্ঠান ইত্যাদি। শরীর-চর্চার জন্য আন্তঃখেলাধুলারও ব্যবস্থা ছিল। কলিকাতার মোসলেম ইনস্টিটিউট এখনও টিকে আছে। ১৯৩১ সালে তালতলাস্থিত ইনস্টিটিউটের বর্তমান গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন তদানীন্তন গবর্নর।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩)

প্রচার ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র পরেই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র স্থান। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র উদ্যোগে এটি জন্ম লাভ করে। শিক্ষাবিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স' (১৮৮৬) নামক সর্বভারতীয় সভানুষ্ঠান। সৈয়দ আহমদ (১৮১৭ -৯৮) এর উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৯৯ সালে প্রথমবারের মত কলিকাতায় 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র অধিবেশন হয়। সৈয়দ আমীর আলী ও কলিকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আগ্রহ, পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতায় এটি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে এবং যথাবিধি প্রচারের মাধ্যমে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি

১. *Report of the Moslem Institute*, p. 17

করে। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ শিক্ষানুরাগী এখান থেকে প্রেরণা লাভ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' সংগঠনের পরিকল্পনা করেন।[১] 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র অনুরূপ এক এক বছরে প্রদেশের এক এক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র যে সভায় (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩) সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন এ-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সে সভায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় একটি 'প্রচারপত্র' বিতরণ করেন। সেটি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকটও প্রেরণ করা হয়। ঐ প্রচারপত্রে শেষের দিকে সমিতির 'তত্ত্বাবধায়ক কমিটি'র সদস্যবৃন্দের নাম দেওয়া হয়েছে; তাঁরা হলেন:

সভাপতি—মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর

সহ-সভাপতি—দেলওয়ার হোসেন আহমদ, খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ, বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)। জোয়াদর রহিম জাহিদ এমএ, বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)।

সম্পাদক—সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন বিএ, বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)।

সদস্য—আবদুল হামিদ, বিএ (সম্পাদক মোসলেম ক্রনিকল) ও আবদুর রহমান।[২]

প্রচারপত্রে বাংলার মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দুর্গতি ও ভগ্ন মনোভাবের বর্ণনা দিয়ে কি উপায়ে সেগুলি দূর করা যায় তার উপায় স্বরূপ শিক্ষা সমিতি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় বলে ওয়াহেদ হোসেন উল্লেখ করেছেন। সমাজের আশু ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এবং সেগুলি কার্যকরী করার ক্ষমতার বিচারে ঐ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলিকে 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষ' নাম দিয়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য:

(১) মুসলমান সমাজের শোচনীয় অবস্থার কথা আঞ্চলিক ভাষায় তুলে ধরার জন্য জেলায় জেলায় সমিতির অধিবেশন করা।

(২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

১. ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০

২. ঐ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

(৩) মুসলমান সমাজে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-অনভিজাত লোকের মধ্যে ভেদাভেদ ও দূরত্ব দূর করে পরস্পর সম্প্রীতি ও সহানুভূতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তোলা।

(৪) জড়, স্থবির, হীনমন্য, হৃতবীর্য, হতাশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সমাজে আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্যমশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ সমাজকর্মী গড়ে তোলা।[১]

পরোক্ষ উদ্দেশ্য :

(১) মুসলমান ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি ফার্স্টগ্রেড রেসিডেন্সিয়াল কলেজ স্থাপন।

(২) অনুবাদ বিভাগ স্থাপন দ্বারা আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

(৩) নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন এবং প্রাচীন ও সমকালীন গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

(৪) অর্থকরী বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(৫) নারীশিক্ষার প্রসার ও তজ্জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৬) সর্বশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ওয়াজ-নসিহত দ্বারা ধর্মপ্রচারের জন্য জেলায় জেলায় শিক্ষিত ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান আলেমগণকে প্রেরণ।[২]

১৩১০ সনের ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া শহরে সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ শামসুল হোদা। অধিবেশনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য পূর্বেই এক সভায় (১৪ ও ১৫ কার্তিক ১৩১০) কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন প্রেরিত প্রতিনিধি (মুনশী মেহেরুল্লা ও মির্জা ইউসুফ) ও রাজশাহীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দায়িত্বভার বণ্টন করা হয়েছিল। 'কার্য পরিচালক কমিটিতে ছিলেন নাটোরের জমিদার মোহাম্মদ এরশাদ আলী খান চৌধুরী (সভাপতি), সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন (সহ-সভাপতি), শেখ আহমদ হোসেন (সম্পাদক), খোন্দকার হামেজউদ্দীন (সহকারী সম্পাদক), মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (অনারেরী সম্পাদক), মোহাম্মদ মানিক উল্লা (কোষাধ্যক্ষ), নসিমউদ্দীন আহমদ (পরিদর্শক), সেরাজউদ্দীন আহমদ ডাক্তার (সদস্য),

---

১. ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০

২. ঐ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

বেলালউদ্দীন (মোক্তার), লুৎফর রহমান বিএ, এলাহী বক্স (ইনস্পেক্টর), মোহাম্মদ সোলেমান খান চৌধুরী প্রমুখ।[১]

দুদিনব্যাপী উক্ত অধিবেশনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'ইসলাম-প্রচারকে'র এক প্রতিবেদনের ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল এরূপঃ

- মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তার সহজসাধ্য করিবার জন্য, জেলায় জেলায় 'ডিষ্ট্রিক্ট এডুকেশন ফণ্ড' বা 'শিক্ষা তহবিল' স্থাপনের উপযুক্ত অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এবং স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের সাহায্য এবং যে-সকল উপযুক্ত গরীব ছাত্রকে সাহায্য দানে উৎসাহিত করা উচিত, তাহাদের জন্য প্রত্যেক জেলায় শিক্ষা তহবিলের টাকা সেই জেলায় ব্যয়িত হওয়া উচিত। (প্রথম প্রস্তাব)
- এই শিক্ষা সমিতির মতে সাধারণ বিদ্যার সহিত কৃষি শিল্পাদি শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধন করা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। (দ্বিতীয় প্রস্তাব)
- এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক এসলামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় ধর্মশিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত থাকা কর্তব্য। (তৃতীয় প্রস্তাব)
- এই সমিতির বিবেচনায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষার প্রতি যথোচিত মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। (চতুর্থ প্রস্তাব)
- অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সমিতির মতে পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। (পঞ্চম প্রস্তাব)
- এই শিক্ষা সমিতির বিবেচনায় সমিতির উদ্দেশ্যাবলী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা এবং মফঃস্বলবাসী লোকদিগকে বুঝাইয়া প্রত্যেক জেলায় এক একটি সভা স্থাপন করা আবশ্যক। এই সমিতির স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটির পরামর্শ লইয়া জেলার শিক্ষা-তহবিল ও অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন করা উক্ত স্থানীয় সভার কর্তব্য কার্য্য হইবে। (ষষ্ঠ প্রস্তাব)
- বর্ত্তমান সময়ে বহু সংখ্যক মুসলমান বালক স্কুল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য পাঠোপযোগী

১, ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৩

পুস্তক অতি বিরল থাকায় এই সমিতির মতে ঐরূপ পুস্তক সংগ্রহের জন্য সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে গ্রন্থকারদিগকে পুরস্কার অথবা ছাপা খরচ দিয়া উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং যাহাতে পাঠোপযোগী পুস্তকগুলি টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয় এবং মুসলমান বালকদিগের জন্য ও সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগে উক্ত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হওয়া আবশ্যক। (সপ্তম প্রস্তাব)

৮ এই সমিতির মতে বঙ্গদেশীয় মক্তব ও মাদ্রাসাসমূহে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী সন্তোষজনক নহে, তজ্জন্য যাহাতে উক্ত প্রণালীর পরিবর্তন হইতে পারে, তাহার এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।[১] (নবম প্রস্তাব)

সভার 'চতুর্দশ প্রস্তাব' অনুসারে একটি 'স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটি' গঠিত হয়। কমিটির গঠনরূপ ছিল নিম্ন প্রকার:

পৃষ্ঠপোষক—মুর্শিদাবাদের নবাব-বেগম সাহেবা ও ঢাকার নবাব বাহাদুর

সভাপতি—সৈয়দ শামসুল হোদা ও মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর

প্রতিনিধি সভাপতি—দেলওয়ার হোসেন খান বাহাদুর, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী জমিদার, করটিয়া, আলী নওয়াব চৌধুরী, খান বাহাদুর, জমিদার, ত্রিপুরা ও আবদুল মজিদ চৌধুরী, জমিদার রংপুর।

কোষাধ্যক্ষ—সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ, বিএল।

সম্পাদক—ওয়াহেদ হোসেন বিএ, বিএল

সদস্যবৃন্দ—এরশাদ আলী খান চৌধুরী (জমিদার, নাটোর), মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ (জমিদার, দিনাজপুর),

---

১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

প্রস্তাবগুলি উত্থাপন, সমর্থন, অনুমোদনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, আবদুল হামিদ, এরশাদ আলী খান চৌধুরী, অসিমুদ্দীন আহমদ বিএ, মুন্সী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, লুৎফর রহমান বিএ, সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মির্জা সুজাত আলী বেগ, মেসেরউদ্দীন আহমদ (দিনাজপুর), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ রওশন আলী, ইব্রাহিম খান (ময়মনসিংহ), মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ওবায়দুল হক (চট্টগ্রাম), দেওয়ান নাসিরুদ্দীন ('সোলতান' পত্রিকার ম্যানেজার)।

> মোহাম্মদ তাহা (মতওয়াল্লি, রংপুর), মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, মোজাম্মেল হক, চৌধুরী আবদুর রহমান ও এস. কে. এম. রওশন আলী।[১]

কমিটিতে অবাঙালী কেউ নেই, উর্দুভাষী বাঙালী অবশ্য আছেন। নবাব, জমিদার, সরকারী কর্মচারী, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছে। এরূপ সমন্বয়ই সম্পাদক ওয়াহেদ হোসেনের স্বপ্ন ছিল।[২]

শিক্ষা সমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশন হয় ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও-এর জমিদার খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরীর 'খোরশেদ মঞ্জিল' নামক প্রাসাদের সম্মুখ-ভাগে সুসজ্জিত চাঁদোয়া তলায়। তিনি ছিলেন স্থানীয় 'অভ্যর্থনা কমিটি'র সভাপতি। স্থানীয় জমিদার সৈয়দ হোসসাম হায়দার চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী, মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী চৌধুরী, শাহ সৈয়দ এমদাদ হক প্রমুখেরও দান ছিল অপরিসীম।[৩] সভার সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহমুদন্নবী। প্রবন্ধ পাঠক ও বক্তা ছিলেন মির্জা সুজাত আলী বেগ, হবিব হোসেন, মিসেস আজিজ, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (সোলতান সম্পাদক), মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (কোহিনুর সম্পাদক) প্রমুখ। মির্জা সুজাত আলী বেগ ইংরাজীতে প্রবন্ধ পড়েন; হবিব হোসেন ও মিসেস আজিজ লক্ষ্ণৌ থেকে আগত, তাঁরা যথাক্রমে উর্দু ও ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী, নোয়াখালীর জমিদার বজলোর রহমান খান বাহাদুর, বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি) প্রমুখ এবং স্থানীয় আলেম, মওলানা, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণীর বহু লোক ছিলেন। সভার প্রস্তাবসমূহ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[৪]

দু দিনের মোট ৪টি অধিবেশনে প্রায় ১৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; (১) শিক্ষা তহবিল স্থাপন, (২) মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ রীতি প্রবর্তন, (৩) বঙ্গভঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা, (৪) মুসলমান বালকের ধর্মশিক্ষা, (৫) মক্তব ও মাদ্রাসায় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দানের প্রথা প্রবর্তন, (৬) মহসিন ফণ্ডের সদ্ব্যবহার, (৭) মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য

১. ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
২. সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩) দ্রষ্টব্য।
৩. কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২
৪. ঐ।

ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে একত্র করেছেন। এটাই শিক্ষা সমিতির স্বাতন্ত্র্যের দিক, এখানেই তার সাফল্যের চাবিকাঠি।

সমিতি-প্রতিষ্ঠার শুরুতেই মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর কণ্ঠে আশাবাদের সুর ছিল: "আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই পর্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির সমর্থনকারী শতাধিক সমাজহিতৈষী শিক্ষিত লোকের নাম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছি। মুসলমানগণের সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও কৃষি প্রভৃতি বিষয় সমূহ সভার আলোচ্য বিষয়ের প্রধান অঙ্গ থাকিবে। ...এসো ভাই! যুক্তশক্তি দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্মবলিদান করি।"[১] মোসারত আলী খান লিখেছেন, "অধঃপতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের দুরবস্থা দর্শন করিয়া দুই চারিটি কোমলপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, ইহা বাস্তবিকই এক শুভ লক্ষণ। ...ভ্রাতৃগণ আসুন, উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া বস্তুর রাজ্যে প্রবেশ করি এবং সমাজ হিতকর এই গভীর কার্য্যের যতটুকু পারি, সাধন করিতে চেষ্টা করি।"[২] মির্জা আবুল ফজলের অভিমত: "এই অধঃপতিত সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তিনি (ওয়াহেদ হোসেন) যেরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কতকটা কৃতকার্যতার আশা করা যাইতে পারে।...ইহা নিশ্চিত যে এমন কোন কারণ নাই যাহাতে কোন স্বজাতিবৎসল, সমাজহিতৈষী ও কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান ভ্রাতা নিজেদের পদগৌরবরূপে লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধারে উক্ত মতের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে সক্ষম হন।"[৩] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, "মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন এখনও তিরোহিত হয় নাই, এখনও আত্মোৎসর্গে স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিবেন বলিয়া অনেকে প্রবল প্রতাপে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল যদি মায়ামরীচিকা না হইয়া আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচায়ক হয়, তবে মুসলমান-শিক্ষাসমিতির দ্বারা বাঙালী মুসলমান সমাজের অজ্ঞানান্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।"[৪] আফতাবউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "সম্প্রতি বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির আবির্ভাবে অভাব পূর্ণ হইবার প্রত্যাশায় বিশেষ সুখ অনুভব করিতেছি।... ব্যক্তিগত কিম্বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিসর্জন দিয়া, বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান

১. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী—বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি, মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

২. মির্জা আবুল ফজল—প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি, নবনূর, শ্রাবণ ১৩১০

৩. মোসারত আলী খান—বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা, মিহির ও সুধাকর, শ্রাবণ ১৩১০

৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—মুসলমান-শিক্ষা সমিতি, সাহিত্য, চৈত্র ১৩১০

ইহাতে সরল হৃদয়ে যোগদান করিয়া, ইহাকে সঞ্জীবিত ও উন্নতি করিতে যত্নবান ও বদ্ধপরিকর হউন।"[১] কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী উচ্চকিত কণ্ঠে বলেছেন, "প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতির দুন্দুভিনিনাদে সঞ্জীবনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া আমরা পুলকে আত্মহারা হইয়াছি। আশার সম্মোহন মধুর বাণীতে আমরা প্রলুব্ধ হইয়াছি। ...মুসলমান শিক্ষা-সমিতির দ্বারা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অজ্ঞানান্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।"[২] নবনূর পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্যই হইতেছে শিক্ষার বিস্তার করা। এইজন্যই আমরা প্রাদেশিক শিক্ষাসমিতির সর্বপ্রকারে বলসঞ্চয় কামনা করি। কারণ এতদ্দারা আমাদের অনেক সৎকার্য সংসাধিত হওয়ার আশা আছে। .. শিক্ষায়-দীক্ষায় যাঁহারা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শীর্ষ স্থানীয় তাঁহারা ভেদনীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইহাতে নির্ভয়ে যোগদান করিবেন এবং এই সমিতির প্রাণস্বরূপ হইয়া নিদ্রিত সমাজে এক নবযুগের সঞ্চার করিবেন।"[৩] সমকালীন পত্র-পত্রিকায় সমাজবিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এসব মন্তব্য থেকেই সমাজের মধ্যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি'র প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বুঝা যায়।

বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি (১৯০৪)

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' ও 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' গঠনের পরিকল্পনা একই কালে প্রায় একই শ্রেণীর নেতৃবর্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান 'ইসলাম-প্রচারকে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০) 'ইসলাম ও মিশন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানেই তিনি 'ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঐ ধরনের সমিতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গঠনপ্রণালী ও কর্মপন্থা সম্পর্কেও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন, যৌথশক্তি ও পরিকল্পিত পদ্ধতি ছাড়া অধঃপতিত মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রচারকের মাধ্যমে সমাজের ব্যাধিগুলি প্রথমে দূর করে তবে উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচী প্রস্তাব-

১. আফতাবউদ্দীন আহমদ—বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা (১), ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

২. সম্পাদক—প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি, কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২

৩. নবনূর, শ্রাবণ ১৩১২

আকারে উত্থাপন করেছেন। এগুলি হল (১) মিশন তহবিল গঠন করা, (২) চরিত্রবান প্রচারক তৈরি করা, (৩) সমিতির সদস্যগণ নিয়ে একটা কার্যপরিচালক কমিটি গঠন করা, (৪) কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য কলিকাতায় কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা, (৫) মিশন-সমিতির নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, (৬) সমিতির মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ করা, (৭) পত্রিকা, প্রচারপত্র, গ্রন্থ অনুবাদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা, (৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা থেকে শুরু করে 'জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়' এমন কি 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা।[১]

প্রবন্ধের শেষে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে: রংপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরীর উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে ইতিমধ্যে একটি 'প্রচার-সমিতি' ও একটি 'প্রচার-ফাণ্ড' স্থাপিত হয়েছে।[২] আমরা পূর্বে দেখেছি, 'রংপুর নূরল ইমান জমায়াতে'র (১৮৯১) শাখা হিসাবে 'মহীপুর দারলাম জমাত' নামে একটি ধর্মসভা আবদুল মজিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও উপযুক্ত ও আদর্শবান ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে ইসলামধর্ম প্রচারের কথা বলা হয়েছে। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সম্ভবত উক্ত জমাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

খ্রীস্টান মিশনের অনুকরণে ইসলাম মিশন তৈরি করে ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা দীর্ঘকাল আগে থেকে ছিল বলে মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর একটি রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' স্থাপনের সংবাদ পরিবেশন করে বলেছেন, "ইসলাম মিশন সমিতি স্থাপিত হইল। মুসলমানদিগের বহুদিনের একটা সঙ্কল্প অদ্য কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ যে বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছিল—আল্লাহতাআলা এতকাল পরে সেই মিশন-কমিটি 'মিশন-ফণ্ডে'র ভিত্তি স্থাপন করিতে মুসলমানদিগকে শক্তি প্রদান করিলেন। মিশন কমিটি দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান জাতিসমূহ পৃথিবী কিরূপ মহামহা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়—হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠে।"[৩] তিনি বলেছেন, রামপুর বোয়ালিয়ায় ২০ চৈত্র, ১৩১০ সনে ওয়াহেদ হোসেনের সভাপতিত্বে 'একটি মহতী সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সে-সভায় তিনি নিজেই 'মিশন

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—ইসলাম ও মিশন, ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১১

২. ঐ।

৩. মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী—বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি, ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা পূর্বক নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর তিনি সভার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,

(১) অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানবসমাজের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতন ইসলাম ধর্মভাস্করের অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন।

(২) ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীদিগের অন্যায় আক্রমণ হইতে ইসলাম-ধর্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা-বিধান এবং আবশ্যক মত আক্রমণ গুলির প্রতি উত্তর প্রদান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীগণের প্রকাশিত ইসলামধর্মের প্লানিকর ট্রাক্ট বা পুস্তিকাগুলি প্রতিবাদকরণ এবং বিধর্মীদিগের আশঙ্কিত সন্দেহ ভঞ্জন।

(৩) হতচেতন মোসলেম সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্মনিষ্ঠা।

(৪) ইসলামধর্মের সংস্কার উন্নতি চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট বা পুস্তিকা এবং পত্রিকাদি প্রকাশ করা।

(৫) বঙ্গের সর্বত্র ধর্মসভা স্থাপন পূর্বক সমাজস্থ লোকদিগকে স্বধর্মে আস্থাবান করা।

(৬) সর্বত্র বিধর্মীদিগের মধ্যে এবং স্বীয় সমাজে সনাতন ইসলাম ধর্মের প্রচার করা।

(৭) মফঃস্বলের গ্রামে ...ইসলামধর্মের প্রচার জন্য সাধ্যানুসারে বেতন-ভোগী বা সমাজের কার্য্যে প্রাণোৎসর্গকারী বক্তা বা প্রচারক নিযুক্ত করিয়া তদনুরূপে প্রচারকার্য নির্বাহ করা।

(৮) মফঃস্বলের জেলা ও প্রধান স্থানসমূহ মুসলমানদিগের যে সমস্ত সভা-সমিতি আছে, সেগুলির সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন এবং আবশ্যকমতে তাহার সাহায্য করা।[১]

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর প্রস্তাবে নিম্নরূপ সদস্যদের নিয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠনের কথা বলা হয়:

পৃষ্ঠপোষক—মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর সৈয়দ শামসুল হোদা উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট।

সভাপতি—আবদুল মাজিদ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর।

সম্পাদক—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, ইসলাম-প্রচারক ও সোলতানের সম্পাদক।

সহকারী সম্পাদক—মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, কোহিনুর সম্পাদক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, সমাজসেবক ও সাহিত্যিক।

১. ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

কার্য-পরিচালক সদস্য— ওয়াহেদ হোসেন, বিএল, মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সব-রেজিস্ট্রার, শেখ জমিরুদ্দীন, শাহ আবদুল্লা, মোহাম্মদ ইসমাইল, দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহমদ বিএ, আবদুল হামিদ, মোসলেম ক্রনিকল সম্পাদক ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, সব-রেজিস্ট্রার।[১]

আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম

ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জ মহকুমার টেঙ্গাপাড়ার 'আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম' নামে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মুনশী ইব্রাহিম খান। রাজশাহীতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ও সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।[২] স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে ইব্রাহিম খান ঘোর প্রচারণা চালান। এতোদ্দেশ্যে তিনি একটি সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত 'লাল ইস্তেহার' বিলি করেন। 'আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম' সেটি প্রকাশ করে।[৩] এরূপ সাম্প্রদায়িক প্রচারপত্রের জন্য তিনি আদালতে অভিযুক্ত হন। পত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করে দিবেন এরূপ শর্তে এবং ১০০০, টাকা ব্যক্তিগত জামিনে তিনি খালাস পান।[৪] বঙ্গবিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন হয়, আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। আঞ্জুমনের সম্পর্ক ছিল সৈয়দ আহমদের 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে'র (১৮৮৮) সাথে। এটি কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী ছিল।[৫] ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের সাথে এ-সম্পর্কের জন্যই আঞ্জুমনের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ হয়।

---

১. ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

২. ঐ।

৩. *Muslim Community in Bengal*, p. 276

৪. *Ibid.*, p. 276

"The red Pamphlet made its first appearence in December 1906, and was circulating in parts of Rajshahi and in the Kishoregunj Subdivision of Mymensing in April 1907." *Home Political Proceedings A, July 1907*

হিন্দু-বিদ্বেষ যে লাল ইস্তেহারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়:—

"একদিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি। দেখ, বঙ্গদেশে তোমাদের সংখ্যা অধিক, তোমরা কৃষক, কৃষিকাজেই ধন উৎপত্তির বীজ, হিন্দু ধন কোথা পাইল, হিন্দুর ধন বিন্দুমাত্রে নাই। হিন্দু কৌশলে তোমাদের ধন নিয়া ধনী হইয়াছে। ...আমরা স্বজাতির আন্দোলন করিয়া আত্মোন্নতি করিব।" *The Bengalee*, 5 May 1907.

৫. *Muslim Community in Bengal*, p. 105

মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি

মেদিনীপুরে 'মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। ওসমান আলী বিএ ও সৈয়দ আবদুল গাফফার আলকাদরি সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, ঐ জেলার মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করা। ১৮৯৬ সালের মহরম উৎসবে সোসাইটি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে; এজন্য জেলার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সোসাইটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।[১] 'মেদিনীপুর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে সোসাইটির সম্পর্ক ভাল ছিল না। মোসলেম ক্রনিকলে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ও সংগঠনদ্বয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।[২]

মহামেডান লিটারেরী একাডেমী

'মহামেডান লিটারেরী একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হয়। নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে একাডেমী একটি শোকসভার আয়োজন করে। সভাটি ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই কলিকাতা মাদ্রাসার হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় পাঁচশ লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ. বিএল। বক্তৃতা করেন একাডেমীর সম্পাদক এ. এইচ. আবদুল হামিদ, মোসলেম ক্রনিকলের সম্পাদক আবদুল হামিদ বিএ, ছোট আদালতের ইন্টারপ্রিটার মোজাম্মেল ইসলাম বিএ. মোহাম্মদ সোলায়মান ব্যারিস্টার, সৈয়দ আজিজুল নবি এবং সভাপতি স্বয়ং। একাডেমীর পক্ষ থেকে সভায় আবদুল লতিফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং আবদুল লতিফের স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে মোট তিনটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। সম্পাদক এ. এইচ. আবদুল হামিদ আবদুল লতিফের উদ্দেশ্যে রচিত একাডেমীর 'স্মৃতিলিপি' পাঠ করেন। তিনি তার বক্তৃতার একস্থানে একাডেমীকে 'একটি ক্ষুদ্র স্থানীয় প্রতিষ্ঠান' বলে উল্লেখ করেছেন। এতথ্য পরিবেশন করে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' (৩১ জুলাই ১৮৯৩) পত্রিকা।[৩] 'মহামেডান লিটারেরী একাডেমী' ঐ বছর অথবা তার পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

১. *The Moslem Chronicle*, 18 July, 5 September 1896

২. *Ibid.*, 18 July 1896

৩. *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, pp. 288-94

আঞ্জমনে ইসলামিয়া

'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' নাম দিয়ে বাংলার ও ভারতের নানা প্রদেশে অনেকগুলি সমিতির নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এক বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় পনের-ষোলটির হদিস পাওয়া যায়। বছর অনুক্রমিক সাজালে এগুলি এরূপ দাঁড়ায়: ময়মনসিংহ (১৮৭৫), নোয়াখালী (১৮৮৫), কুমিল্লা (১৮৯১), ফরিদপুর (১৮৯২), জলপাইগুড়ি (ঐ), শ্রীহট্ট (১৮৯৪), দিনাজপুর (ঐ), খিদিরপুর (১৮৯৭), সিরাজগঞ্জ (১৮৯৮), পাবনা (১৯০৫)। এছাড়া, বীরভূম, নাটোর, উলুবেড়িয়াতেও (হুগলী) ছিল। বাংলার বাইরে পাটনা, পুনা, অমৃতসর, লাহোর, বেরেলী, ছাপরা, বদাউন, গুজরাট, জব্বলপুর, কানপুর, ওয়াজিরাবাদ, মুলতান, আম্বালা, পেশওয়ার, জলন্ধর, আজমীর, গুরুদাসপুর, লক্ষ্ণৌ, ভিজাগাপত্তম, রুড়কি প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া যায়।[১] 'আঞ্জমনে ইসলাম' (১৮৮৬) নামে একটি প্রতিষ্ঠান লণ্ডনেও ছিল।[২]

সংশোধিত 'লিস্ট অব এসোসিয়েশনস' (১৯২৩) থেকে জানা যায় ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং পাবনার আঞ্জমন পরবর্তীকালে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে।[৩] সমিতিগুলির কোন কোনটি কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যেমন সিরাজগঞ্জের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত।[৪] উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে'র সাথে ময়মনসিংহ ও রংপুরের আঞ্জমনে ইসলামিয়ার সম্পর্ক ছিল।[৫] ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং রাজনীতি ছিল এগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুসলমান সমাজের অনেক পদস্থ কর্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এগুলির সাথে জড়িত ছিলেন। তবে মোল্লা-মৌলবী শ্রেণীর প্রভাবও ছিল। নামের সাথে আরবীর আলখাল্লা পরে আঞ্জমনগুলি স্বসমাজের স্বার্থকেই বড় করে দেখত। অনেক ক্ষেত্রে অনুভূতি ছিল স্পর্শকাতর, দৃষ্টিভঙ্গিও সাম্প্রদায়িক। এগুলি সমাজ স্বার্থের পরিপন্থী ঘটনাবলী নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছে। ধর্মীয় শিক্ষার সমর্থনে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক

---

১. *The Moslem Chronicle*, 25 December 1896
২. Jafar-ul-Islam – The Aligarh Political Activities, *The Journal of the Pakistan Historical Society*, January 1964
৩. *Revision of the List of Associations*, pp. 30-52
৪. *Muslim Community in Bengal*, p. 179
৫. *Ibid.*, p. 205

ছিল বেশী। অনেকগুলি আবার দীক্ষিত ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তারের চিন্তা করেছে। পুরাতন মূল্যবোধ নিয়ে এগুলি সমাজকে ধর্মহীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে সত্য; কিন্তু আধুনিক জীবনের সাথে সম্পর্ক না থাকায় সমাজের উন্নতিতে অধিক অবদান রাখতে পারেনি। এগুলি সমাজের পশ্চাদগামী শক্তি হিসাবেই কাজ করেছে। 'মুসলিম লিগ' (১৯০৬) গঠিত হওয়ার পর তার দেশব্যাপী প্রভাব পড়লে আঞ্জমনগুলি লীগের সাথে ক্রমশঃ মিশে যায়। সমালোচক লিখেছেন, "...Anjumans were organised which came to represent the small class of English educated Muslims together with a small section of the ecclesiatical and feudal elements. The Anjuman-i Islamiats (Association of Islam) could be termed as the forerunner of the Muslim League before the latter became a mass organisation in the thirties and forties of the present century."[১]

(১) ময়মনসিংহ (১৮৭৫)

সময়ের দিক থেকে ময়মনসিংহের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' বেশ প্রাচীন, অথচ তার ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। '১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় ময়মনসিংহের আঞ্জমন ইসলামিয়ার নাম পাওয়া যায়। ঐ সময় এর সভ্য সংখ্যা ছিল ৫১১; করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সভাপতি, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ও স্যার এ. কে. গজনবী সহ-সভাপতি এবং শাহাবুদ্দীন আহমদ (ময়মনসিংহের উকিল) সম্পাদক ছিলেন। ময়মনসিংহের আঞ্জমান যে সুগঠিত ছিল, এতে তাই প্রমাণিত হয়। এটি ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়, ঐ তালিকায় তার উল্লেখ আছে।[২] আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মকথায় ময়মনসিংহের আঞ্জমনের কিছু বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বিএল পাশ করার পর 'দি মুসলমান' পত্রিকার কাজ ত্যাগ করে ময়মনসিংহের জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন (১৯২৩)। তিনি ঐ সময় আঞ্জমনে ইসলামিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এ. কে. গজনবী বাংলার ছোটলাটের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত হলে তাঁর স্থলে আবুল মনসুর আহমদ সহ-সভাপতি হন। তখনও ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সভাপতি ও শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদক ছিলেন। আবুল মনসুর কংগ্রেসকর্মী ছিলেন;

১. N. K. Sinha—*History of Bengal (1757-1905)*, p. 305
২. *Revision of the List of Associations*, p. 31

ময়মনসিংহের আঞ্জমন ছিল কংগ্রেসের বিরোধী। তিনি বলেছেন যে, আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বে স্থানীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের অনুরোধে তিনি এ পদ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, আঞ্জমনের সাথে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জেলার প্রজা-সমিতির কর্মী সম্মিলনে আঞ্জমন বিরোধী ভূমিকা নিলে তিনি সহ-সভাপতি পদে ইস্তফা দেন।[১]

(২) চট্টগ্রাম (১৮৮০)

'১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় 'দি ইসলাম এসোসিয়েশন' (চট্টগ্রাম ১৮৮০) নামে যে এসোসিয়েশনের উল্লেখ আছে, সেটিই চট্টগ্রামের 'আঞ্জমনে ইসলাম'। জমিদার থেকে কৃষক পর্যন্ত সমাজের সব স্তরের লোক আঞ্জমনের সদস্যভুক্ত ছিলেন।[২] ১৮৯৬ সালে পরাগলপুরের জমিদার রৈহুন্নেসা খাতুনের সম্পত্তি ধ্বংসমুখী হলে আঞ্জমন তাঁর পক্ষ নিয়ে ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির (১৮৯৫-৯৮) কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে আবেদন জানায়। 'বোর্ড অব রেভিনিউ'র ওপর বিষয়টি তদারক করার দায়িত্ব ছিল। আঞ্জমন সেখানেও সুপারিশ করে।[৩]

(৩) নোয়াখালী (১৮৮৫)

নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় টাঙ্গাইলের 'আখবারে এসলামীয়া' পত্রিকায়। ঐ পত্রের ২য় ভাগ ৬ সংখ্যায় (আশ্বিন ১২৯২) উক্ত আঞ্জমন সম্পর্কে নিম্নের সংবাদ প্রকাশিত হয়—"নোয়াখালীর গবর্নমেন্টের খাস তহশীলদার জনাব মৌলবি বদিউল আলম, জমীদার জনাব মৌলবি আবদুল আজিজ খাঁ সাহেবানের প্রযত্নে তথায় এসলামীয়া সভা নামে একটা সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের নিঃস্ব এবং উপায়হীন মুসলমান বালকদিগকে শহরে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান এবং আপনার সামাজিক উন্নতির প্রতি সভার সম্পূর্ণ লক্ষ্য। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ শোচনীয় দুরবস্থা এমত অবস্থায় তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হৃদয়বান হিন্দু-মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। যাহারা এই সৎকার্য্যে যোগ দিয়াছেন তাহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দি। জিলার কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট এ. বড়ুয়া সাহেব, ইসলামীয়া সভায় ১০৲ দানে প্রতিশ্রুতি হইয়াছেন। খাস তহশীলদার জনাব

---

১. আবুল মনসুর আহমদ—আমার দেখা রাজনীতির ত্রিশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৫-৬৮

২. ঐ, পৃঃ ৪৯

৩. *The Moslem Chronicle*, 22 August, 10 October 1895

মৌলবী বদিউল আলম সাহেবের পত্নী জনাব জমিলা খাতুন বিবি সাহেবা মুসলমান বালকগণের উপকারার্থে এককালে এক শত টাকা দান করিয়াছেন. বঙ্গীয় রমণী-সমাজ জনাব জমিলা খাতুনের অনুবর্তী হইলে বঙ্গের অনেক শুভ সাধিত হইবে।''

'সুধাকর' পত্রিকায় নোয়াখালীর 'জনৈক মুসলমান' প্রেরিত একটি পত্র (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৯) ছাপা হয়। ঐ পত্রে 'নোয়াখালী এসলামিয়া সভা'র ১ ডিসেম্বর ১৮৮৯ সালে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অধিবেশনটি হয় নোয়াখালীর খাস মহলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট মোহাম্মদ বদিউল আলমের বাসগৃহে। শহরের শরীফ মুসলমানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভূম্যধিকারী ও জেলাবোর্ডের সদস্য মোজাফফর আহমদ সভাপতি হন। সভায় নিম্নরূপ চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয় (বদিউল আলম প্রস্তাবক ও ফজলল করিম সমর্থক ছিলেন):

(ক) বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদানার্থ উপযুক্ত মুসলমান ছাত্র প্রেরণ সম্বন্ধে আন্দোলন ও অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতাস্থ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের নিকট পত্র লিখা হউক।

(খ) গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন-পূর্বক শ্রীযুক্ত মুন্সী ওহাজদ্দিন আহমদ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এই সভা তাহার পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন, এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই সভার ব্যয়ে উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহার ৪০০০ সংখ্যা বিনামূল্যে দেশমধ্যে বিতরিত হউক।[1]

(গ) মীর মোশারফ হোসেন 'গোজাতি নির্মূল আশঙ্কা' শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধ আহমদীতে প্রকাশ করেন, তাহাতে মুসলমান ধর্ম বিগর্হিত অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং লেখক ইচ্ছাপূর্বক মুসলমান ধর্মের প্রতি প্রথমে তীব্র কটাক্ষ পরে ভ্রূকুটি এবং অবশেষে অযথা ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৌলবী নৈমুদ্দিন সাহেব শাস্ত্রসম্মতরূপে উক্ত প্রবন্ধগুলির প্রতিবাদ করায়, মীর সাহেব তাঁহার নামে মানহানির যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, এই সভা তজ্জন্য মৌলবী সাহেবের প্রতি আন্তরিক ও অকৃত্রিম সহানুভূতি

১. ওহাজুদ্দীন রচিত 'গো-বধে আপত্তি কেন' (১৮৯০) পুস্তিকাটি ঐ প্রবন্ধেরই ফল। তৃতীয় অধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাময়িক' অংশ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ করিতেছেন। এই সভা ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, মৌলবী সাহেব মোকদ্দমার ব্যয় সম্বন্ধে এই সভার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে, যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা এই সভাকে জানান, তাহা হইলে এই সভা মৌলবী সাহেবের যথাসাধ্য আনুকূল্য করিবেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ বদিউল আলম সাহেব বঙ্গবাসী মুসলমান-দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে চট্টগ্রামে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হউক।[১]

এই 'নোয়াখালী এসলামিয়া সভা' নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে আঞ্জমান সজাগ ছিল, উপরের প্রস্তাবগুলি থেকে তা বুঝা যায়। '১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র উল্লেখ আছে। সেখানে এটিকে জমিদার, তালুকদার, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে।[২]

(৪) রংপুর (১৮৮৭)

১২ মাঘ ১২৯৬ সালের 'সুধাকরে' রংপুরের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট তহমিন-উদ্দীন আহমদ প্রেরিত একটি পত্রে রংপুরের 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' সম্পর্কে নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়। "রঙ্গপুরে কলিকাতার আঞ্জমনে এসলামিয়া সভার শাখা সভা মৌলবী সাহেবের (আবদুল খালেক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) যত্নে প্রায় ৩ বৎসর হইতে স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ বাক শক্তি পাইয়াছিলেন। উক্ত সভার সম্পাদকীয় ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়া যথোচিত পরিশ্রম করতঃ একটী মাদ্রাসার ঘর চাঁদার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।"[৩] উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, রংপুরের 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' ১৮৮৭ সালে স্থাপিত হয়।

(৫) কুমিল্লা (১৮৮৮)

'সুধাকরে' একটি পত্রে কুমিল্লার 'আঞ্জমনে এসলামিয়া'র একটি সভার (৬ পৌষ ১২৯৬) বিবরণ প্রকাশিত হয়। পত্র লেখক মোহাম্মদ ইসমাইল (চরখা, কুমিল্লা) আঞ্জমনের ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রায় ২ বৎসর হইতে চলিল অত্রত্য প্রধান বক্তা পীর আসরফ উদ্দীন আহমদ ও বজলর রহমানের যত্নে ও

---

১. সুধাকর, ১৩ পৌষ ১২৯৬

২. *Revision of the List of Associations*, p. 52

৩. সুধাকর, ১২ মাঘ ১২৯৬

উৎসাহে 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম ২ কয়েক অধিবেশনে দেখিলাম, সভ্যগণের যত্ন অসীম, উৎসাহ অটল; আশা হইল জাতীয় উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবে। প্রস্তাব হইল প্রত্যেক পল্লীতেও ইহার শাখাসমূহ স্থাপিত হইবেক। আমাদের এ সভাও কলিকাতার আঞ্জমনে এসলামিয়া সভার শাখা-রূপে অবধারিত হইল। তথা হইতে চিঠিপত্র আনিয়া আমাদিগকে সোৎসাহিত করিতে লাগিল।...দেখিতে দেখিতে আমাদের সেই নবীন আশা, সেই অতুল আনন্দরাশি নিরানন্দ কাল মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।"[১] পত্রলেখকের প্রধান অভিযোগ সভ্যগণ সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন না ও চাঁদা প্রদান করেন না।

উপরের তথ্য থেকে আঞ্জমনের স্থাপন কাল যে ১৮৮৮ সাল, তা স্পষ্ট জানা যায়।[২] পীর আশরফ উদ্দীন আহমদ ও বজলর রহমান এবং পত্র-লেখক মোহাম্মদ ইসমাইল ঐ সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলিকাতার 'আঞ্জমনে এসলামিয়া'র সঙ্গে শাখা রূপে এর সম্পর্ক ছিল। উক্ত পত্রে সভায় গৃহীত দুটি প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। প্রস্তাব দুটি ছিল এরূপ:

(ক) প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর কলিকাতা উপস্থিত হইলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তথাকার আঞ্জমনে এসলামিয়া যে সভা আহ্বান করিবেন, তাহাতে কুমিল্লার আঞ্জমনে এসলামিয়ার যোগদান ও অর্থ সাহায্য উচিত কিনা?

(খ) কলিকাতার আঞ্জমনে এসলামিয়া সভায় যোগদান জন্য এখান হইতে কাহাকে প্রেরণ করা উচিত কিনা?[৩]

সভায় কলিকাতার আঞ্জমনের সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আরেফর রহমানকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে কুমিল্লার আঞ্জমনের সভ্যগণ এক সভায় মিলিত হয়ে সরকারকে ধন্যবাদ ও আমীর আলীকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৪]

১৯০৩ সালে আঞ্জমনের সভাপতি ছিলেন কাজী রইজুদ্দীন মহম্মদ, (জমিদার)। ত্রিপুরার সরাইলের সাব-রেজিস্ট্রার পদে একজন মুসলমান কর্মচারী

১. সুধাকর, ২৭ পৌষ ১২৯৬
২. ১৯২৩ সালে সমিতি তালিকায় উক্ত আঞ্জমনের স্থাপনের সময় বলা হয়েছে ১৮৯১ সাল, কিন্তু ঐ তারিখটি যথার্থ নয়।
৩. সুধাকর, ২৭ পৌষ ১২৯৬
৪. ঐ, ১২ মাঘ ১২৯৬

নিয়োগ করার আবেদন জানিয়ে একটি 'স্মারকপত্র' (৫ মার্চ, ১৯০৩) সরকারের কাছে প্রদান করা হয়। আবেদনকারীদের মতে, তিন জন মুসলমান এ্যাপ্রিন্টিসের দাবী উপেক্ষা করে বাবু অক্ষয়কুমার গুহকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। এতে মুসলমানদের স্বার্থক্ষুণ্ন হয় বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। ঐ পত্রে কাজী রুইউদ্দীন মহম্মদ আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন।[১]

(৬) ঢাকা

১৮৮৮ সালে ঢাকার 'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আবদুল বারি এবং সম্পাদক শেখ হেদায়েত বক্স (তালুকদার ও ব্যবসায়ী)। কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) ঢাকায় এলে সৈয়দ আবদুল বারির সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তিনি কংগ্রেসের আসন্ন সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানান।[২] শেখ হেদায়েত বক্স আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ১৮৮৯ সালে বোম্বাই-এর কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন।[৩] ঢাকার আঞ্জুমন যে কংগ্রেসের সমর্থক ছিল, এসব তথ্য থেকে তা স্পষ্ট প্রতীত হয়। আঞ্জুমনটি ১৮৮৮ সালে অথবা তৎপূর্বে স্থাপিত হয়ে থাকবে। ঢাকার আঞ্জুমনের অস্তিত্ব ১৯৩১ সালেও ছিল; তা জানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য তালিকা (১০ আগস্ট ১৯৩০—৯ আগস্ট ১৯৩৩) থেকে। আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে সৈয়দ আবদুল হাফিজ ও কাজী আবদুর রশিদ বিএ ঐ কমিটির সদস্য মনোনীত হন।[৪]

(৭) ফরিদপুর (১৮৯২)

১৮৯৫ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে 'মোসলেম ক্রনিকলে' 'ফরিদপুরের আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র সম্পাদকের লেখা একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। 'গোরক্ষিণী সভা'র ফরিদপুর শাখার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 'কসাই দ্বারা গো-হত্যা' শিরোনামে একটি 'বিলিপত্র' প্রচার করেন। এতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে যে, তাঁরা যেন মুসলমান কসাই-এর কাছে হাটে-বাজারে গরু বিক্রয় না করে। গো-দেবতার জীবনরক্ষা করা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য। বিলিপত্রের তারিখ ছিল 'ফরিদপুর ১৫ ফাল্গুন, ১৩০১'। এর প্রতিবাদে

১. *The Moslem Chronicle*, 18 July 1903
২. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 117
৩. *Muslim Community in Bengal*, p. 381
৪. *The Calendar* Vol. 1, Dacca University Dacca, p. 14

'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত ঐ আবেদনপত্রের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান হয়। আঞ্জমনের সম্পাদক লিখেছেন, "I have been directed by the members of the Anjuman-i-Islam, Faridpore, to bring to your kind notice the fact that cow killing question has been the source of constant disputes between the Hindus and the Muhammadans of Behar and other provinces of upper India. But fortunately the Eastern Bengal was quite free from those riots upto this time. ...Recently placards are being circulated, .. inciting the people to exert their best to stop cow-killing any how they can. The result of the circulation and notification has been that the powerful Hindu Zamindars are combining themselves to prevent the sale of cows to butchers and the killing of them in their Zamindari Mohallas. If the Hindus combine to prevent cow killing, Muhammadans are not likely to yield ; thus the result will be a constant dispute and ill-feeling between two communities so long living in peace and amity in Eastern Bengal."[১]

এরূপ আপত্তিকর বিলিপত্র প্রচার বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে পত্র শেষ করা হয়েছে। পত্রে সম্পাদকের নাম নেই। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০১ আঞ্জমনের এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং দুঃখ প্রকাশ করে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়। ঐ সময় আঞ্জমনের সভাপতি ছিলেন আলিমুজ্জামান চৌধুরী (জমিদার) ও সম্পাদক ছিলেন এসকান্দর আলী (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)।[২] ফরিদপুরের আঞ্জমনে ইসলামিয়া খুব সুগঠিত ছিল। '১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় দেখা যায়, আঞ্জমনের সদস্যসংখ্যা ছিল ৭১৫। তাতে বলা হয়েছে, সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার, জোতদার, তালুকদার ও কৃষক শ্রেণীর লোক।[৩]

(৮) জলপাইগুড়ি (১৮৯২)

'ইসলাম প্রচারকে'র এক সংবাদে লেখা হয়, "ব্রিটন সন্তান মৌলবী সেরাজ-

১. *The Moslem Chronicle*, 4 April 1895
২. *Ibid.*, 9 February 1901
৩. *Revision of the List of Associations*, p. 31

উদ্দীন আহমদ সাহেবের যত্নে জলপাইগুড়ি সহরে 'আঞ্জমানে ইসলামিয়া' নামক একটী জাতীয় ধর্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় খ্যাতিমান জমীদার শ্রীযুক্ত মুন্সী রহিম বক্স পেস্কার সাহেব উহার সভাপতি পদে বরিত হওয়াতে, সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।"[১] ১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় জলপাইগুড়ির 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র নাম আছে। তাতে এর প্রতিষ্ঠার কাল দেওয়া হয়েছে ১৮৯২ সাল। এতে বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্যে থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং সমাজের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা ঐ আঞ্জমনের উদ্দেশ্য।[২]

(৯) শ্রীহট্ট (১৮৯৪)

১৮৯৪ সালের ৮ জুন শ্রীহট্টের মৌলভিবাজারে 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন কাজী মোহাম্মদ আহমদ।[৩] ১৮৯৬ সালের ২৩ মার্চ 'আঞ্জমানে ইসলামিয়া' 'আঞ্জমন মাদ্রাসা' স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে। সভায় জেলা কমিশনার পি. এইচ. ও ব্রায়েন, জেলা জজ আর. এইচ. গ্রীভস, স্থানীয় মিশনারী রেভারেণ্ড জে. পি. জোনস্, পুলিশ ইনস্পেক্টর ই. এ. এল. কেম্প, জমিদার হাজি মজিদ বখত মজুমদার, জজকোর্টের পেস্কার, হাজি জহুর আলী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আবদুল হালিম, মাসদের আলী (উকিল) প্রমুখ বক্তৃতা করেন। আঞ্জমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বর্ণনা করে সম্পাদক একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। মূল লক্ষ্য হল, জেলার মুসলমান সমাজের মঙ্গল সাধন ও উন্নতি বিধান। মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন 'মোসলেম ক্রনিকলে' সে সম্পর্কে বলা হয়: "But the immediate object is to give the Musalman youth a preliminary moral and religious training previous to their admission into English Schools with a view to enable them to understand the fundamental principles of their own religion and appoint a preacher for the purpose of lecturing on the doctrines of Islam all district and to guide and control the action of travelling preachers, who time to time visit the place."[৪]

১. ইসলাম-প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
২. *Revision of the List of Associations*, p. 39
৩. সৈয়দ মর্তুজা আলী—শ্রীহট্টের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮
৪. *The Moslem Chronicle*, 16 May 1896

পূর্ববঙ্গে 'তবলিগ প্রথা' প্রচলিত ছিল। তবলিগ পন্থীরা স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে ধর্মচর্চা ও প্রচার করে থাকেন। এঁদের খাঁটি ইসলামের ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ধর্ম প্রচারক নিয়োগের কথা ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তির আগে মুসলমান ছাত্রদেব ইসলামের মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষাকে শরীয়ত সম্মত কবা এবং ধর্ম শিক্ষাব সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করার প্রয়াসেই 'আঞ্জমন মাদ্রাসা'র পরিকল্পনা। ১৯০২ সালে এব সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আবদুল মজিদ বিএ, বিএল। তিনি পরে এর সভাপতির পদও অলংকৃত করেন।[১]

(১০) পাবনা

১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় পাবনাব 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র স্থাপনের সময় ১৯০৫ সাল বলা হয়েছে।[২] কিন্তু এটি ঠিক নয়। ১২৯৬ সনের ২৬ মাঘ সংখ্যায় 'সুধাকরে' প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক নিযুক্ত হলে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য পাবনার 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' এক সভায় মিলিত হয়। সব-রেজিস্ট্রার রসিদন্নবি এবং অনুবাদক আবদুল হাই আঞ্জমনের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন বলে ঐ সংবাদে উল্লেখ আছে।[৩] ১২৯৬ সনে (১৮৮৯) পাবনার আঞ্জমনের অস্তিত্ব ছিল, তা ঐ সংবাদ থেকে প্রমাণিত হয়।

(১১) সিরাজগঞ্জ (১৮৯৮)

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। স্থানীয় জমিদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মিলে এটি স্থাপন করেন। মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা আঞ্জমনের ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত হন। 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর একটি পত্র থেকে (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮) জানা যায়, সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে সিরাজগঞ্জের মাদ্রাসার চত্বরে আঞ্জমনের একটি সভা হয়। সরকারের কাছে স্বসমাজের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরাই এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। পত্রলেখক জানানা যে, কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সাথে এটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে। ঐ সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল

১. শ্রীহট্ট-প্রতিভা, পৃঃ ২৭
২. *Revision of the List of Associations*, p. 41
৩. সুধাকর, ২৬ মাঘ ১২৯৬

৬০। ঐ পত্র থেকে আঞ্জমনের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন,

সম্পাদক—সৈয়দ হোসেন উদ্দীন আহমদ, জমিদার (রায়পুর)

সহকারী সম্পাদক—সৈয়দ আবদুল গাফফার, জমিদার (ঐ)

যুগ্ম সম্পাদক—মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

সদস্য—মোহাম্মদ খলিল উদ্দীন আহমদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আফাজুদ্দীন (মোক্তার), মোহাম্মদ আবদুল বাকি, হায়দার আলী আহমদ, মীর জয়নুল আবেদিন, বসিরুদ্দীন খান ও গোলাম আজম (মোক্তার)।[১]

১৯০০ সালে 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে' চাঁদা সংগ্রহের যে প্রচেষ্টা হয়, তাতে আঞ্জমনের সহকারী সম্পাদক সৈয়দ আবদুল গাফফার সিরাজগঞ্জ থেকে চাঁদা আদায় করেন।[২]

১৯০৬ সালের ৩ অক্টোবর আঞ্জমনের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে একটি জনসভা হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন। মুনশী মেহেরুল্লা সেখানে বক্তা ছিলেন। সভায় একটি প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, আসন্ন ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি আনন্দ মিছিল বের করবে, কেননা ঐদিন এমন একটি নতুন প্রদেশ তৈরী হয়েছে যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ ইতিমধ্যে অনেক উপকার পেয়েছে। এ প্রস্তাবটি মুসলমান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মতিয়র রহমান উত্থাপন করেন, মাদ্রাসার মৌলবী এ. এম. মোয়াইজ সমর্থন দেন। অপর প্রস্তাবটি ছিল, ইসমাইল হোসেন (সিরাজী) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে যোগদান করে স্থানীয় লোককে সে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রচারকার্য চালাচ্ছেন; সভা তাঁর সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক অস্বীকার করেছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সমর্থন করেন মুনশী মেহেরুল্লা।[৩]

সিরাজগঞ্জের আঞ্জমন ১৯২৪ সালেও সক্রিয় ছিল। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হয়। কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমর্থন পাওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জন ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলন আহ্বান করেন। মৌলানা আকরম খাঁ ঐ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইসমাইল হোসেন

১. *The Moslem Chronicle*, 17 September 1898

২, ইসলাম প্রচারক; চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৬-০৭

৩. *Public Letters from India*, 1906 ; *Muslim Community in Bengal*, p. 312

কংগ্রেসের সমর্থক হয়েও সিরাজগঞ্জের এই অধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন যে সিরাজগঞ্জের 'আঞ্জুমনী মুসলমানরা' কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশন পণ্ড করার চেষ্টা করে, কেননা তারা কংগ্রেসের সবকিছুই সন্দেহের চোখে দেখত। শেষ পর্যন্ত ইসমাইল হোসেন সিরাজী নিরপেক্ষ ভূমিকা নেন এবং কংগ্রেস অধিবেশন সফল হয়।[১]

(১২) উলুবেড়িয়া (হাওড়া)

উলুবেড়িয়া 'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র প্রতিষ্ঠার সময় জানা যায় না। 'মোসলেম ক্রনিকলে' (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬) আঞ্জুমনের সম্পাদক নুরুল হকের একটি পত্র ছাপা হয়। আমতার তৎকালীন সব-রেজিস্ট্রারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ঐ পত্র লেখা হয়।

(১৩) পাণ্ডুয়া (হুগলী)

'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র একটি শাখা হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় ছিল। ২১ মার্চ ১৮৯৫ সালের মোসলেম ক্রনিকলে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, ঐ সময় সমিতির সম্পাদক ছিলেন মাহমুদন্নবী। সমিতির এক সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, এন্ট্রান্স বা এফএ পরীক্ষায় আরবী বা ফারসীতে যে মুসলমান ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে একটি ২০৲ টাকা মূল্যের রৌপ্য পদক দেওয়া হবে।

(১৪) বীরভূম

বীরভূমের 'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র সম্পাদক ছিলেন বীরভূমের প্রভাবশালী জমিদার সৈয়দ এরফান আলী। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের সময় ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তির মতামত চেয়ে পত্র লেখেন। বীরভূমের আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে সৈয়দ এরফান আলী বড়লাটের সচিবকে পত্র দেন (৭ আগস্ট ১৯০৫)। তিনি ঐ বঙ্গবিচ্ছেদের স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২] 'বীরভূম মাদ্রাসা-ই-ইসলামিয়া' আঞ্জুমনের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ১৯০৩ সালের ১০ জুলাই মাদ্রাসাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। সৈয়দ এরফান আলী এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৩]

---

১. আবুল মনসুর আহমদ—আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ: ৫১-৫৭ (৩য় সং)।

২. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 152

৩. *The Moslem Chronicle*, 11 July 1903

বিবিধ

এছাড়া আরও কতকগুলি ধর্মসভা দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়েছিল, যে-গুলির নামধাম পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। 'আঞ্জমনে আহম্মদী' (রাজশাহী), 'আঞ্জমনে তাইদে ইসলাম' (নদীয়া ও নাটোর), 'আঞ্জমনে রেয়ায়েতে ইসলাম' (কুমিল্লা), আঞ্জমনে মোখায়েকুল ইসলাম' (কলিকাতা ও সিরাজগঞ্জ), 'আঞ্জমনে মোজাকারিরা ইসলামিয়া' (বীরভূম), 'দরিদ্র বান্ধব ইসলাম ধর্মসভা' (যশোহর) 'কুমারখালী আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলাম' (কুষ্টিয়া) ইত্যাদি।

'আঞ্জমনে আহমদী' সম্পর্কে 'ইসলাম প্রচারকে' লেখা হয়েছে—''রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বিয়াঘাট নামক স্থানে যে মুসলমান সভা স্থাপিত হয়েছে, উহার নাম 'আঞ্জমনে আহম্মদী'। এই সভা নাটোরের 'আঞ্জমনে তাইদে ইস-লামীয়া' নামক সভার শাখারূপে বিরাজ করিতেছে। সভার কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে।''[১] আহমদী সমর্থকদের সাথে বাউলপন্থীদের দ্বন্দ্ব ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে বাউলরাই অধিক সারমুখী ছিল। ইসলাম প্রচারকের এক সংবাদ প্রতিবেদনে লেখা হয়, ''আঞ্জমনে আহমদী' সভার কার্যপরিচালকগণ আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের সাধুসমাজভুক্ত লোকগুলি নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। ইহারা নমাজ রোজা প্রভৃতি কার্যকে বাহুল্য মনে করে এবং লোকদিগকে ঐরূপ বিপথে লইবার চেষ্টা করে। আমরা দেখিতেছি—এই 'ফকীরমতাবলম্বী' লোকগুলি পবিত্রধর্মের পবিত্র জ্যোতিঃ দিন দিনই বিনষ্ট করিতেছে। সকলেরই ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত।''[২] ১২৯৮ সন অথবা তার কিছুকাল আগে 'আঞ্জমনে আহম্মদী' স্থাপিত হয়েছিল, তা উপরের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়। এ সময়ের দিকে রাজশাহীতে 'নূর-অল ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জমনে হেমায়েতে ইসলাম' স্থাপিত হয়। আঞ্জমনের সমর্থকগণ শরীয়তপন্থী। তাঁরা ধর্মীয়ভাবে সচেতন ছিলেন। ঐ অঞ্চলে 'ফকীর মতাবলম্বী' তথা বাউলদের প্রভাবের চিত্রটিও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

নাটোরের 'আঞ্জমনে তাইদে ইসলামিয়া' সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির জুন, ১৯১০ সালের কার্যবিবরণীতে নাটোরের 'আঞ্জমনে ইসলাম' নামের একটি সমিতির উল্লেখ আছে। আঞ্জমনের

১. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৬

২. ঐ।

পক্ষ থেকে এরশাদ আলী খান চৌধুরী (জমিদার) সোসাইটির প্রস্তাব সমর্থন করে আবদুর রহমানকে পত্র দেন।[১] জমিদার চৌধুরী সম্ভবতঃ ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। আঞ্জুমনে ইসলাম ও আঞ্জুমনে তাইদে ইসলামিয়া একই প্রতিষ্ঠান ছিল বলে অনুমিত হয়। নদীয়ার আঞ্জুমনে তাইদে ইসলাম সম্পর্কে ইসলাম প্রচারকে লেখা হয়, "নদীয়ার শান্তিপুরের কতিপয় উৎসাহী যুবক 'আঞ্জুমনে তাইদে ইসলাম' নামক একটি সভা স্থাপন করিয়া ধর্ম বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হইয়াছে।"[২] ১২৯৮ বঙ্গাব্দে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে এটি স্থাপিত হয়েছিল।

'আঞ্জুমনে বেরাদেরে ইসলাম' ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান কুমিল্লার) অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামে স্থাপিত হয়। সৈয়দ শামসুল হোদা (উকিল, কলকাতা হাই-কোর্ট) গোকর্ণে জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ সাদউল্লা ছিলেন আঞ্জুমনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইসলাম প্রচারক এর কার্যরীতি সম্পর্কে লিখেছে, "---'আঞ্জু-মনে বেরাদেরে ইসলাম' এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য করিয়াছেন। সভার যত্নে ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন বাড়িতেছে। নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানে সকলেই প্রাণের সহিত যোগদান করিতেছে। সম্পাদক জনাব মৌলবী সৈয়দ সাদউল্লার সাহেব এই সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারক।"[৩] এটিকেও আমরা উনিশ শতকের নব্বই দশকের গোড়ার দিকে স্থাপিত বলে চিহ্নিত করতে পারি।

সিরাজগঞ্জে 'আঞ্জুমনে মোখায়েরুল এসলাম' নামে একটি সভার নাম পাওয়া যায় 'প্রচারক'-পত্রিকায় (কার্তিক ১৩০৭)। মহামান্য আমির-উল-মোমেনিন, খলিফাতুল মোসলেমিন গাজী আবদুল হামিদ খানের 'রৌপ্য জুবিলী' উপলক্ষে ঐ আঞ্জুমনের একটি সভা হয় (৩১ আগস্ট ১৯০০)। এতে ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'রৌপ্য জুবিলী' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন।[৪] কলিকাতায় 'আঞ্জুমনে মোখায়েরুল এসলাম' নামে একটি সভার নাম পাওয়া যায়। সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। আঞ্জুমন 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে'র চাঁদা সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 'ইসলাম প্রচারকে' লেখা হয়, " 'আঞ্জুমনে মোখায়েরুল এসলামে'র উদ্যোগে সমগ্র বঙ্গদেশ

১. *Abstract of the Proceedings of an Extra-ordinary Meeting of the committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta*, 9 June 1900, p. 48

২. ইসলাম প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮

৩. ঐ।

৪. প্রচারক, কার্তিক ১৩০৭

ব্যাপিয়া চাঁদা আদায়ের প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে।"[১] পত্রিকায় বলা হয় যে, আঞ্জুমনের প্রযত্নে মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মহীপুরের জমিদার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, ঘোড়াশালের আবদুল কবীর, বিক্রমপুরের সৈফুদ্দীন আহমদ, সিরাজগঞ্জের জমিদার সৈয়দ আবদুল গফফার, রংপুর চিলাহাটীর জমিরুদ্দীন আহমদ, শিকারপুরের (বগুড়া) মোহাম্মদ এব্রাহিম, বারহরিয়ার (মালদহ) জমিদার হাসিফুদ্দীন মিয়া নিজ নিজ এলাকায় সভা সমিতির সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ করেন।[২]

১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় বীরভূমের 'আঞ্জুমনে মোজাকারিয়া ইসলামিয়া'র স্থাপনের কাল আছে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ। তালিকায় বলা হয় যে, মুসলমান সমাজের স্বার্থ ও হিতচিন্তা ছিল আঞ্জুমনের উদ্দেশ্য। জমিদার, জোতদার, ডাক্তার, উকিল, মৌলভী ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি এর সদস্যভুক্ত ছিলেন।[৩]

'রংপুর ইসলাম মিশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা মুহম্মদ আবু তালিব উল্লেখ করেছেন। ঐ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহিপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী।[৪] মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী লিখেছেন, "রংপুরের স্বনামখ্যাত জমিদার স্বজাতি বৎসল মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল মজিদ চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেব একটি প্রচার সমিতি স্থাপন পূর্বক তদধীনে একটী প্রচার ফণ্ডের ভিত্তিও স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ সর্বপ্রথম বার্ষিক ৬০০৲ টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি এই মিশন ফণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন।"[৫] ইসলাম ধর্ম প্রচার মিশনের লক্ষ্য ছিল।

১৩১২ সনে 'কুমারখালী আঞ্জুমনে এত্তেফাক এসলামে'র অস্তিত্ব ছিল, তা কবি মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ঐ কাব্যের দুটি কবিতা 'আনন্দবাজার' ও 'উত্থানসঙ্গীত' উক্ত আঞ্জুমনের অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয়। প্রথমটি ১৩১২ সালের অধিবেশনে এবং দ্বিতীয়টি ৪র্থ বার্ষিক সভায় পঠিত হয়।[৬] 'বোরহানোলে বাঙ্গালা' ছদ্মনামে মোজাম্মেল হক 'আল্লার শত নাম ও নামের মাহাত্ম্য' (শ্রাবণ ১৩১৭) নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানি 'কুমারখালী

---

১. ইসলাম প্রচারক, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৬-০৭

২. ঐ।

৩. *Revision of the List of Associations*, p. 21

৪. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪

৫. পূর্বোক্ত, ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন কার্তিক ১৩১০

৬. মোজাম্মেল হক—জাতীয় ফোয়ারা, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ৬০, ১২৯

আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটারী অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী, ধর্ম-ভীরু, কর্মবীর---উদার চরিত সুহৃদয় জনাব মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব'কে উৎসর্গ করা হয়েছে।[১] শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৩) আবদুল কুদ্দুস রুমীর প্রদত্ত একটি 'প্রশংসা পত্র' (২৫. ১. ১৩২০) আছে। সেখানে মৌলানা রুমীকে 'নদীয়া আঞ্জমনে এত্তেফাকে এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটারী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা' বলা হয়েছে।[২] সম্প্রতি প্রকাশিত 'কুষ্টিয়া: ইতিহাস-ঐতিহ্য' নামক গ্রন্থে 'কুমারখালী আঞ্জমন এত্তেফাক ইসলামে'র প্রতিষ্ঠা লাভের সময় ১৯০৪ সাল বলা হয়েছে। খাকগাব নিবাসী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'সমাজ সংস্কারমূলক সংস্থা'টির প্রধান দপ্তর ছিল দুর্গাপুরে, দুর্গাপুরের আম-বাগানে আঞ্জমনের সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত।[৩]

ময়মনসিংহের শেরপুরে 'আঞ্জমনে নূরল ইসলাম' (১৮৯০) স্থাপিত হয়। 'সুধাকর' পত্রিকায় একটি সংবাদে লেখা হয়: "চারুবার্তা পাঠে জানা গেল, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর টাউনের মুসলমান অধিবাসীগণের যত্নে বিগত ২৯এ পৌষ (১২৯৬) রবিবার পূর্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত 'আঞ্জমনের নূরল ইসলাম' নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য একটী মসজেদ ও একটী মাদ্রাসা স্থাপন। উক্ত মাদ্রাসায় আরবি, পারসি, উর্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা অধীত হইবে।"[৪] শেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী ৫০৲ টাকা চাঁদা দেন বলে ঐ সংবাদে উল্লেখ আছে।

১৩০৮ সনের ২৬ মাঘ কলিকাতা কড়েয়া মহল্লায় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ একটি সভা স্থাপন করেন। সভার উদ্দেশ্য 'দুনিয়াবী হিত' সাধন। ১৬২ কড়েয়া রোডে এর অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয়। এর কার্যকরী কমিটির গঠনটি ছিল এরূপ:

সভাপতি—নসিরুদ্দীন আহমদ

সহ-সভাপতি—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক

---

১. মোজাম্মেল হক—আল্লার শতনাম ও নামের মাহাত্ম্য, শান্তিপুর, ১৩১৭, 'উপহার' অংশ দ্রষ্টব্য।

২. শেখ আবদুর রহিম—হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬ সং), পৃ: ৯৫৯

৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত—কুষ্টিয়া: ইতিহাস-ঐতিহ্য, কুষ্টিয়া, ১৯৭৮, পৃ: ১৬১

৪. সুধাকর, ১২ মাঘ ১২৯৬

সম্পাদক—দিদার বক্স
ম্যানেজার—আকবর আলী
সহকারী ম্যানেজার—হবিবর রহমান
ট্রেজারার—ডাক্তার শেখ রওশন আলী
সদস্যবৃন্দ—নাদের হোসেন, ডাক্তার করিম বক্স, হেকিম এমাম আলী, মোহাম্মদ জান ও ডাক্তার আজিজ আহমদ।[১]

আট আনা মাসিক চাঁদা ধার্য হয়। প্রতি শনিবার সভার নিয়মিত অধিবেশন হবে, স্থির হয়। 'মিহির ও সুধাকর' নব-প্রতিষ্ঠিত সভার উক্ত সংবাদ পরিবেশন করে মন্তব্য করেছে, "এই সভার অধিকাংশ মেম্বরই প্রবীণ, জ্ঞানী ও বহুদর্শী, এজন্য আশা করা যায় যে, ইহাদের দ্বারা সমাজের অনেক হিতানুষ্ঠান হইতে পারিবে।"[২] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের নাম সুপরিচিত· তাঁর নিজস্ব 'রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেস'টি ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোডে অবস্থিত ছিল। ডাক্তার শেখ রওশন আলী 'মোহাম্মদীয় বিবাহ সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। 'উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ সংঘটন এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল'।[৩] হেকিম, ডাক্তার মিলে মোট ৪ জন চিকিৎসাবিদ ঐ কমিটিতে ছিলেন। 'মিহির ও সুধাকরে'র উক্ত বিবরণীতে সভাটির নাম উল্লিখিত হয়নি।

বিভিন্ন বিষয়ক ছোটখাটো সভা-সমিতি আরও অনেক ছিল—যেমন 'দি সিলেট এসোসিয়েশন' (শ্রীহট্ট), 'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি' (মেদিনীপুর), 'চিলহাটী মুসলমান সভা' (রংপুর), 'কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' (ফরিদপুর)।

শ্রীহট্টে ১৮৯৬ সালে, 'দি সিলেট এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়; যাঁরা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে ইংলণ্ডে যাবেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা উক্ত এসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।[৪]

'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি'র ২৩-তম সভা হয় ১৮৯৬ সালের ১৮ অক্টোবর। তাতে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব নেওয়া হয়:

(১) সংবাদপত্র কর্তৃক তুর্কীর সুলতানের প্রতি যেসব অসৌজন্যমূলক আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেসব বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা;

১. মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৮
২. ঐ।
৩. ঐ, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
৪. *The Moslem Chronicle*, 10 October 1896

(২) ৬০-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত সম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠান ;

(৩) খরার দরুন সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাহেতু এ জেলা থেকে চাল রপ্তানী যাতে বন্ধ করা হয় ; সে সম্পর্কে জেলা-প্রশাসকের কাছে 'স্মারকপত্র' দান করা।[১]

মাসে একটি করে সভার হিসাব ধরলে 'সোসাইটি' ১৮৯৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। 'মোসলেম ক্রনিকলে'র এক সংবাদে দেখা যায়, 'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি' ঢাকার নবাব আবদুল গণির মৃত্যুতে শোকসভা করেছে।[২] সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোসাইটি সচেতন ছিল, এসব দৃষ্টান্ত থেকে তা বুঝা যায়।

'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে'র জন্য চাঁদা সংগ্রহের যে আন্দোলন হয় তাতে রংপুরের 'চিলাহাটি মুসলমান সভা'র সহকারী সম্পাদক মুনশী জমিরুদ্দীন সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ইসলাম-প্রচারকের ১৩০৬-০৭ সনের চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় এ তথ্য জানা যায়।

১৯০৩ সালে ফরিদপুরের পাংশায় 'কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। 'কোহিনুর' নামক মাসিক সাহিত্যপত্রটি 'কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' কর্তৃক পাংশা, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী।[৩]

তখন সভা সমিতি গড়ার জোয়ার এসেছিল। গ্রামের স্কুলের ছাত্ররাও সমিতি স্থাপন করে তাদের অস্তিত্ব ও অধিকার সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছে। সিরাজগঞ্জের বনোয়ারীলাল স্কুলের ছাত্রগণ 'সিরাজগঞ্জ ছাত্র সমিতি' গঠন করে। এতে বিতর্ক, আলোচনা, রচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হত। মাঝে মাঝে বড় আকারে জলসার (ধর্মসভা) ব্যবস্থাও হত। ১৩০৭ সনের ৯, ১০ ও ১১ চৈত্র—তিন দিন ব্যাপী একটি বড় জলসার আয়োজন করে তারা। মুনশী মেহেরুল্লাহ, শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ বক্তা তাতে বক্তৃতা করেন।[৪] 'দি মহামেডান ডায়মণ্ড জুবিলী ভিক্টোরিয়া ক্রীকেট

১. *The Moslem Chronicle*, 24 October 1896
২. *Ibid.*, 12 September 1896
৩. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১১৫
৪. প্রচারক, চৈত্র ১৩০৭

এণ্ড ফুটবল ক্লাব' নামে ছাত্রদের একটি ক্রীড়া সংগঠনও ছিল।[১] খুলনার দৌলতপুর স্কুলে 'মহামেডান বয়েজ এসোসিয়েশন' ছিল। আফগানিস্তানের সুলতান আমীর আবদার রহমানের মৃত্যুতে এসোসিয়েশনের ছাত্ররা শোক-সভা করে।[২] কুষ্টিয়া মহকুমার 'ছাত্র সমিতি' ছিল। সমিতির পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভার আয়োজন হয় (২৮ বৈশাখ ১৩০৯)। সে সভায় সকাল বিকাল ও রাত্রির অধিবেশনে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ এব্রাহিম প্রমুখ।[৩] 'দি বরিশাল মহামেডান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' নামে একটি ছাত্রসমিতি নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে (১৮৯৩) শোক বাণী পাঠিয়েছিল এ. এফ. এম. আবদুর রহমানের কাছে।[৪]

---

১. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭

২. ঐ, ১ কার্তিক ১৩০৮

৩. ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০২

৪. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, p. 264

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (১৮০০) সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও আইন-কানুন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয়। বাংলা রচনার জন্য হিন্দু পণ্ডিত এবং উর্দু-ফারসী রচনার জন্য মুসলমান মৌলবী নিয়োগ করা হয়। বাংলার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী এবং মুনশী রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশী, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রথম দেড় দশকে ১৩ খানি বাংলা গদ্য পুস্তক রচিত হয়। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত অথবা ইংরাজী-ফারসীর অনুবাদ। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) অবশ্য মৌলিক রচনা।

খ্রীস্টান মিশনারীরা বাইবেলের অনুবাদ ও ধর্মমূলক অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য। 'শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনে'র সঙ্গে স্বয়ং উইলিয়ম কেরী সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম দু'দশকে ঐ মিশন প্রায় ৮০ খানা বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে।

দেশীয় স্কুল স্থাপন, তদারক ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য সরকারের উদ্যোগে 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত হয়। ৯ জন ইউরোপীয়, ৪ জন বাঙালী হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান মৌলবী নিয়ে স্কুল বুক সোসাইটির 'পরিচালক কমিটি' গঠিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান বাংলা, ইংরাজী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত করে। ১৮১৭-১৮২১ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা (প্রচারপত্রসহ) দাঁড়ায় লক্ষাধিক।[১]

১৮১৮ সালে জন মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগদর্শন' (মাসিক) ও 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়। খ্রীস্টান ও বাঙালীর সম্পাদনায় তিন দশকের মধ্যে ত্রিশের অধিক বাংলা সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে।[২] সাময়িকপত্রের বিবিধ বিষয়ক আলোচনা দ্বারা বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়।

১. A. F. Salahuddin Ahmed—*Social Ideas and Social Changes in Bengal* (1818-1836), Calcutta, 1976 (2nd edition), p. 24

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯ (৪ সং)।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রামমোহন রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রথম বাংলা গদ্যচর্চা শুরু করেন। 'বেদান্তসার' (১৮১৫) তাঁর প্রথম গ্রন্থ। রামমোহনের পর ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়-কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি আধুনিক বাংলা গদ্য ও পদ্য রচয়িতার আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক কবিতা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক গদ্যের সার্থক সূচনা করেন। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) আখ্যানে সাহিত্যধর্মী গদ্য প্রথম পরিস্ফুট হয়। এর অল্পকাল পরেই প্যারিচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।

আধুনিক বাংলা ভাষাচর্চার আর একটি ধারা প্রবাহিত হয় সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি মূলক বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) ছিল এ-ধরণের প্রথম সভা। সভাগুলিতে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ, তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা হত; সেগুলি মুখপত্র, প্রচারপত্র, অনুষ্ঠানপত্র, স্মারক-পত্র বের করত। 'গৌড়ীয় সমাজে'র (১৮২৩) সভার কার্যবিবরণী বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। 'ভার্নাকুলার লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৫১) বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

১৮৬০ সালে খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীর (১৮০৮-৭০) গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গ্রন্থ 'উচিৎ শ্রবণ' প্রকাশিত হয়। মুনশী আজিমদ্দী (১৮৬৩), মুনশী নামদার (ঐ), শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৬৮) কয়েকটি ক্ষুদ্র নক্সা-প্রহসন রচনা করেন। ১৮৬৯ সালে মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গদ্য পুস্তক 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত তখন থেকেই।

১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যাকাশে মুসল-মান লেখকের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর হলেও ঐতিহাসিক সত্য। শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত মুসলমান প্রাচীন ধারায় মিশ্রভাষায় পুথিসাহিত্য ও অশিক্ষিত মুসলমান আঞ্চলিক ভাষায় লোকসাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু আধুনিক ভাবধারায় শুদ্ধ বাংলায় তাঁরা গদ্য বা পদ্য রচনায় অগ্রসর হননি। শেখ আলীমুল্লার দ্বিভাষী 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১) ও রজব আলীর পঞ্চভাষী 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'

১, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর—বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, সাক্ষরতা প্রকাশন, —কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ৭৮-৭৯

(১৮৪৬) নামক সংবাদপত্রে বাংলার স্থান ছিল বটে, কিন্তু তা আদর্শ গদ্যের নিদর্শন বহন করে না—অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি সংবাদগুলি বাংলায় তরজমা করা হত মাত্র। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছর বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যকর্মে চরম শূন্যতা বিরাজ করেছে। এর পশ্চাতে বহুবিধ ঐতিহাসিক কারণ নিহিত ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বারা। কলিকাতা শহর এই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেন্দ্র ছিল। প্রথম দিকে কলিকাতায় বাঙালী মুসলমানের ইংরাজী শিক্ষিত কোন নব্য শ্রেণী গড়ে উঠেনি ; অতি ক্ষুদ্রকায় একটি শিক্ষিত শ্রেণী ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা বাংলা ভাষাব চর্চা করেননি ; যেটুকু চর্চা করেছেন, সেটুকু ছিল উর্দু-ফারসী ভাষায়। ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা বাঙালীর মানস জগতের পরিবর্তনের মৌলিক কারণ ছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল অবধি ইংরাজী ভাষাশিক্ষায় গরজ করেননি· তাঁরা আরবী-ফারসী শিক্ষা ও প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা করেছেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে। আবদুর রহিম ইংরাজী বিজ্ঞানের বই আরবীতে অনুবাদ করেছেন।[১] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মৌলবীরা কেউ কেউ ইংরাজী গ্রন্থের উর্দু ও ফারসী অনুবাদ করেছেন।[২] সুতরাং যাঁরা ইংরাজী জানতেন, তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেননি। গ্রামের দরিদ্র লোকেরা ব্যয়বহুল ইংরাজী শিক্ষার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। উপরন্তু ওয়াহাবী, ফারায়েজী আন্দোলনের ফলে ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যার প্রতি সাধারণ লোকের একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। সুতরাং যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাঁরা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এ ভাষার চর্চা করতে অক্ষম হয়। মাঝারি শিক্ষিত লোকেরা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষায় 'দোভাষী পুথি' রচনা করেছেন। দোভাষী পুথি ছিল সমকালীন জীবনের সাথে প্রায় সম্পর্কহীন ; প্রধানতঃ সেগুলি অতীতচারিতা, কাল্পনিকতা ও অলৌকিকতায় ভরপুর ছিল। এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে পুথিগুলি বেশ জনপ্রিয় ছিল। দোভাষী পুথি মুসলমানের সাহিত্যের শূন্যতা পূরণ করেছিল সত্য, কিন্তু সেই

১. Azizur Rahman Mallick, Doctor—*British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, Dacca, 1961, p. 178

২. মৌলভী আবদুল খায়ের 'মজমুয়ায়ে শামসী' (১৮০৭) শিরোনামে একখানি ফারসী গ্রন্থে কোপারনিকাসের জ্যোতিষী পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মচারী ডব্লিউ হান্টারের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।
Thomas Roebuck (edited)—*Annals of the College of Fort William*, Hindustanee Press. Calcutta, 1819, p. 38, (Appendix III).

সাথে নতুন করে চিন্তাভাবনা, আত্মানুসন্ধান ও আত্মস্ফুরণের পথও রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

মধ্যযুগে মুসলমানের বাংলা সাহিত্য চর্চার যে ধারা ছিল তার প্রধান স্রোত ধর্মভাবকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়; আর এ ধর্মচেতনা সুফী মরমীয়াবাদকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়। কবিগণ অনেকে ব্যক্তি-জীবনে পীরভক্ত ছিলেন; তাঁরা কেউ কেউ পীর-গুরুর নির্দেশেই কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে রচিত সুফীপদগুলি মরমীয়া অধ্যাত্মবাদেরই বাঙ্ময় প্রকাশ। 'জ্ঞানসাগর', 'জ্ঞান-চৌতিশা', 'সায়াতনামা', 'নূরনামা' 'তোহফা' প্রভৃতি তাসাউফ বা সুফীতত্ত্বের গ্রন্থ। 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লী-মজনু', 'মধুমালতী', 'সতীময়না লোর-চন্দ্রানী', 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে সুফীপ্রেমতত্ত্বের রূপক আছে। এসব বিষয়ের ফারসী ও হিন্দীর মূল গ্রন্থগুলি পুরোপুরি অধ্যাত্মপ্রেমের রূপক কাব্য। সুতরাং মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ সুফী অধ্যাত্মবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে। শরীয়তী ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ ও মর্সিয়া সাহিত্য নামে অপর ধারা ছিল, কিন্তু এসবের গ্রন্থসংখ্যা বেশি ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলন হয়: এই ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল শরীয়তপন্থী; মারিফতপন্থী সুফীবাদের বিরোধী তা। এর ফলে সুফীসাধনার উপর আঘাত আসে। প্রকাশ্য সামাজিক স্বীকৃতি না পেয়ে এটি ফকিরপন্থী বাউলদের গুহ্যসাধনার দিকে মোড় নেয়। বাউলগানের এরূপ ঐতিহ্য থাকায় এগুলির ভাষা অনেকখানি গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতা মুক্ত ছিল। লালন ফকিরের গানের ভাষা প্রায়ই আধুনিক ভাষার পর্যায়ভুক্ত ছিল। আমাদের ধারণা, সুফীসাধকদের আশ্রয়-চ্যুত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের একটা গতিভঙ্গ হয়, সেটাই ক্রমে শূন্যতার সৃষ্টি করে। মোঘল নবাব-সুবেদাররা উর্দুর সমর্থক ছিলেন; মোঘল আমলে বাংলা ভাষা দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হারায়; ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে সুফীসাধকদেরও অবলম্বন হারায় তা। সত্যপীর, গাজীপীর, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একটি হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত ভাব-ধারার সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মর্সিয়া সাহিত্য ও এই ধারার রচনায় অনৈসলামিক উপাদান থাকায় এগুলির উপরেও ওয়াহাবী আন্দোলনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এর সাথে এল যুগের পরিবর্তন। আধুনিক যুগে শিল্প-সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব কমে আসে। ওয়াহাবীরা রসধর্মী সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। ফলে ভাবজগতেও শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নব্য শ্রেণীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার এই অচলাবস্থা দূরীভূত হয়নি।

নতুন পরিবর্তনের যুগেও আবার একটা দোলাচল অবস্থা ছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে উঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।[১] মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না; আবদুল লতিফ সংস্কৃতবহুল বাংলার পরিবর্তে কোর্ট-কাচারীতে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দমিশ্রিত বাংলাকে গ্রামের মুসলমান বালকের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ভাবগত ও বিষয়গত দ্বন্দ্বেও অনেকে বিচলিত ও শঙ্কিত ছিলেন।[২]

মোঘল আমল থেকে বাংলাদেশে উর্দুর প্রভাব পড়তে থাকে; অভিজাত শ্রেণীর পারিবারিক ভাষা হয়ে দাঁড়ায় উর্দু। উর্দুর উৎপত্তি ভারতে। ফারসী রাজভাষা হলেও মাতৃভাষা হিসাবে তার স্থান ভারতে ছিল না। যখন উর্দুর উদ্ভব হল, তখন ভারতবর্ষের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা তাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। বাংলায় যতদিন উর্দু আসেনি, ততদিন বাংলাই মাতৃ-ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। সামাজিক মর্যাদা লাভ করার জন্য দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত উর্দুকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। আঠার শতকের কবি আবদুল হাকিম (নোয়াখালী) বঙ্গভাষা বিদ্বেষী ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে-ছেন এবং বঙ্গদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে বলেছেন। খুব সম্ভব, এটি উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বেরই ফল। কোম্পানীর আমলে উর্দুর প্রভাব কমেনি, বরং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উর্দু স্বীকৃতি লাভ করে। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল

---

১. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয়, তা ঐতিহাসিক কারণে খ্রীস্টান পাদরী ও হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা গড়ে উঠে। তাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা জ্ঞান করে ব্যাকরণরীতি ও শব্দমালার দিক থেকে সংস্কৃতকে বেশী নির্ভর করেন। পণ্ডিত-দের হাতে বাংলা ভাষা কিরূপ মূর্তি লাভ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত 'আজ্যই' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে।...পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।" (উদ্ধৃত: বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃ: ১৭৬) এরূপ ভাষার প্রতি মুসলমানদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল।

২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের 'ভাষা ও সাহিত্য' অংশ দ্রষ্টব্য।

উর্দু, অনেক কাল পরে সেখানে কেবল প্রাথমিক স্তরে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সব উর্দুভাষী মুসলমান মুনশী নিয়োগ করা হয়; বাংলাভাষী কোন মুসলমান সেখানে ছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণীর মধ্যেও দেখা দেয়, যার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা ও প্রচলনের জন্য আন্দোলন করতে হয়। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল, বাংলা ভাষা উচ্চভাব প্রকাশের উপযোগী ছিল না।[১] উর্দু-প্রীতির কারণে মুসলমানদের মনোভাব এক্ষেত্রে আরও বিরূপ ছিল। উইলিয়ম কেরী কোন বাঙালী মুসলমানকে বাংলা পুস্তক রচনায় নিযুক্ত করেননি, বাংলা ভাষায় শিক্ষিত মুসলমানের অভাবকেই তা সূচিত করে। ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতে উর্দু ও বাংলা লেখকদের নিয়োগ করা হয়েছিল, সম্প্রদায় ভিত্তিতে নয়। অন্ততঃ কলিকাতায় বাংলা শিক্ষিত মুসলমানের অভাব ছিল, প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকলে, তাঁরাও সুযোগ পেতেন। মোটামুটি এসব কারণেই বাঙালী মুসলমানের দ্বারা ঐ সময় বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওলের বিশুদ্ধ বাংলা দরবারের সম্মান পেয়েছিল, এখন সে-বাংলা পূর্বের ঐতিহ্য হারিয়ে 'বটতলা'য় নেমে আসে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নব্য শিক্ষিত মুসলমানেরা যখন বাংলা সাহিত্য-চর্চায় এগিয়ে এলেন, তখন তাঁরা একটি তৈরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পেলেন, হিন্দু লেখকগণের মত তাঁদের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতে হয়নি। কিন্তু মুসলমান লেখকগণ এত বড় সুবিধাকেও পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেননি। মীর মশাররফ হোসেন ও দু'একজন ছাড়া আধুনিক সাহিত্য রচনায় অন্য কেউ সফলকাম হতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের যুগে আবির্ভূত এবং তাঁদের ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শের সহিত পরিচিত হয়েও তাঁরা উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তারও পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমতঃ সেই নগরকেন্দ্রিক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী যার গঠণপর্ব সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, এ শ্রেণীর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ছিল না, এটি ছিল আর্থিক-নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত সমাজ থেকে আগত একটি মিশ্র শ্রেণী। ইতিমধ্যে ফারসী চর্চা রহিত হওয়ায় এই নব্য শ্রেণীর আরবী-ফারসী ভাষাজ্ঞান হ্রাস পেতে লাগল, আবার ইংরাজী শিক্ষার ফলে তাঁরা ইসালামী সংস্কৃতির সাথেও ঐক্য স্থাপন করতে

১. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃঃ ১৭৪-৮০

পারলেন না।[১] বলতে গেলে, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা কিছুকাল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বিরাজ করতে থাকেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুস সালাম, আবদুল হামিদ, আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রহিম, আবদুল করিম, আবদুর রসুল, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম প্রভৃতি প্রথম দিকের গ্রাজুয়েট যাঁরা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে-ছিলেন, তাঁরা বাংলার চর্চা করেননি। আবদুল লতিফ ও তাঁর উচ্চ শিক্ষিত পুত্র চতুষ্টয় বাংলা বর্জন করেন। তাঁরা বেশীর ভাগ ইংরাজীতে এবং অংশত উর্দুতে জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা করেছেন। সোহরাওয়ার্দী পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সন্তানেরাও বাংলা চর্চা করেননি। আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমানের দুটি পৃথক শ্রেণীর কথা বলেছেন, যাদের রক্তধারা, ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছিল পৃথক।[২] এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্ক ছিল না, বরং প্রথম শ্রেণী (আবদুল লতিফ যাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণী বলেছেন) দ্বিতীয় শ্রেণীকে (তাঁর মতে যারা নিম্নবিত্তের ধর্মান্তরিত মুসলমান) অবজ্ঞাই করতেন। অথচ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই ছিল বাংলা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যাঁরা সমাজের পুরো-ভাগে ছিলেন, তাঁরা হলেন বিমুখ, আর যারা নীচের তলায় ছিল, তারা হল অক্ষম ও অচেতন। এরূপ দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কথা উল্লেখ করে কামরুদ্দীন আহমদ বাঙালী মুসলমানের চিত্তশূন্যতা ও সৃজনহীনতা সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁরা (উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণী) নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন পাছে লোকে তাঁদের ধর্মান্তরিত মুসলমান বা অনার্য বলে ঘৃণা করে। ... তাঁদের অন্তর আবেগ ও আনুগত্যবিহীন হয়ে পড়েছিল, তাঁরা বাংলা-দেশকে জন্মভূমি বলে মেনে নিতেও পারেননি এবং বাংলা ভাষাকেও মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে তাঁরা দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হননি যার ফলে তাঁরা সৃজনশীল হতে পারেননি এবং সক্ষম হননি মৌলিক কিছু দান করতে। . সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির জন্য চাই বলিষ্ঠ পটভূমিকা এবং তাঁদের প্রেরণার উৎস হবে স্বদেশের মাটি।"[৩] স্বজাতি ও স্বদেশের সাথে এরূপ সম্পর্ক

---

১. "আজকের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান যেমন একদিকে Mutannabi, Nizami, Amir Khusrau, Mir বা Ghalib-এর আরবী-ফার্সি, উর্দু কাব্যের সাথে মানসিক আত্মীয়তা অনুভব করতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে ময়নামতির গান বা সোনাভানের পুথিও তার প্রাণে আর সাড়া জাগাতে পারে না।" সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ১৬১

২. *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, p. 225

৩. কামরুদ্দীন আহমদ—পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৭-১৮

হীনতা সাহিত্য স্বষ্টির অন্তরায় হয়েছিল। ভাষা উন্নত হলেও যদি সমাজ উন্নত ও উজ্জীবিত না হয়, তবে তার শিল্পসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতি ঘটতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন; সেটি হল এই যে, এ সময় যাঁরা ইংরাজী ভাষা, এমন কি, বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করেছেন, তাঁদের অনেকের লক্ষ্য ছিল, কেবল এসব ভাষা শিক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা, কেননা ইংরাজী ও বাংলা যথাক্রমে রাজভাষা রূপে স্বীকৃত হওয়ায় ঐ ভাষাদ্বয়ের মাধ্যমেই চাকুরীতে প্রবেশের ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। স্বয়ং আবদুল লাতফ ঐ ধরণের মনোভাব পোষণ করতেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠা এবং পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলার বিষয়টি প্রথম দিকের সমাজকর্মীরা ভেবে দেখেননি। দেশীয় শিল্প ধ্বংস হওয়ায় এবং পুঁজি না থাকায় একমাত্র চাকুরীই ছিল আর্থিক উন্নতির উপায়। স্টুয়ার্ট মিল, বার্ক, বেকন, হেগেল, বেনথাম, হিউম প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীর চিন্তাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজে যেরূপ 'ইয়ং বেঙ্গলদলে'র উদ্ভব হয়েছিল, সেরূপ কোন প্রগতিশীল ও বন্ধনমুক্ত 'দল' বা গোষ্ঠী মুসলমান সমাজে গড়ে উঠেনি। অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করা যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য না হয়, তবে সে-শিক্ষার প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী 'জাতীয় ভাষা' ও 'জাতীয় বিদ্যা'র মোহ ত্যাগ করতে পারেননি, সে-কথা আমরা অন্যত্র বলেছি।[১] মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যর্থতা সত্ত্বেও নতুন করে আরও মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ঐ মোহের কারণেই। বাংলার হিন্দু সমাজ যে অর্থে ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমান সমাজ দীর্ঘদিন সে অর্থে গ্রহণ করেননি। সুতরাং সমাজে তার ফলাফলও সমভাবে ও সমমানে প্রতিফলিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসাবে আমরা যাঁদের দেখতে পাই, তাঁদের মধ্যে রংপুরের তসলিমুদ্দীন আহমদ, মেদিনীপুরের শেখ ওসমান আলী, খুলনার কাজী ইমদাদুল হক, কুমিল্লার দৌলত আহমদ, ঢাকার মকবুল আলী গ্রাজুয়েট (বিএ/বিএল) ছিলেন—এঁরা কেউ কলিকাতায় অবস্থান করেননি; চাকুরীস্থলে মফস্বলে ছিলেন। এন্ট্রান্স পাশ করেছেন অথবা এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছেন এমন লেখকের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা 'ছাত্রবৃত্তি' পর্যন্ত; কেউ কেউ 'নর্মাল' পাশ; 'মাদ্রাসা' পাশ মৌলবীও ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশেরই সাহিত্য-চর্চার পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না, আবার অনেকে

১. চতুর্থ অধ্যায়ের 'ভাষা ও সাহিত্য' অংশ দ্রষ্টব্য।

গ্রামে-গঞ্জের এমন পরিবেশে থেকেছেন, যেখানে সুস্থ ও সুষ্ঠু শিল্পচর্চা, জ্ঞান-চর্চার সুযোগ ছিল না। যাঁদের 'প্রধান' লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, তাঁদের কুল-বৃত্তি-শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা নীচের তালিকায় পাওয়া যায়:

নাম	জন্মস্থান	শিক্ষা	কুল	বৃত্তি
মীর মশাররফ হোসেন	কুষ্টিয়া	ইংরাজী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন	বড় জোতদার	জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (দেলদুয়ার ও পদমদী)
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	টাঙ্গাইল	ছাত্রবৃত্তি, নর্মাল পাশ ও মাদ্রাসায় অধ্যয়ন	মাঝারি জোতদার	শিক্ষক, সাংবাদিক ও ধর্ম প্রচারক (টাঙ্গাইল)
আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	,,	—	বড় জোতদার	জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার ও সাংবাদিক (টাঙ্গাইল)
কায়কোবাদ	ঢাকা	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা ঢাকার উকিল	পোস্ট-মাস্টার (স্বগ্রাম-আগলা)
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা রেশম ব্যবসায়ী	শিক্ষক, সাবরেজিস্ট্রার (রংপুর, নাটোর, রাজশাহী)
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী	টাঙ্গাইল	—	—	অধ্যাপক, জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (কলিকাতা ও দেলদুয়ার)
শেখ আবদুর রহিম	২৪-পরগণা	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা পাঠশালার শিক্ষক	শিক্ষক ও সাংবাদিক (কলিকাতা, নদীয়া)
মোজাম্মেল হক	নদীয়া	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক (নদীয়া)
মোহাম্মদ নজিবর রহমান	পাবনা	নর্মাল পাশ	—	শিক্ষক (পাবনা)
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	যশোহর	পাঠশালা পর্যন্ত অধ্যয়ন	সাধারণ গৃহস্থ	দর্জি ও ধর্মপ্রচারক (যশোহর ও বিভিন্ন স্থান)
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	বরিশাল	ছাত্র বৃত্তি পাশ	মাঝারি জোতদার	শিক্ষক, সাংবাদিক (রূপসা, কলিকাতা)
শেখ আবদুস সোবহান	ঢাকা	—	—	মোক্তার (ঢাকা)

নাম	জন্মস্থান	শিক্ষা	কুল	বৃত্তি
নওশের আলী খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল	এফএ পাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	বড় জোতদার	জমিদার, সাবরেজিস্ট্রার (টাঙ্গাইল)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	চট্টগ্রাম	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক ও কেরানী (চট্টগ্রাম)
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	কুষ্টিয়া	উচ্চ গ্রেড অব বিডার পাশ	মাঝারি গৃহস্থ	শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক (কুষ্টিয়া বিভিন্ন স্থান)
মতিয়র রহমান খান	ঢাকা	এন্ট্রান্সপাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা মুন্সেফ	শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি)
শেখ ওসমান আলী	মেদিনীপুর	বিএ, বিএল পাশ	—	মুন্সেফ (বিভিন্ন স্থান)
আবু মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলী	চট্টগ্রাম	মাদ্রাসা পাশ	—	শিক্ষক (নোয়াখালী)
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী	,,	মাদ্রাসা পাশ	পিতা পাঠশালার শিক্ষক	শিক্ষক, সাংবাদিক ও ধর্মপ্রচারক (বিভিন্ন স্থান)
সৈয়দ এমদাদ আলী	পাবনা	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক, সাংবাদিক সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টর (বিভিন্ন স্থান)
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	,,	উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা হেকেমী চিকিৎসক	বক্তা ও রাজনৈতিক কর্মী
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	রংপুর	গৃহশিক্ষা	পিতা জমিদার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী (কলিকাতা)
শেখ ফজলল করিম	,,	ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন	—	জুটফার্মের ম্যানেজার (কাকিনা)
কাজী ইমদাদুল হক	খুলনা	বিএ পাশ ও এমএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা মোক্তার	শিক্ষক, সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর (বিভিন্ন স্থান)

তৃতীয়তঃ বাংলার লেখকগণ সমকালীন যুগ ও পরিবেশের নানাবিধ ভাব-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত ছিলেন। ভাষাগত ও ভাবগত দ্বন্দ্ব তো ছিলই, উপরন্তু স্ব-জাতি-বিজাতির মধ্যে ধর্মগত কলহ, সামাজিক বিরোধ ও সাংস্কৃতিক সংঘাত দেখা দিয়েছিল। খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, বাউলদের প্রভাবে ও প্রচারে সমাজের মানুষ উদ্ভ্রান্ত, কেউ কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিপথগামী হয়েছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার নীতিহীনতা সমাজকে অক্টোপাশের মত বেঁধে রেখেছে; সিয়া-সুন্নি হানাফী-আহলে হাদিস মতবাদ নিয়ে সমাজের মানুষ পরস্পর কলহে লিপ্ত; গ্রামের জমিদারগণ বিলাসিতা ও আরাম-আয়াসে মগ্ন; নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর অনেকে ব্যক্তি-স্বার্থকে বড় করে দেখেন—সমাজের কথা তেমন গুরুত্বের সাথে ভাবেন না। নব্বই দশক পর্যন্ত সমাজের এরূপ অবস্থা বেশ প্রকট ছিল। বাংলার লেখকগণ সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে থেকে সমাজের এই দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন: তাঁরা সমাজকে রক্ষা করাই প্রথম কর্তব্য মনে করেছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সমাজজীবনের সর্ববিধ দায়িত্ব তাঁবাই আপন স্কন্ধে তুলে নেন। তাই দেখা যায়, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন শিল্পচর্চার কথা না ভেবে খ্রীস্টান-ব্রাহ্ম-বাউলদের অপপ্রচার থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা ধর্মপুস্তক রচনা, পত্রিকা সম্পাদনা, ধর্মসভায় বক্তৃতা দান, ধর্ম-শিক্ষামূলক সমিতি গঠন ইত্যাদির প্রতি বেশী মনোযোগী হয়েছেন। ইসলামের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা আরব-ইরানের সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, কেননা মুসলমানের ধর্ম ও ঐতিহ্যের যা কিছু গৌরব আরবী-ফারসী ভাষায় ঐসব দেশের সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত। সুতরাং তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ হল ধর্ম, নীতি, জ্ঞান ও তত্ত্বমূলক গ্রন্থের অনুবাদ অথবা মুসলিম ইতিহাস, কৃষ্টি ও মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা। যুগের প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাঁরা যতই তত্ত্বধর্মী ও প্রচারধর্মী রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, ততই তাঁদের শিল্পকর্ম শিল্পাদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে।

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এমন কি, কায়কোবাদ পর্যন্ত রসধর্মী সাহিত্য রচনার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তাঁদের অধিকাংশের রচনা শিল্পের বাহন না হয়ে উদ্দেশ্যের বাহন হয়েছে।

চতুর্থতঃ একজন ভাল শিল্পী হতে হলে মৌলিক প্রতিভার সাথে বুদ্ধিবৃত্তি, বহুদর্শিতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, সেযুগের মুসলমান লেখকের মধ্যে এসবের অভাব ছিল। অনেকেই অকারণ আবেগ-উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সাময়িক আবেগ-উদ্দীনপাকে প্রশ্রয় দিয়ে কাব্য-

উপন্যাস লিখলে সমকালীন উদ্দেশ্য সফল হয়, কিন্তু সে-সাহিত্য সময়কে জয় করতে পারে না। সাহিত্যকে কালজয়ী হতে হলে সাময়িকতাকে অতিক্রম করতে হয়। মুসলমান লেখকদের এই আবেগ-উচ্ছ্বাসের দিকটি লক্ষ্য করে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একটি প্রবন্ধে বলেন, "যে সকল মুসলমান লেখক বঙ্গসাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির উপর ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা কেবল উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সময় ক্ষয় করিলে মুসলমান বালকগণ অন্তঃসারশূন্য ও স্বজাতি-গৌরবান্ধ হইয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইবে। তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে যাহাতে সদ্ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞানপিপাসু করে, তজ্জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। ...তাহার পরিবর্তে নব্যবঙ্গে মুসলমানের বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর আস্ফালনের আড়ম্বর ফুটিয়া উঠিতেছে।"[১]

মুসলমান লেখকগণের অনেকের আবার মৌলিক প্রেরণার অভাব ছিল। কোন কোন লেখক কতক বিষয়ে কেবল বাদ-প্রতিবাদ করার জন্য লেখনি ধারণ করেছিলেন, কেবল চিন্তাশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ক্ষেত্রে নয়, গল্প-উপন্যাস-কবিতার ক্ষেত্রেও এ মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। কেউ কেউ হিন্দু লেখকগণের অক্ষম অনুকরণ করেছেন। মশাররফ হোসেন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এড়াতে পারেননি – ভাষা-রীতি, শিল্পরীতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর অনুসরণ করেছেন। কায়কোবাদের মহাকাব্য হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অনুবর্তন। কতক ক্ষেত্রে নকল আছে—যেমন, আবু মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৪)। প্রতিবাদধর্মী গল্প-উপন্যাস হয়েছে শুষ্ক বাগবিলাস মাত্র। নকল, অনুকরণ, বাদ-প্রতিবাদের রচনা দ্বারা বড় শিল্পী হওয়া যায় না। দু'একজনের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকলেও এসব কারণে তাঁরা উচ্চমানের শিল্প সৃষ্টি করতে পারেননি। নতুন শিল্পরীতি, ভাষারীতি, নব জীবন-জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ তাঁরা কেউ সৃষ্টি করতে পারেননি।

মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-প্রবন্ধকার ভাল শিল্প বা বড় শিল্প রচনা করতে পারেননি সত্য, তবে তাঁরা যা রচনা করেছেন, তাতে যুগজীবনের আবেগ আশা-আকাঙক্ষা, দ্বন্দ্ব—সংঘাতের চিত্রটি নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে ধরা পড়েছে; ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের সমকালীন চিন্তা ও চেতনার রশ্মিপাত ঘটেছে।

আমরা এ অধ্যায়ে লেখকগণের ব্যক্তি-জীবন, কর্মজীবন, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দানের সাথে সাথে তাঁদের রচনার পরিমাণ ও প্রকৃতির

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—মুসলমান শিক্ষা সমিতি, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১০

স্বরূপ নির্ণয় করেছি। তাঁদের রচনার উৎস ও উদ্দেশ্য কি এবং রচনা সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া কি—আমরা সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেছি। লেখক-গণের চিন্তাশক্তি ও প্রকাশশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে রচনাগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করেছি। সাহিত্যের মানদণ্ডে অধিকাংশ লেখাই টিকে না, তবু সব লেখকের সব রচনা একত্র করেছি, কেননা জাতীয় জীবনের চিন্তার ফসল এসবের মধ্যেই নিহিত আছে। লেখকদের 'প্রধান' ও অপ্রধান' —এদুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তাঁদের রচনার গুণগত মানের বিচারে।

এ অধ্যায়ে 'পত্রপত্রিকা'র আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। পত্রিকার সাথে অনেক লেখক জড়িত ছিলেন, অনেকে এক ও একাধিক পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। সাময়িকপত্রে গোষ্ঠীচেতনার প্রতিফলন ঘটে। পত্রিকার আদর্শ ও নীতিমালার দ্বারা অনেক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি-সাহিত্য ও সাময়িক-সাহিত্য একত্রে আলোচনা করায় ব্যক্তি-প্রয়াস ও যৌথ-প্রয়াসের সমন্বয়-সূত্রটি বুঝবার সহায়ক হয়েছে।

২৪ জন প্রধান ও ১৪৮ জন অপ্রধান লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক ৩৪৪ খানি মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান নানা সূত্রে পাওয়া গেছে।[১] আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্য, মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, জীবনচরিত, আত্মচরিত, প্রবন্ধ প্রভৃতি শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়; আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, আইন চিকিৎসা ইত্যাদি শ্রেণীর গদ্য ও পদ্য রচনাও পাওয়া যায়। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটি পরিসংখ্যান (আঙ্গিক ও বিষয় মিশ্রিত) নিম্নরূপে দেখান যায়:

রচনা	সংখ্যা	হার
ধর্ম ও নীতি	১০৫	৩০ ৫
কবিতা, গান ও মহাকাব্য	৯৫	২৭·৬
উপন্যাস ও গল্প	১৬	৪·৭
নাটক, প্রহসন ও নক্সা	৩০	৮·৭
সন্তজীবনী	২২	৬·৪
আত্ম-চরিত	৩	·৯
ইতিহাস	৮	২·৩
আইন	৮	২·৩
চিকিৎসা	১১	৩·২
বিবিধ	৪৬	১৩·৪

১ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' অংশে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন, এখানে তাঁদের এবং তাঁদের রচনা এ সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে এক 'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া আর কোনটাই সফল হয়নি। 'বিষাদ-সিন্ধু' আবার পুরোপুরি উপন্যাসের আঙ্গিকে পড়ে না। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে কাল্পনিকতা ও অলৌকিকতার আশ্রয় আছে। প্রখর সমাজচেতনা ও বাস্তবতাবোধ কোন উপন্যাসেই প্রকাশ পায়নি। 'যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা' উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি আছে বটে, কিন্তু এত বেশী কল্পনার আশ্রয় আছে যে, ইতিহাসের সত্য চাপা পড়ে যায়। তাঁর ভাষাও উপন্যাসের ভাষা নয়। 'লায়লী-মজনু', 'হাতেমের উপাখ্যান', 'তহমিনা' প্রভৃতি আরব্য পুরাণ এবং 'রত্নবতী',' মনোহর-তারাবতী' প্রভৃতি দেশীয় রূপকথা জাতীয় গল্প। 'প্রেমদর্পণ', হাফেজ সাহেব', 'আমিনা' প্রভৃতি উপন্যাসে সমকালের জীবন স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু কোনটাই উঁচু মানের রচনা নয়।

খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা, গান-গজলের অনেকগুলি বই পাওয়া যায়। প্রকৃত কবি হিসাবে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রেরণা ছিল মৌলিক। কাজী ইমদাদুল হক, মোসলেমউদ্দীন খানের কবি-প্রতিভা ছিল, কিন্তু দু'একখানি গ্রন্থ দিয়ে কবি-খ্যাতি স্থাপিত হয় না। খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তু হল মানবপ্রেম, প্রকৃতি-প্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি ও সমকালীন জীবনের আবেগ অনুভূতি। কায়কোবাদের 'মহাশ্মান' (১৯০৪) ও হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব্য '(১৯০৫) মহাকাব্যের আখ্যা পেয়ে থাকে; কায়কোবাদ হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে এবং হামিদ আলী মধুসূদনকে অনুসরণ করেছেন। মহাকাব্য রচনার মত তাঁদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, ভূমাবোধ ও সমুন্নত শিল্পচেতনার অভাব ছিল। উপরন্তু তখন বাংলা সাহিত্য থেকে মহাকাব্যের যুগ অপসারিত হয়েছে। সুতরাং এগুলি অক্ষম অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

নাটক-প্রহসন-নক্সা-ব্যঙ্গ জাতীয় রচনার সংখ্যা ৩০ খানি। মীর মশাররফ হোসেন ছাড়া আর কারও অন্তর্দৃষ্টি, আঙ্গিকচেতনা ও সামাজিকবোধ ছিল না। প্রহসনগুলিতে সমসাময়িক কালের সমাজজীবনের ছবি আছে। সেদিক থেকে কোন কোন কবিতা গ্রন্থের মত প্রহসন-নক্সাগুলির মূল্য স্বীকার্য।

প্রবন্ধাদি গদ্যরচনায় মশাররফ হোসেন থেকে রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ উচচ খ্যাতির দাবীদার। তাঁরা বিবিধ বিষয় নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ, আলোচনা ও গবেষণা পুস্তক লিখেছেন।

অন্যান্য শাখার তুলনায় গদ্যরচনায় মুসলমান লেখকগণ অধিকতর সফলতা দেখিয়েছেন। 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা'র জন্য তাঁরা অনেক কৃতবিদ্য লেখকের প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁরা সমাজ-শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে নভেল-নাটক-কবিতা অপেক্ষা চিন্তাশীল প্রবন্ধকে অধিক উপযোগী মাধ্যম হিসাবে মনে করেছিলেন।

জীবনী গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হজরত মহম্মদ, খলিফা ও পীর-আউলিয়াদের সম্বন্ধে রচিত হয়েছে। দেশের কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বা সমাজসেবকের জীবনী স্থান পায়নি। উক্ত সময় পর্যন্ত হাজী মোহাম্মদ মহসীনের (১৭৩২-১৮১২) মত দানবীরের জীবনীও লেখা হয়নি। ধর্মভাব ও নৈতিকচেতনার দ্বারা লেখকগণ অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এতে তাই প্রমাণিত হয়। মশাররফ হোসেনের দুখানি এবং আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরীর একখানি আত্মচরিতকথা রচিত হয়; তিনখানি গ্রন্থেই শিল্পাস্বাদ আছে। তাঁদের রচনায় চলমান সমাজের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে।

গদ্যে ও পদ্যে রচিত অনেকগুলি অনুবাদ গ্রন্থ আছে। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার ধর্মকথা, নীতিকথা ও সন্তজীবনী অনূদিত হয়েছে। চিকিৎসা ও আইনের ছাত্রপাঠ্য বই ছাড়া পাশ্চাত্যের অন্য কোন ইংরাজী বই-এর অনুবাদ হয়নি। শেখ আবদুর রহিমকৃত ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'দি আলহামরা' ও 'দি পিলগ্রিম অব লাভ' গ্রন্থের অনুবাদ যথাক্রমে 'আলহামরা' ও 'প্রণয়যাত্রী' (১৮৯২) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

তালিকায় ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। মৌলিক রচনা, আলোচনা ও অনুবাদ মিলিয়ে গদ্যে ও পদ্যে শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকার নাম পাওয়া যায়।[১] মুসলমান লেখকগণের চিন্তায় ধর্মকথা ও নীতিকথা কেন প্রাধান্য লাভ করেছে, আমরা তা পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমান সমাজ হতাশায় ও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগছিল; বাহুবল ও মনোবল হারিয়ে তাঁরা ক্রমশ: ধর্মমুখী ও ঐতিহ্যমুখী হয়ে পড়ে। তাঁরা অধার্মিকতা ও নীতিজ্ঞানহীনতাকে সমাজের পতন ও জাতির দুর্গতির কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং সমাজের মানুষকে ধর্মবোধ ও নৈতিক জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ না করলে সমাজের জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব নয়। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ

১. ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থের সাথে সন্তজীবনীগুলি একত্রে ধরলে ধর্মভারাশ্রিত পুস্তকের হার দাঁড়ায় প্রায় ৩৬·৯%

মনিরুজ্জমান প্রমুখ লেখক তাঁদের প্রায় সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন ইসলাম ধর্ম, শরিয়তী আদর্শ ও নীতিজ্ঞান ব্যাখ্যা ও প্রচারের কাজে। ধর্মের স্রোত এসেছে আরবভূমি থেকে; সেজন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করেছে। প্যান-ইসলামী মনোভাবের দরুন এরূপ প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়।

কলেজের ছাত্রদের পাঠোপযোগী ৮ খানা আইন ও ১১ খানা চিকিৎসার বই রচিত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশ দুর্বল অনুবাদ। আইন ও চিকিৎসার জটিল বিষয়গুলি দেশীয় ছাত্রদের বোধগম্য করে তোলা তাঁদের লক্ষ্য ছিল, তাঁরা প্রকৃত লেখক কেউ ছিলেন না; তাঁরা অনেকে পরিভাষা ব্যবহার করেননি অর্থাৎ অনুবাদের কোন সুষ্ঠু নীতি সৃষ্টি করতে পারেননি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য শাখা নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়নি, এমন কি, পত্রপত্রিকাগুলিতেও বিজ্ঞানচর্চার স্থান খুবই সীমিত। গবেষণাধর্মী রচনায় একমাত্র আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছাড়া আর কেউ অগ্রসর হননি। পুস্তক-সমালোচনা কেবল সাময়িকপত্রের পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন লেখকের জীবন ও রচনার মূল্যায়ন করা হয়নি। পত্রপত্রিকায় সমালোচনাও আবার ধর্মানুভূতি ও নৈতিকচেতনার মাপকাঠি দ্বারা নিরূপিত হয়েছে; রসগ্রাহী সাহিত্য-সমালোচনা একটিও হয়নি। এক্ষেত্রে 'ইসলাম-প্রচারক' ও 'নবনূরে'র ভূমিকা ছিল অগ্রণীয়। মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন হয় অনৈসলামিকতা, না হয় অনৈতিহাসিকতা, আর না হয় নীতিহীনতার কারণে অভিযোগের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। সেযুগের হিন্দু-লেখক-লেখিকাও ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী বক্তব্যের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।

কবি সাহিত্যিকগণ সামাজিক মানুষ হিসাবে তাঁদের লেখার মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূর্ণ করে থাকেন। স্পর্শকাতর অনুভূতি ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী লেখকগণই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের গূঢ়, গভীর, সূক্ষ্ম বিচিত্র রূপ রহস্যের অনুসন্ধান পান; তাঁরা তাঁদের লেখায় সেগুলি ফুটিয়ে তোলেন। বাংলার মুসলমান লেখকগণ সমসাময়িক যুগ-পটভূমিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভাবানুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজজীবনকে কিভাবে দেখেছেন এবং কি পরিমাণে সমাজের চাহিদা মিটিয়েছেন, চতুর্থ অধ্যায়ে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং শিল্পকর্মের মূল ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন সম্পন্ন জোতদার ছিলেন। পদমদীর জমিদাররা ছিলেন পিতৃকুলের আত্মীয়। মোয়াজ্জম হোসেন মোটেই বাংলা জানতেন না, স্বাক্ষর করতেন ফারসীতে। তবে তিনি বাংলা বা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। মশাররফ হোসেন স্বগৃহে মুনশীর কাছে আরবী-ফারসী এবং পাঠশালায় পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিখেন। তাঁর স্কুল জীবন কাটে প্রথমে কুষ্টিয়া, পরে পদমদী এবং শেষে কৃষ্ণনগরে।[১] কিন্তু কোথাও বিদ্যাচর্চা অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। আলীপুর আদালতের আমীন নাদির হোসেনের আশ্রয়ে কলিকাতায় কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হন কিন্তু তাঁর পড়া মোটেই অগ্রসর হয়নি। নাদির হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফন্নেসার স্থলে ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়া কন্যা আজিজন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ে হয় (১৮৬৫)। আজিজন্নেসা অসুন্দরী ও বিদ্যাহীনা ছিলেন। মশাররফ হোসেন বিদ্যাচর্চা ত্যাগ করে লাহিনীপাড়ায় ফিরে এসে পিতৃসম্পত্তি দেখাশুনা করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি সাঁওতার সাধারণ কৃষককন্যা কুলসুমকে বিবাহ করেন (১৮৭৪)। তাঁর দ্বিতীয় দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিকাশে কুলসুমের দান ছিল বলে মশাররফ হোসেন 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। হুগলী কলেজের ছাত্রদের সহযোগিতায় মশাররফ হোসেন প্রথমা স্ত্রীর নামে 'আজিজন নেহার' (১৮৭৪) পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে টাঙ্গাইলে যান। করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী ছিলেন দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ ম্যানেজারের পদে বৃত ছিলেন। মশাররফের সাহিত্যিক কর্মের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) টাঙ্গাইলে অবস্থান কালেই রচিত হয়। জমিদার পরিবারের সহিত মনোমালিন্য ও স্থানীয় লোক ও কর্মচারীর সহিত বিবাদের ফলে তিনি টাঙ্গাইল ত্যাগ করে লাহিনী-পাড়ায় ফিরে আসেন। এরপর ভাগ্যান্বেষণে তিনি বগুড়া, কলিকাতা এবং শেষে পদমদীতে যাতায়াত করেন। মশাররফ হোসেন ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন। পরের তিনটি বছর পদমদীতে অবস্থান করেন। ১৯১২ সালে পদমদীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সেখানেই শেষ শয়ানে শায়িত আছেন।

১. স্বগ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালা, কুমারখালির ইংরাজী বিদ্যালয়, পদমদীর নবাব স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নের কথা আত্মজীবনীতে আছে'। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বছর খানেক পড়েছিলেন।

মীর মশাররফ হোসেনের স্বগৃহে সাহিত্যের পরিবেশ ছিল না। গান-বাজনা-নাচের প্রতি পিতার আসক্তি ছিল। এমন কি, তিনি নর্তকীও রাখতেন। সেযুগে জমিদার-জোতদার ধনী লোক মাত্রই বাইজীর নাচ-গানে আসক্ত হয়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। শৈশবকালে মশাররফ হোসেন পিতৃগৃহে এবং পদমদী, বামনা, ঢাকার আত্মীয়-পরিজন গৃহে এরূপ ভোগ-বিলাসিতা দেখেছেন—বিদ্যা-চর্চা, সাহিত্যচর্চা কোথাও দেখেননি। নিজ গৃহে সাহিত্যচর্চা বলতে এক দেখে-ছেন পুঁথিপাঠ। 'আমীর হামজা'; 'সোনাভান', 'হাতেম তাই', 'জয়গুনের কেচ্ছা' প্রভৃতি সেকালের দোভাষী পুথি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। তিনি বাল্য-কালে ঐসব কাহিনী আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনেছেন, সুর করে পড়তেও দেখে-ছেন। গ্রামে-গঞ্জে আর এক শ্রেণীর সংস্কৃতিচর্চা দেখেছেন—তা হল পল্লীগান, বাউলগানের চর্চা। এই বাউলগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে আস্তানা করে থাকতেন। ছেঁউড়িয়া ও লাহিনীপাড়ার দূরত্ব মাইল খানেক। কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩—১৮৯৬) সাথে লালন শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। হরিনাথ মজুমদার ছিলেন মশাররফের সাহিত্যিক গুরু। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' এবং রামচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকরে' স্থানীয় সংবাদ লিখে বাংলা রচনায় মশাররফের হাতে খড়ি হয়।[১] কাঙাল হরিনাথ বাউলগানের ভক্ত ছিলেন, তিনি বাউলগান রচনাও করতেন। তাঁর প্রভাবে মশাররফ হোসেনও বাউলগান লিখে-ছিলেন। 'সঙ্গীত লহরী'তে (১খণ্ড, ১৮৮৭) তার পরিচয় আছে। 'সঙ্গীত লহরী'তে আধুনিক গান-গজলও আছে। স্বজন-পরিজনের সঙ্গীতচর্চার প্রভাব থেকেই তিনি এ বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। মশাররফ হোসেনের মেধা ও প্রতিভা দুই ছিল। বিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যাচর্চার অবসরেই তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি মার্জিত, উন্নত এবং সুশৃঙ্খল বাংলা ভাষার সহিত পরিচিত হয়েছিলেন, আত্ম-কথা 'আমার জীবনী'তে (১৯০৮-১০) তার উল্লেখ আছে। মশাররফ হোসেন দোভাষী পুথির ও বাউলগানের প্রভাবে পুথিকার বা বাউল সঙ্গীতকার হলেন না, এমন কি তরুণ বয়সের সংবাদ-ফিচারের প্রভাববশে সাংবাদিকও

১. "গ্রামবার্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। ... সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। ... তিনি (হরিনাথ) কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথ বাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবন বাবু আমার সামান্য লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন।"—আমার জীবনী।

হলেন না; বরং পুথি-বাউল-সাংবাদিকতার ঈষৎ প্রভাব অঙ্গে মেখে তিনি হলেন আধুনিক গদ্যলেখক—উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও রম্যরচয়িতা। বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর শীতল ও স্থবির নীরবতা দূরীভূত হয়ে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্য চর্চার দ্বারোদ্‌ঘাটন হল মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্মের মাধ্যমেই। একটি সুপ্তিমগ্ন, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, ভ্রান্তপথগামী জাতির জীবনে প্রথম সম্বিৎ এনে দিলেন তিনি। মশাররফ হোসেন আত্মজীবনীতে নিজ পরিবারের ও স্বজন-পরিজনদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাকে সেযুগের বাংলার অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারের মোটামুটি অভিন্ন ছবি হিসাবেই ধরা যায়। মধ্যযুগীয় চেতনায়, গতানুগতিক জীবন ধারায় পীর-মোল্লার প্রভাব কবলিত নির্বেদ নিস্তরঙ্গ সমাজে পরিবর্তনের আশা বড় একটা ছিল না। শহরে মুষ্টিমেয় সংখ্যক যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের কারও কারও কণ্ঠে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-সুর বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে স্পর্শ করেনি। বরং অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টায় ছিলেন। প্রথম দিকে কলিকাতার মত আধুনিক শহরের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়নি; পল্লী-বাংলার সাধারণ মানের অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই সে-চর্চা শুরু হয়। তাঁরা অনেকে মফস্বলে থেকে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। নব্বই দশকের দিকে তাদের কেউ কেউ কলিকাতায় অবস্থান করলেও তাঁদের অধিকাংশের শিক্ষা গ্রামের পাঠশালা-বিদ্যালয়-মাদ্রাসা পর্যন্ত; গ্রাম থেকে সদ্য শহরে এসেছেন ভাগ্যের অন্বেষণে। ভাগ্যের সন্ধানেই তাঁরা হিমসিম খান, সাহিত্যচর্চা সেক্ষেত্রে আরও দুরূহ কর্ম ছিল। সুতরাং মুসলমান সমাজের চৈতন্যোদয় হতে হয়তো আরও অর্ধ-শতাব্দী কেটে যেত। কিন্তু মশাররফ নিজ চেষ্টায় সমাজের সেই ঘোর নিশা আগেই দূর করেন। পশ্চাৎমুখী সমাজের বন্ধনদশা, সংস্কারমোহ ও উদ্যমহীনতার স্তূপ ঠেলে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।[১]

সমাজের জন্য সমাজের কাছে মুখ খুলতে গিয়ে পদে পদে বাধা এসেছে। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে নিন্দার ভাগী হয়েছেন। রসধর্মী সাহিত্য-

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "৪০ বৎসর পূর্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুরু মশায়ের পাঠশালা বা দুই একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, দুই চারিখানি কলেজ এবং দুই দশখানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশাররফ হোসেন যে সাহিত্য শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।" প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮

সৃষ্টি আর এক অপযশের কারণ। সর্বোপরি নির্মোহ মতবাদ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লাঞ্ছিত হয়েছেন—মোল্লারা 'কাফের' ও 'স্ত্রীহারাম' ফতোয়া দিয়েছেন।[১] স্বসমাজের কাছ থেকে নিন্দা পেলেও হিন্দু সমাজের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। আধুনিক উন্নত ভাষার ব্যবহারের জন্য সেযুগের কমবেশী সকল হিন্দু-সমালোচক মশাররফ হোসেনের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন এমন বাংলা মুসলমান কেন, অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুও লিখতে পারেন না।[২] মুসলমান সমালোচকেরা ঐরূপ ভাষা ব্যবহারের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন।[৩] 'নবনূর' 'মৌলুদ শরীফে'র ভাষার নিন্দা করে।[৪] মশাররফ হোসেন 'হিন্দু সাহিত্যের আদর্শে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ' লিখে সমাজে নিন্দিত হয়েছিলেন বলে শেখ আবদুর রহিম উল্লেখ করেন।[৫] মুসলমান সমাজের বাঁধনটি এমন বজ্র-আঁটুনিতে বাঁধা যে কোন দিকে নড়চড় করার উপায় ছিল না। সমাজের গতি পশ্চাৎমুখে আর নিম্নমুখে অন্ধকারের দিকে। এ সময় একটি উজ্জ্বল দীপশিখা হাতে নিয়ে সকল লাঞ্ছনা-অপবাদ শিরোধার্য করে মীর মশাররফ হোসেন বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গনটি আলোকিত করেছেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মের তাৎপর্য ও সফলতা এরই আলোকে নির্ণয় করতে হবে।

প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) থেকে শেষ গ্রন্থ 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' (১৯১০) পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি মোট ৩৫ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক নাম এরূপ: ১. রত্নবতী (১৮৬৯), ২. গোরাই ব্রিজ বা গৌরীসেতু (১৮৭৩), ৩. বসন্তকুমারী নাটক (ঐ), ৪. জমীদার দর্পণ (ঐ), ৫. এর উপায় কি? (১৮৭৫), ৬.

১. মীর মশাররফ হোসেনকৃত 'গো-জীবন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উল্লেখযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলামও মুক্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে মোল্লাদের কাছ থেকে 'কাফের' ফতোয়া পেয়েছিলেন।

২. 'গোরাই ব্রিজ' কাব্যের সমালোচনা করে' বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১৮৭০) লেখা হয় "...তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরনীয়।" 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমালোচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বসুধা'য় (ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৯) মন্তব্য করেন, "...সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালি হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।"

৩. "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।" বিষাদ-সিন্ধু, ১ খণ্ড, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

৪. নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১

৫. মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৩৬

বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১), ৭. সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭), ৮. গো-জীবন (১৮৮৯), ৯. বেহুলা গীতাভিনয় (ঐ), ১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), ১১. তহমিনা (১৮৯৭), ১২. টালা অভিনয় (ঐ), ১৩. নিয়তি কি অবনতি? (১৮৯৮), ১৪. গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), ১৫. ভাই ভাই এতই চাই (ঐ), ১৬. ফাস কাগজ (ঐ), ১৭. এ কি! (ঐ), ১৮. পঞ্চনারী পদ্য (ঐ), ১৯. প্রেম পারিজাত (ঐ), ২০. রাজিয়া খাতুন (ঐ), ২১. বাঁধা খাতা (ঐ), ২২. মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), ২৩. মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (১ ভাগ ১৯০৩, ২ ভাগ ১৯০৮), ২৪. বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), ২৫. হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (ঐ), ২৬. হজরত বেলালের জীবনী (ঐ), ২৭. হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (ঐ), ২৮. মদিনার গৌরব (১৯০৬), ২৯. মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), ৩০. এসলামের জয় (১৯০৮), ৩১. বাজীমাৎ (ঐ), ৩২. আমার জীবনী (১ খণ্ড, ১৯০৮-১৯১০), ৩৩. হজরত ইউসোফ (১৯০৮), ৩৪. খোতবা, ৩৫. বিবি কুলসুম (১৯১০)।[১]

মশাররফ হোসেনের রচনাবলীকে বিষয়ের দিক থেকে ৫টি ধারায় বিভক্ত করা যায়: রূপকথা ও ইতিহাসভিত্তিক গল্প-উপন্যাস, বাস্তব সমাজ সমীক্ষা-মূলক গল্প-নাটক-নক্সা-প্রহসন, ধর্মমূলক জীবনী ও তত্ত্বকথা, আত্মজীবনী এবং পাঠ্যোপযোগী শিক্ষামূলক রচনা।

মশাররফ হোসেন মূলতঃ গদ্যশিল্পী। 'রত্নবতী'তে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের গল্পের রূপকে বিত্ত বড় না বিদ্যা বড় তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই 'কৌতুকাবহ উপন্যাসে'র দেশ-কাল-পাত্র সবই কাল্পনিক, তবে কোন কোন চরিত্র চিত্রণে লেখকের জীবন জিজ্ঞাসার ছায়াপাত আছে। 'রত্নবতী'র প্রথম সমালোচনা বের হয় 'ঢাকা প্রকাশে'। সেখানে এর ভাষার প্রশংসা করা হয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার কথা বলা হয়। পত্রিকার ভাষায় "...ইহার লেখা অতি সরল প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটীতে বিশেষ চাতুর্য্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।"[২] 'রত্নবতী'র দ্বিতীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে "This is a romantic tale designed to show that knowledge is of greater importance than wealth, but as it is founded on the mervallous and the supernatural it is not likely to be of much use. The author's argument is to the effect that

১. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ খণ্ড, ১৯৭৬, পৃ: আট-এগার।
২. ঢাকা প্রকাশ, ২২ পৌষ ১২৭৬

knowledge is more valuable than wealth, since the former enabled one Sumanta to turn some women into apes, while the latter is effectual to produce that wonderful result. But as knowledge that we know of can turn into apes, the superiority of knowledge over wealth my well be doubted. But we dare say that writer did not intend either to instruct or to argue, but merely to make his readers laugh. We take it that the author has concealed his real name under the *nom de plume* of a Musalman."[১] কুষ্টিয়ার গৌরী নদীতে রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণ কার্য উপলক্ষ্য করে মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী-সেতু' (১৫ পৌষ ১২৭৯) কবিতার বই রচিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি পাঠ করে অক্ষয়কুমার সরকার 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা লিখেছিলেন। "গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুরাগী হইবেন।"[২] এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ।

তৃতীয় গ্রন্থ 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৫ মাঘ, ১২৭৯)। মশাররফ হোসেন 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল। বাসন্তী সুসৌরভ এ কুসুমে আছে কি না, নিজে আমি সেটি জানি না। .. নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম ; ইহাতে নানা দোষ সম্ভাব অবশ্যম্ভাবী।"[৩] এজন্য লেখক পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ইন্দ্রপুরের বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভার্যা যুবরাজ নরেন্দ্রসিংহের প্রতি প্রণয়াসক্তা হন, কিন্তু কামানুরাগিতা চরিতার্থ করতে অসমর্থ হয়ে জিঘাংসাবশে যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নী—বসন্তকুমারীকে দগ্ধ করে হত্যা করেন। অদম্য দেহজকামনার অভিব্যক্তি এবং পরিণাম নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র আত্ম-প্রকাশের অব্যবহিত পরে 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ফাল্গুন, ১২৭৯) এর দীর্ঘ সমালোচনা হয়। তাতে মশাররফের ভাষার ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করা হয়, কিন্তু আঙ্গিকের ত্রুটি ও বিষয়ের তুচ্ছতার কথা বলা হয়। "আমাদের এই আশঙ্কা ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্য সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের

---

১. *The Calcutta Review*, Vol. L.No. 99, 1870, p. 235
২. বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০
প্রকাশকালের দিক থেকে বসন্তকুমারী নাটক প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গ্রন্থ।
৩. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ১০৫

বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচনা করিয়া কখন কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারকে বিপর্যাস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উহার প্রণয়নকর্তা মুসলমান। নাটকখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদিগত নিগূঢ় বৃত্তান্তগুলি সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছেন।... বসন্তকুমারী নাটককার সাধু বাঙ্গালায় গ্রন্থ না লিখিয়া যদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তাঁহার গ্রন্থ অনাদরোপহৃত হইত সন্দেহ নাই। ... গল্প রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের কোন প্রকার চাতুর্য প্রকাশ হইতেছে না। গ্রন্থখানি করুণরস প্রধান, কিন্তু যেরূপে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে, তাহাতে 'ফুললো আর মলো' এই যে প্রবাদ বাক্যটী আছে তাহাই আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। গ্রন্থকার ততব্যস্ত না হইলে উপসংহারটি অধিকতর মনোহর হইত সন্দেহ নাই।"[১] মশাররফ হোসেন নাটকখানি 'মহামহিমমিত্র' আবদুল লতিফ খান বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন। লাহিনীপাড়ায় মশাররফের বাটীতে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র অভিনয় হয়।[২]

তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'জমিদার-দর্পণ' নাটক (চৈত্র ১২৭৯)। নাটকখানি উপহার দিয়েছেন পদমদীর জমিদার মীর মোহাম্মদ আলীকে। তিনি 'পাঠক সমীপে নিবেদন' অংশে বলেছেন, "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।"[৩] 'জমিদার দর্পণে'র আদর্শ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (১৮৫৮)। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র নাটকটির সমালোচনা করেন। "জমিদারদিগের অত্যাচারের উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য, নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য। ... নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা, জমীদারের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, সেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে।"[৪] মশাররফ হোসেন এই

১. বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৬৮৬-৮৭

২. এডুকেশন গেজেট, ১০ শ্রাবণ ১২৮০

৩. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ১৯১

৪. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০

প্রথম স্বসমাজকে স্পর্শ করেছেন এবং সমকালীন সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন। শিল্পীর স্বভাবজ সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে তিনি সমশ্রেণীর বিরুদ্ধেও কলম ধরেছেন—অর্থলোলুপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, প্রজানিপীড়ক জমিদারদের মূর্তি তুলে ধরেছেন এই নাটকে।

পঞ্চম গ্রন্থ 'এর উপায় কি?' প্রহসন। কাহিনীর পটভূমি মধ্যবিত্ত সমাজ। মদ্যাসক্ত ও বেশ্যাসক্ত পুরুষের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৯৯) ভূমিকায় মশাররফ হোসেন বলেছেন, "... বিষয়টি ভাল নয়—কিন্তু রাধাকান্ত বাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার খুঁজিলে যে, না পাওয়া যায় তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে হইতেছে। কত পরিবারের চক্ষের জল অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ নহে,—কোনও সত্য ঘটনার কতকসময়ের চিত্রই 'এর উপায় কি?' বিষয়টী যতই কেন কদর্য্য হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে,—আর কেন? বাবুদিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করি।"[১] লেখকের উদ্দেশ্য যে সমাজ-সংস্কার, এখানে তা স্পষ্ট। ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রহসনখানির বিরূপ সমালোচনা হয়। "এদেশের মুসলমান ভদ্র লোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে বীতস্পৃহ, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কদাপি সখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই, এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু তাঁহারা যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও, কল্পনায় ও ভাষায় যার পর নাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন,—অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায় আমরা বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করি—এর উপায় কি?"[২] মদ্যপান, বেশ্যালয় গমন প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ নিয়ে সেযুগে নাটক-প্রহসন অনেকে লিখেছেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রভৃতি এ শ্রেণীর রচনা। মশাররফ 'সধবার একাদশী'র দ্বারা প্রভাবিত হন। উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রিয়চর্চায় মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনেও পদস্খলন ঘটেছিল।[৩]

---

১. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ২০০ ('নিবেদকের কয়েকটি কথা' দ্রষ্টব্য)।

২. বান্ধব, আশ্বিন ১২৮৩

৩. আনিসুজ্জামান, ডক্টর—মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'এর উপায় কি?' পাণ্ডুলিপি, ৩ খণ্ড, ১২৮৩, পৃঃ ১৬৩

মশাররফ হোসেনের পরবর্তী রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'। তিনটি 'পর্বে' এটি সম্পন্ন—মহররম পর্ব (১২৯১), উদ্ধার পর্ব (১২৯৪) ও এজিদ পর্ব (১২৯৭) মশাররফ হোসেনের সমস্ত খ্যাতির মূলে আছে 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কারবালার বিষাদময় কাহিনী নিয়ে উপন্যাসখানি রচিত। কল্পনার যথেষ্ট আশ্রয় থাকলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক চিন্তার বাহন করেছিলেন, মশাররফ তেমনি দোভাষী পুথি প্রভাবিত পৌরাণিক-ঐতিহাসিক কাহিনীকে নতুন চিন্তার বাহন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই ধর্মের বন্ধন স্বীকার করেননি। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাবণ ও এজিদ সংগ্রাম করে উভয় লেখকের সহানুভূতি পেয়েছেন। অধার্মিকতা, পাশবিকতা প্রভৃতি দীর্ঘকালের আরোপিত মনুষ্যত্বহীন চরিত্র-ধর্ম থেকে তাঁদের মুক্ত করে মানবোচিত চারিত্রিক দোষ-গুণ দান করেছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক 'মুখবন্ধে' বলেছেন, "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনা-কৌশল এবং শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। .. মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গ ভাষাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।"[১] 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় এর সমালোচনা হয়। "প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদ-সিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পূর্ণ যে পাঠকালে চক্ষে জল রাখা যায় না।"[২] পরবর্তীকালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "... তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। ... মহরমের আখ্যান-কাব্য বিষাদ-সিন্ধু কিরূপ প্লাবনী করুণরসে টলটল করিতেছে।"[৩] লেখকের গদ্যভঙ্গি অত্যন্ত বেগবান, প্রমূর্ত ও স্বচ্ছন্দগামী। 'ভারতী' মন্তব্য করে, "ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"[৪] পাঁচ মাস আগে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল, "এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেরও বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে।"[৫]

---

১. মীর মশাররফ হোসেন—বিষাদ-সিন্ধু, মহররম পর্ব, ১৮৮৫, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।
২. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২: 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' ১ খণ্ড, পৃঃ ১৬ ('মীর মশাররফ হোসেন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)
৩. বসুধা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮
৪. ভারতী, ফাল্গুন ১২৯৩
৫. ঢাকা প্রকাশ, ৪ আশ্বিন ১২৯৩

তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণ দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী 'শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন'কে উৎসর্গ করেন।[১] পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেটি বর্জন করেন। সম্ভবত: জমিদার পরিবারের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি সেটি প্রত্যাহার করেন।

সপ্তম গ্রন্থ 'সঙ্গীত লহরী' (১২৯৪) সঙ্গীতের বই, অধিকাংশ গানে সুর ও তালের উল্লেখ আছে। গীতিকবিতা হিসাবেও এগুলি সুখপাঠ্য। মীর-পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল; মশাররফের পিতা বাদ্য সঙ্গীত চর্চা করতেন। বাইজীর নাচ-গান জমিদার-পরিবারে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত। সঙ্গীতে রসবোধ তাঁদের আবশ্যক ছিল। মশাররফ হোসেন পারিবারিক সূত্রে সঙ্গীতে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। প্রেমই 'সঙ্গীত লহরী'র মুখ্য বিষয়, তবে কোন কোনটিতে সমাজের চিত্র আছে। 'ললিত রাগিণী' ও 'আড়াঠেকা তালে'র একটি গান এরূপ:

কাতরে ডাকি তোরে, শুন মা ভারতেশ্বরী।
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে, মরি মরি।।
থাক মা সাগর পারে,
কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা-প্রজা কিংকরে,
বিনয়ে মিনতি করি।।
দয়া মমতা পালিনী
প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
দীন-দুঃখ নাশিনী
মা, তুমি শুভংকরী।
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি।
করুণা কটাক্ষ রাখি, তর মা ভারতেশ্বরী।।[২]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'নীলকর', 'দুর্ভিক্ষ' ইত্যাদি কবিতার অনুরূপ ভাব ও সুর আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে'র সাথে মশাররফ হোসেনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

মশাররফ হোসেনের অষ্টম গ্রন্থ 'গো-জীবন' (২৫ ফাল্গুন ১২৯৫) একখানি প্রবন্ধ পুস্তক। প্রথমে 'কৌতুকাবহ গল্প' পরে কাব্য, তৎপরে তিনখানি নাটক

---

১. 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য

২. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৬২২

ও প্রহসন, একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, একখানি সঙ্গীত, অতঃপর প্রবন্ধ পুস্তক—মশাররফ হোসেন ঘনঘন আঙ্গিকের পরিবর্তন করেছেন ; অবশ্য সময়সীমা অনেক, প্রায় ২০ বছরের ব্যবধান। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গো-বধ নিয়ে দীর্ঘকালের বিবাদ ছিল ; মশাররফ হোসেন গো-হত্যার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে 'গো-জীবন' রচনা করেন। মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে তাদের মধ্যে থেকে এর প্রতিবাদ উঠে: বাদ-প্রতিবাদ শেষে আদালত পর্যন্ত গড়ায়।[১] সেদিক থেকে 'গো-জীবন' সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। 'গো-জীবনে'র প্রথম সমালোচনা হয় 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়। "কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। ... লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে, আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি, অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।"[২] দ্বিতীয় সমালোচনা হয় 'অনুসন্ধানে'। "মীর মশাররফ হোসেন মহাশয় স্বয়ং মুসলমান হইয়াও গো-হত্যার প্রতিকার বিষয়ে যে এই পুস্তক লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকেই প্রকৃতই হৃদয়বান বলিতে হয়। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্র হইতেও দেখাইয়াছেন যে, গো-হত্যা তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধও নহে।"[৩] তৃতীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। "তিনি (মশাররফ) মুসলমান হইয়া স্বীয় ভ্রাতা মুসলমানদিগকে গোমাংস সেবনে নিরত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, গোজাতির উপকারিতা ভূয়সী, উহার নিধনে দেশের দুগ্ধ প্রভৃতি সুখাদ্যের ও কৃষিকার্য্যের হানি, গোমাংস সেবনে উৎকট ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা—সেহেতু উহা এদেশের উপযোগী নহে। ... দয়াধর্ম্মের মূল এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।"[৪]

গদ্য-পদ্যে রচিত 'বেহুলা গীতাভিনয়' (৭ আশ্বিন, ১২৯৬) দেশীয় যাত্রার চঙে রচিত। তিনি 'অগ্রে পাঠ্য' শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছেন, "বেহুলা লখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রীমহলে বেহুলার কাহিনী বড়ই আদরের। ... এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষাদোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই

---

১. চতুর্থ অধ্যায়ের 'ধর্ম' অংশে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে
২. ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৫
৩. অনুসন্ধান, ১৫ বৈশাখ ১২৯৬
৪. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮১১ শকাব্দ (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)

শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই।..মনসার ভাসানই 'বেহুলা গীতাভিনয়'। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত সমাজের কথঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[১] উপকথাশ্রিত গ্রাম্য যাত্রাকে শিক্ষিত শ্রেণীর উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই মশাররফ হোসেন এটি রচনা করেছিলেন। 'রত্নবতী' ও 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী রূপকথাধর্মী। 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনীও আরবের পুরাণ-ইতিহাস মিশ্রিত। 'বেহুলা গীতাভিনয়ে' দেশীয় উপকথা-ব্রতকথার ছায়াপাত আছে। গল্প-উপন্যাস-নাটকের জীবন-কাহিনী অনুসন্ধানে লেখকের এই মানসক্রিয়াটি লক্ষ্যযোগ্য। তিনি সমকালীন জীবনকে বেশী আশ্রয় করেননি। পরবর্তীকালে রচিত 'তহমিনা'র কাহিনীর উৎস ফেরদৌসীর 'শাহনামা'। দু'একটি নাটক-প্রহসন ও আত্মচরিত ছাড়া তিনি সমকালীন সমাজজীবনকে আর অবলম্বন করেননি। শেষ দিকের প্রায় সব রচনা ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিক পুরুষের জীবনেতিহাস। অতীতচারিতা ও কল্পনাশ্রয়িতা রোমান্টিক মনোভঙ্গির লক্ষণ; মশাররফ হোসেনের রোমান্সপ্রিয়তা ছিল সন্দেহ নেই; তবে মশাররফ হোসেন বর্তমান জীবনের সমস্যাকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। মুসলমান সমাজের বিষয় নিয়ে কোন কিছু লেখা সহজ ছিল না। এক 'গো-জীবন' লিখে তিনি বিপদাপন্ন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত কপি তুলে নিয়ে এবং দ্বিতীয় বার প্রকাশ করবেন না এই শর্তে বিরোধী পক্ষের সহিত আপোষে মীমাংসা হয়।

'জমিদার দর্পণে'র উপহারপত্রে তিনি বলেছেন, "অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।"[২] 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র 'জমিদার দর্পণে'র প্রচার বন্ধ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। "আমরা পরামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।"[৩] 'এর উপায় কি?' প্রহসনটি সম্পর্কে সমালোচনা করে 'সুলভ' প্রভৃতি পত্রিকা লেখককে 'গালাগালি' দেন এবং 'বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন' করেন। এমন কি, যে 'প্রিয়তম বন্ধু ভ্রাতা'কে পুস্তকখানি উপহার দিয়েছিলেন, তিনি পুস্তকের সাথে নিজের নাম আর জড়িত রাখতে চাননি। এ সমস্ত তথ্য মশাররফ হোসেন দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন।[৪] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'

১. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ২৬-২৭
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯২
৩. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০
৪. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ২৫৫

গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, "মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমন কি জীবনের সংশয়।"[১] ধর্মের বিষয় নিয়ে লেখাও সহজ ছিল না। শব্দ ব্যবহারেও ছুঁৎ-মার্গতা ছিল। হজরত মহম্মদকে 'প্রভু', 'মহাপ্রভু' বলা চলবে না। 'মৌলুদ শরীফে'র সমালোচনা করে 'নবনূর' মন্তব্য করে, "...হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রভু ও মহাপ্রভু শব্দে বিশেষিত হইলে তাহার পবিত্র নামের মর্যাদা কিছু বাড়ে কি? যীশুখৃস্ট এবং জগদীশ্বরও প্রভু মহাপ্রভু; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও মহাপ্রভু। আমরা জানি না, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।"[২] 'বিবি খোদেজার বিবাহ' নামক পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন যে, বাংলার মুসলমান পাঠকশ্রেণীর চৌদ্দ আনা পদ্যাশ্রিত 'মুসলমানী বাঙ্গালা' বা বটতলার পুথির ভক্ত।[৩] মুসলমানী বাঙ্গালার গ্রন্থসমূহ ছিল আমীর হামজা, ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, গোলে বকাওলী, চাহার দরবেশ, জঙ্গনামা প্রভৃতি আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের অলৌকিক ও আজগুবি কাহিনী। তারা এ শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করেই তৃপ্তি লাভ করে, অন্য কাব্য গ্রন্থ বা নতুন রীতিতে রচিত গদ্য গ্রন্থ পছন্দ করে না। যুগের ধর্ম, সমাজের রীতি এবং পাঠকের মনোভাবকে মশাররফ হোসেন পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেননি; সমাজের গতি এমন ছিল না যে তিনি নতুন পাঠক সৃষ্টি করবেন; রচনার অসাধারণ সৌকর্য দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকগণকে তাঁর পুস্তক পড়তে বাধ্য করেছিলেন, মশাররফের সেরকম প্রতিভাও ছিল না। সুতরাং তিনি যুগচাহিদার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১২৯৭) ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৫ আশ্বিন ১৩০৬)-গদ্যে রচিত আত্মজীবনী। 'উদাসীন পথিক' ও 'গাজী মিয়াঁ' মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক ছদ্মনাম। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবন কথা লেখকের বর্ণনার গুণে প্রায় উপন্যাসের ধর্ম লাভ করেছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র 'মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, "জলধির জলের ঘাত প্রতি-ঘাতেই তরঙ্গের সৃষ্টি। সংসার সাগরেরও ঠিক তাহাই। সেই ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে সকল স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই একে একে ভাঙ্গিয়া দেখাইব। আর মনের কথা শুনাইব।"[৪] 'ভারতী ও বালক' উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে বলে, "সমালোচ্য পুস্তকখানি ঠিক উপন্যাস নহে, ইহা উপন্যাসাকারে নীল

১. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩৭৩
২. নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১
৩. বিবি খোদেজার বিবাহ, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।
৪. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩৭৪

অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ। অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে—তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটি হয় নাই।"[১] ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান মন্তব্য করেন, "মশাররফ হোসেনের যে শিল্পী-সত্তার সমাজ সম্পর্কে ছিল সচেতনতা, দেশের প্রতি ছিল সুগভীর মমতা, পাপের প্রতি শুধু ঘৃণাই নয় ছিল তীব্র ক্রোধ, ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা, যার প্রকাশ দেখি 'জমিদার দর্পণ' নাটকে এবং 'এর উপায় কি' প্রহসনে, তারই একটি উল্লেখযোগ্য অভি-ব্যক্তি ঘটেছে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে।'[২] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে আঙ্গিকের দিক দিয়ে মশারবফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনুসরণ করেছেন। বস্তানীর চরিত্র ও স্থানের নাম কাল্পনিক যা আত্মজীবনীর আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু মশাররফের ব্যক্তিগত জীবনীর সহিত পরিচয় থাকলে ছদ্মনামের অন্তরালে কারা কি ভূমিকায় আছেন, তা চিনতে অসুবিধা হয় না। কর্মস্থল দেলদুয়ারের অভিজ্ঞতা বস্তানী রচনার প্রধান উৎস। 'যম দ্বার' হল দেলদুয়ার আর 'পয়জারন্নেসা' হলেন করিমুন্নেসা চৌধুরানী। মশাররফ হোসেন এঁরই অধীনে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। লেখক স্বয়ং 'গাজী মিয়াঁ' ও 'ভেড়াকান্ত' নাম নিয়েছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র দীর্ঘ সমালোচনা করেন। "গাজী মিয়াঁর বস্তানী একখানি বিচিত্র সমাজ চিত্র, সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল ... যাহা চাও তাহাই প্রচুর অথচ সকল রসের উপর হৃদয়কাতর করুণ উথলিয়া পড়িতেছে। গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটু দোষ পরিহার করিতে পারেন না; ... গাজী মিয়াঁর কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাসপ আঘাত ধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাতর ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ফুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক। হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ পড়ে নাই। বস্তানীর পল্লীচিত্র ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্ণিস, ভিতরে টিনের পাতা, দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে, বিচার নাই। ... রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।"[৩] 'তহমিনা', 'বাজিয়া খাতুন', 'প্রেম পারিজাত', 'নিয়তি

১. ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮
২. মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৪২
৩. প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮

কি অবনতি' ইত্যাদি গ্রন্থের কোনটি সাময়িকপত্রে (অংশতঃ) প্রকাশিত হয়, কোনটির নাম কেবল বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়। এগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য।

মৌলুদ শরীফ' (১৩১০), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (বৈশাখ ১৩১২), 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' (১ শ্রাবণ ১৩১২), 'হজরত বেলালের জীবনী' (১৩১২), 'আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ' (কার্তিক ১৩১২) ইত্যাদি ধর্মপুস্তক ও সন্ত-জীবনী। প্রথমখানি গদ্য-পদ্যে রচিত, পরের চারখানি কাব্য। বিবি খোদেজা (মহম্মদের সহধর্মিনী) হজরত ওমর (দ্বিতীয় খলিফা), হজরত বেলাল (ধার্মিক পুরুষ), হজরত আমীর হামজা (বীরপুরুষ) আরবের ইসলামের গৌরবময় যুগের ঐতিহাসিক চরিত্র। মশাররফ হোসেন 'মদিনার গৌরব', 'মোসলেম বীরত্ব', 'এসলামের জয়', 'হজরত ইউসুফ, 'খোতবা' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেছেন যে-গুলির ভিত্তি ধর্মজীবন। জীবনের শেষ দশকে তিনি যে বাস্তব জীবন থেকে সরে এসে ধর্মমূলক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তা স্বীকার করতে হয়। ধর্মানুরক্তি এর একটি কারণ হতে পারে।[১] বঙ্কিমচন্দ্রও শেষের দিকে ধর্মপুস্তক

---

১. প্রথম দিকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ একটি উদার মনোভাবের পরিচয় দিলেও, শেষের দিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন সম্মেলনে' সৈয়দ আমীর আলী সভাপতির ভাষণে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে আলীগড় কলেজের আদর্শে কলিকাতা ও অন্যান্য মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করার অভিমত ব্যক্ত করেন। আবদুর রহমান পরিচালিত 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এক জরুরী সভায় (৯ জুন ১৯০০)-এর প্রতিবাদ করে এবং সভার সিদ্ধান্তের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ করে। মীর মশাররফ হোসেন লিখিতভাবে সোসাইটিকে তাঁর মত জানিয়েছিলেন। তার পুরো বক্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়া হল: Extract from the opinion of Moulvi Meer Mosharraf Hossain, late Honorary Magistrate, Kustia and Tangail. Resolution 1. The Present system of Education is highly beneficial to the Musalman Students in Bengal and I see no reason why a change should be introduced. A system which time and experience have proved conducive to progress and improvement, should not, in my openion be interefered with. Resolution II. The Madrashas supported by the Mohsin Fund have done immense good toward diffusing the tennts of Islam among the generality of the Musalmans of Bengal. If any change is at all necessary, I would suggest a thorough education in classical Bengali for Mahomedan Youths. Resolution III. A thorough religious education is indispensible for youths receiving education in Schools and Colleges. If the cultivation of our religious literature and inculcation of the principles of our faith be neglected, very deplorable consequences will be the result." *Abstract of the Proceedirggs of an Extraordinary Meeting of this Committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta held at* No. 16 Taltollah, on 9th June, 1900, pp. 44-45

রচনায় ঝুঁকে পড়েছিলেন। মশাররফ হোসেনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। তিনি 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেছেন যে, ইসলামের অতীত গৌরবময় কাহিনী নিয়ে পদ্যে রচিত বটতলার রচনাগুলির পাঠকের সংখ্যা বেশী—প্রায় চৌদ্দ আনা। আধুনিক সাহিত্যের পাঠক দু'আনা মাত্র। প্রথম শ্রেণীর রচনার ব্যবসায় করে কত যে দত্ত, বসাক ধনী হয়েছেন, সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়,—"পদ্য-পদ সংযোজিত না করিতে পারিলে সে আবার লিখক কিসের? একথার প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার মুসলমানি বাঙ্গালা পুস্তক বটতলার বাজার হাট পুরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকও পদ্যপদ ভিন্ন নহে। সমুদয় পয়ার ত্রিপদী চৌপদীতে লিখিত। অনেক পুস্তকে আবার রাগরাগিণী তালের পরিচয়ে গানও আছে। এই প্রকার নিত্য নূতন প্রকাশ হইতেছে। কত হিন্দু মহাশয় ছাপাখানা করিয়া মুসলমানি বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইতেছেন। ... বেশ দশ টাকা লাভের জন্য কত পাইন, দে, দত্ত, শীল, বসাক মহাশয় মল্লিকা হাজার, কেয়ামতনামা, গো-কোরবাণীর ফজিলাত, হজরত এসমাইলের বিবরণ বিক্রয় করিতেছেন। ... ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—মুসলমান সমাজে পদ্যের বড়ই আদর।"[১] দেলদুয়ারের ম্যানেজারীর পদ ত্যাগ করার পর মশাররফ হোসেন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন। বগুড়া, কলিকাতা, পদমদীতে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরেছেন। অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে তিনি চৌদ্দ আনা পাঠকের মনোভাবের উপযোগী কাব্য রচনা করেছিলেন বলেও আমাদের ধারণা। 'মৌলুদ শরীফে'র ভেতর দিয়ে তিনি প্রথম ধর্মভাবজগতে প্রবেশ করেন। গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় তাঁর মনোভাবের প্রতিফলন হয়েছে এভাবে: "পবিত্র মিলাদ শরীফের আলোচনা করিলে ধর্মের মূল সুদৃঢ় হয়, ভক্তিরসে ধর্মমূল সর্বদা সজীবভাবে অবস্থান করে। যে স্থানে হজরতের জন্ম-বৃত্তান্ত আবৃত্তি হয়, সেই স্থানে স্বর্গীয় দূত—ফেরেশতাগণের আবির্ভাব হয়, খোদা তাআলার রহমত নাজেল হয়। মিলাদ শরীফের বরকতে শয়তান ভয়ে সহস্র যোজন দূরে পালায়, অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়, পরকালে মুক্তিপথের পাপ-অন্ধকার বিনাশ করে। ভক্তিশ্রদ্ধা ও এক মনে যিনি পবিত্র মিলাদ শরীফের আয়োজন করেন, মজলিসে যোগদান করেন এবং একচিত্তে ঐ সকল বিবরণ শ্রবণ করেন, সহস্র প্রকার পাপে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার ভাগ্য

---

১. মীর মশাররফ হোসেন—বিবি খোদেজার বিবাহ, কলিকাতা, ২ বৈশাখ ১৩১২; 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য

একবার সুপ্রসন্ন হইবেই হইবে। তিনি নাজাত (মুক্তি) লাভ করিয়া বেহেশতে-দাখিল হইবেনই। ইহার অনেক প্রমাণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। এই মজলিসের নাম শুনিবামাত্র উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে হয়; আহ্বানের অপেক্ষা করিতে হয় না। পরিষ্কার পবিত্র পরিচ্ছদ ব্যবহার, সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা শরীর চর্চিত—সংসারের শোকতাপ যাবতীয় চিন্তা অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া, হজরতের জীবন-বৃত্তান্ত ও গুণকীর্তন একাগ্রচিত্তে শুনিতে হয়। মনুষ্য মাত্রেই পাপী। সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হজরত নূরনবী রসূলে খোদার (দঃ) দয়া ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোন পাপীর মুক্তির অন্য উপায় নাই—পন্থা নাই।... এসলামধর্মের বিধিব্যবস্থা অনুসারে ধর্মচর্চা, শাস্ত্রালোচনা, আরাধনা, উপাসনা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি কার্য ভিন্ন আর কোন প্রকারেই উদ্ধারের উপায় নাই।"[1] মশাররফ হোসেনের কণ্ঠে পুরোপুরি মোল্লা-মৌলবীর সুর ধ্বনিত হয়েছে। গ্রন্থের কবিতা অংশ প্রাচীন পুঁথিকারদের ঢঙে রচিত:

> শুন শুন সবে কথা শুন মন দিয়া।
> পাপে ভরা বসুন্ধরা এল কি দেখিয়া।।
> হজরত নূহ প্রতি করেন আদেশ।
> এক মনে শুন সবে তার সবিশেষ।।
> খোদার মহিমা ভবে কে বুঝিতে পারে।
> ইচ্ছাময় ইচ্ছা তার যাহা ইচ্ছা করে।।
> আমরা মানব জাতি তার কাছে ছার।
> কীট হতে অতি নীচ, নীচ সবাকার।।
> প্রশ্ন নাই কথা নাই তাঁহার কার্যেতে।
> বিজ্ঞান জ্ঞানের সীমা পরাস্ত যাহাতে।।[2]

এটা যে কোন মৌলিক শিল্পীর কণ্ঠস্বর না, তা সহজেই বুঝা যায়। ভাষা-ভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, 'রহমত নাজেল', 'নাজাত লাভ', 'বেহেশতে দাখিল' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ মীরের পূর্ব রচনায় নেই। বিষয় অনুসারে ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক, মশাররফ হোসেন হয়ত সেটাই করেছেন, কিন্তু তিনি তা শিল্পসত্তার বিনিময়ে করেছেন বলে আমাদের ধারণা। খুব সম্ভব 'নবনূরে' সৈয়দ এমদাদ আলীর সমালোচনায় এরই প্রতিধ্বনি আছে।

---

১. মীর মশাররফ হোসেন—মৌলুদ শরীফ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১৩২৪ (৫ সং), পৃঃ ৩-৪ (ভূমিকা)

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮

তিনি লিখেছেন, "...ইহার সঙ্গে পবিত্র শবে মেরাজ, ওফাত ও হজরত বেলালের আশ্চর্য প্রভুভক্তি ও জীবনের শেষ ঘটনার পদ্যপদ গজল ও গাথা গাথা আছে। এই গ্রন্থ সাধারণ সাহিত্য-রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। ...মৌলুদ শরীফ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পাঠনীয় ও অনুষ্ঠেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বাঙ্গালায় অনূদিত এই মৌলুদ শরীফ ফলদায়ক হইবে কিনা, সে বিচার সাধারণ সাহিত্যতন্ত্রে হওয়ার নহে; দেশের মোল্লা সাহেবেরাই ফতোয়া জারি করিবেন। মৌলুদের বৃত্তান্ত মুসলমানের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ... কিন্তু অনুবাদে যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহার ভাষাও অদ্ভুত খিচুরি বিশেষ। তাঁহারা বলিবেন, সাধারণ মুসলমানের বোধ সৌকর্যানুরোধেই এরূপ করা হইয়াছে; ... ধর্মজ্ঞান লাভে কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া এই গ্রন্থের সুপ্রচার বাঞ্ছনীয়।"[১] 'নবনূরে'র এই সমালোচনার কথা স্মরণ রেখে মশাররফ হোসেন 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র 'বিজ্ঞাপনে' লেখেন, "মৌলুদ শরীফ-জাতীয় বিবরণ, জাতীয় ধর্মকথা, বাজে গল্প নহে, আখ্যায়িকা, উপন্যাস নহে। ধর্মসংস্রবী, আদবতামিজসংস্রবী শব্দসমূহ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক প্রতি শব্দ না থাকিলেও কিছু না আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিয়া মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন নব্য লিখক প্রিয় ভ্রাতা ডালখিচুড়ির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সুতরাং নব্যদলে নবীন লিখক ভ্রাতাগণ মধ্যে বিবি খোদেজার বিবাহ আদরণীয় হইবে না ইহা লিখকের মনে ধ্রুব বিশ্বাস। তবে মূল উদ্দেশ্য আশা কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।"[২] 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে মশাররফ হোসেন লিখেছেন, "মুসলমান সমাজে বিবি খোদেজার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ বিবি খোদেজা সমগ্র মুসলমানের জননী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন। বিবি খোদেজাই হজরত মহম্মদ মোস্তফার মাননীয়া প্রিয় সহধর্মিনী। ইহারই কন্যারত্ন বিবি ফাতেমা জগতপূজ্যা। হজরত বিবি খোদেজা দেবীর বিবাহ ঘটনা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার আদি অন্ত পাঠ করিলেই বিবাহ সম্বন্ধের পবিত্রতা, বিচিত্রতা, পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্ত চিত্র, হজরতের সহিষ্ণুতা, সৎকার্যে প্রবৃত্তি, কর্তব্যজ্ঞান, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা এবং বিবি খোদেজার পতিভক্তিসহ সর্বস্বত্যাগ, স্বামীগতপ্রাণা অবলা হৃদয়ের বল ও একাগ্রতা বিষয়ের সপ্রমাণ সমুজ্জ্বল-

১. নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১
২. বিবি খোদেজার বিবাহ, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য

ভাবে দেখিতে পাইবেন।"[১] 'ঢাকা প্রকাশ' গ্রন্থখানির সমালোচনা করে বলে, "কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, আখ্যায়িকা অংশে এ গ্রন্থখানি অপ্রীতিকর নহে। পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্তচিত্র, হজরতের সহিষ্ণুতা, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিবি খোদেজার পতিভক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি মীর সাহেব বেশ সরল ভাবে মাধুর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"[২]

'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মশাররফ হোসেন লিখেন, "পরমপূজ্য হজরত মহম্মদ মোস্তফার (দঃ) পবিত্র জীবনের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, তৎসমুদয় ক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিব মনে করিয়াছি। ... ইহাতে ইসলাম ধর্মের সভ্যতার জীবন্ত ও জলন্ত জ্যোতিঃ নবভাবে উদিত-চালিত, রক্ষিত-পরীক্ষিত, আদৃত-সম্মানিত ও সম্মিলিত হইয়া দিগদিগন্তরব্যাপী ধীশক্তি সম্পন্ন মহাশক্তির আবির্ভাবে বহু অন্তরের বিঘোর অন্ধকার বিশদরূপে বিদূরিত করিয়া এক উপাদেয় ঘটনার অবতারণা করিয়াছে; সেই উপাদেয় ঘটনাই আজ পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি।"[৩]

মশাররফ হোসেনের পরবর্তী ৮ খানা গ্রন্থে নতুন আঙ্গিক কিংবা নতুন বিষয় আসেনি—ধর্মকথা ও আত্মকথার অনুবর্তন আছে। 'আমার জীবনী' ও 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' তথা 'বিবি কুলসম' আত্মজীবনী হয়েও উপন্যাসের রসাস্বাদন লাভ করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র বেগবান গদ্যকে তৈরি করতে হয়েছে, 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুমে'র সাবলীল গদ্য জীবনের তলা থেকে উঠে এসেছে; এজন্য এতে এতটুকু আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা নেই। বিষয় ও বিষয়ীর অভিন্নতার কারণে শিল্পীমনের খোলা দরজা দিয়ে আবেগ-স্পন্দন ও প্রকাশ-স্বচ্ছন্দতা এসেছে। মশাররফ হোসেন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন উনিশ শতকের সত্তর দশকে, শেষ করেন বিশ শতকের প্রথম দশকে। চল্লিশ বছরে যুগ ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মশাররফের মনোভাব ও চিন্তাজগতের পরিবর্তন হয়। বিশেষতঃ বাংলার মুসলিম সমাজের তখন সংকট ও সংকট-উত্তরণের কাল। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ও 'সংবাদ-প্রভাকরে'র মাধ্যমে তিনি সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন; কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার ও ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সাহিত্যিক গুরু। আটি দশকে 'গো-জীবন' নিয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। 'ফতুয়া-প্রপীড়িত' সমাজে স্বাধীন ও উদার ভাবে কোন কিছু

১. বিবি খোদেজার বিবাহ, 'পাঠকগণের সমীপে নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য

২. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১২

৩. হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ, কলিকাতা, ১ শ্রাবণ ১৩১২, 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' দ্রষ্টব্য

বলা যে কত কঠিন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।[১] নব্বই দশকে মুসলমানদের সাময়িকপত্রগুলির আবির্ভাব হয়; সেগুলির অধিকাংশই ছিল ইসলাম-পন্থী, সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনা দূরের কথা, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ধ্বংস করার পক্ষ-পাতী ছিল অনেক পত্রিকা। কোন কোন পত্রিকায় মশাররফের লেখা ছাপা হয়েছে। এগুলির যৎসামান্য সাহিত্যিক মেজাজ ছিল। ছোট-বড় প্রায় সব লেখকই ইসলামী ভাবধারা আমদানী করে 'জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির আন্দোলন করেছেন। সমাজপতিদের কণ্ঠেও সেই সুর। মশাররফ হোসেন যুগের এই দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি, যুগধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতাকে অস্বীকার করার মত তাঁর মানসিক গঠন, শিক্ষা, প্রতিভা ছিল না। তাঁর অর্থনৈতিক ভিত্তিও দুর্বল ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তলোকে যে স্বাভাবিক বিচলন দেখা দেয়, মীরের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে, যৌবনের ভাবনা এবং যৌবনোত্তরকালের ভাবনার মধ্যে আদর্শগত ও নীতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কলিকাতার রক্ষণশীলদের সাথে তাঁর যোগসূত্র ছিল। কোন দৃঢ় মতবাদ বা বড় আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হননি। 'গো-জীবন' সম্পর্কিত দ্বন্দ্বে তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলদের কাছে নতি স্বীকার করেন। জমিদার বংশোদ্ভূত মীর মশাররফ হোসেনের সমস্ত সাহিত্য-কর্ম যুগধর্ম ও স্বসমাজের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের সফলতা ও ব্যর্থতার পরিচয় প্রসঙ্গে ত্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখেছেন, "তিনি (মশাররফ) সহজাত শিল্পবোধ ও রসানুভূতির অধিকারী ছিলেন প্রতি-ভার গুণেই। তিনি চিন্তার রাজ্যে বিপ্লবী নহেন, কিন্তু যুগের ইঙ্গিতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয়তা ও মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছেন। ... কিন্তু যেখানে তিনি মুসলিম নব-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি, সেখানে তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।"[২] মশাররফ হোসেন ধর্মভাব নিয়ে দশখানা পুস্তক লিখেন যা তাঁর সমগ্র রচনার প্রায় ত্রিশ শতাংশ। রূপকথা-পুরাকথাধর্মী গল্প এবং ছোট ছোট নক্সা-প্রহসনের সংখ্যাও প্রায় ত্রিশ শতাংশ। এই দুই শ্রেণীর রচনা বাদ দিলে বাকী চল্লিশ শতাংশ রচনা অর্থাৎ চৌদ্দ-পনের খানি গ্রন্থের ভিত্তির উপরে মশাররফের প্রকৃত সাহিত্যকীর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মানবপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, সমাজের হিতচিন্তা এসব রচনায় সহজ স্ফূর্তি লাভ করেছে।

---

১. উদাসীন পথিকের মনের কথা, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য

২. ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ১০০

মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮)

'আমার প্রথম যৌবনে যখন সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করি, মুসলমানদের জাতীয় জীবনে তখন এক সূচীভেদ্য ঘোর অমানিশা রাজত্ব করিতেছিল, ... দেখিলাম সেই অন্ধকার যুগেও বাঙ্গালার সাহিত্য গগনে সমাজের দুইটি ধ্রুবতারা অন্ধকারে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে—তাহার একটি পরলোকগত মীর মশাররফ হোসেন সাহেব, এবং অন্যটি মৌলবী নইমুদ্দীন মরহুম মগফুর সাহেব।"[১] 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ আবদুর রহিম এই উক্তি করেন। মোহাম্মদ নইমুদ্দীন মীর মশাররফ হোসেনের পনর বছর বড়; সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন চার বছর পরে। টাঙ্গাইলে উভয়ে একত্র হয়েছিলেন, কিন্তু একত্রে মিলতে পারেননি। গো-রক্ষা-গো-বধ দ্বন্দ্বে উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততার পর্যায়ে দাঁড়ায়। করটীয়ার 'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৮৪) সাময়িকপত্রটি সম্পাদনা করতেন মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। টাঙ্গাইলের 'আহমদী' (১৮৮৬) পত্রিকায় মশাররফ হোসেন 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধ লেখেন। মশাররফ হোসেন গো-বধের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলে নইমুদ্দীন নিজ পত্রিকায় (পৌষ ১২৯৫) তীব্র ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ করেন এবং প্রবন্ধলেখককে 'কাফের' এবং তাঁর 'স্ত্রী হারাম' বলে ফতোয়া দেন। এতে মশাররফ হোসেন মানহানির মামলা করেন। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ নইমুদ্দীনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। নইমুদ্দীন ইসলামপন্থী এবং পুরোপুরি রক্ষণশীল। ধর্মীয় বক্তৃতা ও পুস্তকাদির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান ধর্ম ও সমাজের স্বার্থে তাঁর নীতি ছিল অবিচলিত ও আপোষহীন।

টাঙ্গাইলের শুরুজগ্রামে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের মধ্য-বাংলা বিদ্যালয় থেকে 'ছাত্রবৃত্তি' পাশ করে পাবনার দুলাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ঢাকায় বিশিষ্ট আলেমের তত্ত্বাবধানে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদ, বিহার, এলাহাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে এবং আলেম-আউলিয়াদের সহিত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করে 'জাহেরী ও বাতেনী' বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।[২] ইব্রাহীম খাঁ বলেন, তিনি নর্মাল পরীক্ষা পাশ করে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে পাবনায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার

১. শেখ আবদুর রহিম—বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ, মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৩৬

২. আবদুল কাদির—মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৩৬

ও কাজীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিশেষে এসব কাজ ত্যাগ করেন এবং করটীয়ার জমিদার খান পন্নী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[১] তিনি হানাফী মজহাবে বিশ্বাসী ছিলেন। পত্রিকা ও পুস্তকে হানাফী মতাদর্শ প্রচার করেন। একজন সুবক্তা হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। করটীয়ার গোলাম সারওয়ার ছিলেন তাঁর সহযোগী।

মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের প্রথম গ্রন্থ 'জোব্দাতল মসায়েল' (১ খণ্ড, ১৮৭৩)। এটি অনুবাদধর্মী ধর্মগ্রন্থ। লেখক 'আভাষ' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন, "শরার সমুদয় বিবরণ আরবী ভাষায় যেরূপ জানা যায়, অদ্য পর্যন্ত কোন ভাষাতেই সেরূপ জানা সম্ভব নহে। কিন্তু মাতৃভাষায় তাহার মূল নিয়মগুলি জানিতে পারিলে অনেক উপকার আসে। বহুদিন যাবত আমার অন্তঃকরণে এই আশা ছিল যে, অতি সরল বঙ্গভাষায় শরার মূল নিয়মগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি, যাহাতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই উপকার হয়।... এই জোব্দাতল মসায়েল অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থাশাস্ত্রের সার সংগ্রহ কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করি নাই, বরঞ্চ শরেহ বেকায়া, কাজীখান, জামেয়ের রক্কুম, কানজ, আলমগিরী, দোরল মোখতার প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া লিখিত হইল।"[২] জোব্দাতল মসায়েলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। এতে ইসলাম ধর্মকর্মের বর্ণনা ও নির্দেশ আছে। 'বালক-শিক্ষকে'র প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মেরবিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। উভয় খণ্ড করটীয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অনুমত্যনুসারে ও অর্থানুকূল্যে রচিত ও মুদ্রিত হয়। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'ইনসাফ' (১৮৮৬) 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়ের বিপক্ষে মত প্রচার করে লিখিত।[৩] প্রায় একই বিষয় নিয়ে তিনি 'লা-মজহাবিগণের ধোকাভঞ্জন' (১৮৮৯) লিখেন। হানাফীমতের বিরুদ্ধে প্রচারিত লা-মজহাবীদের পুস্তিকার প্রতিবাদে এটি রচিত হয়।[৪] নইমুদ্দীন লা-মজহাবীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ঐ মজহাবকে 'মন মজহাব' বলে কটাক্ষ করেন।[৫] তিনি মোট ৪ খণ্ড 'ফতুয়ায়ে আলমগিরী' (১৮৮৪-৯২)

১. ইব্রাহিম খাঁ—মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মাহে-নও, চৈত্র ১৩৬৫
২. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—জোব্দাতল মসায়েল, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৯০১ (৭ সং), পৃঃ ৶৹ (আভাষ)
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ, খ., ১৮৮৬
৪. ঐ, ২ ত্রৈ. খ., ১৮৮৯
৫. জোব্দাতল মসায়েল, পৃঃ ৷৹ (আভাষ)

প্রণয়ন করেন।[১] আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক 'ফতুয়া-ই-আলমগিরি' রচিত হয়। এটি তারই বঙ্গানুবাদ। তিনি গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বলেছেন যে, 'দেওয়ান হাফেজ মাহমুদালী খাঁ জমিদার সাহেবের অনুমত্যনুসারে' ও 'মৌলবী গোলাম সরওয়র সাহেবের সাহায্যে সংশোধনে' এটি প্রকাশিত হয়েছে।[২] নইমুদ্দীনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ৩ খণ্ডে 'বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ' (১৮৮৭-১৯০৮)।[৩] ব্রাহ্ম ধর্মভুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম কোরানের বঙ্গানুবাদ করেন (১৮৭৬)। মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ মুসলমানকৃত প্রথম অনুবাদ। এদেশের মুসলমানদের আরবী ভাষা ও কোরান সম্বন্ধে এমন উত্তুঙ্গ ধারণা যে, বাংলায় তার অনুবাদ অকল্পনীয় ছিল। বাংলার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রচর্চা মধ্যযুগ থেকেই মোল্লাদের কাছ থেকে প্রতিবন্ধকতা পেয়ে এসেছে। 'আরবী-লিখন' বাংলায় তরজমা মহাপাপ। সে-সংস্কার নইমুদ্দীনের যুগেও দূরীভূত হয়নি। শেখ আবদুর রহিম এ সম্পর্কে আলোকপাত করে লিখেছেন, '...সমাজেরই বা তখন কি ঘোর অন্ধবিশ্বাস। কি শোচনীয় দুরবস্থা। ইংরাজী ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও তখন কাফের ভাষা হইয়া গিয়াছে—সুতরাং উক্ত উভয় ভাষাই অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য। বাঙ্গালা ভাষায় কোরআন, হাদিস বা ধর্মগ্রন্থ লিখিলে সে স্পষ্ট ধর্মদ্রোহী হইবে। ...বাঙ্গালা ভাষায় হজরতের জীবনী বাহির করিতেও তখন আমাকে মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদিগের সার্টিফিকেট লইতে হইয়াছিল। ...মৌলভী নইমুদ্দীন সমাজের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা তুলিয়া কোরআন শরীফের সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তফসীর প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজে এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তাঁহার উপর কত ফতোয়া-বৃষ্টি হইতে লাগিল। ওদিকে মীর মশাররফ হোসেন

---

১. 'ফতুযাযে আলমগিরী'র ১ খণ্ড ১৮৮৪ সালে, ২ খণ্ড ১৮৮৭ সালে, ৩ খণ্ড ১৮৮৯ সালে এবং ৪ খণ্ড ১৮৯২ সালে মুদ্রিত হয়। প্রথম খণ্ড কলিকাতা ও পরবর্তী খণ্ডগুলি করটিয়ার 'মাহমুদীয়া যন্ত্র' থেকে ছাপা হয়।
বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ. খ., ১৮৮৪, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৮৯, ৩ ত্রৈ. খ., ১৮৯২

২. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—ফতুওয়ায় মাহমুদীয়া অর্থাৎ ফতওয়ায় আলমগিরী, ২ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটিয়া, ১৮৯৪

৩. কোরানে মোট ৩০টি অধ্যায় আছে। শেষের অধ্যায়ে ছোট ছোট সুরা (মন্ত্র) আছে যা শিক্ষার্থীদের প্রথম শেখান হয়। নইমুদ্দীন ৩ খণ্ডটি 'আম্মাসিপারা' (শেষ খণ্ড) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

সাহেব হিন্দু সাহিত্যের আদর্শে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া সমাজে নিন্দিত হইতে লাগিলেন।"[১]

সমাজের নিন্দা, ফতোয়া-বৃষ্টি শিরোধার্য করে নইমুদ্দীন স্বপথে অবিচল থেকেছেন, কারণ তিনি বুঝেছেন, এ পথ সমাজের কল্যাণের পথ, মুক্তির পথ। তিনি নিজে একজন আলেম হয়েও আলেমদের বদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন বৃহত্তর সমাজের জন্যই। এক্ষেত্রে নইমুদ্দীনের চিন্তাধারা তাঁর রক্ষণশীলতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

'ইসলাম-প্রচারকে' কোরান শরীফের সমালোচনা করা হয়। "এই বঙ্গানুবদিত কোরান শরিফখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। মৌলবী সাহেব আরবী অক্ষরে কোরান শরিফের আয়াতগুলি লিখিয়া অর্থ বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন, তৎপরে টীকা সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক আয়াতের নিম্নভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। টীকা না পড়িলে আয়াতের প্রকৃত ধর্ম অবগত হওয়া যায় না, তাই মৌলবী সাহেব বহু যত্ন স্বীকার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য টীকাসকল সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে আয়াতগুলির অর্থ সহজবোধ্য হইয়াছে।"[২] করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একটি 'প্রশংসাপত্রে' (৩১ শ্রাবণ ১৩০০) লেখেন, "এই বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ বঙ্গীয় এসলাম সমাজের গৌরবের আদর্শস্থল। ইহার পবিত্র জ্যোতিতে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া নির্মল এসলাম ধর্মের পথ দেখিতে সমর্থ হইবে। এবং কোরান শরিফের পবিত্র ভাব, পবিত্র মত, পবিত্র আদেশ যাবতীয় মানবজীবনে প্রতিফলিত হইয়া আপনার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিবে এবং মুসলমান সমাজ আজীবন আপনার কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে।"[৩]

তাঁর 'কালেমাতল কুফর' (১৮৯১) গ্রন্থে মুসলমানের আদব-কায়দার কথা বলা হয়েছে। কিরূপ কথাবার্তা, আচরণ ও মনোভাব মুসলমানকে কাফেরে পরিণত করে, এতে তারই নির্দেশ আছে।[৪]

---

১. মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৩৬
ইব্রাহিম খাঁ তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণা করে অনুরূপ চিত্র বর্ণনা করেছেন: "ছোট বেলায় আমপারার উপর 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার মলাট দিয়েছিলাম। আমার ওস্তাদ সক্রোধে সে মলাট টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হুকুম দিয়ে বলেছিলেন, 'এত বড় বেআদবী'। কালামুল্লার উপর বাংলা হরফ। সে আমলে কোরানের বাংলা তরজমায় হাত দেওয়া কল্পনাতেরও কথা ছিল না।"
ইব্রাহিম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫
২. ইসলাম-প্রচারক, কার্তিক ১২৯২
৩. কোরান শরিফ, শেষ খণ্ড, 'প্রশংসাপত্র' দ্রষ্টব্য।
৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ. খ., ১৮৯১

'এসবাতে আখেরজ্জোহর' (১৮৯১) গ্রন্থে শুক্রবারের জুমা ও জোহরের নামাজ সম্বন্ধীয় বিতর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে, ঐদিন জুমা ও জোহর উভয়ই পড়ার নিয়ম।[১] 'বেতর' (১৮৯৪), 'তারাবিহ' (ঐ), 'মৌলুদ শরীফ' (১৮৯৫) নমাজ সম্পর্কীয় তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা। 'রফা ইদায়েন' (১৮৯৬) ও 'আদেল্লায় হানিফীয়া বা রদ্দে লা-মজহাবী' (১৮৯৭) গ্রন্থ দুটিও বিতর্কমূলক। 'আদেল্লায় হানিফীয়া'য় লা-মজহাবীদের আক্রমণ করে বলেছেন, "এই কেতাব পাঠ করিলে ... লা-মজহাবীগণের অবস্থার আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না; উহাদের দাগাবাজি, ফেরেববাজি, ঝুটামি সকলি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এবার এই কেতাবের শেষ ভাগে উহাদের অনেক ধোকা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।"[২]

'সেরাতল মস্তাকিম' (১৮৯৬) ও 'সিরাজল হেদায়েত' (ঐ) ধর্মনীতি সম্পর্কীয় পুস্তক। 'কোরান শরীফে'র শেষ খণ্ড অর্থাৎ 'আম্ম সিপারা'র 'আভাষে' নইমুদ্দীন লিখেছেন, "... দোয়া দরুদ ইত্যাদি যাহা নমাজে পড়া আবশ্যক তাহার অর্থ লিখিয়া 'সেরাতল মস্তাকিম' নামক একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ এই অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।"[৩] নইমুদ্দীন ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে কিছুকাল উত্তরবঙ্গে অবস্থান করেন। তাঁর কোরানের অনুবাদ জলপাইগুড়ির জমিদার খান বাহাদুর রহিম বক্সের অর্থানুকূল্যে ও প্রযত্নে মুদ্রিত হয়।[৪]

হানাফীমতের বড় ব্যাখ্যাতা ইমাম বোখারির আরবী তত্ত্বশাস্ত্রের অনুবাদ 'সহি বুখারী শরীফ' (১৮৯৮) একটি বৃহৎ গ্রন্থ; মোহাম্মদ নইমুদ্দীন গোলাম সারওয়ারের সহযোগিতায় এটি প্রণয়ন করেন।[৫]

৮ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র প্রচার-পুস্তিকা 'গোমস্তা-দর্পণ' (১৮৮৬)। এতে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে দাখিলাদি জমিদারী নথিপত্র লেখার উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬]

মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবনে'র (১৮৮৯) প্রতিবাদে নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড' (১৮৮৯) রচনা করেন। 'আখবারে এসলামীয়া'য় (শ্রাবণ ১২৯৫) প্রকাশিত নইমুদ্দীনের

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯২
২. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮; আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩
৩. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—কোরান শরীফ, শেষ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র. ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৷৹ (আভাষ)।
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৪১ (৪ সং)।
৫. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮
৬. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৮৬

একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ মশাররফ 'গো-জীবনে' সংকলিত করেন। তাঁর অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি মশাররফ হোসেন বাদ দেন, এরূপ অভিযোগ এনে নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড' সংকলনটি প্রকাশ করেন।[১] এটি তৎকালীন গো-হত্যা বিষয়ক সামাজিক সমস্যার ফল।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০)

টাঙ্গাইলের চারান গ্রামনিবাসী আবদুল হামিদখান ইউসফজয়ী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'আহমদী'র (১৮৮৬) তিনি সম্পাদক ছিলেন। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত ছিল। মীর মশাররফ হোসেন এই পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। গো-হত্যা ও হানাফী-লা-মজহাবী প্রশ্নে 'আখ্‌বারে এসলামীয়া'র সাথে 'আহমদী'র অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল।[২]

গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত 'সারসংগ্রহ' (১ খণ্ড, ১৮৭৮) নামে একখানি নীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনার দ্বারা আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর সাহিত্যিক জীবনের শুরু। পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "যতই সদ্‌গ্রন্থের প্রচার ও দেশীয় যুবকগণের মন নীতি এবং ধর্মরসে অভিষিক্ত হয়, ততই মঙ্গল বিবেচনা করিয়া এই সামান্য পুস্তকখানি প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার অধিকাংশ পারসী, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর বিশেষ বিশেষ স্থানের ভাব অনুবাদ ও অনুকরণ। পদ্যগুলি আমার স্বকল্পিত।"[৩] ২৩ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চারটি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ আছে। 'নীতিকথা' প্রবন্ধের একটি উক্তি এরূপ: "বিনয়ে ক্রোধীকে, সত্য ও সরলতায় সাধুকে, সেবা ও ভক্তিতে প্রভুকে, ধনে লোভীকে, শাস্তি দ্বারা খলকে, বশ্যতায় গুরুজনকে, উদারতা ও উপকারে মিত্রকে এবং মিষ্টকথা ও নম্রতায় জগৎকে বশীভূত কর।"[৪] ময়মনসিংহের 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় ইউসফজয়ীর কাব্যখানি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' 'সার-সংগ্রহে'র সমালোচনা হয়। "গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র; ইহার অধিকাংশ ধর্মবিষয়ক বাক্যাবলী। ...নীতিকথাগুলি ভাল, বালকদের জানা উচিত।"[৫]

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৯
২. এ অধ্যায়ের 'পত্র-পত্রিকা' অংশ দ্রষ্টব্য
৩. সারসংগ্রহ, ১ খণ্ড, ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৮৭৮, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য
৪. ঐ, পৃ: ১৮
৫. বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৫

এর পর আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 'বিরাগ সঙ্গীত' (১৯৮০), 'প্রবোধ সঙ্গীত' (১৮৯১) এবং 'উদাসী' (১৯০০) নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথম দুখানি কাব্যের বিষয়বস্তু মূলতঃ অধ্যাত্মপ্রেম। সুফীতত্ত্বে আসক্তি-বিরহিত যে অধ্যাত্মপ্রেমের কথা আছে, ইউসফজয়ী সেই প্রেমাদর্শের কথা প্রচার করেছেন। 'বিরাগ সঙ্গীতে'র প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থের প্রকাশক 'নিবেদনে' বলেছেন, "হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় জাতিই ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য ভাবিয়া সাংসারিক জাকজমক বিশিষ্ট উন্নতি সঙ্কল্পে নিতান্ত উদাসীন। পরিণাম চিন্তা এবং বীতরাগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি ঔদাসীন্য ভাব সকল তাঁহাদের মনপ্রাণ অন্তরের অস্থিমজ্জা নিয়ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই উভয় জাতির মধ্য হইতেই অসংখ্য সংসার-বিরাগী উদাসীন তপস্বীগণ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী অলংকৃতা করিয়াছেন। আর অধুনাতন এই উভয় জাতিই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসী; বরং, অধিকাংশ বিষয়েই প্রধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাম্প্রতিক তাঁহাদের মধ্যে অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বাসনাসক্তি এবং অজ্ঞান ও অদূরদর্শিতার প্রাবল্য দিন২ যতদূর পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহাতে অতি সত্বর এদেশের পতন ও দুরবস্থা নিশ্চিতরূপে সম্ভাবনীয় হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ নাই। এই সম্ভাবিত দুর্ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়াই আমাদের বিশ্বপ্রেমিক প্রাজ্ঞ কবির কোমল হৃদয় বিরাগ সঙ্গীতের তান ধরিয়া আজি কয়েক বৎসর হয় দেশকে জাগ্রত করিবার জন্য বংশীধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের ভাবগতিক বুঝিয়া তিনি সেই বংশীধ্বনি আরম্ভ মাত্র করিয়াই আবার নিজে ২ ক্ষান্ত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক ধীরে ২ অন্য এক-দিকে পদার্পণ করিতেছেন। যে হউক আমরা তাঁহার সেই মধুময় বংশীধ্বনি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে না পারিয়া এইভাবে এই অবস্থার সাধারণ্যে তাহার কথঞ্চিৎ প্রচার করিলাম।"[১] 'প্রবোধ সঙ্গীতে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য এরূপ: "আমরা এই সকল কথা দ্বারা সংক্ষেপতঃ সকলকে ইহাই একমাত্র বুঝাইতে চাই যে, যথার্থরূপে সংসারধর্ম প্রতিপালন, জাগতিক প্রত্যেক বিষয়ের উপযুক্ত সারতত্ত্ব অনুশীলন ও পরিমার্জিত জ্ঞানবুদ্ধি উপার্জন ও মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত ভাব অনুধাবন, উপযুক্তরূপে দেহপ্রাণ রক্ষা করা এবং উপযুক্তরূপে ন্যায়পথে চিত্তমন পরিচালন ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও পরিচেষ্টা করাই মনুষ্যের কর্তব্য। অর্থাৎ সংসারী হইয়া জ্ঞানধর্মসম্মত ন্যায্য ভোগবাসনা

১. আবদুল হামিদ খান আহমদী ইউসফজয়ী—বিরাগ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র; টাঙ্গাইল, ১২৯৭, পৃ: ।/০-।৶০ ('নিবেদন'—প্রকাশক আবদুল মন্নান খান ইউসফজয়ী কর্তৃক লিখিত)

প্রভৃতিও যেমন চরিতার্থ করিতে হইবেক, কিন্তু আবার তেমনি সংসারের মায়া-মোহ প্রভৃতি কোন জঞ্জালের মধ্যেও সংবদ্ধ ও ফাসাইতে হইবেক না।"[১] 'যে নিয়মে পাঠ করিতে হইবেক' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, "অন্যান্য সঙ্গীত সকল সাধারণতঃ যে প্রকার লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে এই প্রবোধ সঙ্গীত তদ্রূপ নহে। ইহা তাহা হইতে অনেকাংশে পৃথক প্রণালীর। অন্যান্য সঙ্গীত সকল যে প্রকার উচ্চৈঃস্বরে কালওয়াত সহকারে এবং বিশেষ ২ নামকরণের তাল মান ও রাগরাগিণী ঠিক রাখিয়া গাইতে হয়, ইহা সেরূপ নহে। ইহা সচরাচর কবিতার ন্যায়ই পঠিত হইতে পারে, কিন্তু মিষ্ট শুনাইবার জন্য বিশেষ কোন একটা সুর অবলম্বনপূর্বক কোন ২ স্থানের অক্ষর লঘু উচ্চারণ ও কোন ২ স্থানের অক্ষর গুরু উচ্চারণ করিয়া ধীরে এবং গম্ভীরভাবে পড়িতে হইবেক। অথ প্রকার পাঠ করিলে সুশ্রাব্য শুনায় ও মনের মত্ততা জন্মে সেই প্রণালীতে পড়িলে ভাল হয়। ... কেহ যদি কোন একটা বাঁধা সুরের সহিত না পড়িয়া কেবল সাদা সিধা কবিতার ন্যায়, অর্থাৎ স্কুলের ছেলেদের পাঠ্য কবিতার ন্যায় পাঠ করেন, তবে কোনই লালিত্য অনুভব করিতে পারিবেন না। ...সঙ্গীত দ্বারাই সাধন ভজন এবং চিত্তমন বিনম্র ও বিগলিত করিবার বিশেষ উপায়। সুতরাং ইহা সঙ্গীতাকারে প্রকাশ করিলাম।"[২] তিনি 'বিরাগ সঙ্গীতে'র ভূমিকায় কাব্যের আঙ্গিক ও পরিরীতি সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। কবির কণ্ঠে বেদনার সুর: সুফীরা করুণ সুরের মাধ্যমে আশিক-মাশুকের প্রেমারতি প্রকাশ করেন: ইউসফজয়ীর সঙ্গীতধর্মী কবিতাগুলিতে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি যে সুফীপন্থী সাধনার সমর্থক ছিলেন তা এই কাব্য দুটির ভাববস্তু থেকে বুঝা যায়।

কেনরে অবোধ মন! বাড়ালে অজ্ঞান রাতি?
আঁধার মন্দিরে তব জ্বালিলে না জ্ঞান-বাতি!
রিপুগণ দস্যুজন
দাগা দিয়ে অনুক্ষণ
সর্বস্ব নিলরে লুটে, করিয়ে বিশ্বাস ঘাতি।
কেনরে অবোধ মন। বাড়ালে অজ্ঞান রাতি?[৩]

---

১. প্রবোধ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৮, পৃঃ ।৶০

২. ঐ, পৃঃ ৸০-৸৶০ (ভূমিকা)

৩. বিরাগ সঙ্গীত, পৃঃ ২৭

মন হে। ভাব কেন হায় বোঝ না ?
কেন এত বাড়াবাড়ি, সহজ জ্ঞানে মজনা
কঠোর বেদ আর কঠোর তন্ত্র
কঠিন বুধ্য পুরাণ মন্ত্র
সরল ভক্তি সরল প্রেমে তারে কেন পূজনা ?
মন হে! ভাব কেন হায় বোঝা না ?[১]

'উদাসী'তে তিনখানি স্বতন্ত্র কাব্য আছে 'উদাসী' (১-২১২ পৃষ্ঠা), 'কিরণ প্রভা' (২১৩-২৮৮ পৃষ্ঠা) এবং 'অরুণভাতি' (২৮৯-৫০৪ পৃষ্ঠা)। 'উদাসী' খণ্ড কবিতার সংকলন। তিনি কাব্যের পরিচয় দিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন, "ধর্ম, অধর্ম, প্রেম, বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি কয়েকটি অত্যুচচ বিষয় মূল ভিত্তি করিয়া ভিন্ন ২ ভাবে ও বিভিন্ন প্রকারের বর্ণবৈচিত্র্যে এই উদাসী নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অনেকদিন হয় রচিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কবিতা বিংশতি বৎসরেরও পূর্বের লিখিত।"[২] ধর্মাধর্ম, প্রেম-বৈরাগ্য ভাবাশ্রিত কবিতায় কোন অভিনবত্ব নেই; তবে স্বদেশ ও সমাজমূলক কবিতাগুলিতে যুগ সম্বন্ধে কবির সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধন এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন। 'উদ্বোধন' কবিতায় তিনি বলেছেন,

অসম্মিলন, হিংসাদ্বেষ   সে দোষে মজিল দেশ
কে করে আর একতা বন্ধন ?
দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ঘোরে   ভারত গেলরে পুড়ে
কে নিবারে সে ভীম দাহন ?[৩]

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদের উল্লেখ করে লিখেছেন,

জাতিগত হিংসাদ্বেষ   দ্বেষেতে মজিল দেশ
মুর্গী পাঠা লয়ে টানাটানি।
গোমাংসের নামে হায়! পালে পালে কুঁদে ধায়
যথাতথা ঘোর কাটাকাটি।[৪]

---

১. প্রবোধ সঙ্গীত, পৃঃ ২৫
২. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী—উদাসী, টাঙ্গাইল, ২২ শ্রাবণ ১৩০৭, পৃঃ ।/০-।৶০ (ভূমিকা)
৩. ঐ, পৃঃ ১২০
৪. ঐ, পৃঃ ১২২

কাব্যের মূল সুর প্রেম। কবি মানবপ্রেম অপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেমকেই উত্তম বলেছেন। তাঁর অভিমত,

তুচ্ছ মানবীর প্রেমে মজিনু বিশেষ।
তুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তরে
ভুলিয়া রহিনু আমি জগত-ঈশ্বরে।[১]

'কিরণ প্রভা' ও 'অরুণভাতি' আখ্যানভিত্তিক প্রেমকাব্য। তিনি কিরণ প্রভার 'আভাসে' লিখেছেন, "আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগের শ্রেষ্ঠ গুরু মান্যবর হেমচন্দ্র বনাধিক বিংশতি বৎসর পূর্বে 'মদন পারিজাত' এবং 'চিন্তা তরঙ্গিনী'তে ভাবের ও প্রেমের ভাষার সঙ্গে যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া যেরূপ ভাব ও যেরূপ প্রেমের বিচিত্র চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, আধুনিক পরিমার্জিত সুরুচি-সম্পন্ন শিক্ষিত-দিগের নিকট তাহা নিতান্ত উপভোগ্য বটে। ... ঈশান বাবুর 'যোগেশে'র ভাষাও কম মর্মস্পর্শী নহে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ প্রেমিক কবিদিগের এইরূপ সহজ উদার ভাষার সুদৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। 'কিরণ প্রভা' ও 'অরুণভাতি'র ভাষায় যদি তদসম্বন্ধে কাহাকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে তবে এই তুচ্ছ জীবনকে চিরকৃতার্থ জ্ঞান করিব।"[২] আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী কাব্যের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেও মধ্যযুগীয় আখ্যানমূলক কাব্যরীতির প্রভাব এড়াতে পারেননি। হেমচন্দ্রের তুলনায় হামিদের ভাষা অনেক দুর্বল। 'অরুণভাতি' কাব্যের এক স্থানে তিনি বলেছেন, "সরল গ্রাম্য ভাষা এবং পরিমার্জিত সাধুভাষার সংমিশ্রণে কাব্যাদি লিখিলেই ... উপাদেয় হইতে পারে এমত আমার বিশ্বাস।"[৩] তিনি আরও বলেছেন, "দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় কবিতা, স্বদেশীয় কবিতা, সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য, অনাদর ও অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক কর্কশভাবের অনুরাগী হইয়াও বাঙ্গালী জাতি নিজের জাতীয়তা নিজের মাহাত্ম্য স্বচ্ছন্দে হারাইতে বসিয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীত্ব প্রাণের ভিতরের প্রশংসার্হ ও উল্লেখযোগ্য যে সকল খাঁটি জিনিষ আছে তন্মধ্যে দেশীয় প্রাচীনসঙ্গীতও একটি। প্রকৃত প্রস্তাবে সাদাসিদে সরল ভাবের গ্রাম্য সঙ্গীতগুলিই 'জাতীয় ভাষার প্রাণ' এবং প্রাচীন ধরণের রাগরাগিণীগুলিই এদেশীয় 'জাতীয় ভাবের প্রতিধ্বনি'।"[৪]

---

১. উদাসী, পৃঃ ৯২
২. ঐ, পৃঃ ২১৫-১৬
৩. ঐ, পৃঃ ৩০৭
৪. ঐ, পৃঃ ৪৭৮-৭৯ (পাদটীকা)

বিদেশী সাহিত্যের ভাবাদর্শ নয়, তিনি সরল গ্রাম্য ভাষা ও পরিমার্জিত সাধু ভাষা সংমিশ্রণে দেশীয় ও জাতীয় ভাবাদর্শকে অনুসরণ করার পক্ষপাতী। গ্রাম্য ভাষা ও পল্লী সঙ্গীতের প্রভাব তাঁর কাব্যে রয়ে গেছে। উপরন্তু গতানুগতিক প্রেমাখ্যান বর্ণনা ছাড়া তিনি নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ আরোপ করতে পারেননি।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর গদ্যগ্রন্থ 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদি-বৃত্তান্ত' (১৮৯৯)। এটি খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'দি অরিজিন অব দি মুসল-মানস্ অব বেঙ্গল' (১৮৯৫) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। লেখক 'অনুবাদকস্য' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন, "মুর্শিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত খোন্দকার ফজলে রাব্বি খান বাহাদুর সাহেব ১৩০৮ হিজরিতে (১৮৯১) উর্দু ভাষায় (প্রকৃত-পক্ষে ফারসী ভাষায়) 'হাকিকাতে মুসলমানানে বাঙ্গালা' নামক একখণ্ড কেতাব লিখেন। ইহারই এক ইংরেজী অনুবাদ বর্ধিত আকারে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল' নাম দিয়া ১৮৯৫ অব্দে বাহির করেন। সেই ইংরাজী সংস্করণ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি অনুসারে এই বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষিত মহাত্মা গৌর-বান্বিতা রাজরাজেশ্বরী মাতা ভারতেশ্বরীর বঙ্গীয় মুসলমান প্রজাগণের বিরুদ্ধে কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক যে অযথা নিন্দা ও অপবাদ রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া স্বজাতির এবং স্বদেশের এক মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই গুরুতর কার্য্য সমাধা করার জন্য তাঁহাকে অনেক মেহনত করিতে হইয়াছে। ... খান বাহাদুর সাহেব যে বিষয় কথায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভরসা করি আমরা তাহা কার্য্যে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ন্যায় চিত্তে ধৈর্য্য, কার্য্যে উৎসাহ, জ্ঞান-চর্চায় আগ্রহ, ধর্মে দৃঢ়তা প্রভৃতি আমরাও দেখাইতে সমর্থ হইব। ...এখন আর বিজাতীয় অলসতায় কাটাইবার সময় আমাদের নাই।"[১]

'প্রচারক' পত্রিকার জনৈক লেখক 'টাঙ্গাইল ভ্রমণ' নিবন্ধে বলেছেন যে, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 'আরব-কাণ্ড' নামে একখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে রত আছেন। তাঁর ভাষায়, "আমরা এতদিন মনে করিতাম, মৌলবী সাহেবের (ইউসফজয়ীর) উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইল। মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া একটি জলন্ত উৎসাহের অবতার বলিয়া বোধ হইল।

১. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী—বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত, ভারত মিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬, পৃঃ (১-৪)

তিনি পরম উৎসাহের সহিত 'আরব-কাণ্ড' প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ লিখিতেছেন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।"[১] গ্রন্থাকারে 'আরব-কাণ্ড' মুদ্রিত হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এযাবৎ কোন তথ্য প্রকাশিত হয়নি। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ী দেলদুয়ারের গজনববী জমিদারদের 'স্ববংশীয় শরীক' ছিলেন। চারানের পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী আবদুল হামিদের বৈবাহিক ছিলেন।[২] তিনি ১৯০১ ও ১৯০৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। আবদুল হামিদ স্বদেশী আন্দোলনেও যোগদান করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে তিনি একবার ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, রামপ্রাণ গুপ্ত প্রমুখের সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল।[৩]

কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)

গদ্যে মীর মশাররফ হোসেন এবং পদ্যে কায়কোবাদ প্রায় সমমর্যাদার অধিকারী। 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) মশাররফের এবং 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ রচনা। একজন কারবালার বিষাদময় যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করেছেন, অপরজন তৃতীয় পানিপথের করুণ যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মধ্যে উভয়ে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা অনুসন্ধান করেছেন। অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব উভয়ের বৈশিষ্ট্য।

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জের আগলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শাহামতুল্লাহ ওরফে এমদাদ আলী ঢাকায় ওকালতি করতেন।[৪] প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসা ও পরে ঢাকায় স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এন্ট্রাস পাশ করার পূর্বেই তিনি স্বগ্রামের পোস্ট-অফিসে পোস্ট মাস্টারের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ঐ পদেই আজীবন বহাল ছিলেন।

---

১. প্রচারক, পৌষ, ১৩০৭

২. ইব্রাহিম খাঁ—টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫, পৃঃ ২৭

৩. ঐ, পৃঃ ২৭-২৮

৪. বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩

অতি অল্প বয়সে কায়কোবাদের কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ১২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বিরহ বিলাপ' (১৮৭০) ছাপা হয়। বিশুদ্ধ বাংলায় আধুনিক গীতিকবিতার বই এটি। তখন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বহু সংখ্যক গীতিকাব্য, মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য লিখেন। কায়কোবাদের প্রতিভা ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ও বহুদর্শিতার অভাবের কারণে তিনি কোন বৃহৎ বা মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেননি। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ এবং বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেও যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। তিনি প্রধানতঃ পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেছেন এবং উনিশ শতকের আবেগ ও চেতনার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন। তিনি সামাজিক মেলামেশা কম করেছেন এবং নাগরিক ভাবান্দোলন হতে দূরে থেকেছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটেনি। এটাই তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও আবর্তনুপ্তিতার কারণ। তবু পুথি-প্রভাবের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক কাব্যাদর্শ প্রচার এবং মুসলমান সমাজের নব্যচিন্তাবিমুখ মনোভাবের পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। 'মহাশ্মশানে'র মত বিরাট কাব্য রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের জড়ত্বকে ভেঙে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মশাররফের সাথে কায়কোবাদের কৃতিত্বের মিল আছে।

তাঁর 'বিরহ বিলাপ' (১৮৭০), 'কুসুম কানন' (১৮৭৩), 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪) খণ্ড কবিতার বই। কাব্যগুলির প্রধান বিষয়বস্তু মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম। তিনি পরস্পর বিবদমান হিন্দু-মুসলমানকে 'বানর' ও 'উল্লুক' বলে সম্বোধন করে ভারতের পরাধীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন ও জাগরণ কামনা করেছেন। মুসলমানদের প্রাচীন গৌরব, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলির প্রধান লক্ষ্য পশ্চাদপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে আশাবাদ ও মনোবল সঞ্চার করা। ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আবেগ ও আবহ তাঁর কাব্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছে।

'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হওয়ার পর 'ঢাকা গেজেট' (১৮ চৈত্র ১৩০২) 'বঙ্গবাসী' (২১ ভাদ্র ১৩০৩) 'সারস্বতঃ' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) ও 'নবনূরে' (শ্রাবণ ১৩১১) এর সমালোচনা হয়। 'বঙ্গবাসী'র বক্তব্য; "মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, দেশে এমন কেহ আছে, আমাদের জানা ছিল না।"[১] 'ঢাকা গেজেটে' লেখা হয়, "কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন, কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন,

---

১. বঙ্গবাসী, ২১ ভাদ্র ১৩০৩

তাঁহার কবিতা কষ্ট কল্পনার জিনিষ নহে, তোতাপাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ—সহজ, স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী।"[১] 'নবনূরে' প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে বলা হয়, "তিনি একজন প্রকৃত ভাবুক কবি। তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে।"[২] নবীনচন্দ্র সেন কবিকে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রে (২ এপ্রিল ১৮৯৬) মন্তব্য করেন, "মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যেদিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি কখনও উপস্থিত হয়, আপনার 'অশ্রুমালা' তাহার প্রভাত শিশিরমালা স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।"[৩]

মধুসূদনকে নয়, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে কায়কোবাদ অনুসরণ করে 'মহাশ্মশান' রচনা করেন। এতে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে'র (১৮৭৫) প্রভাব পড়েছে বেশী। ঐতিহাসিক পটভূমিতে উভয় কাব্য রচিত। কায়কোবাদ 'মহাশ্মশানে'র ভূমিকায় এটিকে মৌলিক মহাকাব্য বলেই দাবী করেছেন। নানা বিষয়ে কবির দুর্বলতা ও ত্রুটির কথা বলেও এটি যে মহাকাব্য তা, কমবেশী সব সমালোচকই স্বীকার করেছেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১) ভারত-আফগান সম্মিলিত মুসলমান শক্তির সঙ্গে মারাঠাশক্তির পরস্পর রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসমুখী সংগ্রাম মহাশ্মশানের বিষয়বস্তু। কবি একে ইতিহাসনিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছেন সত্য, তবে তিনি সর্বত্র কল্পনামুক্ত হতে পারেননি। কাব্যের ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক হয়েছে, কেননা ঐতিহাসিক কাব্য কাব্যই, ইতিহাস নয়। 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি নিজে যা বলেছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য: "আমি বহু দিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ

১. ঢাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২
২. নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১
৩. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭৬ (৪নং)

যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।"[১] সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন বাংলা ও ভারতের জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন কায়কোবাদ অত্যন্ত সচেতন-ভাবে সেই তিক্ত, সঙ্কীর্ণ ও অবাঞ্ছিত পথ বর্জন করেছেন : তিনি বলেছেন, যে, শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের বীরত্ব প্রকাশে গৌরব, যবনশক্তিতে শৌর্য-বীর্য প্রকাশে গৌরব নেই। হিন্দু-মুসলমান শক্তিতে, সাহসে, বীর্যে, স্বাধীন-চিত্ততায়, স্বাজাত্যপ্রেমে সমান বীর ও মহিমান। এখানে আছে বীরের সঙ্গে বীরের যুদ্ধ।[২]

সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'মহাশ্মশানে'র আলোচনা হয়। 'নবনূরে' একটি প্রবন্ধে ফজলুর রহমান খাঁ নিন্দা-প্রশংসা দু-ই করেন। তাঁর ভাষায়, "কবি কায়কোবাদের প্রতিভা আছে, মহাশ্মশান তাহারই স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র। ... গ্রন্থকার যেরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় নানা বীর-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ... কবি আসুরিক শক্তি ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহার কাব্য এ দুর্দিনে প্রকাশ না হওয়াই ছিল ভাল।"[৩] পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় (বৈশাখ ১৩২৬) সৈয়দ এমদাদ আলী লেখেন 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ; 'এসলাম-দর্শনে' (ভাদ্র ১৩২৭) মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লেখেন 'মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় ইসলামের অবমাননা' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দুটিতে কায়কোবাদের কবিধর্ম বা কবিত্বশক্তির বিচার নেই, কাব্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কার গৌরব রক্ষিত হল, কার হল না, হিন্দুয়ানী-মুসলমানী ভাব কি পরিমাণে বজায় থাকল, কি পরিমাণে থাকল না সে সবের বিচার হয়েছে এবং সে-সূত্রে কবিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[৪]

কায়কোবাদের পরবর্তী কাব্য 'শিবমন্দির' (১৯২৭), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), 'শ্মশানভস্ম' (১৯২৪), 'মহরম শরীফ' (১৯৩২)। অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে

১. কায়কোবাদ—মহাশ্মশান, ১৯২৭ (২ সং), পৃঃ ৮ (ভূমিকা)
২. ঐ, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
৩. নবনূর, মাঘ ১৩১২
৪. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, পৃঃ ৪৪৫-৪৮ (২ সং)

'উপদেশ রত্নাবলী', 'প্রেমের ফুল', 'জোবেদামহল কাবা' ও 'মন্দাকিনী ধারা' উল্লেখযোগ্য।[১]

মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০)

মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর থানার আলিয়াবাদ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুনশী মর্শীরত উল্লাহ রেশমের কারবার করতেন। পূর্বপুরুষ মির্জা আলী কুলি বেগ শাহ সুজার (১৬৩৯-৫৯) সহিত ইস্পাহান থেকে আগমন করেন এবং আলি-আবাদের জমিদার কন্যাকে বিবাহ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।[২] মির্জা ইউসুফ আলী শ্রীধরপুর গ্রামে মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। পরে রাজশাহী নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন এবং ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি শিক্ষকতায় যোগদান করে প্রাইভেটে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং এফএ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি প্রথমে রংপুরে নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন (১৮৮১-৯৩), পরে সব-রেজি-স্টারের চাকুরী গ্রহণ করেন (১৮৯৩-১৯১৭)। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে ইসলামের পুনর্জাগরণের ও সম্প্রচারের কাজে যশোহরের মুনশী মেহেরুল্লা, টাঙ্গাইলের মৌলবী নঈমুদ্দীন, চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জমান, বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের যে ভূমিকা ও অবদান, রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ আলীর সেই ভূমিকা ও অবদান। তিনি ত্রিবিধ কর্মসূচী নিয়েছিলেন —পুস্তক প্রণয়ন, সমিতি স্থাপন ও পত্রিকা সম্পাদনা। রাজশাহীর 'নূর-অল-ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম' (১৮৯১) ও 'রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র (১৯১৮) তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। 'নূর-অল-ইমান সমাজে'র মুখপত্র 'নূর-অল-ইমান পত্রিকা' (১৯০০) এবং 'রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র মুখপত্র 'মুসলমান শিক্ষা-সমবায়' (১৯১৯) সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রধান দায়িত্বে তিনিই ছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ও 'বঙ্গীয় ইসলাম সমিতি'র একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির তিনি অনারেরী সম্পাদক ছিলেন। সম্মেলনকে জনপ্রিয় ও সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য তিনি এবং মুনশী মেহেরুল্লা পূর্ব হতেই বিভিন্ন সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার-কার্য চালান।[৩] তিনি 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'র

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৭৯ (৪ নং)
২. প্রবন্ধ বিচিত্রা, পৃঃ ১২১-৩০
৩. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন কার্তিক ১৩১০

কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। ইসলাম মিশনের একজন বড় প্রবক্তা ছিলেন মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। মির্জা ইউসুফ রংপুর নর্মাল স্কুলে ও মনিরুজ্জমান রংপুর কারামতিয়া মাদ্রাসায় যখন শিক্ষকতা করতেন তখন তাঁদের মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। মনিরুজ্জমান সম্পাদিত 'সোলতান' (১৯০৪) পত্রিকা প্রকাশে মির্জা ইউসুফ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন।[১] রাজশাহী শহর ও নওগাঁয় মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহীর ফুলার হোস্টেল ১৮৯৯ সালে ও নওগাঁর মুসলিম হোস্টেল ১৯০৩ সালে স্থাপিত হয়। ছাত্রাবাস নির্মাণ সেযুগের শিক্ষান্দোলনের একটি অঙ্গ ছিল।

কলিকাতায় মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন সুধাকর-গোষ্ঠীর বন্ধুদের সাহায্যে যৌথভাবে যেরূপ 'এসলামতত্ত্ব' (১৮৮৮-৮৯) অনুবাদ করেন, রাজশাহীতে মির্জা ইউসুফ 'কতিপয় কৃতবিদ্য মৌলভী'র সহযোগিতায় যৌথভাবে সেরূপ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (১৮৯৫-১৯০৩) অনুবাদ করেন।[২] উভয়ই ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবহারবিধি বিষয়ক গ্রন্থ; ইসলামীকরণ এবং তদ্দ্বারা জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অনুবাদকগণ এ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বৃহৎ গ্রন্থ; 'দর্শন পুস্তক' (১৮৯৫), 'এবাদত পুস্তক' (১৯০০) 'ব্যবহার পুস্তক' (১ ভাগ, ১৯০১ ও ২ ভাগ, ১৯০৩) এবং 'পরিত্রাণ পুস্তক' নাম দিয়ে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র অনুবাদ ও প্রকাশ যে যৌথ প্রয়াসের ফল তা গ্রন্থের 'ভূমিকা' থেকে জানা যায়। "ভারত বিখ্যাত কর্মবীর মহাত্মা হাসন আলী ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লার সুপ্রসিদ্ধ অমূল্য গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সাআদৎ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য 'রাজশাহী আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম সভা'র নির্বাচিত 'নূরল ইমান' -নামক অনুবাদক ও প্রকাশক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছেন।"[৩] গ্রন্থের

১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১; প্রবন্ধ-বিচিত্রা, পৃঃ ১৩৭

২. নবনূর, আশ্বিন ১৩১৩

৩. মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সম্পাদিত)—সৌভাগ্য স্পর্শমণি, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩ (বুকস এণ্ড বুকসে'র সংস্করণ), পৃঃ ।৵০-।৶০

'অনুবাদক কমিটি'র গঠনরূপটি ছিল এরূপ:

পরিদর্শক ১. মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ (ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক)
২. মৌলবী আবু আলী মোহাম্মদ আবেদ (রাজশাহী কলোজিয়েট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মৌলবী)
৩. মৌলবী মোহাম্মদ সাবেরউদ্দীন আমিন (রাজশাহী মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মৌলবী)

অনুবাদক—মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী) সম্পাদক)

রক্ষাকারক—মুনশী মোহাম্মদ আমির

সহকারী সম্পাদক—খয়রুজ্জমান খাঁ

মির্জা এম. এ. আজীজ—সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী চৈত্র ১৩৪০

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা হয়, "বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষায় অদ্য এক অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ হইতে চলিল। হাতেম তাই, আমির হামজা, গোলে বকাওলী, সোনাভান, জৈগুন, বিদ্যাসুন্দর ও নানা প্রকার নাটক-নভেল প্লাবিত দেশে ইহার কিরূপ সম্মান হইবে তাহা অনুবাদক সমাজ জানে না। ...বিদ্যা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নহে; স্বদেশীয় স্বজাতীয় ভ্রাতাভগিনীদিগকে জ্ঞানের একটা নূতন পথ প্রদর্শন করা এবং তাহাদিগকে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়াই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য।"[১] এটি ছিল প্রথম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের ভূমিকার বক্তব্য; দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩২৫) ভূমিকায় লেখা হয়, "মুসলমানগণ সম্প্রতি আল্লার নেআমৎ (মহাদান) হইতে বঞ্চিত হইয়া নিগুণ এবং জগতের চক্ষে ঘৃণিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহাদের ও প্রতিবেশীর মধ্যে পরস্পর প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়াছে। মুসলমানকে মানবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত করা এবং প্রতিবেশী জাতির মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করা এই প্রকাশের উদ্দেশ্য।"[২] 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র ভাষা সরল ও সহজবোধ্য ছিল।

মির্জা ইউসুফের একক প্রচেষ্টায় রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১)। এতে চারটি অংশ আছে: কুসংস্কার বর্জিত যুক্তিমূলক উদার ধর্মমত প্রচার, হিতকর শিক্ষা বিস্তার, মুদ্রাযন্ত্রের সদ্ব্যবহার ও সমবেত শক্তি-গঠনে বিশ্বাসমূলক ভাবে সওদাগরীর প্রসার।[৩] সমকালীন সমাজের উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে উক্ত বিষয়গুলি নির্বাচিত ও আলোচিত হয়েছে। লেখকের যে একটা তীব্র সমাজবোধ ও হিতার্তি ছিল তা রচনাগুলির মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। 'দুগ্ধ-সরোবরে'র উপর আলোকপাত করে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয় যে, ঐ গ্রন্থে মুসলমান জাতির সেযুগের শোচনীয় দুরবস্থা অতি মনোহর প্রণালীতে (রূপক কাহিনীর মাধ্যমে) ব্যাখ্যা করা হয় এবং সেই দুরবস্থা দূর করার উপায় সকল দেখান হয়।[৪] 'দুগ্ধ-সরোবরের'র ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ ছিল। এতে কোন এক সাময়িকপত্রে বিরূপ সমালোচনা হয়। সে কথা স্মরণ করে লেখক 'নূর-অল-ইমানে' বলেন, "বহু শতাব্দী হইতে যে সকল আরবী, পারসী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ নানা কারণে বাঙ্গলার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত

১. মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সম্পাদিত) সৌভাগ্য স্পর্শমণি, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬১ (বুক্‌স এ্যাণ্ড বুকস'র সংস্করণ), পৃ. ।৵১-।৷০ (ভূমিকা)

২. ঐ, পৃঃ ৵০ (ভূমিকা)

৩. মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী—দুগ্ধ-সরোবর, বিনোদ প্রেস, বোয়ালিয়া (রাজশাহী), ১৯১৪ (২সং) 'সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য।

৪. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮

ভাষার সহিত রক্তমাংসের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল; তজ্জন্য সেই দুগ্ধ-সরোবরের সমালোচনাকালে কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মুসলমানের বাবুর্চিখানায় পক্ব দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এইজন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।"[১]

মির্জা ইউসুফ আলী 'অন্তিমকালের কর্তব্য' (অপ্রকাশিত) নামে আর একখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২] 'খোশ খবর' তাঁর অপর গ্রন্থ; এতে 'ইসলাম মিশনে'র প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা আছে।[৩]

মির্জা ইউসুফ আলীর চিন্তা ছিল ভাবাবেগমুক্ত। তিনি বাকসর্বস্ব নীতিবাগীশ ছিলেন না, বাস্তব কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য বিভিন্ন কর্মে রত থেকে সমাজের মানুষকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র তৃতীয় সংস্করণের (১৩২৭) ভূমিকায় প্রকাশক বলেন, "শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসে ও মসজিদ স্থাপনে—অমর সাহিত্য সাধনায় এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়—আর্ত দুঃখ মোচনার্থ কো-অপারেটীব আইনের আশ্রয়ে 'সাধারণ গ্রাম্য তহবিল' স্থাপনের চেষ্টায় তাঁহার বিভিন্নমুখী মানস প্রতিভার বিকাশ, বাংলার সকলকেই বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"[৪] মির্জা ইউসুফ আলী নিজ কর্মগুণে ও চরিত্রমাহাত্ম্যে এরূপ প্রশংসা লাভের যোগ্য ছিলেন।

রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯—১৯১৯)

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত '১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা'য় 'মুসলমান লেখকগণের তালিকা' নিবন্ধে রওশন আলী চৌধুরী রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, "পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদী। নিবাস চারান গ্রাম। পোঃ রতনগঞ্জ (ময়মনসিংহ)। ইনি মুসলমান সমাজের একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। বঙ্গ ভাষার একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সুলেখক। ভাষাজ্ঞান অসাধারণ। 'প্রবন্ধ কৌমুদী', 'অগ্নিকুক্কুট' প্রভৃতি পুস্তক ইনি লিখিয়াছেন। 'ফকির আবদুল্লা বিন ইসমাইল আল কোরেশী অলহিন্দী' এই ছদ্মনামে পুস্তকগুলি লিখিত হইয়াছিল। ... 'সমাজ

---

১. নূর-অল-ঈমান, শ্রাবণ ১৩০৭
২. মোহাম্মদ আবু তালিব—মির্জা ইউসুফ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪
৩. প্রবন্ধ-বিচিত্রা, পৃঃ ১৩৫
৪. সৌভাগ্য স্পর্শমণি, ১ খণ্ড. পৃঃ ৫/০ (ভূমিকা)

ও সংস্কারক' নামে ১২৯৬ সালে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর গভর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ... ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতের জন্য নানা বিষয়পূর্ণ 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' নামক একখানি পঞ্জিকা ১২৯৮ সাল হইতে প্রচার করিয়াছিলেন। ... ইহার আর একখানি গ্রন্থ 'সুরিয়া বিজয়'। এই গ্রন্থখানি সম্প্রতি শেখ আবদুর রহিম সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন।"[১] রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী তখন জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় 'পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি পণ্ডিত মাশহাদী সম্পর্কে বলেন, "পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন আহমদ এক সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সুপক্ক লেখনিপ্রসূত 'অগ্নিকুক্কুট', 'সমাজ ও সংস্কারক', 'সুরিয়া বিজয়', 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রভৃতি সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুলনীয় সামগ্রী ছিল। ... তিনি 'মুসলমান সাম্রাজ্য' নামক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়াছিলেন; বিরাট পুস্তক ১000 পৃষ্ঠার ১০ খণ্ডে শেষ হইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ... আমরা যখন 'সুধাকর' সংবাদপত্র বাহির করি, তখন সে বিষয়ে তিনি আমাদিগকে সর্বপ্রকার উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং উহার অনুষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ... দেলদুয়ারের জমীদার মিঃ এ. কে. গজনভী সাহেব ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পণ্ডিত সাহেবকে স্বীয় ইস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। তখন তিনি মাদ্রাসার চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ... ম্যানেজারী পদ গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য সেবা হইতে এক প্রকার চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী এবং উর্দু ভাষায় মোটামুটি অধিকার ছিল।"[২] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন 'আমার সংসার জীবন' (১৯১৪) নামক আত্ম-জীবনীতেও নানা জায়গায় পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীনের নাম উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে, 'এসলামতত্ত্ব গ্রন্থখানি প্রণয়ন ও প্রকাশে সুধাকর-গোষ্ঠীর যে চার জনের সম্মিলিত অবদান আছে তাঁদের মধ্যে রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী ছিলেন অন্যতম।[৩] মাশহাদীর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে এর অতিরিক্ত তথ্য জানা যায় না।

---

১. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, সমসাময়িক ভারত কার্যালয়, বাঁকীপুর (বিহার), পৌষ ১৩২৩

২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬

৩. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৫

'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এর উৎস ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "অধঃপতিত মোসলমান সমাজের একমাত্র উদ্ধার-প্রয়াসী মহা পণ্ডিত সৈয়দ জামাল অল-দিন অল-আফগানীর জীবন-চরিত সম্বলিত অখিল মোসলমান সমাজের সাধারণ বিবরণ - মেসর হইতে প্রকাশিত তদীয় আত্মসংশোধিত জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া লিখিত।"[১] সৈয়দ জামাল-উদ্দীন আফগানী ছিলেন প্যান-ইসলাম মতবাদের উদ্‌গাতা ও প্রচারক। এর একটি রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল। ইউরোপবাসী বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। বিশ্বের সব মুসলমান জাতির অবস্থা পতনোন্মুখ: ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক গ্রাস থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় বিশ্ব-মুসলমানের রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা, ইসলাম এই ঐক্য স্থাপনের সহায়ক হবে। প্যান-ইসলামের এটাই ছিল সারকথা। জামাল উদ্দীন আফগানী ১৮৮০ সালে কলিকাতায় এলে রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর নয় বছর পর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থের জন্ম। বাঙালী মুসলমানের সমাজ জীবনে তখন নানা দিক থেকে দুর্যোগ ঘনীভূত; নিঃসাড়, নিশ্চেতন সমাজদেহে প্রাণস্পন্দন জাগাতে হলে জামালউদ্দীন আফগানীর সংগ্রামী জীবন ও বিপ্লবী ভাবধারা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। এরূপ ভাবনা থেকে তিনি 'সমাজ ও সংস্কার' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থের সূচনায় এরূপ লক্ষ্যের কথাই বলেছেন। "বর্তমান সমাজে প্রতিপক্ষ সমাজ হইতে সমন্তাৎ তীব্রস্বরে মোসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কলঙ্ক ও অপবাদের ঘোর রোল সমুখিত হইয়াছে। এক্ষণে জগতে মুসলমানেরা কাপুরুষ, বিশ্বদ্রোহী, জ্ঞান-বিদ্যাবিরহিত, বর্তমান সাময়িক চিন্তায় অসমর্থ, বিলাসী, জঘন্য-প্রকৃতিক বলিয়া কীর্তিত হইতেছেন। ... আমি বহুকাল চিন্তা ও অনুধ্যানের পর, মোসলমান সমাজকে ঈদৃশ আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে, মোসলমানের প্রকৃত অবস্থা জনসমাজে প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের ভবিষ্যমান অপায় হইতে সতর্ক করিবার জন্য একজন অতুল প্রতিভা-শালী মহাসংস্কারকের জীবনচরিতসহ মোসলমানদের বর্তমান কলামাত্রাবশিষ্ট সাম্রাজ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের প্রকৃত চিত্র নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সহৃদয় মহানুভবগণের সমক্ষে স্থাপন করিলাম।"[২] 'সমাজ ও সংস্কারক' জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনালেখ্য মাত্র নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, মিসর, তুরস্কের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বাস্তব

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) মাশহাদী রচনাবলী, ১ খণ্ড, ১৯৭০, পৃঃ ৭
২. মাশহাদী রচনাবলী, ১ খণ্ড, পৃঃ ৫-৬

সমীক্ষা-চিত্রও বটে। ইংরাজ শাসক জামালউদ্দীনকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি ব্রিটিশের শোষণনীতির বিরোধী ছিলেন। মাশহাদীর গ্রন্থে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতার সমালোচনা থাকায় এটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অগ্নিকুক্কুট' (১৮৯০)। মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবনে'র প্রতিবাদ স্বরূপ এটি রচিত হয়। রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রধানতঃ যুক্তিবাদী ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির লেখক ছিলেন। গো-কোরবানী, গো-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদিকে তিনি মুসলমানদিগের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোকই সামাজিক ও ধর্মশাস্ত্র সম্মত স্বত্ব, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষে সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 'অগ্নিকুক্কুট' মোসলমানদিগের সেই অধিকার সংরক্ষণ জন্য সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ইহা উৎপীড়িত মোসলমান সমাজের নিজ পক্ষ ও অধিকার সমর্থন বিষয়ে সর্ব প্রথম পুস্তক।"[১] যজুর্বেদ, মনু-সংহিতা, চরক সাহিত্য, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে গো-বধ ও গো-মাংস ভক্ষণের দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং গো-বধে হিন্দুদিগের আপত্তি করার ধর্মীয় কারণ থাকতে পারে না। অপর পক্ষে ভারতের মুসলমানরা ধর্মীয় কারণে গো-কোরবান করে থাকে। গো-হত্যা সম্পর্কিত সমকালীন দ্বন্দ্বে মাশহাদী এরূপ যুক্তি উত্থাপন করে মশাররফ হোসেনের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন সত্য, কিন্তু স্বসমাজের স্বার্থ ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ করার মত মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। বিশেষতঃ যুগের যেরূপ ধর্ম ছিল, তাতে সামাজিক উদারতা প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না। "গো-রক্ষিণী সভা" (১৮৮২) প্রতিষ্ঠা করে এবং পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তখন হিন্দুগণও গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ফলে মাশহাদী নিজ ভাষাকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত রাখতে পারেননি।

রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর তৃতীয় গ্রন্থ 'প্রবন্ধ কৌমুদী' (১ খণ্ড, ১৮৯২)। এতে 'আরব ও ইসলাম', 'মোসলমান বীরাঙ্গনা', 'আত্মসম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব', 'এসলুক যুদ্ধের পূর্বাভাস', 'মালেক-আল গাজী' ও 'মহরম'—এই ৬টি প্রবন্ধ আছে। 'অগ্নিকুক্কুটে'র মত 'প্রবন্ধ কৌমুদী'তেও 'ফকির আবদুল্লা বিন ইসমাইল' ছদ্মনাম গৃহীত হয়েছে। 'মিহির ও সুধাকরে' 'প্রবন্ধ কৌমুদী'র বিষয়ের গভীরতা ও ভাষার পারিপাট্যের প্রশংসা করা হয়।[২]

১. মাশহাদী রচনাবলী, ১খণ্ড, পৃঃ ২০৭; স্মরণযোগ্য যে, মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের 'গো-কাণ্ড' এর আগের বছর প্রকাশিত হয়। সুতরাং মাশহাদীর বইটি এধারার দ্বিতীয় পুস্তক

২. ঐ, পৃঃ ৩১৮

তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'সুরিয়া বিজয়' (১৮৯৫)। এটি প্রথমে 'মিহিরে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এতে হজরত আবুবকর কর্তৃক সিরিয়া অভিযান ও বিজয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ফারসী মূল গ্রন্থ ও বাংলা দোভাষী পুথি থেকে 'সুরিয়া বিজয়ে'র কাহিনী সংগৃহীত। রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রাঞ্জল গদ্যে এটি লিখেছেন।

'প্রচারক' পত্রিকায় মোট তিন সংখ্যায় (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭) তিনি 'বিবাদ' নামে একটি সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাপান। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী সেনের 'মোগল রাজ পত্নী' ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধদ্বয় থেকে প্রেরণা লাভ করে তিনি 'বিবাদ' লিখেছিলেন।[১]

'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' নামে দুবছরে দুটি (১৮৯১, ১৮৯২) মহম্মদীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বর্ষের সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার আলোচনা করে 'মিহিরে' লেখা হয়: "এই পঞ্জিকার প্রথমে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় আবশ্যক কতকগুলি কথা আছে। তাহাতে দিন, রাত্র, ঋতু-পরিবর্তন, গ্রহণ প্রভৃতি বুঝান হইয়াছে। তৎপরে ইহাতে মোসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যুগপ্রকরণ কর্তব্যকার্য, নামাজ, জুমায়া, আইয়ামে বেজ, মহররম, আখেরি চাহার শোম্বা, ফতেহায়ে দোয়াজ দাহোম, রজব, শাহবান, শবে বরাত, রমজান, সেহর ও এফতার, এহতেকাফ, শবে কদর, ঈদঅল ফেতর; শওয়াল, জেলহজ ও ঈদঅলজোহা প্রভৃতির বিবরণ এবং সেই সেই সময়ে কোরান শরিফ ও হাদিস শরিফ অনুসারে কখন কি কাজ করা ফরজ, ওয়াজেব, সোন্নত, নফল তাহার বিবরণ আছে। প্রকৃতপক্ষে মোসলমান সমাজের ব্যবহার পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর উপযোগী করিতে ইহার প্রতি চেষ্টার কম হয় নাই।"[২] হিন্দুসমাজে বার, ব্রত, মাস, তিথি, পূজা-অর্চনা, শুভাশুভ, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, বাণিজ্যযাত্রা, পুণ্যাহ, আহার, উপবাস ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জিকা বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল, মুসলমান সমাজে মুসলমানদের ধর্মকর্মে ব্যবহার-উপযোগী অনুরূপ পঞ্জিকার প্রয়োজনবশে মাশহাদী প্রথম 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রণয়ন করেন। তিনি স্বসমাজের কেবল চাহিদাই পূরণ করেননি, সে-সমাজের অস্তিত্ব আছে এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে—সেটাও তুলে ধরেছেন। আত্ম-বোধের-সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য চেতনার যে যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, এতে তারই সাক্ষ্য রয়েছে। মাশহাদী 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থে 'মুসলমান সাম্রাজ্য' শীর্ষক যে

১, মাশহাদী রচনাবলী, ১ খণ্ড পৃঃ ৩৩১ ৩২
২. ঐ; পৃঃ ৩২৩-২৪

সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রস্তুতির কথা বলেছেন, তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, পাণ্ডু-লিপিরও অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি।

রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি ও নীতিগত আদর্শ থাকায় সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রেও তাঁর মনের উগ্রতা বা চিত্তের সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়নি। তাঁর চিন্তার ঐক্য, সংহতি ও সংযম বরাবর বিদ্যমান ছিল। তিনি কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতাকে জাতীয় প্রগতির অন্তরায় বলেই মনে করতেন।

শেখ অবেদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)

শেখ আবদুর রহিম ২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার মহম্মদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ গোলাম এহিয়া পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হলে তিনি মাতুল গোলাম কিবরিয়ার ('উচিৎ কথা'র লেখক) আশ্রয়ে লেখাপড়া করেন। গোলাম কিবরিয়া টাকীর পাঠশালার শিক্ষক ও জমিদার রাধামাধব বসুর পরিবারের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। রাধামাধব বসু ব্রাহ্ম ছিলেন। আবদুর রহিম এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি স্থানীয় মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে কলিকাতায় সিটি স্কুলে ভর্তি হন এবং এন্ট্রান্স শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন (১৮৭৫). অসুস্থ-তার জন্য এন্ট্রান্স পাশ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী-ফারসী অধ্যাপক মৌলভী মেয়রাজুদ্দীন আহমদ আবদুর রহিমের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, রেয়াজুদ্দীন, মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ একত্র হয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথম এক সাহিত্য-গোষ্ঠীর সূচনা করেন। 'এসলামতত্ত্ব' গ্রন্থখানি তাঁদেরই যৌথপ্রয়াসের ফল। পরে 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হলে 'সুধাকর-গোষ্ঠী' হিসাবে তাঁরা পরিচিত হয়ে উঠেন।

শেখ আবদুর রাহমের সাহিত্যধর্ম ও সাংবাদিকতা পাশাপাশি চলেছিল। তিনি একাদিক্রমে ৭ খানি সাময়িকপত্রের সম্পাদনা করেন ও ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতাকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে রেয়াজুদ্দীন আহমদের সহিত তাঁর মিল আছে। উভয়ের লক্ষ্য মোটামুটি এক ছিল—ইসলামের ভাবধারার আলোকে বাংলার মুসলমান সমাজে নব-জাগরণের আন্দোলন। তাঁদের বিশ্বাস যে, ধর্মের আদর্শচ্যুতি ও ইতিহাসের গৌরববিস্মৃতির জন্য মুসলমানদের অধঃপতন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা লাভের সাথে ধর্মচেতনা ও ইতিহাসচেতনা না জন্মিলে মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। আবদুল লতিফ, আমীর আলীর মত নেতৃবৃন্দ প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ

করতেন: ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা তাঁরাও চাননি। আমীর আলী মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রধান দুটি রচনা 'স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) এবং 'এ শর্ট হিস্টরী অব সারাসিন্‌সে' (১৮৯৮) ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান ইতিহাসের মাহাত্ম্য ও গৌরব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খ্রীস্টানদের অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা প্রচারণার হাত থেকে কোরান, মহম্মদ ও ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আমীর আলীর মত সৈয়দ আহমদও লেখনি ধারণ করেছিলেন। 'সুধাকর-গোষ্ঠী'র লেখকেরা এই আদর্শ-সূচী দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়েছিলেন। 'এসলামতত্ত্ব' যৌথভাবে এবং 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত্র ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮) এককভাবে রচনা ও প্রকাশ করে শেখ আবদুর রহিম বাঙালী মুসলমানের কাছে সেই ভাবাদর্শ পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আবদুর রহিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না: তাঁর সাহিত্যিকসুলভ একটি মন ও মেজাজ ছিল; তিনি একটি সুললিত সুঠাম পরিমার্জিত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা ছাড়াও আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরাজীতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর সারগর্ভ রচনায় ঐসব ভাষার বহু উপাদান আছে।

'সুধাকর' (১৮৮৯), 'মিহির' (১৮৯২), 'হাফেজ' (১৮৯২), 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৪). 'মোসলেম ভারত' (১৯০০), 'মোসলেম হিতৈষী' (১৯১১) এবং 'ইসলাম-দর্শন' (১৯১৬) সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র আবদুর রহিমের সম্পাদনায় জন্ম লাভ করে। দেশের বিদ্বৎসমাজ ও বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সহিত তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, আবদুস সোবহান চৌধুরী, নবাব খাজা সলিমুল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, পীর আবু বকর প্রমুখের বিভিন্ন রকম সহযোগিতায় পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এঁদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানধারণার সাথে আবদুর রহিম পরিচিত হন। নানা দ্বন্দ্ব-দোলায় বিচলিত, আঘাত-সংঘাতে বিক্ষত সমাজের হিতসাধনে এঁদেরই সম্মিলিত চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াস ঐসব পত্রিকার মধ্যে প্রচার লাভ করে। আবদুর রহিম সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অনেক মূল্যবান লেখা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করেন। 'আলহামরা' (মিহির), 'পুরাতত্ত্ব' (ঐ) 'বাঙ্গালার মুসলমান' (হাফেজ), 'ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকর্ম' (ঐ) প্রভৃতি দীর্ঘ রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮), 'ইসলামতত্ত্ব' (১৮৯৬), 'নামাজতত্ত্ব' (১৮৯৮), 'হজবিধি' (১৯০৩), 'ইসলাম ইতিবৃত্ত'

(১৯১০), 'নামাজশিক্ষা' (১৯১৭), 'প্রণয়-যাত্রী' (১৯২০), 'ইসলামনীতি' (১৯২৫), 'কোরআন হাদিসের উপদেশাবলী' (১৯২৬), 'রোজাতত্ত্ব' (ঐ), ও 'খোৎবা' (১৯৩২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থে হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি মুখ্যভাবে এবং সমসাময়িক কালে সমাজের ধর্মীয় সমস্যাবলী আনুষঙ্গিকভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি গ্রন্থের উৎস সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "যিনি সত্য ও সনাতন ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ অধ্যাবসায় ও কঠোর সাধনা বলে শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করত স্বীয় মহান ব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রচলিত পবিত্র ধর্মের তেজে মানবগণের ভ্রম ও কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়া ইসলামের ধর্মবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই মহাত্মার জীবনচরিত, আমি কলিকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের সুযোগ্য আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক মৌলভী মেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সাহায্যে তারিখ এবনে-হেশাম, সেফায়ে-কাজী-আয়াজ, মাদারেজন্নবুয়ত, রওজতল-আহবাব, মায়ারেজন্নবুয়ত মাগায়ির-রসুল, জাজবল-কলুব্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবী ও পারসী গ্রন্থাবলম্বনে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সঙ্কলন পূর্বক জনসমাজে প্রচার করিলাম। হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল গ্রন্থ হইতেও আবশ্যক বোধে নানা অংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহা ব্যতীত স্যার সৈয়দ আহমদ ও মি. সৈয়দ আমির আলি সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে হজরত নূহ আলায়হেচ্ছালামের (নোয়ার) সময় হইতে আরবদেশের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।"[১] তাঁর গ্রন্থে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতা পুরোপুরি অনুসৃত না হলেও তিনি অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক উপাদানগুলি যুক্তি দিয়েই বর্জন করেছেন, ভক্তের অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে মহম্মদের চরিত্র মাহাত্ম্য ও ইসলামের গৌরব কীর্তন করেননি। তিনি বলেছেন, হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের ত্রাণকর্তা। ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে—খ্রীস্টান পাদরীদের এরূপ প্রচারণা তিনি মানেননি। "ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় হজরত মহম্মদের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায় অসম্পূর্ণ এবং ইংরাজী গ্রন্থ

---

১ শেখ আব্দুর রহিম—হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬সং) পৃঃ (।/০) প্রথম বারের বিজ্ঞাপন, ফাল্গুন ১২৯৪)

অবলম্বনে লিখিত বলিয়া কোন কোন বিষয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। হজরত মহম্মদ তরবারি বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ যে তাঁহার নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।"[১]

'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'র মত একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, তা লেখক পরবর্তীকালে 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' উল্লেখ করেছেন। "আমাদের জাতীয় প্রাচীন ইতিহাসগুলি আরব্য ভাষারূপ সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ। আজকাল আমাদের মধ্যে আরবী ভাষার চর্চা লোপ পাইতেছে বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে পূর্ণ অনভিজ্ঞ। জাতীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যাঁহার উম্মত অর্থাৎ অনুগামী, তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত আমাদের মধ্যে কয়জন অবগত আছেন? ... বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের সেই অভাব দূর করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে আমি 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করি।"[২] পাঠকের মনে ও সমাজে গ্রন্থখানির প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়: "পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অশেষ উপকার হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং খৃষ্টানধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক ইসলামের প্রতি অযথা দোষারোপের অনেক নিরাকরণ করা হইয়াছে।"[৩]

'ইসলামতত্ত্ব' 'নামাজতত্ত্ব' 'হজবিধি' প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মপালনের রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তিনি নামাজতত্ত্বের ভূমিকায় বলেছেন, যে ধর্মকর্ম পালন না করার জন্য মুসলমান সমাজের দুরবস্থা হয়েছে; কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী যদি চলে তবে মুসলমানরা প্রাথমিক যুগের ন্যায় পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হবে। তাঁর ভাষায়, "পূর্বকালীন মুসলমানদিগের ন্যায় মনের ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমরা এখন নামাজ পড়ি না বলিয়াই আমাদের এই দুরবস্থা। ... যদি আমরা পূর্বোল্লিখিত নিয়মে নামাজ পড়ি এবং সমুদয় কার্য্যে কোরআন

১. শেখ আব্দুর রহিম—হযরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬ সং) পৃ: ।৵০
২. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড, পৃ: ২৯
৩. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭

শরিফের আদেশ প্রতিপালন এবং পয়গম্বর (দরুদ) সাহেবের অনুকরণ করি, তাহা হইলে আমাদের এইরূপ দুর্দশা কখনই থাকিবে না; আমরা আবার সেই প্রাথমিক মুসলমানদিগের ন্যায় পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইব।"[১] 'মিহির ও সুধাকরে' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় রক্ষণশীল মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল। রসধর্মী রচনা তাঁদের মনঃপূত ছিল না। এমন কি, ধর্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করতেও মৌলবীদের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। এ অবস্থায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনা অকল্পনীয় হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আবদুর রহিমের ধারণা হয়েছিল যে, 'কাব্য, কবিতা প্রভৃতি সখের সাহিত্য' অপেক্ষা 'ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস' প্রভৃতি জ্ঞানধর্মী রচনার দ্বারা দেশপ্রীতি ও ভাষাপ্রীতি জাগানো সম্ভব হবে। লেখকের ভাষায়, "পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে ভূষিত করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন কাব্য, কবিতা প্রভৃতি সখের সাহিত্যের সাধুভাষা কিংবা শুধু সৌন্দর্যকলার আকর্ষণে মুসলমান কিছুতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না।"[২] ফলে তাঁর মধ্যে যে সাহিত্য-চেতনা সুপ্ত ছিল, তা অচিরেই লুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াশিংটন আরভিং এর 'দি আলহামরা' (১৮৩২) অবলম্বনে 'আলহামরা' এবং 'দি পিলগ্রিম অব লাভ' অবলম্বনে 'প্রণয়-যাত্রী' (১৮৯২) শেখ আবদুর রহিমের দুটি অনুবাদ গ্রন্থ। উভয় রচনায় তাঁর রোমান্টিক শিল্পীমনের পরিচয় আছে; কিন্তু তা এখানেই শেষ হয়, তিনি আর এ পথে অগ্রসর হননি। 'প্রণয়-যাত্রী'র প্রথম সংস্করণে তিনি নাম ব্যবহার করেননি, কেবল 'উৎসর্গ-পত্রে' "আ-র" স্বাক্ষর ছিল। গ্রন্থের, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯২০) তাঁর নাম আছে, তবে নামের আগে 'শেখ' নেই।[৩] 'প্রণয়-যাত্রী' নিয়ে এরূপ লুকোচুরি খেলা তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব-সংশয়কে সূচিত করে। তিনি প্রণয়-যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' এরূপ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইহা বর্তমান সময়ের পাঠকগণের রুচিকর হইবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ। তবে জাতীয় সাহিত্যের অভ্যুদয়-যুগের একটি আদর্শ যাহাতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া না যায় সেই জন্যই পুস্তকখানি পুনরায় প্রকাশ করিলাম।"[৪]

---

১. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭
২. ঐ, পৃঃ ২৩০
৩. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৪৯
৪. ঐ, পৃঃ ১৪৭

শেষের দিকে তিনি ধর্ম ও নীতির দিকে আরও ঝুঁকে পড়েন ও রসধর্মী শিল্পের বিরোধী হয়ে উঠেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, "ধর্ম এবং নীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশ্বের সুখসৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের ভিখারী আমি নহি।... আমাদের নিকট ধর্মনীতিহীন সৌন্দর্যের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।"[১]

'হজবিধি' মোহাম্মদ ইয়াকুব নূরী এবং শেখ আবদুর রহিম যৌথভাবে রচনা করেন। বিত্তশালী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে হজ বা তীর্থ উদযাপন অবশ্য শাস্ত্রীয় কর্তব্য। এই পুস্তিকায় সেই হজব্রতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা আছে।

ভাষার প্রশ্নে তাঁর মনোভাব ছিল স্বচ্ছ: বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, তা তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটা বড় দিকই ছিল মাতৃভাষার উন্নতি ও ব্যাপক প্রসারসাধন। তিনি নিজ লক্ষ্যের কথা ব্যাখ্যা করে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, "অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের ক্ষীণশক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ণ নিরবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য-আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম তখন একটিমাত্র চিন্তা আমার সমস্ত দেহমন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সে চিন্তাটি এই যে—কেমন করিয়া আমার প্রিয়তমা স্বজাতি বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব, কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পুণ্যমন্দিরে লইয়া আসিব এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জাগাইয়া দিব?"[২]

আবদুর রহিম তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র তিনি সদস্য ছিলেন। 'আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীনে ইসলামে'র (১৯১০) বাংলার প্রথম সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত হন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র (১৯১১) কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি হন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'রও (১৮৯৩) তিনি সদস্যভুক্ত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)

গদ্যে ও পদ্যে সমান দক্ষতা ছিল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের। নদীয়ার শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে তিনি একটি সাবলীল, পরিশীলিত, শ্রুতিসুখকর

১. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, পৃ: ২৪৫-৪৬
২. ঐ, ২ খণ্ড, পৃ: ২১৮ (প্রবন্ধটি মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৩৬ সনের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

বাংলা ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন; এবং তজ্জন্য তিনি সমালোচকের কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছেন। তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রবেশ করেন এবং সেখানে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ে স্কুল ত্যাগ করেন।[১] তাঁর উচ্চশিক্ষা না হলেও সুশিক্ষা ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছিল; তিনি বাংলার সাথে আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরাজী শিখেছিলেন। তিনি এসব ভাষার গ্রন্থের অনুসরণে মূলানুবাদ বা ভাবানুবাদ করেছেন। মোজাম্মেল হকের কর্মজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'সুধাকর' পত্রিকায় ১২৯৯ সনের ১৮ ভাদ্র সংখ্যায় আছে যে, তিনি 'শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসা'য় শিক্ষকতা করতেন; 'মহারানীর জুবিলী উৎসবে'র (১৮৮৭) বছর এ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[২] তিনি কিছুকাল কলিকাতায় গৃহশিক্ষকতা করেন। সৈয়দ এমদাদ আলী একটি প্রবন্ধে লিখেন, "তিনি (মোজাম্মেল হক) তখন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র-নাথ দাস এমএ, বিএল মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটারী করিতেন।"[৩] ঐ সময় তিনি মঙ্গলায় থাকতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে অধ্যাপক মেয়া-রাজউদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, ডাক্তার হবিবর রহমান প্রমুখ জ্ঞানী ও সাহিত্যিক-গণের সহিত মোজাম্মেল হকের পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জনের ফলে তিনি এই সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

কবিতা লিখে তিনি সাহিত্য-জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রথম কাব্য-সংকলন 'কুসুমাঞ্জলি' (১৮৮১)। এর পর তিনি 'অপূর্ব দর্শন' (১৮৮৫), 'ইসলাম সঙ্গীত', 'প্রেম-হার' (১৮৯৮), 'হজরত মহম্মদ' (১৯০৩), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) শিরোনামে খণ্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনা করেন। 'কুসুমাঞ্জলি' ও 'প্রেম-হারে'র বিষয়বস্তু মর্ত্যপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম। 'কুসুমাঞ্জলি' মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এতে ১২টি কবিতা আছে। 'বঙ্গবিধবা' কবিতায় পরাধীনা বঙ্গভূমির বিধুর প্রাকৃতিক ছবি এঁকে তিনি প্রকারান্তরে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন।

ভাসিছ নয়ন-নীরে কেন গো নলিনী
তোমার সে মুখ-রবি, পরম প্রেমের ছবি,

১. মাসিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
২. সুধাকর, ১৮ ভাদ্র ১২৯৯
৩. সৈয়দ এমদাদ আলী—মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪০

ঢাকিয়াছ গাঢ়তর চির অন্ধকারে
তম ভেদি সেকি পুনঃ পারে উঠিবারে?[১]

'বান্ধব', 'সুরভি', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় 'কুসুমাঞ্জলি'র সমালোচনা হয়। 'বান্ধবে' লেখা হয়, "বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকেরা এইরূপ সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, ইহা আমরা কখনও জানিতাম না। এই পুস্তকের 'মহরম' ছাড়া আর সমস্ত কবিতাই হিন্দুর প্রাণে ও হিন্দুর ভাষায় লিখিত।"[২] 'সোমপ্রকাশে'ও মোজাম্মেল হকের 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা'র প্রশংসা করা হয়: "আমাদের জানাও ছিল, শুনাও ছিল, মুসলমানেরা ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারে না, কুসুমাঞ্জলি আমাদের সে সংস্কার দূর করিয়া দিতেছে, আমরা ইহার দুই তিনটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখুন, মোজাম্মেল হক কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন।"[৩] 'সুরভি' মোজাম্মেল হকের শ্রুতিমধুর বাংলা ভাষার প্রশংসা করে, কিন্তু বিষয়ের গতানুগতিকতার উল্লেখ করে কবিকে নিরুৎসাহিত করে। "...লেখক মুসলমান হইয়া এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন বলিয়া প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ক কবিতা বঙ্গভাষায় অনেক লেখা হইয়াছে, অভিনব মনোহর কবিত্বে অনুরঞ্জিত হইয়া সকল বিষয়ে কবিতা না লিখিতে পারিলে লিখিবার আবশ্যক নাই। কুসুমাঞ্জলির কোন কবিতার অভিনবত্ব নাই।"[৪] 'মুসলমান বন্ধু'র (২৫ আগস্ট ১৮৮৪) মন্তব্য: "পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও পাঠোপযোগী হইয়াছে। উপমান ও উপমেয়গুলি আরও অধিক সরল হওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানের পাঠ্য।"

'প্রেমের-হারে' ২১টি কবিতা আছে; কবিতাগুলির শীর্ষে শেক্সপীয়ার, মিল্টন, স্কট, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, লংফেলো, কালিদাস, ফেরদৌসী প্রমুখের নির্বাচিত চরণগুচ্ছের উদ্ধৃতি আছে। নর-নারীর প্রেম কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রেমের কবিতায় কোন কোন শ্রেণীর পাঠকের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে প্রকাশক এম. আর. আলী 'প্রকাশকের নিবেদনে' বলেছেন, "সমালোচক হয়ত গ্রন্থের নাম শুনিয়াই চটিবেন; 'রুচির বিকার' বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন। করুন, ক্ষতি নাই। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'। তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, ইহাতে রুচি বিরুদ্ধ একটিও বিষয় নাই যাহাতে সভ্য সমাজের অরুচি জন্মিতে পারে।"[৫]

১. মোজাম্মেল হক—কুসুমাঞ্জলি, কর প্রেস, কলিকাতা, ফাল্গুন ১২৮৮, পৃঃ ১১
২. বান্ধব, অগ্রহায়ণ ১২৮৯
৩. 'অপূর্ব দর্শন' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত।
৪. সুরভি, ২৫ ফাল্গুন ১২৮৯
৫. মোজাম্মেল হক—অপূর্ব দর্শন, মহম্মদীয়া লাইব্রেরী, শান্তিপুর, (নদীয়া), ১২৯২।

'অপূর্ব দর্শন' ও 'হজরত মহম্মদ' ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য। বাংলার সুলতান বাখর খানের সহিত দিল্লীর বাদশাহ কায়কোবাদের মিলন-কাহিনী 'অপূর্ব দর্শনে' বিবৃত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।[১] হজরত মহম্মদ আদর্শ মহামানব সন্দেহ নেই, তবে মোজাম্মেল তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবেই চিত্রিত করেছেন, ভক্তি-আতিশয্যে তাঁকে অতিমানব করেননি। 'হজরত মহম্মদে'র 'বিজ্ঞাপনে' কবি লিখেছেন, "বহু দিন হইতে যে সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, ... আজ তাহা করুণাময় বিশ্ববিধাতার অনুগ্রহে সফল হইতে চলিল।... ইহাতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ, তৎপর মক্কানগরী, জমজমকূপ ও কাবাশরীফের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তদনন্তর হজরতের জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া পয়গম্বরী (প্রেরিতত্ত্ব) লাভ ও ইসলাম প্রচার পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।"[২] 'নবনূরে' 'হজরত মহম্মদে'র সমালোচনা হয়। "এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী নূতনে পুরাতনে মিশ্রিত। কবি কেবল আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার রচনা করিয়াছেন বোধ হয়। চেষ্টা কারলে তিনি রচনার আরো উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতেন। ... ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। একমাত্র কবি মোজাম্মেল হক সাহেব ও মুনসী কায়কোবাদ সাহেবই আমাদের কাব্য-লেখক কবি। ... যদি তাঁহাদের সমুচিত সমাদরের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বুঝিব, এ অধঃপতিত সমাজের উদ্ধার হইতে আজও বহু বিলম্ব আছে।"[৩] 'বিবিধ সদগুণ বিভূষিত, স্বজাতি-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ মাননীয় মৌলবী সৈয়দ মহমুদন্নবি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সুকর-কমলে' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়।

'জাতীয় ফোয়ারা'য় স্বাজাত্যপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগিতার তীব্র অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৭টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে রচিতঃ 'কোহিনুর' কবিতাটি 'কোহিনুর মাসিকপত্রের অনুষ্ঠান-পত্র দর্শনে লিখিত' হয়। মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী সম্পাদিত 'কোহিনুরে'র প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩০৫) এটি ছাপা হয়।[৪] 'উদ্দীপনা' কবিতাটি 'সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র (১৩০৬) সভা উপলক্ষে রচিত, সভায় সেটি পাঠ

১. মোজাম্মেল হক—প্রেমহার, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ২৮৯৬, পৃঃ ৭
২. মোজাম্মেল হক—হজরত মহম্মদ, হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৩১৭ (২ সং) পৃঃ ✓০ ('প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন')
৩. নবনূর, মাঘ ১৩১০
৪. মোজাম্মেল হক—জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ৭৬

করা হয়।[১] 'উত্থান সঙ্গীত' ও 'আনন্দবাজার' কবিতা দুটি 'কুমারখালী আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলামিয়া'র যথাক্রমে 'চতুর্থ বার্ষিক সভা' ও '১৩১২ সালের অধিবেশনে' পঠিত হয়।[২] 'রজত জুবিলী' কবিতাটি 'মহামান্য তুরস্ক সুলতান আবদুল হামিদের পঞ্চবিংশতি বর্ষ শুভ রাজত্ব উপলক্ষে' রচিত।[৩] 'আফগান রাজকুমার সর্দার এনায়েতুল্লা খানের কলিকাতায় শুভাগমন উপলক্ষে' (১২ পৌষ ১৩১১) রচিত হয় 'অভ্যর্থনা' কবিতা। এতে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও বীর্যবত্তার গুণকীর্তন করা হয়; অপরপক্ষে স্বদেশের পরাধীনতা ও স্বজাতির দুর্দশার কথা বলা হয়।[৪] কলিকাতায় আলিগড়ের 'মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র ত্রয়োদশ অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয় 'জাতীয় সঙ্গীত' কবিতা। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সভায় এটি পাঠ করেন।[৫] 'চাঁদের হাট' কবিতাটি ১৩১৩ সনের ২ বৈশাখ 'ঢাকার শাহবাগে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির ১ম অধিবেশনে' পঠিত হয়।[৬] কবি মোজাম্মেল এসব কবিতায় সমকালীন জীবনের আবেগ আকাঙক্ষাকে প্রথম স্পর্শ করেছেন। এর আগে তিনি অমৃত ভাবলোকে বিচরণ করেছেন। স্বদেশের ও স্বসমাজের নেতৃবর্গের প্রশস্তি রচনা করে তিনি তাঁদের সমাজসেবার কাজে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বিলাসিতা, অলসতা, দীনতা, হীনমন্যতা ত্যাগ করে সকল শ্রেণীর মানুষকে জাগ্রত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, 'জাতীয় ফোয়ারা কতকগুলি জাতীয় কবিতার সমাবেশ—দুঃস্থ সমাজের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সময়ে সময়ে যে সকল কবিতা সভাসমিতিতে পঠিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার অধিকাংশ তৎসমুদয়ের সংগ্রহমাত্র। ...এতৎ পাঠে যদিই কোন পাঠকের হৃদয় জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল ও বাসনা পূর্ণ হইবে।"[৭] বলা বাহুল্য, সরকার এটিকে সুনজরে দেখেননি; এর প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[৮] কাব্যখানি ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়।

---

১. মোজাম্মেল হক—জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা. ১৩১৯, পৃঃ ৬-১০
২. ঐ, পৃঃ ৬০, ১২৯
৩. জাতীয় ফোয়ারা, পৃঃ ৩০
৪. ঐ, পৃঃ ৫২
৫. ঐ, পৃঃ ৭৮
৬. ঐ, পৃঃ ৮৯
৭. ঐ, বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।
৮. মুসলিম মানুষ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৭৬

গদ্য লেখক মোজাম্মেল হকের রচনার প্রধান ধারা দুটি: বর্ণনামূলক বিবিধ জীবনচরিত ও সৃষ্টিধর্মী উপন্যাস। 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৪), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৮৯৮), 'তাপসকাহিনী' (১৯০০), শাহনামা' (১৯০৯), 'মওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'খাজা মরীনউদ্দীন চিশতী' (১৯১৮), 'দরাফ খান গাজী' (১৯১৯) প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সন্তজীবনীমূলক রচনা। সুফী সাধকগণের মাহাত্ম্য-প্রচার চরিতাখ্যানগুলির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। তিনি সমাজ-জীবনে ধর্মীয় ঐতিহ্যবোধ সঞ্চার করতে চেয়েছেন। শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মির্জা ইউসুফ আলী প্রভৃতি লেখক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও মহাপুরুষের জীবনী ব্যাখ্যা করে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা করেছেন, তার আবেদন ছিল বুদ্ধিলোকে, মোজাম্মেল হক সুফীসাধকদের জীবনচরিত ব্যাখ্যা করে ইসলামের ভাবলোকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোজাম্মেল হক, ফুরফুরার পীর আবু বকরের ভক্ত ছিলেন। সুফী ভাবধারায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। তাঁর 'মহর্ষি মনসুর' সবচেয়ে সুখ্যাতি লাভ করে। গ্রন্থের 'নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। একখানি উর্দু পুস্তিকার মর্মাবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীনভাবে রচিত হইয়াছে। ... ইহা রচনাকালে শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসার পারস্য শিক্ষক জনাব মৌলবী হাজি অবায়েদুল্লা সাহেবের অনেক সাহায্য পাইয়াছি।"[১] 'মহর্ষি মনসুরে'র সমালোচনা করে 'এডুকেশন গেজেটে' লেখা হয়, "এই গ্রন্থখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ভাষা মার্জিত বাঙ্গালা। আলোচ্য বিষয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর একটী সাধক বৈদান্তিকের জীবনী। এরূপ মহাত্মার পবিত্র চরিত্র পাঠে সকল জাতীয়েরই উপকার আছে। বোগদাদবাসী সাধক মনসুর 'আনাল হক' বা আমি ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।"[২]

'ফেরদৌসী চরিত' ফারসী 'শাহনামা' কাব্যের রচয়িতা ফেরদৌসীর জীবন-বৃত্তান্ত। কবির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মোট নয়টি পরিচ্ছেদে এটি সমাপ্ত হয়। প্রথমে এটি 'মিহির' (১৮৯২) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বসুমতী'তে ফেরদৌসী চরিতের সমালোচনা বের হয। পত্রিকায় লেখা হয়, "মহাকবি ফেরদৌসী সুপ্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য শাহনামার রচয়িতা, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়। বর্তমান পুস্তকে তিনি (মোজ্জাম্মেল হক) উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্যে কবির জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা

১. মোজাম্মেল হক—মহর্ষি মনসুর, মিলন প্রেস, কলিকাতা, ৯ আষাঢ় ১৩০১
২. 'প্রেম—হার' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ৪

এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব পুলকিত হইয়াছি। মুসলমানের লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে অতি কমই হইয়া থাকে।'[১] ফেরদৌসী চরিত ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও পারস্য অধ্যাপক মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দীনকে উৎসর্গ করা হয়।"[২] 'তাপস কাহিনী'তে হজরত আবদুল কাদের জিলানী, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, ইমাম জাফর সা'দেক, ইব্রাহিম আদহম বলখী প্রমুখের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

'জোহরা' (১৯২৭) ও 'রঙ্গিলাবাই' দুখানি পারিবারিক উপন্যাস। দোষে-গুণে মানুষ চিত্রিত করার চেয়ে আদর্শ-চরিত্র চিত্রনের প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশী ছিল।

মোজাম্মেল হকের গদ্য-পদ্য রচনার অপর ধারা প্রবাহিত হয় পাঠ্যপুস্তক রচনায়। শিশু ও বালকদের উপযোগী করে এগুলির অধিকাংশ রচিত—যেমন 'সাহিত্য-শিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা', 'সরল বাঙ্গালা শিক্ষা', 'শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা', 'পত্রদলিল লিখন শিক্ষা', 'সৎ শিক্ষা, 'কিণ্ডার গার্টেন ধারাপাত' ইত্যাদি। এগুলির কোন কোনটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার ফল এসব রচনা।' 'বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে নীতিগর্ভ সরল গদ্য পাঠাবলী'র সংকলন 'পদ্য-শিক্ষা' (প্রথম ভাগ) ৩৬ পৃষ্ঠার বই। এতে ১৭টি ছোট ছোট কবিতা আছে। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের দুটি, রামলাল চক্রবর্তীর একটি, ব্রজনাথের একটি এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের একটি কবিতা আছে। বাকীগুলি মোজাম্মেল হকের প্রণীত।[৩] 'পদ্য-শিক্ষা'র (১ ভাগ) সমালোচনা করে 'সুধাকর' পত্রিকায় লেখা হয়, "ইহাতে নীতিপূর্ণ কয়েকটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মধুর ও শ্রুতিসুখকর। পুস্তকখানি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী।"[৪] 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। "সরল ভাষায় বালিকাদিগের শিক্ষার্থে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাহাতে ইহা একখানি পাঠ্য-পুস্তক রূপে পরিগৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি বিজ্ঞাপনে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ-গণের উপরও অনেক অনুরোধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি নেহাত মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহে। আজকাল

১. মোজাম্মেল হক—মহর্ষি মনসুর, ৯ আষাঢ় ১৩০৩
২. মোজাম্মেল হক—ফেরদৌসীচরিত, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
৩. মোজাম্মেল হক—পদ্য-শিক্ষা, ১ ভাগ, নিউ মুন প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৯
৪. 'প্রেম-হার' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ৫

অনেকেই এইরূপ পুস্তক লিখিয়া পাঠ্য পুস্তক নির্বাচিত হইবে আশা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা বোধ হয় একবারও ভাবিয়া দেখেন না।"[১] 'অনুসন্ধানে'র ঐরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও 'পদ্য-শিক্ষা' (১ ভাগ) 'টেক্স্ট বুক কমিটীর অনুমোদিত ও ডিরেক্টর বাহাদুরের প্রকাশিত পাঠ্যলিস্টে বাংলা মধ্য শ্রেণীর স্কুলসমূহের ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট' হয়।[২] 'পদ্য-শিক্ষা' ২ ভাগের সমালোচনা করে 'বঙ্গবাসী' মন্তব্য করে, "গ্রন্থকার মুসলমান হইলেও হিন্দুর ব্যবহার্য্য বাঙ্গালায় সুপ্রবিষ্ট। যাঁহারা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পদ্য-শিক্ষা পাঠ করিলে অনেক বিষয়েই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।"[৩]

'নানা বিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা' 'লহরী' (১৯০০) মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কেবল কবিতা নিয়ে সাময়িকপত্র মুসলমানের সম্পাদনায় এটিই প্রথম। তিনি 'লহরী' ছাড়া 'মোসলেম-প্রতিভা' (১৯০৭) ও 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) নামে আরও দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষোক্তটি শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মেল হকের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৪]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে দিজেন্দ্রলাল রায় বলেন, "হক সাহেবের কাব্য-প্রসুন শান্তিপুরের মাধবীকুঞ্জে ফুটিলেও ইহার অনিন্দ্য সৌরভ বঙ্গবাণীর সাহিত্যকাননের সকল দিকই একদিন আমোদিত করিবে।"[৫]

মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩)

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ফসল উঠে বিশ শতকের দুই দশকে বেশ পরিণত বয়সে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনোয়ারা' ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩) 'হাসান-গঙ্গা বাহমনি' (১৯২৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯২৮) প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। আমাদের আলোচ্য যুগে তাঁর দুখানি প্রবন্ধ পুস্তক মুদ্রিত হয়: 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯০৪) ও 'বিলাতী বর্জন রহস্য' (১৯০৪)। এ ছাড়া, 'ইসলাম-প্রচারকে' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৮) তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়।

১. অনুসন্ধান, ১৫ ফাল্গুন ১২৯৬
২. প্রেম-হার, পৃঃ ৫
৩. ঐ, পৃঃ ৫
৪. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ১২৬
৫. মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪০

তিনি পাবনা জেলার বেলতৈল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয় হতে 'ছাত্রবৃত্তি' এবং ঢাকা থেকে 'নর্মাল পরীক্ষা' পাশ করেন। তিনি যখন 'বিলাতী বর্জন রহস্য' রচনা করেন তখন তিনি সলঙ্গা মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন।[১] পরে তিনি সিরাজগঞ্জের একটি মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯১০ সালে রাজশাহীর জুনিয়র মাদ্রাসার বাংলা শিক্ষক হন। তিনি নিজ চেষ্টায় স্বগ্রামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৮৯২) যা পরবর্তীকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তিনি ইংরাজী শিক্ষা ও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তিনি সাহিত্যকর্মে সুনীতি ও আদর্শ প্রচার করেন। এই আদর্শ-বাদিতা ও নীতিধর্মিতার জন্য তাঁর উপন্যাসগুলির শিল্পগুণ অনেকাংশে ম্লান হয়েছে। কিন্তু সেযুগে সমাজের যে অবস্থা ও গতি ছিল, তাতে ঐরূপ করা ছাড়া উপায় ছিল না। দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় মুসলমান সমাজ নৈরাশ্য ও গ্লানিতে ভুগছে, গ্রামের অবস্থা আরও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। নজিবর রহমান উপন্যাসে আদর্শ চরিত্র ও কাহিনী চিত্রিত করে সামাজিক উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে চেয়েছেন। সমকালের গ্রামের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর উপন্যাসের পট-ভূমি। উপন্যাসের আঙ্গিকে বাস্তব জীবনকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেন।[২] নজিবর রহমানের রাজনৈতিক চেতনার ফল 'বিলাতী বর্জন রহস্য' গ্রন্থ। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন হিন্দু-মুসলমানের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় এ গ্রন্থে তার স্পষ্ট ছবি আছে। বলা বাহুল্য উভয়ের প্রতিক্রিয়া অভিন্ন ছিল না। মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিপক্ষে রায় দেয়। ৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানিতে নজিবর রহমান অংশত প্রবন্ধের, অংশত সংলাপের ভঙ্গিতে সমকালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। পুস্তকের 'মুখবন্ধে' আছে: "বিলাতী বর্জন রহস্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গবেষণা, যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই। নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও দৃষ্টান্তই ইহার মূল ভিত্তি। ... এই সামান্য পুস্তকে সমাজের সামান্যটুকু উপকার হইলেও শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[৩]

মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭)

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার পৈতৃক নিবাস ছিল যশোহরের ছাতিয়ান তলা

১, গোলাব সাকলায়েন—বিলাতী বর্জন রহস্য, সাহিত্যিকী, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৫৬

২, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২০৪; মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪৩২-৩৩; গোলাব সাকলায়েন—মোহাম্মদ নজিবর রহমান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪

৩. মোহাম্মদ নজিবর রহমান—বিলাতী বর্জন রহস্য, ১৩১১, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' পর্যন্ত তাঁর বাল্যশিক্ষা হয়। তাঁর পিতা ওয়ারেস উদ্দীন সামান্য বিত্তের মানুষ ছিলেন। মেহেরুল্লার বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হলে পাঠশালা ত্যাগ করে জীবিকার জন্য তিনি দর্জির দোকানে সেলাই-এর কাজ শুরু করেন। খ্রীস্টান মিশনারীরা যশোহরে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতেন। তাঁরা বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেন ও অজ্ঞ মুসলমানদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতেন। মেহেরুল্লার মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি নিজ চেষ্টায় আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন এবং কোরান-হাদিস সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভে করেন। তিনি প্রথমে পাদরীদের প্রতিবাদে হাটে-বাজারে ধর্মীয় বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি ইসলামের মাহাত্ম্য, বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে সমাজে আলোড়ন তোলেন। ক্রমে সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মোল্লাদের মত গতানুগতিক বক্তৃতা করতেন না, তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে যুগোপযোগী যুক্তিশীল বক্তৃতা দিতেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, লোকশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সবকিছুই তিনি বক্তৃতার অঙ্গীভূত করেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে জাগান ও সুপথ দেখান। একই উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তক রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, সমিতি গঠন, মাদ্রাসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বরিশালের পিরোজপুরে পাদরী স্পার্জন ও পাদরী টিস্ডালের সাথে ধর্মীয় বিতর্ক মুনশী মেহেরুল্লার জীবনের একটি বড় ঘটনা। ১২৯৮ সনের ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিন তিন দিন ধরে প্রকাশ্য সভায় ঐ 'তর্কযুদ্ধ' হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১] তর্কযুদ্ধে কোরান-বাইবেল, যীশু-মহম্মদ, ঈশ্বর-আল্লাহ, খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায়—সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই বিতর্কে মেহেরুল্লার ভূমিকা ছিল প্রধান। তাঁর রচিত 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' (১৯০১) গ্রন্থখানি এই বিতর্কের ফল। ১৩০৪ সনে রাণাঘাটে পাদরী মনরোর সঙ্গে অনুরূপ তর্কযুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মনরোর অনুপস্থিতিতে মেহেরুল্লা ও জমিরুদ্দীন খ্রীস্টধর্মের অসারতা ও ইসলাম ধর্মের মহিমা ও তৎসহ মুসলমান সমাজের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন।[২] এ ছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতাকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা

১. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮

২. শেখ হবিবর রহমান---কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ৩৬

সমিতি'র রাজশাহী ও পশ্চিমগাঁও-এর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি একজন উৎসাহী কর্মী হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রচারকার্য দ্বারা অধিবেশনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেন।[১] তিনি জন জমিরুদ্দীনকে প্রবন্ধ-তর্কে পরাভূত ও বশীভূত করে ভাবশিষ্য ও প্রচারক-সঙ্গী করে নেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সিরাজগঞ্জ), মোহাম্মদ ইব্রাহিম (বরিশাল), গোলাম রব্বানী (যশোহর), শাহ আবদুল্লা প্রমুখও তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন।[২]

মেহেরুল্লা যে কয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার সবগুলি ধর্ম ও সমাজমূলক ছিল। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম এরূপ: ১. খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৭), ২. বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার (১৮৯৪), ৩. রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫), ৪. মেহেরুল এসলাম (১ খণ্ড, ১৮৯৭), ৫. জওয়াবোন্নাসারা (১৮৯৮), ৬. হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮, ২ সং), ৭. খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ (১৯০১), ৮. কারামতিয়া মাদ্রাসা (১৯০১), ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮), ৯. পান্দনামা (১৯০৮)।[৩]

খ্রীস্টান পাদরীদের প্রচারণার বিরুদ্ধেই মেহেরুল্লার মৌলিক বিরোধ। এজন্য খ্রীস্টধর্মকে তিনি আক্রমণের ক্ষেত্র করেছেন। 'খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা', 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান', 'জওয়াবোন্নাসারা', 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' গ্রন্থগুলি তারই ফলশ্রুতি। তিনি পাদরীদের অপপ্রচারের গতিরোধ করার জন্যই এগুলি প্রণয়ন করেন। 'খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা' গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলেন, "সম্প্রতি এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বাগযুদ্ধ চলিতেছে, —যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টীয়ান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি প্রায় সকলেই স্ব স্ব ধর্মের গৌরব ও

---

১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১; কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২

২. কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, পৃ: ৮৬

৩. 'মিহির ও সুধাকরে' (২৫ ফাল্গুন ১৩০৮) এক বিজ্ঞাপনে মুন্সী মেহেরুল্লা প্রণীত 'ঈশানচন্দ্র বাবুর মুসলমান ধর্মগ্রহ'; 'শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের ইসলাম গ্রহণ' 'সাহেব মুসলমান' নামে অপর তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ আছে। মেহেরুল্লার প্রভাবে ঈশানচন্দ্র মণ্ডল (মোহাম্মদ এহসানউল্লা) ও শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ের ধর্মান্তর গ্রহণের বৃত্তান্ত প্রথম দুখানি পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে। তৃতীয় পুস্তিকা সম্পর্কে অধ্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন, "অস্ট্রেলিয়া নিবাসী একজন সাহেব মোসলমান হইয়া লিভারপুলস্থ মোহাম্মদ আবদুল্লা কুইলিয়ম সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ১৩১৪ হিজরী পাঁচবী মহরম তারিখে মনসুর-ই-মোহাম্মদী গেজেট হইতে মোহাম্মদ মেহেরুল্লা দ্বারা সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত।"
আলী আহমদ প্রণীত গ্রন্থপঞ্জী (অপ্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু তন্মধ্যে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণকে যেরূপ অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দ্বেষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়কে দেখা যায় না। তাঁহারা অপর ধর্মের সামান্য দোষকে বর্ণনায় পর্বত সমান ও আপন ধর্মের সামান্য গুণকে অলঙ্কারে পর্বত করিয়া তুলেন। ... বলেন, এই পৃথিবীতে বাইবেল শাস্ত্র ব্যতীত ঈশ্বরদত্ত অন্য কোন পুস্তক নাই; আরও বলেন, এ জগতে কোনও মনুষ্য নিষ্পাপ নহে, সকলেই পাপাসক্ত; কেবল প্রভু যীশুই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক; সেই মহাত্মা ব্যতীত পরিত্রাণ দিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। ... কেবল যাহারা ঈশ্বরের ত্রিত্বতে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে; প্রায়ই খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারক পাদরিগণ এরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, খ্রীস্টানগণ যাহা প্রচার করেন ও যাহা শিক্ষা দেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন।"[১] খ্রীস্টধর্মের মূল ভিত্তি যে ত্রিত্ববাদ মেহেরুল্লা বাইবেল থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তার অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থে তিনি কোরান ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বাইবেলের ভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা এবং কোরানের সত্যতা ও উৎকৃষ্টতার কথা আলোচনা করেছেন।[২] 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' পিরোজপুরের ও 'জওয়াবোন্নাসারা' নোয়াখালীর পাদরী-মৌলবীদের বিতর্কের বিষয় নিয়ে রচিত। 'জওয়াবোন্নাসারা' রচনার বিবরণ দিয়ে শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "... নোয়াখালির পাদ্‌সাহেবেরা তথাকার মুসলমানদিগের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া, প্রশ্নগুলি মুনসী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুনসী সাহেব আমাকে (জমিরুদ্দীনকে) সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুনসী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সাহেব 'জোয়াবোন্নাসারা' (১৩০৫) নাম দিয়া পাদ্‌র প্রশ্ন ও আমাদের উত্তরগুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন।"[৩]

খ্রীস্টধর্মের মত হিন্দুধর্মকেও মেহেরুল্লা সমালোচনার ক্ষেত্র করেন। কেননা তখন উভয় সমাজের মানুষের কাছ থেকে মুসলমান সমাজের উপর আঘাত এসে-

১. 'মুন্সী মোহাম্মদ' মেহেরুল্লা---খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩১৬ (৩সং), পৃঃ ১-২

২. রদ্দ (আরবী রদ) শব্দের অর্থ প্রতিবাদ; দলিল অর্থ প্রমাণপত্র। 'দলিলোল এসলামে'র অর্থ ইসলামের দলিল বা প্রমাণপত্র।

৩. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন---মেহের-চরিত, কলিকাতা, ১৯০৭, পৃঃ ৫২

ছিল। 'বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার' এবং 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থ দুটিতে তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ দেওয়া হত না। মুনশী মেহেরুল্লা এ-প্রথার নিন্দা করেছেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলন এবং সরকারের প্রবর্তিত আইনের তিনি প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি 'উপক্রমণিকা'য় বলেন, "কেবল হিন্দু গৃহেই যে বিধবাদিগের প্রতি নিগ্রহ, এমত নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাসমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর মিঞা সাহেবদিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। বিধবাবিবাহ না হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, গর্ভপাত, নরহত্যা এবং পবিত্র মুসলমান নামে কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে? ... আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তি সমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল, সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। ... যদি ইহার দ্বারা একজন বিধবাবিবাহ বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে, সন্দেহ নাই।"[১]

সমকালীন কোন কোন হিন্দু লেখকের মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিবাদে পুরাণোক্ত হিন্দু দেবদেবীর লীলারহস্যের বিবরণ দিয়ে 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থখানি রচিত। তিনি ধর্মবিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের সমকালীন দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে বলেছেন, "... বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ই ভারতের প্রধান অধিবাসী। বাস্তবিক আমাদের এই দুইয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াই সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আবার ধর্মের বিভিন্নতাই সেই বিবাদের মূল। হিন্দু যাহাকে পুণ্য, মুসলমান তাহাকে পাপ ও মুসলমান যাহাকে পুণ্য, হিন্দু তাহাকে পাপ জ্ঞানে একজন অন্য জনকে ঘৃণা ও হিংসার চক্ষে দেখিতেছে। অতএব আসুন, আমরা অকপট মনে, বিবাদীয় বিষয়গুলির সূক্ষ্মালোচনা দ্বারা মীমাংসা এবং কল্পনার অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃত সত্যানুরাগী হইয়া পরস্পর বিবাদ নিষ্পন্ন করি।"[২] 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা'র

১. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা—বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার, যশোহর, ১৩৭৫ (৭ সং), পৃঃ ৵০-।০ (উপক্রমণিকা)

২. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা—হিন্দু ধর্মরহস্য ও দেবলীলা, পৃঃ ১৩

ভাষা আক্রমণাত্মক ও রুচিহীন। প্রতিবাদধর্মী ও উদ্দেশ্যধর্মী রচনায় তিনি এক তরফাভাবে হিন্দুধর্মের ত্রুটি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিশ্লেষণ করেননি। তত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল বাইরের রূপটা দেখে বিচার করেছেন। মেহেরুল্লার মৃত্যুর পরপরই তাঁর উভয় গ্রন্থই অশ্লীলতা ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[১]

যশোহরের মনোহরপুর গ্রামে কারামতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেহেরুল্লা মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন। 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' পুস্তিকায় উক্ত মাদ্রাসার বিবরণ আছে। মেহেরুল্লা জৌনপুরের কেরামত আলীর সমর্থক ছিলেন। তিনি ফুরফুরার পীর আবু বকরকেও মান্য করতেন। কেরামত আলী ও আবুবকর ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেহেরুল্লাও শাসকদের বিরুদ্ধে যাননি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের বিপক্ষে মত দেন।[২] প্রাথমিক পর্যায়ের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "যশোহর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা দ্বিগুণ; কিন্তু এক শতের মধ্যে পাঁচজন লোকও লেখাপড়া জানেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনার অভাবে মুসলমানদিগের অবস্থা এতই নীচ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নীতিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ না করিত এমন কাজ নাই। এই কারণ প্রযুক্তই যশোহরে চোর, দস্যু, দাঙ্গাকারী, মামলাবাজ, নাড়ার ফকির সম্প্রদায় অনেক বেশী। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা ব্যতীত লোকসমাজ হইতে ঐ সমুদয় পৈশাচিক ভাব বিদূরিত হওয়া অসম্ভব। তাই আমরা কতিপয় দীনহীন দরিদ্র মুসলমান একযোগে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত কৃষকসমাজগণ যাহাতে বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সহজে বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা করিতে পারে, মাদ্রাসায় কারামতীয়াতে তাহার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"[৩] তিনি এটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার আশা প্রকাশ করেন। এখানে মেধা ও অভিপ্রায় অনুসারে ছাত্ররা ইংরাজী সহ আধুনিক শিক্ষা অথবা আরবীসহ ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে—এই ছিল

১. অধ্যাপক আলী আহমদ তাঁর অপ্রকাশিত 'গ্রন্থপঞ্জী'তে বলেছেন যে, বিধবা-গঞ্জনা ও হিন্দুধর্ম-রহস্য প্রচারের জন্য মুন্শী মেহেরুল্লার পত্র মুনসুর আহমদ ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। মনসুর আহমদ দণ্ডিত হন এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন সর্বস্বান্ত হন।

২. কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা, পৃঃ ১০৮

৩. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সংগৃহীত)—নূরুল ইসলাম বা মাদ্রাসায় কারামতীয়া বিবরণী সম্বলিত সাময়িকপত্র, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, পৃঃ ১৫

তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।[১] মেহেরুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবমুখী এবং গঠনমুখী। বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্ম-প্রচার তাঁর মৌলিক পেশা ছিল। কিন্তু বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়েই তিনি দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হননি, এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন সমিতি গড়েছেন। মেহেরুল্লা 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা ইসলামধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।[২]

মুনশী মেহেরুল্লা শুধু নিজেই লেখেননি, তরুণ লেখকদের লিখতে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজ ব্যয়ে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' (১৯০০), শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ' (১৯০৩) এবং শেখ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) মুনশী মেহেরুল্লার উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। শেখ ফজলল করিম 'পরিত্রাণে'র অবতরণিকায় লিখেছেন, "বঙ্গ বিখ্যাত মিশনারী, বাগ্মীপ্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুনশী মেহেরউল্লা সাহেব গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে যে অকৃত্রিম সদাশয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"[৩]

মুনশী মেহেরুল্লার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, "বাস্তবিক মুনশী সাহেব আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তিনি পরম ধার্মিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে খ্রীস্টিয়ান পাদ্রীগণ কম্পিত হইতেন। ধর্মদ্রোহী নেড়ার ফকিরগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। ... তাঁহার চেষ্টায় বহু মাদ্রাসা, স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে নির্জীব মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্মভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। ... তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমান-দিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল।"[৪]

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে কাউনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারিয়ে প্রথমে ফজলুল হকের

---

১. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সংগৃহীত)—নুরুল ইসলাম বা মাদ্রাসায় কায়দা-ভাঁড়া। [illegible] সংকলিত সাময়িকপত্র, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, পৃঃ ১৫

২. মেহের-চরিত, পৃ. ৯-১০; দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভা-সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য

৩. শেখ ফজলল করিম—পরিত্রাণ, কলিকাতা, ১৩১০ 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য

৪. 'কর্মবীর মুনসী মেহেরুল্লা' থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ১৪৪

পিতৃব্যের আশ্রয়ে ও পরে রূপসার জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর আশ্রয়ে লেখাপড়া করেন। রূপসার বাজাপ্তি সার্কেল স্কুল থেকে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন (১৮৭৬)। জমিদারের সহযোগিতায় একটি পাঠশালা খুলে সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পাঠশালার সাথে একটি পাঠাগারও স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন লোকের আর্থিক সাহায্যে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখর জ্ঞানতৃষ্ণা ও সংগঠনশক্তি ছিল, তা শৈশবকালেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্কুলপাঠ্য 'বোধোদয়ে'র (১২৮৬ সনের সংস্করণ) কতিপয় ভুল তিনি তাঁকে পত্র মারফত জানিয়ে ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কৃতজ্ঞতাসহ সংশোধন করেছিলেন। বোধোদয়ের ১৮৮৯ সালের সংস্করণের (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) 'বিজ্ঞাপনে' বলা হয়: "ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রিডিং ক্লাব অর্থাৎ পাঠ-গোষ্ঠী আছে, উহার কার্যদর্শী শ্রীযুক্ত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মহাশয় বোধোদয়ের কতিপয় স্থান অসংলগ্ন দেখিয়া পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। ... উহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত এবং সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে।"[১] রজনীকান্ত গুপ্তের ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান বাদশাহদের নাম বিকৃত হওয়ায় জমিদার চৌধুরী মোহম্মদ গাজীর সহযোগিতায় ফারসী গ্রন্থ থেকে প্রকৃত নামের শুদ্ধ বানান লিখে পাঠাতেন।[২] রূপসার জমিদারের সাহায্যে ফারসী 'তওজকে জাঁহাগীরি' হতে ঐতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করে হুগলীর 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ করতেন।[৩] রূপসাতে অবস্থানকালেই রেয়াজুদ্দীন আহমদের জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল।

আত্মপ্রকাশের উদগ্র বাসনা তাঁর; পল্লীগ্রামের 'কূপমণ্ডুক' পরিবেশে সেটি সম্ভব নয়। 'শ্রীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রকিশোর রায় তাঁকে উৎসাহ দিতেন। রূপসার একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি কলিকাতায় গমন করেন। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী ও মোজাম্মেল হকের সাথে তাঁর পূর্বেই পত্রালাপ ছিল; এবার সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তিনি বিদ্যাসাগরের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯০ সালের দিকে নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। এখানে মীর মশাররফ হোসেন, মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিমের সাথেও তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা জন্মে।[৪]

---

১. মোহাম্মদ ইদরিস আলী—মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৩৬৫, পৃ: ৪
২. ঐ, পৃ: ৪
৩. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, ১ খণ্ড, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯), কলিকাতা, পৃ: ।।০ (ভূমিকা)
৪. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃ: ৯

রেয়াজুদ্দীনের প্রতিভার মৌল-প্রকৃতি ছিল সাংবাদিকতা; সংবাদপত্রকেই তিনি আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। 'ইণ্ডিয়ান ইকো'র সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় রেয়াজুদ্দীনকে সম্পাদক নিযুক্ত করে 'মুসলমান' (১৮৮৪) নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকাখানি বের করেছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১০।১২ সপ্তাহের পর তা বন্ধ করে দেন। এর পর রেয়াজুদ্দীন আহমদ বাল্যবন্ধু চন্দ্রকিশোর রায়ের 'শ্রীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু মতবিরোধ হওয়ায় অল্পকাল পরেই সেটি ত্যাগ করেন।[১] 'দি ক্রিসেন্ট' পত্রিকায় সম্পাদক আবদুল ময়েজ 'নব-সুধাকর' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পরিচালনা করতেন; রেয়াজুদ্দীন আহমদ ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৮৬), কিন্তু ৫।৬ সপ্তাহের পর ঐ পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়।[২] রেয়াজুদ্দীন দমবার পাত্র নন। একখানি 'জাতীয় সংবাদপত্র' প্রকাশের বাসনা অন্তরে লালন করে কিছুদিন যৌথভাবে 'এসলামতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। মৌলবী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ একত্রে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে সফলতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই উৎসাহ-বীজ থেকে 'সুধাকর' (নভেম্বর ১৮৮৯) সাপ্তাহিক পত্রের জন্ম হয়। এর দু'বছর আয়ু ছিল; যৌথ সম্পাদনায় কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর রেয়াজুদ্দীন আহমদ এর সম্পাদক হন। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' প্রকাশিত হয়। মাঝে প্রায় সাত বছর বন্ধ থাকার পর এটি নবপর্যায়ে ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। সর্বমোট ১৩ বছর 'ইসলাম-প্রচারকে'র আয়ু ছিল; রেয়াজুদ্দীন আহমদ বরাবর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন।[৩] তিনি 'সোলতান' (১৯০২) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রেরও সম্পাদনা করেন। পরে মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এর সম্পাদক হন।[৪] তিনি কিছুকাল 'মিহির ও সুধাকর' পত্রেরও সম্পাদক হন। শেষ জীবনে ফজলুল হক পরিচালিত 'নবযুগ' ও অন্য একটি পত্রিকা 'রায়ত বন্ধু'র (১৯২৬) তিনি সম্পাদনা করেন।[৫] তিনি কলিকাতায় কড়েয়া গোরস্থান রোডে 'রেয়াজ উল ইসলাম

১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩
২. ঐ, পৃঃ ১৫
৩. পত্র-পত্রিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
৪. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৬৬
৫. সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৪৩১

প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রচারক ও সেযুগের অনেক পুস্তক-পুস্তিকা এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়; তিনি অনেক গ্রন্থের প্রকাশকও ছিলেন।

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র (১৮৮৩) সহিত মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের যোগসূত্র ছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "ঢাকা শহরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধে বিশেষতঃ অক্লান্তকর্মী সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলভী আবদুল আজিজ বিএ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন।"[১] সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা। বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের অভাব থাকায় সম্মিলনীর অনুরোধে তিনি 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১৮৮৩) প্রণয়ন করেন।[২]

১৮৯৩ সালে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সদস্য তালিকায় তাঁর নাম নেই। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল না। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র সদস্য-তালিকায় তাঁর নাম আছে।[৩] ইউনিয়নের আশ্রয়ে গঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি এর বার্ষিক বিভিন্ন অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমিতির 'স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটি'র সদস্য ছিলেন।[৪] 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'র (১৯০৪) কার্যকরী কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন।[৫] এছাড়া, কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে স্থাপিত একটি সমিতির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন।[৬] 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' নামে অপর একটি সাহিত্য সভার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯১১ সালে স্থাপিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ১৯১৭-১৮ সালের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ভুক্ত ছিলেন।[৭]

রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকতার সাথে সাথে সাহিত্য সেবাও করে গেছেন। তিনি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এগুলির অধিকাংশই

---

১. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃঃ ২৬
২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩
৩. ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০
৪. ঐ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
৫. ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০
৬. মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৮
৭. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ২০৭-০৮

উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী। তিনি রসধর্মী কাব্য সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ কাব্য' ও 'লায়লী-মজনু' উপাখ্যানের বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, "ঐ লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর পশ্চাদপদ বর্তমান মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে?"[১] স্বধর্ম ও স্বসমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ছিল। ধর্ম ও সমাজের দুর্দশা ও দুর্গতির কথা ভেবেই তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। নিজ ধর্ম ও সমাজের স্বার্থের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল আপোষহীন। এজন্য তিনি অন্য সমাজকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। স্বসমাজের অনাচার, জড়ত্ব, নির্বুদ্ধিতা ও উন্মার্গগামিতাকেও সমালোচনা করেছেন। অনৈসলামিক ধর্মাচরণের জন্য নেড়ার ফকির' বা বাউলদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ইসলাম বিরোধী প্রচারণার জন্য তিনি খ্রীস্টান মিশনারী ও ব্রাহ্ম প্রচারকদের ঘোর বিরোধিতা করেন। 'ইসলাম-প্রচারকে' এর বিরুদ্ধে একটি সফল আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ধর্মসভা, সমিতি, ধর্মপ্রচারক ও ইসলাম মিশনাদির কথা ঘটা করে ছাপাতেন।

তাঁর আর একটি দৃষ্টি ছিল আরব-তুরস্কের দিকে। তাঁর 'এসলামতত্ত্ব' জামালউদ্দীন আফগানীর 'নেচার ও নেচারিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ। প্যান-ইসলামিক চেতনা দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আরব, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্কের অতীত ও বর্তমানের গৌরবময় কাহিনী ও জীবনচিত্র 'ইসলাম-প্রচারকে' অজস্র ছাপা হত। তিনি নিজেও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, 'জঙ্গে রুস ও ইউনান' (১৮৯৭) ও 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১ ও ২ ভাগ, ১৮৯৯) নামে দুইখানি ইতিহাস গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন-চরিত', 'হজরত ফাতেমা জোহরার জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে আহতদের সেবায় ও দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে নির্মাণে চাঁদা সংগ্রহে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। জাতীয় ভাষায় জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা এবং জাতীয় ভাবে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কথা সেযুগের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতো রেয়াজুদ্দীন আহমদও বলেছেন। বাংলার মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী মিশ্রিত একটি স্বতন্ত্র 'জাতীয় ভাষা' কামনা করেছেন, কিন্তু তিনি যে ভাষার চর্চা করেছেন তা আধুনিক শুদ্ধ ভাষা। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংরাজদের সমর্থন করেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের বিরুদ্ধতা করেছেন। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায়, রেয়াজুদ্দীন আহমদের পুরোপুরি

১. ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০২

মুক্ত মন ও স্বচ্ছদৃষ্টি ছিল না। রূপসার 'পাঠকগোষ্ঠী' থেকে শুরু করে কলিকাতার 'ইসলাম প্রচারক-গোষ্ঠী' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে যে সংগঠনশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তা মুক্তচিন্তার দ্বারা পরিচালিত হলে সমাজ-উন্নতির একটা নির্দিষ্ট গতিপথ নির্ণীত হত। তার মানসলোকে ধর্মানুরাগ, মুসলমান প্রীতি, হিন্দু-বিরূপতা, ইংরাজানুগত্য, জাত্যাভিমান, অতীতচারিতা ভাব মিশে একটা আবর্ত সৃষ্টি করেছিল। সেযুগের মুসলিম মানসিকতা এই আবর্তে আচ্ছন্ন ছিল। কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সাথে রেয়াজুদ্দীনের মনোভাবের মিল আছে। একাধারে স্বদেশানুরাগ অন্যধারে ইংরাজপ্রীতি উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। উভয়েই গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কলিককাতায় এসে পত্রিকা, প্রেস, পুস্তক ও প্রতিষ্ঠানকে সর্বস্ব করে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। নিজ নিজ সমাজের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত মুসলমানদের এবং রেয়াজুদ্দীন হিন্দুদের নিন্দা করেছেন।

রচনাবলী :

১. বোধোদয়তত্ত্ব (১৮৭৯)
২. পদ্যপ্রসূন (১৮৮০)
৩. তোহফাতুল মোসলেমিন (১৮৮৫)
৪. এসলামতত্ত্ব (১ খণ্ড ১৮৮৮, ২ খণ্ড ১৮৮৯)
৫. বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৮৯৫)
৬. উপদেশ রত্নাবলী (১৮৯৬)
৭. জঙ্গে রুস ও ইউনান (১৮৯৭)
৮. গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১ ভাগ, ১৮৯৯, ২ ভাগ ১৯০৯)
৯. বিলাতি মুসলমান (১৯০০)
১০. বোতলে মা ভুবেশ্বরী (১৯০০)
১১. জোবেদা খাতুনের রোজনামচা (১৯০৭)
১২. হক নসিহত (১৯০৭)
১৩. নামাজশিক্ষা (১৯০৭)
১৪. আমার সংসার জীবন (১৯১৫)
১৫. কৃষক বন্ধু
১৬. জোলেখা
১৭. বৃহৎ হীরকখনি
১৮. আমির জানের ঘরকন্না

১৯. হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত (১৯২৭)
২০. হজরত ফাতেমা জোহরার জীবন চরিত
২১. পাক-পাঞ্জাতন (১৯২৮)
২২. মুসলিম সাহিত্যের ইতিহাস।

কোন কোন গ্রন্থ 'এবনে মাজীজ' 'গরীব শায়ের' ছদ্মনামে রচিত। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর প্রবন্ধরাশি ছড়িয়ে আছে। প্রথম গ্রন্থ 'বোধোদয়তত্ত্ব' ঈশ্বরচন্দ্রের 'বোধদয়ে'র অর্থপুস্তক। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পদ্য-প্রসুন' মৌলিক কবিতার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। 'তোহফাতুল মোসনেমিন' ইসলাম-ধর্মের মসলাবিষয়ক গ্রন্থ। তিনখানি গ্রন্থই পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী পাঠ্যবই। চতুর্থ পুস্তক 'এসলামতত্ত্ব বা মোসলমানধর্মের সারসংগ্রহ' (১ ও ২ খণ্ড) মূলতঃ অনুবাদ—প্রথম খণ্ড মৌলানা জামাল উদ্দীন আফগানীর 'নেচাব ও নেচারিযা' এবং দ্বিতীয় খণ্ড মৌলানা আবদুল হকের 'তফসিরে হক্কানী'র উপক্রমনিকা অংশের অনুবাদ।[১] এসলাম-তত্ত্ব রচনার পূর্ণ গৌরব রেয়াজুদ্দীনের নয়, তাঁব এবং শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন ও অধ্যাপক মেয়রাজুদ্দীন আহমদের যৌথ প্রয়াসের ফল এটি।[২] গ্রন্থখানি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপূর্ণ। খ্রীস্টান পাদ্রী ও ব্রাহ্ম প্রচারকের বিরূপ প্রচারের ফলে ইসলামধর্মের উপর আঘাত এসেছিল। এসব নিন্দা ও অপপ্রচারের উত্তর দেওয়ার মত কোন পত্রিকা তাঁদের ছিল না। মুসলমান সমাজ যাতে ভুল পথে না যায়, পাদ্রী ও ব্রাহ্ম প্রচারকের অপপ্রচার বন্ধ হয় এবং ইসলামের মাহাত্ম্যকথা স্বধর্মের লোকেরা জানতে পারে—এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তাঁরা 'এসলামতত্ত্ব' প্রণয়ন ও প্রচারে মনোনিবেশ করেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে 'ভূমিকা'য় লেখা হয়, "বঙ্গদেশে এসলামধর্মের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎসংশোধন জন্য আমরা এসলামতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ এরূপ একখানি গ্রন্থের আবশ্যকতা মোসলমান মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। আজকাল আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগের মধ্যে 'স্বধর্মে অনাস্থা' একটী উৎকট রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ

১. 'এসলামতত্ত্বে'র (১ খণ্ড) ভূমিকায় কোন কোন ভাষার কি কি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।
এসলামতত্ত্ব (১ খণ্ড), অরুণ যন্ত্র, কলিকাতা, আশ্বিন ১২৯৫ (ভূমিকা)।

২. 'এসলামতত্ত্বে'র (১ খণ্ড) প্রচ্ছদ পটে আছে, "ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত এবং মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিম কর্তৃক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত।"
ঐ, (প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)।

আশা ভরসার একমাত্র অবলম্বন তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন এসলামের অশেষ অমঙ্গলের কারণ। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এসলাম ধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত থাকিলে, তাহারা কদাচ অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইত না। ... এসলাম ধর্মাবলম্বীর অন্য ধর্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধ-বিশ্বাসী লোকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম-ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। ... আমাদের নব্য-শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন পবিত্র এসলামধর্মের 'মূলতত্ত্ব' বিশেষরূপে অবগত হইয়া ধর্ম সম্বন্ধে স্ব স্ব কর্তব্য অবধারণ করেন। ... নিজের ধর্মের কি আছে একবার তাহার তত্ত্বগ্রাহী না হইয়া অন্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা ঘোরতর মূর্খের কার্য্য।"[১] 'নাস্তিকতা', 'এসলাম' ও 'বিশ্বাস' এই তিনটি বিষয় নিয়ে এসলামতত্ত্বের প্রথম খণ্ড রচিত। গ্রন্থখানি মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সমাজের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল তা দ্বিতীয় খণ্ডের 'ভূমিকা' হতে জানা যায়।[২] 'সুধাকরে' এক বিজ্ঞাপনে দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়, "কোরানের অপূর্ব-সৌন্দর্য্য, অনুপম মাহাত্ম্য ও অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহাতে খোদাতালার প্রেরিত শেষ কেতাব, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। খৃস্টান-দিগের ভ্রমান্ধতাও দেখান হইয়াছে, আর কোরান শরীফের পাঁচ প্রধান এলেমের যথাযথ বিবরণ, আয়েতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কোরান মানুষকে যে 'প্রকৃত' মনুষ্যত্বে পরিণত করে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন কোরান শরীফের উপর বিধর্মীগণ যে সকল দোষারোপ করে তাহার সম্পূর্ণ খণ্ডন আছে।"[৩]

রেয়াজুদ্দীন আহমদের ইতিহাসের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তিনি 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে'র ভূমিকায় লিখেছেন, "রূপসার বর্তমান স্বনামখ্যাত জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী সাহেব তখন পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সাহায্যে 'তওজকে জাহাঁগীরি' নামক পারস্য ইতিহাস হইতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করিয়া হুগলীর প্রসিদ্ধ 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিতার্থ পাঠাইতাম। উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ও অনুগ্রহপূর্বক তাহা মুদ্রিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেন। ... রূপসার মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় আমি ছাত্রদিগকে ইতিহাস এবং ভূগোল

১. এসলামতত্ত্ব, (১ খণ্ড), 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
২. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, পৃঃ ২৩৫-৩৬
৩. সুধাকর, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৬

শিক্ষা দিতাম।"[১] 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "বিগত ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে যখন গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ঐ যুদ্ধ বিষয়ক একখানি ইতিহাস লিখিতে আমার একান্ত আগ্রহ জন্মে। তদনুসারে বাঙ্গালা নানা গ্রন্থ এবং সংবাদ পত্রাদির সাহায্যে গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। ... অতঃপর গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কতিপয় উর্দু পুস্তক আনাইয়া, তৎসাহায্যে এই গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ পুস্তক ১ম ভাগ ক্রমশঃ লিখিতে ও মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করি।"[২] তিনি গ্রন্থখানি পিতা 'মুনশী মৌজুদ্দীন আহমদ'কে উৎসর্গ করেন। একই ঘটনাকে আশ্রয় করে তিনি পদ্যে ১২৯৯ থেকে ১৩২১ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে প্রকাশ করেন। এতে 'মুসলমানদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়' থাকত। এছাড়া, প্রতি সংখ্যায় বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্রের সমকালীন ও অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হত। এখানেও তাঁর লক্ষ্যবস্তু এক—ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে স্বজাতির চৈতন্য ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা।

শেখ আবদুস সোবহান

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বড়গাঁও নিবাসী শেখ আবদুস সোবহান 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থ লিখে সুধীসমাজে পরিচিত হন। স্বসমাজের প্রতি তাঁর অসামান্য দরদ, কিন্তু সে তুলনায় তাঁর সংযমবোধের অভাব ছিল। উগ্র সমাজপ্রীতি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হতে পারে না, আবদুস সোবহান নিজ সমাজের দুর্গতির কথা বলতে গিয়ে নিরপেক্ষ মনোভাব রক্ষা করতে পারেননি। মুসলমান জমিদারদের অকর্মন্যতা, বিলাসিতা, নির্বুদ্ধিতা ও অধর্মাচরণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেও হিন্দু আমলাদের ষড়যন্ত্র, চাতুরী, স্বার্থপরতা ও জমিদারী আত্মসাতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে সব মোসলমান জমিদার বিনাশ হইয়াছে, আমরা যত প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছি, মূলে দেখা গিয়াছে, কেবল হিন্দু কর্মচারীদের ধূর্ততা এবং বিশ্বাসঘাতকতাই ইহার বীজ। মিঞা সাহেবদের অদূরদর্শিতায় ও বিলাসীতায় এই বীজ রোপণ করে।"[৩] তাঁর ধারণা হয়েছিল, সরকারী চাকুরীতেও হিন্দু আমলার পক্ষপাতিত্বের জন্য মুসলমানরা বঞ্চিত।[৪]

---

১. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ. ১২ রবিওল আউওল, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯) পৃঃ ।।, (ভূমিকা)।

২. ঐ, পৃঃ ।।৵ (ভূমিকা)।

৩. শেখ আবদোস সোবহান—হিন্দু মোসলমান, ভিক্টরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃঃ ৩-৪

৪. সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালের 'সেন্ট্রাল মহামেডান ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে'র 'স্মারক পত্রে' অনুরূপ অভিযোগ তুলেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

মুসলমানদের দুর্গতির প্রকৃত কারণ ইংরাজদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও শাসন-শিক্ষানীতির পরিবর্তন। হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণী শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করে এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে ব্যবসায়, চাকুরী, মহাজনী, জমিদারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে অগ্রসর হন, মুসলমানরা এর বিপরীত আচরণ করে পিছিয়ে পড়ে। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের উন্নতি-অবনতি, অগ্রগতি পশ্চাৎগতির এটাই প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণ। সেযুগের সরকারী চাকুরীর তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মোট চাকুরীর সিংহভাগ ইউরোপীয়দের দখলে, ভারতীয়দের ভাগ্যে ছিটাফোঁটা অংশ জুটে।[১] অনেক মুসলমান সমাজ-পতির মত আবদুস সোবহানও এই সাধারণ সত্যটি অনুধাবন না করে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য হিন্দু সমাজকে দোষারোপ করেছেন এবং সেই সূত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন। একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী সাব্যস্ত করে তাঁকে আক্রমণ করেছেন (লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্র তখন জীবিত) এবং কংগ্রেসী নেতাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাতে মুসলমানদের যোগদানে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি মুসলমান জমিদারদের কর্মঠ, স্বাবলম্বী ও শিক্ষাব্রতী হতে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষা গ্রহণ, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ দূর করে ঐক্যভাব স্থাপন, সমিতিগঠন ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে সমাজ-উন্নতির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। 'হিন্দু মোসলমান' গ্রন্থের সার বক্তব্য এটাই।

'হিন্দু মোসলমান' প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক প্রকাশকের সাথে প্রথমে বিবাদ ও পরে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। 'সুধাকর' সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'বিজ্ঞাপন' ছাপিয়ে তিনিও মানহানির মামলায় জড়ান।[২] লেখক ভূমিকায় বলে-ছেন যে, তিনি এ সময় আবদুল লতিফের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর সাহায্য লাভ করেন।[৩] লেখকের এরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে আরও সূচীমুখী করে তোলে। এরূপ বিভ্রাটের জন্য গ্রন্থের ২ খণ্ড (১৮৮৮) ও ৩ খণ্ড (১৮৮৯) আগে এবং ১ খণ্ড (১৮৯১) পরে আত্মপ্রকাশ করে। ১ খণ্ডে বাংলায় মোসল-

১. ১৮৭১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের মোট ২১১১ জন কর্মচারীর মধ্যে ইউরোপীয় ১৩৩৮, হিন্দু ৬৮১ ও মুসলমান ৯২ জন। শতকরা হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৪, ৩২ ও ৪। বিনয় ঘোষ—বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ৪ খণ্ড, পৃঃ ২১৮

২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬

৩. হিন্দু মোসলমান, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

মান রাজত্বের কারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় আছে ; ২ খণ্ডের বিষয়বস্তু 'মোসলমান জমিদার', 'হিন্দু আমলা' বৃত্তান্ত ও 'মোসলমান জমিদারদের প্রতি উপদেশ', ৩ খণ্ডে 'গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী হিন্দুদের প্রকৃতি এবং কর্মপ্রার্থী মুসলমানদের দুরবস্থা', 'ন্যাশানাল কংগ্রেসের ভাবী ফল এবং কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দেওয়া উচিত কি না' ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।[১] 'হিন্দু মোসলমানে'র ভূমিকায় গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেন, "আমি কাহাকেও গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখনী হাতে লই নাই। কেবল মোসলমানগণ যে ভবিষ্যৎ চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতেছেন, কর্তব্য কার্য্যে উদাসীন হইতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করাইতে, কর্তব্য পথে অগ্রসর করিতে 'হিন্দু মোসলমান' লিখিলাম, কাজেই কতকগুলি সত্য ঘটনা—উচিত কথা, প্রকাশ করিতে হইয়াছে ... ইহাতে অলীক গল্পের কণামাত্রও নাই,—যাহা লিখিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"[২] তিনি গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীকে উৎসর্গ করেন।

শেখ আবদুস সোবহানের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কলির নারী চরিত্র' (১৮৮০)। এটি কবিতার বই, ঢাকার 'নিউজ প্রেসে' ছাপা হয়। কতিপয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমকালের নারীদের কলঙ্কিত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেছেন যে, পিতামাতাই তাদের কন্যাদের বড় শত্রু। তাদের অসাবধানতার দোষে মেয়েরা অবাধ্য হয় ও বিপথে যায়। লেখক সর্বত্র সুরুচির পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি।[৩]

শেখ আবদুস সোবহানের অপর গ্রন্থের নাম 'আর্যধর্ম' (১ ও ২ খণ্ড, ১৯০৪)। ঢাকার 'বেদব্যাস প্রেসে' এটি ছাপা হয়। 'নবনূরে' 'আর্যধর্মে'র সমালোচনা হয় : "ইহা একখানি ধর্ম-সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ। ... কোনটি প্রকৃত 'আর্য-ধর্ম' তাহার বিনিশ্চয়ার্থ এই গ্রন্থের প্রচার। ... লেখক কেবল হিন্দু, ব্রাহ্ম, য়িহুদী, খ্রীস্ট ও ইসলাম—এই ধর্ম-পঞ্চকের আলোচনা করিয়াছেন। ...এরূপ গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ পাণ্ডিত্য, যেরূপ ধর্মজ্ঞান, যেরূপ গবেষণা, সর্বোপরি যেরূপ নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতার প্রয়োজন, বর্তমান গ্রন্থ-প্রণেতার নিকট তাহার কোন অভাব পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র ধীরতা ও সংযমের অভাবে তিনি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও স্বীয় উদ্দীষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।"[৪] লেখক ইসলামকে প্রকৃত 'আর্যধর্ম' (সমুন্নত অর্থে) নামের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

১. হিন্দু মোসলমান, 'সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য ; সুধাকর, ২৬ মাঘ ১২৯৬
২. হিন্দু মোসলমান, ভূমিকা।
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ চৈত্র, খ., ১৮৮০
৪. নবনূর, ফাল্গুন ১৩১২

আবদুস সোবহান পরবর্তীকালে 'পোলিশ কাহিনী', 'জীবন প্রবাহ', ''বিংশতি বর্ষ', 'আলী নওয়াব জীবনচরিত', 'এলাজল ফোকরো' (১৯২২) নামে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

'ইসলাম-সুহৃদ' (১৯০৬) নামে একটি মাসিকপত্রের সম্পাদনা শেখ আবদুস সোবহানের আর একটি কীর্তি। এটি অনিয়মিত ভাবে এক বছর চালু ছিল।[১]

নওশের আলী খান ইউসফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪)

তিনি টাঙ্গাইলের চারান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে পাকুল্লার জমিদার মীর আতাহার আলীর কন্যার পাণিগ্রহণ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তিনি গ্রামের পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি (১৮৭৭), ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮১) পাশ করে ঢাকা কলেজে বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন, গ্রাজুয়েট ডিগ্রিলাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। ১৮৮৯ সালে পাকুল্লায় সব-রেজিস্টারী অফিস স্থাপিত হলে নওশের আলী খান ইউসফজয়ী সেখানে সব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৯১১ সালে সব-ডেপুটি হন।[২]

নওশের আলী খান ইউসফজয়া স্থানীয় ও অন্যত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিলেন। স্বসমাজে শিক্ষাবিস্তার তাঁর চিন্তা ও কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল। ১৯০৩ সালে রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের এবং ১৯০৫ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন।

তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন কালে সমাজসংস্কার মূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। 'ঢাকা প্রকাশে' তাঁর লেখা ছাপা হত। পরে তিনি ইসলাম প্রচারক, নবনূর, মিহির ও সুধাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন।

নওশের আলী গ্রন্থাকারে প্রবন্ধ, কবিতা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১), 'শৈশব কুসুম' (১৮৯৫), 'দলিল রেজিস্টারি শিক্ষা' (১৮৯৭), 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০১), 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত', 'সাহিত্য প্রভা' (১৯১৪), 'সাহিত্য শিক্ষা' (১৯১৫), 'নোটিস অন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০১) প্রভৃতি তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থ। 'বঙ্গীয় মুসলমান' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। গ্রন্থ-রচনার প্রেরণা ও লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে

১. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১২৩
২. ইব্রাহিম খাঁ—নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বজাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করিয়া অনেক সময় অস্থির হইয়াছি, গভীর নিশীথে একাকী নির্জন-কক্ষে বসিয়া সমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া কত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু দেখিয়াছি, আমার সে অস্থিরতার প্রতি সহানুভূতি এবং আমার সে অশ্রু দর্শনে সকলের চক্ষু হইতে প্রতি অশ্রু বিনির্গত না হইলে কোনই লাভ হইবে না; তাই আজ পাঠক পাঠিকার নিকটে বঙ্গীয় মুসলমান লইয়া উপস্থিত হইলাম। ... যে উদ্দেশ্যে আমি এই বঙ্গীয় মুসলমান লিখিলাম, তাহা শুধু এই গ্রন্থ প্রচারে পূর্ণ হইবে না, তবে যদি অন্যান্য ভ্রাতাগণ সমাজের অবস্থা চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতির উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ যে সমস্ত অভাব রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার এ গ্রন্থ প্রচারের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম, মনে করিব।"[১] নওশের আলী গ্রন্থ-প্রণয়নে সাহায্যকারী বন্ধুদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন, "মুসলমান সমাজের প্রকৃত হিতৈষী নোয়াখালী নিবাসী বর্তমান চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বন্ধুবর মৌলবী আবদুল আজিজ বি.এ, সাহেব এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু সুধাকর পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেবের নিকটে এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।"[২]

তিনি সমকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; ধর্ম, নীতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্গতি ও দুরবস্থা বিদ্যমান। এই অবনতির কবল থেকে সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে-সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ধর্মহীনতা, বিদ্যাহীনতা, দারিদ্র্য এবং কুপ্রথা সমাজ-উন্নতির অন্তরায়। তিনি ধর্মনীতি বহির্ভূত শ্রেণীভেদ প্রথা মানতে চাননি। "মুসলমান ধর্ম জাতি-ভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য স্বীকার করে না, মানসিক সাম্যনীতি শিক্ষা-দানার্থে জগতে ইসলামের আবির্ভাব। ... মুসলমানের জাত্যাভিমান তাহার হৃদয়ের নীচতা প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান এই শ্রেণী বিভাগ তাহাদের বংশানুক্রমিক বিভিন্নতাসূচক, ধর্ম কি সমাজ সম্বন্ধীয় কোন প্রাধান্য নহে।[৩] নওশের আলী বাল্যবিবাহ ও বহু-

১. ইব্রাহিম খাঁ—নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃঃ ।০-।/. (বিজ্ঞাপন)।

২. ঐ, পৃঃ ।/.

৩. ঐ, পৃঃ ৪

বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি 'নব্যধরণের স্ত্রীস্বাধীনতা' চাননি, তবে স্ত্রী-শিক্ষা কামনা করেছেন। "যদিও আমি আজকালের নব্যধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী নই, তথাপি স্ত্রীজাতি যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অধিকার সকল লাভ করিতে পারেন, তাহা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।"[১] "সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে না হইলেও স্ত্রীজাতির হৃদয় শিক্ষালোকে আলোকিত, সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞান সম্পন্ন করিতে নাই—ইহা মনে করা বিষম ভ্রান্তি।"[২] ধর্মের অনৈসলামিক আচরণগুলির বিরোধিতা করে সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শে ধর্ম সংস্কারের কথা বলেছেন। "আমাদের ধর্মগ্রন্থ সকল আরবী ও ফারসী ভাষাতে লিখিত, বঙ্গীয় মুসলমানগণের অধিকাংশের উক্ত ভাষাদ্বয় অধিকার না থাকাতে, ইসলামধর্মের মূলতত্ত্ব সমাজে আশানুরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্যকরূপে প্রচারিত হইলে যে সকল মুসলমান ইসলামতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইত এবং তাহাদের ধর্মজীবনও সমুন্নত হইয়া উঠিত।"[৩] তিনি রাজনীতিকভাবে সচেতন ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধতা করেননি। "আমরা মুসলমান জাতি ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছি—তরবারি ছাড়িয়াছি ; আমাদের বর্তমান অবনত অবস্থায় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ... মুসলমানগণের সহিত যাহাতে ইংরেজদের দিন দিন বন্ধুতা বৃদ্ধি পায়, তাহারা তজ্জন্যে যেন চেষ্টা করে, ইংরেজদের বীরতা, ধীরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎগুণগুলি শিক্ষা করিতে যত্ন করেন।"[৪] নওশের আলীর রাজনৈতিক চিন্তার এটাই মাপকাঠি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন একান্তভাবে কামনা করেছেন : পরস্পরের প্রতি সরলতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার দ্বারা এই সম্মিলন সম্ভব বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫]

---

১. ইব্রাহিম খাঁ—নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ৪৪ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে নওশের আলীর এ ব্যাপারে 'নবনূরে বাদানুবাদ হয়। বেগম রোকেয়ারায়ো' 'আমাদের অবনতি' '(ভাদ্র ১৩১১) প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে নওশের আলী 'একেই কি বলে অবনতি' (কার্তিক ১৩১১) প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, "আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"

২. বঙ্গীয় মুসলমান, পৃঃ ৪৩

৩. ঐ, পৃঃ ৬৮

৪. ঐ, পৃঃ ৫৮

৫. ঐ, পৃঃ ৫৯-৬০

নওশের আলী খান ইউসফজয়ী প্রধানতঃ মধ্যপন্থী ছিলেন, সমাজের কোন গুরুতর পরিবর্তন তাঁর কাম্য ছিল না, তবে দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির স্ফুরণ দেখা যায়।

ইউসফজয়ীকে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে ১২ মার্চ (১৮৯১) রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গীয় মুসলমান' সম্পর্কে বলেন, "...your appeal to the Bengal Mussalmans to effect their own improvement and progress by Social and moral reforms by education and earnest work has ring of true patriotism and enlists my sympathy and admiration."[১] 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় 'বঙ্গীয় মুসলমানে'র সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়: "In the treatise before us the writer examines the conditions of his countrymen in Bengal in their social and political and religious aspects and ascribes much of their drawbacks to want of proper education. His suggestion for their amelioration breath a true spirit of patriotism and eminently worthy of being considered by his co-religionists."[২] পরবর্তী সমালোচনা হয় 'মোসলেম ক্রনিকলে'। "It is a well-written pamphlet on the political and social disintegration of the Mussalmans of Bengal. In a very impressive language the author has shown the decaying process of the aristocratic class of Muhammadans and has statistically proved the gradual decline of cultivating classes into ignorance and impoverished circumstances"[৩] 'নবনূরে' 'বঙ্গীয় মুসলমানে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। "লেখক আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অবস্থার যে চিত্র অাঁকিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানেরই একটু বিশেষভাবে সমালোচনা করা উচিত। আমরা লেখকের সঙ্গে একমত হইয়া বলি, 'বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটী কোটী প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি নরনারী বাস করিতেছে কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের

১. নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'শৈশব-কুসুম' কাব্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত। উক্তপত্র ও বঙ্গীয় মুসলমান সম্পর্কে অন্যান্য সমালোচনার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির জন্য 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

২. *The Indian Mirror*, 3 May 1895

৩. *The Moslem Chronicle*, 7 December 1895

চেতনা বা অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।' ... বিগত সেন্সস রিপোর্টে দেখা গিয়াছে বঙ্গীয় মুসলমান সংখ্যায় প্রায় বঙ্গীয় হিন্দুর কাছাকাছি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কি তাহারা তাহাদের উন্নত প্রতিবেশীর নিকটবর্তী হইবার উপযুক্ত? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত।"[১]

'শৈশব-কুসুম' ও 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর স্বদেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। 'শৈশব-কুসুমে' ১৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "যখন শৈশবের সুখ সরসে ভাসিতেছিলাম, যখন সংসারের এ দুঃখতাপে আমাকে সন্তপ্ত হইতে হয় নাই মানস-কাননে যে কয়েকটি ভাবকুসুম বিকশিত হইয়াছিল আজ তাহা পাঠক-পাঠিকার করকমলে উপহার দিলাম। গোলাপ ও গন্ধরাজের নিকট পলাশ ও শিমূলও স্থান পায়; তাই বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানে এই শৈশব-কুসুম লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইলাম।"[২] কবির মত সমর্থন করে 'নবনূরে' লেখা হয়, "লেখকের শৈশবস্মৃতির সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে আমরা বলিতে বাধ্য তাঁহার কুসুমে পলাশ ও শিমূলের অন্তর্নিহিত মধুর ন্যায় দু'এক ফোঁটা মধুর স্বাদ পাওয়া যায়।"[৩] হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কামনা করে ইউসফজয়ী লিখেছেন,

হিন্দু আর মুসলমান
যেন সবে এক প্রাণ
হেন শুভ দিনে মরি পুলকে পুরিত।
মিলিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত॥[৪] (শিক্ষা বিস্তার)

তিনি কাব্যখানি পিতা 'স্বর্গীয় কাওছার আলি'কে উৎসর্গ করেন।

১৮৯৯ সালে বাংলা সরকার নিম্নশিক্ষা প্রণালীর পুনর্গঠনের জন্য একটা কমিটি করেন। কমিটি ফ্রোবেলের শিক্ষানীতির অনুসরণে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। বাংলা সরকার ১৯০১ সালে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন। ইউসফজয়ী 'উচচ বাঙ্গালা শিক্ষা-বিধি' (১৯০১) পুস্তকে ফ্রোবেলের শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সূচী ছিল 'ফ্রোবেলের

১. নবনূর, ভাদ্র ১৩১০
২. নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—শৈশব-কুসুম, আহমদী প্রেস, টাঙ্গাইল, ১৩০২, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।
৩. নবনূর, ভাদ্র ১৩১১
৪. শৈশব-কুসুম

শিক্ষানীতি, বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষানীতি, ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রণালী, হিন্দু-শিক্ষা প্রণালী, মোসলেম শিক্ষা প্রণালী, উচ্চ প্রাইমারী ও মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা, শিক্ষা ও অধ্যাপন, পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষা দান প্রণালী, নৈতিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধান, ছাত্রদের গুণাবলী, শিক্ষকের গুণাবলী ও কর্তব্য।'[১] তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "The new vernacular Education Scheme is about to usher to a new era in the Vernacular Education. To my mind, it is frought with changes of great moment and will supply a long-felt desideratum of practical education in Vernacular institutions. Loyal to the feelings of sympathy that I have for the Scheme, I have thought it my duty to be of some use for its introduction in Bengal and have thus ventured to present this humble fruit of my labour to the public who, I believe, will condone my shortcoming in considerations of the fact that I had to travel on a path of untrodden before. As to the contempts of the work, I have only to say that I strictly followed the Hints and Suggestions made in the Government. Resolution No. 1 for 1901 and that I have and that I have added exhaustive notes of lessons in Physics and Agricultures and object lessons etc. so that the Vernacular Teachers any profit by them"[২]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)

'পুঁথির কুবের' আবদুল করিম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রচণ্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; পটিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতসহ এন্ট্রান্স পাশ করেন (১৮৯৩) এবং চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। দীর্ঘকাল রোগভোগে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। তিনি জীবিকার সন্ধানে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন পরে

১, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি, ভারত মিহির যন্ত্র, কলিকাতা ১৯০১, 'সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য। 'উচ্চ বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাবিধি' শীর্ষক এর অপর নাম পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পুস্তকটি নেই; ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে শেষোক্ত গ্রন্থ আমি দেখেছি।

২. উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি, ১৯০১

ফৌজদারী আদালতে কেরানী হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কবি নবীনচন্দ্র সেনের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে তিনি কেরানী রূপে যোগদান করেন (১৮৯৮)। আবদুল করিম বিএ. যখন চট্টগ্রাম বিভাগে স্কুল-ইনস্পেক্টর হন তখন তাঁর আশ্রয়ে আবদুল করিম শিক্ষ-বিভাগে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করেন (১৯০৬)। তিনি মাঝখানে সাত বছর (১৮৯৮-১৯০৫) মনোয়ারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আবদুল করিম সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন মননশীল গবেষক। তিনি সুদীর্ঘকাল সাহিত্যের গবেষণা করে কাটিয়েছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র প্রধানতঃ একটি বিশেষ জগতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি হল 'পুথি সাহিত্য'। প্রাচীন যুগের হস্তলিখিত বাংলা ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ, পাঠোদ্ধার ও আলোচনা ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। তিনি প্রায় দুহাজার পুথি সংগ্রহ এবং সেগুলির বহুলাংশের আলোচনা প্রকাশ করে অতীতের বিস্মৃতির অন্ধকারে চাপা-পড়া যুগকে আলোকিত করেন। এক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত তাঁর তুলনা দেওয়া চলে। তিনি কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সদস্য ছিলেন (১৩০৮); পরে পরিষদের সহকারী সভাপতি হন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় তাঁর বহু মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১৩২০-২১) দুটি খণ্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করে।[১] 'সত্যনারায়ণের পুথি' (১৩২২), 'মৃগলুব্ধ' (১৩২২), 'গোরক্ষবিজয়' (১৩২৪) প্রভৃতি গ্রন্থও পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আবদুল করিম পুথির জগৎ কেন বেছে নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "বাঙ্গালার যে যুগে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার উন্মেষ হয়, আমরা সেই যুগেরই উদয় এবং সেই যুগেরই অস্ত-তারা। ...এই যুগে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সেবায় বিভিন্ন ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমিই ছিলাম পাল হইতে পলাতক। ... আমার সহ-কর্মীরা আরবী, ইরানী, তুরানী জাত-ভাইদের কীর্তিকলাপ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু আমি করিয়াছি আমার পাশের বাড়ীর মুসলমানের, আমার দেশের জাত-ভাইদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীর্তিকলাপ সংগ্রহ। আমি সোজা কথায় ইহাই বুঝি, আমার দেশের জাত-ভাইরা দেশের ভাষার জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহাই

১. মুহম্মদ এনামুল হক (ডক্টর) ও কবীর চৌধুরী (সম্পাদিত)—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

যদি জানিতে না পারিলাম, তবে পরের দেশের ও বিদেশীয় ভাইদের কথা জানিয়া কি হইবে?"[১] আবদুল করিম সেযুগের অধিকাংশ মুসলমান লেখকের মত প্যান ইসলামী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হননি, এ উক্তির মধ্যে তার সাক্ষর আছে। তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদী মনোভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাও এখানে স্পষ্ট। তিনি ঐ সময় আবির্ভূত না হলে মুসলমানদের গবেষণার দিকটি অপূর্ণ থেকে যেত।

হুগলীর 'পূর্ণিমা' (১৩০২) পত্রিকায় আবদুল করিমের লেখা ছাপা হয়। তখন থেকে পরবর্তীকালে তিনি আলো, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বীরভূমি, আশা, ভারত-সুহৃদ, ইসলাম প্রচারক, জ্যোতিঃ, কোহিনূর, নবনূর, প্রদীপ, প্রকৃতি অবসর, নববিকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি প্রাচীন পুথির উপর আলোকপাত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আটশত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২] সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তাশীল মৌলিক প্রবন্ধও তাঁর আছে। বিশেষতঃ 'মাতৃভাষা' ও 'জাতীয় সাহিত্য' নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, আবদুল করিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বাংলা, এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল ও অনমনীয় ছিলেন। ইসলাম প্রচারকে 'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের কোন কোন বিজ্ঞ বকধার্মিক স্বজাতি হিতৈষী ভ্রাতৃগণ বঙ্গভাষার পরিবর্তে ভাষান্তরকেই সজাতীয় ভাষার স্থানীয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, দেখিতেছি। ... কোন অধঃপতিত সমাজের বা জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে তবে তাহা জাতীয় ভাষার সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। বঙ্গভাষা ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও ত্যাগ করিতে হইবে।"[৩]

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা কোনটাই সহজ সাধ্য ছিল না। সাপুড়ে যেমন সাপের গন্ধ পায় এবং সেটি না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না, আবদুল করিম তেমনি পুথির গন্ধ পেতেন এবং তা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন, "তিনি (আবদুল করিম) মুসলমান, কোন কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুঁথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাহার দ্বারে গিয়া পুঁথি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুঁথি

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ, পৃঃ ৪১
২. ঐ, পৃঃ ১৯৯
৩. ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ ১৩১০

সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়; অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি মিনতিতে নরম হইয়া নিজে পুঁথি খুলিয়া উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন, মুন্সী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্ত স্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া মোট করিয়া সেই সব পুঁথির বিবরণ লিখিয়ে আনিয়াছেন।"[১] 'যোগ কালন্দর' কাব্যে রাধাকৃষ্ণের রূপকে সুফীতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। আবদুল করিম সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ 'ইসলাম প্রচারকে' (শ্রাবণ ১৩১০) প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধের পাদটীকায় সম্পাদক নিজ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলেন, "ধর্ম সম্বন্ধীয় মতামত প্রকাশে লেখককে একটু ধীর ভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। কারণ ইহা অতি কঠিন ও গুরুতর বিষয়।"[২] পুথি সম্পাদনার কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। 'রাধিকার মানভঙ্গ' (১৯০১) নামক প্রাচীন কাব্যের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, "... তিনি (আবদুল করিম) এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদনকার্যে যেরূপ পরিশ্রম যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা, যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় যেন কোন 'জর্মান এডিটর' এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।"[৩] প্রাচীন পুথির বিবরণে'র কতকাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১৩০৭, ১৩১০ অতিরিক্ত, ১৩১২ অতিরিক্ত, ১৩১৮)। পত্রিকা-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূমিকায় বলেন, "সঙ্কলনকর্তার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বাঙ্গালা-সাহিত্য-অনুরাগ, ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। ... হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে।"[৪] উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন পুথি সাহিত্যের সাথে সাথে বাংলা লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও আলোচনা তিনি করেছেন।[৫] এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন।

১. 'বাঙ্গালী প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফীকৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২. ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ ১৩১০
৩. 'রাধিকার মানভঙ্গে'র ভূমিকা' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত) দ্রষ্টব্য।
৪. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১০ (অতিরিক্ত সংখ্যা)
৫. 'বাঙ্গালার গ্রাম্যগীত' (আশা, ভাদ্র-আশ্বিন, পৌষ ১৩০৮), 'চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া' (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০১), 'ছেলে-ঠকান ধাঁধাঁ' (ঐ, মাঘ-চৈত্র ২৩১২), স্বর্ণরেণু (নবনুর, আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১০, আশ্বিন ১৩১১) ইত্যাদি।

পুথি সম্পাদনাসহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ইতিহাস বিষয়ক তাঁর পনের-খানি গ্রন্থ আছে। 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (১৯০৪) 'ইসলামাবাদ' (১৯১৮) তাঁর একক প্রচেষ্টায় রচিত মৌলিক গ্রন্থ। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৩৫) আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল হক যুগ্মভাবে রচনা করেন। 'ইসলাম ইতিবৃত্তে'র পরিচয় দিয়ে 'নবনূর' এটিকে 'উপাদেয় ও মূল্যবান' বলে মন্তব্য করে।[1]

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০)

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার গাঁড়াডোর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মক্তবে, পরে পাঠশালায় ও ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে নর্মাল স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের প্ররোচনায় খ্রীস্টধর্ম দীক্ষা নেন (১৮৮৭)। তখন তাঁর নাম হয় জন জমিরুদ্দীন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে এলাহাবাদে যান। এলাহাবাদে সেন্ট পলস ডিভি-নিটি কলেজ থেকে 'হাইয়ার গ্রেড অব রিডার' বা 'পাঠকরত্ন' ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা শেষে তিনি খ্রীস্টধর্ম প্রচার কাজে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে প্রচারকার্য চালাবার সময় তিনি কোরান ও ইসলামের বিরোধিতা করে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' (জুন ১৮৯২) পত্রিকায় 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ইসলামী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে জন জমিরুদ্দীনের অভিযোগের জবাব দেন।[2] জমিরু-দ্দীনের ক্রমে ভাবান্তর আসে এবং নতুন ও পুরাতন বাইবেলের পরস্পর-বিরোধী তথ্যে খ্রীস্টধর্মে আস্থা হারিয়ে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জন জমিরুদ্দীন শেখ জমিরুদ্দীন নাম গ্রহণ করে গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করেন। মুনশী মেহেরুল্লা তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচার কাজে উৎসাহিত করেন এবং ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা দানে সঙ্গী করেন। শেখ জমিরুদ্দীন শিক্ষকতা ছেড়ে বাকী জীবন ইসলাম প্রচারে ব্যয় করেন। ধর্ম-প্রচার ও বক্তৃতার উদ্দেশ্যে বাংলার প্রায় সব জেলায় ভ্রমণ করেন এবং বিপথগামী মানুষকে 'দীন-ই এলাহি'র পথে ফিরিয়ে আনেন। তিনি বহু সংখ্যক অমুসলমানকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। ধর্মের সঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও রাজনীতিকেও তিনি প্রচারের বিষয় করেন। বঙ্গীয়

১. নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
২. সুধাকর, ২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০

রাজনীতির ক্ষেত্রে শেখ জমিরুদ্দীন শাসক ইংরাজদের সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে স্বরাজ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমন কি, বলকান যুদ্ধে মুসলমানগণ তুরস্কের পক্ষ নিয়ে ইংরাজদের দোষারোপ করলে জমিরুদ্দীন সেটি মানেননি। তাঁর এই অবিচল রাজভক্তি ও তদ্‌গত চিন্তার জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে একাধিকবার প্রশংসা-পত্র পেয়েছিলেন।[১] রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মিশনারীদের নিন্দা, কিন্তু শাসকদের স্তুতি করেছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারে শেখ জমিরুদ্দীন দ্বিমুখী অভিযান চালান—বক্তৃতা দান ও পুস্তক প্রবন্ধ প্রণয়ন। অন্যের আঘাত-আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা, ইসলামের মহিমা প্রচার করা, অবিশ্বাসীদের ইসলামে দীক্ষা দেওয়া, ধর্মবোধে মুসলমানদের জাগ্রত করা—এক কথায় ইসলামীকরণ এবং তদ্দ্বারা সমাজের পুনর্জাগরণ—এই ছিল শেখ জমিরুদ্দীনের মুখ্য ব্রত।

শেখ জমিরুদ্দীনের প্রথম গ্রন্থ 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) মুনশী মেহেরুল্লার প্রেরণায় এটি লেখা হয় এবং তাঁরই অর্থানুকূল্যে ছাপা হয়।[২] বাল্যজীবন শিক্ষা, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ ও প্রচার, ইসলামে পুনঃদীক্ষা এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় তাঁর আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে। মুসলমান রচিত বাংলা আত্মজীবনী হিসাবে এটি দ্বিতীয়, প্রথম গ্রন্থ আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী প্রণীত 'জীবনচরিত' (১৮৮৯)। 'রদ্দে খৃষ্টান' নামে একটি গ্রন্থ-সিরিজে মোট ৯ খানি পুস্তক-পুস্তিকা ছাপা হয়। এগুলির নাম নিম্নরূপ :

হজরত ইসা কে? (১ আশ্বিন, ১৩০৬)
ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য
(২০ শ্রাবণ ১৩০৭)
ইসলামী বক্তৃতা (মাঘ ১৩১৪)
রদ্দে সত্যধর্ম নিরূপণ ও হেদায়তুল ইসলাম
রদ্দে নাসারা ও আখলাকে জমিরিয়া
ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য
(শ্রাবণ ১৩১২)

---

১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—মুনশী জমিরুদ্দিন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা. মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬
২. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, ননুপূর্ণ প্রেস, যশোর, ১৩০৪

পাদ্রি মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন (১৩৩৪)
গ্লোরি অব ইসলাম (১৩৩৫)
মাসুম মোস্তফা (দঃ) (পৌষ ১৩৩৫)

এগুলির মধ্যে 'রদ্দে নাসারা ও আখলাকে জমিরিয়া' জমিরুদ্দীনের জীবনকথার ভিত্তিতে মনিরুদ্দীন আহমদ রচনা করেন। 'ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' জমিরুদ্দীনকৃত সংকলন গ্রন্থ—এতে কৃষ্ণকুমার মিত্র, গিরিশচন্দ্র শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেন, ধর্মানন্দ মহাভারতী, মহেন্দ্রনাথ বসু, টমাস কার্লাইল, টমাস আর্নল্ড, ম্যাক্সমুলার ও জন ডেভিট পোর্টের প্রবন্ধ আছে। 'গ্লোরি অব ইসলামে'র 'ফ্রম ক্রিশ্চিয়ানিটি টু ইসলাম' প্রবন্ধ জমিরুদ্দীনের লেখা, বাকী চারটি অন্যের রচনা, বিভিন্ন ইংরাজী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।'[১]

'রদ্দে খৃষ্টান' সিরিজের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি শেখ জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা। 'হজরত ঈসা কে?' গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন, "জেলা বাঁদা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইউনিটোরিয়ান মিশনারী পাদরী আকবর মসীহ সাহেব প্রণীত 'উলুহতে মসীহ' নামক সুবিখ্যাত উর্দু পুস্তক অবলম্বন করিয়া 'হজরত ঈসা কে' লিখিত হইল। ইউনিটোরিয়ান খৃষ্টান মণ্ডলী ব্যতীত প্রায় সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজ হজরত ঈসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি খোদা কিনা, এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; কারণ যদি তিনি খোদা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উপাসনা করা আমাদের কর্তব্য। আর যদি তিনি খোদা না হন, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের উপাসনা না করা কর্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে না জানিয়া হজরত ঈসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ... হজরত ঈসা কে? অর্থাৎ তিনি খোদা কি বান্দা এই বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক লিখিতে যশোহর, হাতিয়ান তলা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অনুরোধের বশবর্তী হইয়া 'হজরত ঈসা কে' জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা একটি ঈসা-পূজকের মনও একেশ্বরে আইসে, তাহা হইলে আমার যাবতীয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।"[২]

'ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদের মন্তব্য' গ্রন্থ-সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "বহুকাল হইতে হিন্দু ও খৃষ্টানেরা মোসল-

১. দ্রষ্টব্য: মৌলবী জমিরুদ্দীন—গ্লোরি অব ইসলাম, পাড়াডোব, নদীয়া, ১৯২৯
২. শেখ জমিরুদ্দীন—হজরত ঈসা কে? ১৩০৬

মান ধর্মকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, কয়েকজন হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান পণ্ডিত মোসলমান ধর্ম আলোচনা করিয়া 'ইসলামের সভ্যতা' সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আজকাল বিধর্মী মোসলমান ধর্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল বহুমূল্য মন্তব্য নানা গ্রন্থে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমি আমার সহকর্মী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক ... মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ও কতিপয় মোসলমান ধর্মবন্ধুব সেই সকল মন্তব্য নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ ও প্রচার করিলাম।"[১]

'রদ্দে খৃষ্টান' পুস্তকমালা ছাড়াও তিনি 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন' (১৩১৬), 'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলে পেশ খবর', 'আসল বাইবেল কোথায়?' (১৩২৭) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি একই উদ্দেশ্যে 'ইসলাম-প্রচারক', 'সুধাকর', মিহির ও সুধাকর', 'নবনূর' 'কোহিনূর' 'ইসলাম দর্শন', 'বঙ্গনুর' শরিয়ত' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখনি চালনা করেছেন। 'ইসলাম প্রচারকে' (১৮৯৯–১৯০৫) সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন—যথা বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে', 'প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে', 'বাইবেলে বহুবিবাহ' 'বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা', 'প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে', 'টমাস কার্লাইল ও ইসলাম', 'ফারাক্লিত', 'ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা', 'হজরত মহম্মদের (দঃ) সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য, 'বার্ণবার ইঞ্জিল', 'বাইবেলের পরিবর্তন' ইত্যাদি। এগুলির অধিকাংশ 'রদ্দে খ্রীষ্টান' গ্রন্থমালার পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধ ও পুস্তকের নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম, কোরান, মহম্মদ সম্পর্কে খ্রীষ্টান পাদরী ও পণ্ডিতদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এগুলি রচিত হয়েছে। এগুলিতে প্রতিবাদ ও প্রতি-আক্রমণ দুই আছে।

মুনশী মেহেরুল্লার মৃত্যুর দু'বছর পরে জমিরুদ্দীন 'মেহের-চরিত' (১৯০৯) প্রকাশ করেন। এতে মেহেরুল্লার ব্যক্তিগত জীবন এবং তৎসঙ্গে তাঁরা দু'জনে ইসলাম প্রচারে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২]

শেখ জমিরুদ্দীন 'পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ' (১৮৯৭), 'বিশুদ্ধ খতনামা' (১৯০৩) এবং 'নামাজ পড়া শিক্ষা' নামে তিনখানি শিক্ষামূলক গ্রন্থ লিখেন। প্রথমটি বাক্যগঠন সংক্রান্ত ব্যাকরণ, দ্বিতীয়টি 'মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ' শিক্ষা এবং তৃতীয়টি ইসলাম ধর্মের আচরণবিধি শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। কারবালার যুদ্ধ নিয়ে লেখেন 'জঙ্গে কারবালা' (১৯০৪)। এটি ২৮ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[৩]

---

১. শেখ জমিরুদ্দীন (সংকলিত)—ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য, ১৩০৭
২. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—মেহের চরিত, কলিকাতা, ১৯০৯
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ চৈত্র, খ., ১৯০৪

'কোথা চলে গেলে' (১৯০২) দুটি কবিতার সংকলন: মাতা ও স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা দুটি রচিত। এ দুটি কবিতা ও অন্যান্য শোকমূলক কবিতা নিয়ে তাঁর 'শোকানল' (১৯০৮) কাব্য প্রকাশিত হয়। মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, মুনশী মেহেরুল্লা ও তাঁর নিজের লেখা গজলের একটি সংকলন 'আসল বাঙ্গালা গজল' (১৯০৮) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

শেখ জমিরুদ্দীনের ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি ছিল। লেখনিশক্তিকে প্রচার-কার্যে ব্যবহার করায় তাঁর দ্বারা উন্নতমানের রচনা লেখা সম্ভব হয়নি। সাহিত্যের মানদণ্ডে এগুলি কোনটাই টিকে না। সম্ভবতঃ তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা ছিল না। প্রচার উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর লেখাগুলি প্রচার-কার্যে সফলতা লাভ করে। তিনি বিদ্বৎসমাজ থেকে 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'কাব্যনিধি' উপাধি পান।[১]

মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭)

মতীয়র রহমান খান ঢাকার মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মফিজুর রহমান চট্টগ্রামের মুন্সেফ ছিলেন। মতীয়র রহমান এন্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সোহরাওয়ার্দী ইংরাজীতে কবিতা লিখতেন, মতীয়র রহমান তার বাংলা অনুবাদ করতেন। বিএ পাশ করার আগেই তিনি দিনাজপুরের শিবগঞ্জ মধ্য-ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। এর পর কলিকাতা লায়েক জুবিলী স্কুলে ও কলিকাতা মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি দিল্লীর মুখলিসিয়া একাডেমীতেও শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯০৭ সালে সেটলমেন্ট কানুনগো নিযুক্ত হন।

মতীয়র রহমানের কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা আছে। 'মোসলেম বধ', 'সোহরার বধ', 'দিল্লী গাথা' প্রভৃতি কবিতা, 'যমুনা', 'নব-কুমুদ', 'মোক্ষপ্রাপ্তি' প্রভৃতি উপন্যাস, 'প্রবাসের স্মৃতি', 'আগ্রাকাহিনী' ভ্রমণবৃত্তান্ত, 'গূঢ়তত্ত্ব', 'গুপ্তসভা', 'নগাপ্রভু' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। 'যমুনা' উপন্যাস অংশতঃ 'মিহির ও সুধাকরে' (১৮৯৯) এবং অংশতঃ 'ইসলাম প্রচারকে' (১৯০৪) প্রকাশিত হয়। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—আহমদ শাহ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রের বিশ্বাস রাও-এর কন্যা যমুনার প্রণয় কাহিনী এর বিষয়বস্তু। 'নব-কুমুদ' 'প্রচারকে' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। 'মোক্ষপ্রাপ্তি' 'মিহির ও সুধাকরে' (১৯০২-০৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৮ (২সং)

হয়। 'নবনূরে' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসের স্মৃতি' (১৩১১) এবং 'আগ্রার কাহিনী' (১৩১২)। এগুলিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। ব্যঙ্গরচনায় তিনি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমালোচনা করেন।

শিল্পের দিক থেকে মতীয়র রহমানের রচনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে তাঁর রচনা উদ্দেশ্যহীনও নয়। 'যমুনা' উপন্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিবাদ স্বরূপ রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসে শিল্পধর্ম ও উদ্দেশ্যধর্ম দুই সার্থক ভাবে ফুটেছে, মতীয়র রহমান কোনটাই রক্ষা করতে পারেননি।

মতীয়র রহমান এক পর্যায়ে 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদনা করেন।[১]

শেখ ওসমান আলী (১৮৭২-১৯৫২)

শেখ ওসমান আলীর পেশা ছিল আইন ব্যবসায়—তিনি মেদিনীপুর জজ-কোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। তিনি পরে মুন্সেফ ও সব-জজ হন। ওসমান আলী ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯৬ সালে সিটি কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। মেদিনীপুর তাঁর জন্মভূমি, তিনি শহরের বড় বাজার এলাকায় থাকতেন।[২] 'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি'র তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি উৎসাহী তরুণ কর্মী হিসাবে সে-সময় খ্যাতি অর্জন করেন।

একজন কবি ও গদ্য-লেখক হিসাবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। 'হাফেজ সাহেব' (১৯০০), 'দেবলা' (১৯০১), অলোক সভা' (১৯০৪) এবং লালচাঁদ (১৯১২) এই চারখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'দেবলা' সর্বোৎকৃষ্ট। কাব্যকাহিনীর উৎস সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' বলেছেন, "মি. রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. মহোদয় প্রণীত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আলাউদ্দীন বাদশাহের রাজত্বকালের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে, গুজরাটের রাণী কমলা

১. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪১১-১৩; আবদুল কাদির-মতীয়র রহমান খানের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

২. শেখ ওসমান আলীর 'দেবলা' কাব্যের 'মুখবন্ধে' কবির নামের পাশে 'চুয়াডাঙ্গা নদীয়া' ঠিকানা দেখে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান অনুমান করেছেন যে, শেখ ওসমান আলী 'সম্ভবতঃ চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা' ছিলেন। (আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য ও মুসলিম-সাধনা) কিন্তু তথ্যটি ভুল। ওসমান আলী সরকারী চাকরী উপলক্ষে সেখানে অবস্থান করতেন (১৯০১)। বিক্রমপুর, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) প্রভৃতি স্থানেও তিনি বদলী হন।

দেবী ও তদীয় দুহিতা দেবলা দেবীর মনোহর আখ্যান অবগত হই। ... ইহাতে ইতিহাসে উল্লিখিত প্রকৃতি ঘটনাবলী যথাসাধ্য সন্নিবেশিত করিয়াছি, অনৈতিহাসিক অমূলক ঘটনা বিবৃত করিবার চেষ্টা করি নাই।'[১] কাব্য লেখার পাঁচ বছর পর এটি মুদ্রিত হয়। কাব্যের সংশোধনে ও প্রকাশনায় শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মেল হক তাঁকে সাহায্য করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তের শতকের কবি আমীর খসরু ঐ বিষয় নিয়ে 'খিজির খান ও দেবলরাণী' নামে ফারসী কাব্য লেখেন। আমীর খসরুর কাব্য বিয়োগান্তক—খিজির খান ও দেবলরাণীর প্রণয় কারাগারে বন্দীদশা ও উভয়ের মৃত্যু পযন্ত কাহিনী বিস্তৃত। ওসমান আলীর 'দেবলা' কাব্য মিলনাত্মক—খিজির খান ও দেবলাদেবীর প্রণয় ও পরিণয় দেখিয়ে তিনি শেষ করেছেন। ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। তখন মুসলমান সমাজের উন্মেষের কাল। সমাজের মানুষের কাছে আশার সঞ্চার করেই ওসমান আলী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গৌরবময় কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন। সেযুগের শিক্ষিত নব্য যুবকদের ভাবানুভূতিকেই তিনি বাণীমূর্তি দিয়েছেন।

'মিহির ও সুধাকরে' দেবলার প্রথম সমালোচনা হয়। "ঐতিহাসিক কাব্য বেদলা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি হইয়াছি। ... গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও উহার রচনা-চাতুর্য, ভাষার গাম্ভীর্য এবং শব্দবিন্যাসের মাধুর্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। ... গ্রন্থকারের স্বভাববর্ণন পাঠ করিলে শত মুখে তাঁহার সর্ববিষয়িনী কল্পনার প্রশংসা করিতে হয়। এমন মনোমুগ্ধকর স্বভাবোক্তি তাঁহার তীক্ষ্ণধী এবং সুপার্জিত মস্তিষ্কের পরিচায়ক।"[২] দেবলার দ্বিতীয় সমালোচনা হয় 'নব্য ভারতে'। "বাঙ্গালার জনসংখ্যার প্রধানতঃ দুই অংশ—হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই অঙ্গের সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। বড়ই সুখের বিষয়। শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুগণ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইতেছেন। লেখকের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইলাম।"[৩] দেবলার অপর সমালোচনা হয় 'সময়' পত্রিকায়। "এই কাব্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল ও ওজোগুণ বিশিষ্ট। শিক্ষিত মুসলমান কেন, একজন হিন্দু বাঙ্গালীর পক্ষেও এরূপ রচনা প্রশংসনীয়। লেখা পাঠ করিয়া জানা গেল মৌলবী সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ শিক্ষিত।"[৪]

১. (শেখ) ওসমান আলী—দেবলা, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।
২. মিহির ও সুধাকর, ২৯ কার্তিক ১৩০৮
৩. নব্য ভারত, চৈত্র ১৩০৮
৪. আলোক সভা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত। পৃ: (২)

তাঁর 'অলোক সভা' গীতিকাব্য। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি এক এক প্রহরের প্রকৃতির দৃশ্যপট বর্ণনা করে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রহস্য এবং এবং প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সম্পর্ক সূত্র নির্ণয় করেছেন। তিনি কাব্যের 'পূর্বভাষে' বলেছেন, "... আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রা ধীরে আসিয়া চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর আমি যাহা দর্শন করিলাম তাহা অপূর্ব ও অলৌকিক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।"[১]

স্বপ্নাভিভূত আবেগানুরঞ্জনে রোমান্টিকতার বর্ণসম্পাত ঘটেছে এই কাব্যে। 'নবনূরে' অলোকসভার সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "মৌলভী সাহেব (ওসমান আলী) গুরুভার রাজকার্য্যের বোঝা মাথায় লইয়াও সাহিত্যচর্চার অবসর পান, ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার কথা বটে। ... সমালোচ্য কাব্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল। ইহার স্থানে স্থানে লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।"[২]

শেখ ওসমান আলীর 'হাফেজ সাহেব' পারিবারিক উপন্যাস এবং 'লালচাঁদ' ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য।

'ইসলাম-প্রচারক', 'হাফেজ', 'নবনূর', 'মিহির ও সুধাকর', 'কোহিনূর' প্রভৃতি সেযুগের প্রধান পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কথা তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল। তাঁর আলোচনা স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। একজন মননশীল লেখক হিসাবে তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কামনা করেছেন সত্য, কিন্তু মৌলিকভাবে স্বসমাজের স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন।

আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-১৯৫৪)

আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাশ করে (১৮৯৪) শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত হন। তিনি এক সময় নোয়াখালী জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'ভ্রাতৃবিলাপ' (১৯০৩)। ৩২ পৃষ্ঠার এই কাব্যে ভ্রাতার মৃত্যু জনিত শোক ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রেরণা ও উৎস সম্বন্ধে কবির নিজস্ব বক্তব্য: "কোন সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারিয়াছি যে, কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মনে আঘাত প্রাপ্তে বা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তনে কোন কোন অতীত কবি-বৃন্দের কবিত্বশক্তি

১. আলোকসভা, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ।/০ (পূর্বাভাষ)
২. নবনূর, ভাদ্র ১৩১১

প্রকাশ পাইয়াছিল। ভ্রাতৃবিয়োগে আমারও কাব্যোচ্ছাস। তাই মাতৃভাষার সেবা আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষার্থে ভ্রাতৃবিলাপ প্রকাশ।"[১] তিনি আরও বলেছেন, "মেঘনাদবধে'র কয়েকস্থলের মাধুর্য্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা অনুকরণ করিয়াছি।"[২] সুতরাং মধুসূদন ছিলেন তাঁর কাব্য-গুরু। ভ্রাতৃবিলাপ প্রকাশের পর পরই পত্রপত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়। 'নবনূরে'র আক্রমণ তীব্র ছিল। পত্রিকার ভাষায়, "এখানি কাব্য। মহাকাব্য কিনা কোথাও লেখা নাই। ইহাতে ভূমিকা ও উৎসর্গপত্র আছে, খণ্ড ও সর্গ আছে। ইহাতে সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ আছে, স্বর্গীয় মাইকেলের পিণ্ডের যোগাড় আছে। ... ইহাতে কান্না-কুসুম আছে, 'পাঠ্য-সখা' আছে, 'শুভক্ষণে জন্মা' আছে। 'অশ্রুবারি' যে ঢের আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ... এই গ্রন্থখানি পেডাণ্ট্রির একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকারের কতকটা শক্তি আছে কিন্তু তাহার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধনা ও সংযম অভ্যাস করিয়া তিনি দশের একজন হইতে পারিতেন।"[৩] 'বঙ্গবাসী'তে নিন্দা-প্রশংসা দুই আছে। "ভ্রার্তৃবিয়োগে গ্রন্থকারের এই কাব্যোচ্ছাস। ইহাতে আমাদের সমবেদনা আছে। ... মুসলমান গ্রন্থকার বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা খুশী। কিন্তু তাঁহার 'কোলয়', 'পরিনিলে' প্রভৃতি ক্রিয়া প্রয়োগে আমরা খুশী হইতে পারি না"।[৪] 'ইসলাম-প্রচারক' কাব্যের ত্রুটির কথা বলেও কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করে। "... যাহা হউক আমরা এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকারের ভ্রাতৃবৎসলতা প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক চেষ্টা করিলে কালে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।"[৫]

হামিদ আলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৫) কাব্যখানি চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন 'স্কুলসমূহের ইনসপেক্টর' আবদুল করিম বিএ সাহেবের নামে উৎসর্গ করা হয়।[৬] তিনি কাব্যের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'ভূমিকা'য় লিখেছেন, "১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের 'মিহির ও সুধাকরে' বাবু দীনেশচন্দ্র

১. 'কাসেমবধ কাব্যে'র 'ভূমিকা' (পৃঃ।০) দ্রষ্টব্য
২. ঐ, ভূমিকা
৩. নবনূর, মাঘ ১৩১০
৪. বঙ্গবাসী, ১৮ পৌষ ১৩১০
৫. ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩
৬. 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য

সেনের 'মাতৃভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—মুসলমান হিন্দু সাহিত্যপাঠে—হিন্দু আচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে; তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিত নহে। ১৩১০ সালের (কার্তিক) 'ভারতী'তে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয় 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা' নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্যে বর্জন করিতে পারি না ... পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সময়ে মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় আসিয়াছে। ...প্রকৃতপক্ষে মহানুভব হিন্দুভ্রাতৃবর্গের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মুসলমান পাঠক, মুসলমান বালক চিরকাল তাহাদের গ্লানিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ব্যথিত হউক, আর মনে মনে গ্রন্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত করুক। তাই তাঁহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িতে পরামর্শ দিতেছেন। আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, মুসলমান গ্রাজুয়েটদিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান-পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন ও সে বিষয়ে তাঁহাদের উদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। নতুবা আমার মত দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।"[১]

'কাসেমবধ কাব্যে'র উৎস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: "রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত। 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্তসংহারে'র মত এই কাব্যের উপকরণ পূর্ব হইতে সংগৃহীত ছিল না। মহররম-ঘটনা আরও অনেকে লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছি। কাব্য রসাস্বাদী সুধীমণ্ডলী ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না, কাব্যের পথ নিষ্কণ্টক।"[২]

কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' রচিত, হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব'ও তাই। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আঙ্গিক তাঁর আদর্শ। তবে মধুসূদনের মত মনের গঠন, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, ভূয়োদর্শন চিন্তাশক্তি হামিদ আলীর ছিল না। সুতরাং তাঁর রচনায় মহাকাব্যের

১. আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী—কাসেম বধ কাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২, পৃ: ৶৵৹ (ভূমিকা)

২. কাসেমবধ কাব্য পৃ: ।৶০ (ভূমিকা)

শিল্পাস্বাদন প্রস্ফুটিত হয়নি। আবেগসর্বস্ব রচনায় মহাকাব্যের রসস্ফূর্তি ঘটে না। বিষাদ-করুণ একটি জনপ্রিয় কাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে শিল্পরূপ দিয়েছেন, এটাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। 'ভ্রাতৃবিলাপে' ভাষার যে দুর্বলতা, এখানে তা অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে, চরিত্রচিত্রণেও তাঁর কৃতিত্ব আছে। কোন কোন বর্ণনা মর্মস্পর্শী হয়েছে।

সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'কাসেমবধ কাব্যে'র একাধিক সমালোচনা হয়। 'এডুকেশন গেজেট' কবির ভাষার প্রশংসা করে। "ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিয়া পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বঙ্গীয় মুসলমান কবি প্রকৃতই বাঙ্গালার সুসন্তান।"[১] 'নবনূর' বিভিন্ন দোষ-গুণের উল্লেখ করে শেষে মন্তব্য করে, "আমরা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পারি যে, যেখানে যেখানে তিনি সংযতভাবে ও বিনা উল্লম্ফনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার সহজ বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্ব-শক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।"[২] 'মিহির ও সুধাকরে' মোহাম্মদ মিনুত আলী 'কাসেমবধ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি কাব্যের দোষ-গুণের উল্লেখ করে এক জাগায় মন্তব্য করেন, "প্রাচীন কার্বালার সেই বীরত্বের করুণ রসপূর্ণ কাহিনী বঙ্গীয় মুসলমান কবি আজ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কীর্তন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কারস্বরূপ হইল, একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়।"[৩] চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার বক্তব্য: "কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; গ্রন্থকার ভূমিকায় আভাস দিয়াছেন যে মোসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়া আবশ্যক। এইজন্য গ্রন্থকারের চেষ্টা প্রশংসনীয়।"[৪] ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মোসলেম ক্রনিকলে' দীর্ঘ সমালোচনা বের হয়। পত্রিকায় প্রশংসার ভাগই বেশী আছে।[৫] 'সোলতান'ও অনুরূপ প্রশংসা করে— "কবির বর্ণনা প্রণালী মোটের উপর বেশ হইয়াছে। ...তাঁহার যেরূপ কল্পনা ও রচনা শক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা আশা করা যায়, কবি কালক্রমে একজন সাহিত্য সমাজের বিশেষ সম্মানিত মেম্বর মধ্যে গণ্য হইবেন।"[৬]

কবিকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পত্রে (২০ নভেম্বর ১৯০৮) নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, "আপনার রচিত কবিতাকুঞ্জ ও কাসেমবধ কাব্য আমি রোগশয্যায় পড়িয়া

১. এডুকেশন গেজেট, ৯ ভাদ্র ১৩১২
২. নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১২
৩. মিহির ও সুধাকর, ২০ মাঘ ১৩১২
৪. জ্যোতিঃ, ২৪ ফাল্গুন ১৩১২
৫. দি মোসলেম ক্রনিকল, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৫, 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য
৬. সোলতান, এপ্রিল ১৯০৬

পরম প্রীতিলাভ করিলাম এবং আমাকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। বঙ্গভাষা উভয় হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষা। অতএব কতিপয় মুসলমান ভ্রাতারা বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের অশেষ উপকার করিতেছেন। সমস্ত দেশ তাঁহাদের কাছে ঋণী। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ মাতৃভক্তি আমি অন্ধকার আকাশে শশাঙ্করেখার মত মনে করি। ---আপনার রচনা প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। নতুন লেখকের যেমন হইয়া থাকে, যদিও স্থানে স্থানে ছন্দপতনে ও শব্দবিন্যাসে কিঞ্চিৎ অসাবধানতা দৃষ্ট হয় তথাপি ভাষা সুন্দর ও সুমধুর। আশা করি, আপনি অনুশীলনের দ্বারা সময়ে বঙ্গদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হইবেন।"[১]

'কবিতাকুঞ্জ' (১৯০৫) হামিদ আলীর তৃতীয় কাব্য। এটি খণ্ড কবিতার বই। 'প্রবাসী'তে এর সমালোচনা হয়। "বাঙ্গালী সর্বধর্ম নির্বিশেষেই বাঙ্গালী। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন যিনি যে ধর্ম স্বীকার করুন না বাঙ্গালায় যাঁহার বাস, তিনি বাঙ্গালী, তাঁহার ভাষা বাঙ্গালা, তাঁহার স্বার্থ দেশের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ তাঁহার স্বার্থ। এই সাধারণ সহজ সত্যটি আজকাল অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ। শ্রীযুক্ত মহম্মদ হামিদ আলী এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কবিতাকুঞ্জ রচনা করিয়াছেন। তিনি হিন্দু বালবিধবার দুঃখে গলদশ্রু, জাষ্টিস মুখার্জ্জির বিধবা কন্যার বিবাহকে বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত জানিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ... হৃদয়ের দিক দিয়া দেখিলে এই কবিতাকুঞ্জ বড় সুন্দর ছায়াশীতল।"[২]

'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৯০৭) ও 'সোহরাববধ কাব্য' (১৯০৯) দু'খানি জাতীয় আখ্যানমূলক কাব্য। এছাড়া তিনি ছোটদের পাঠোপযোগী 'নীতি ও বিজ্ঞানগাঁথা' (১৯০৫) নামে একখানি 'কিণ্ডারগার্টেন কবিতাবলী' এবং ইংরাজীতে 'ষ্টুডেণ্টস্ হ্যাণ্ডবুক অব পারসিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৯০৫) নামে দুখানি পুস্তক রচনা করেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] তাঁর পিতা মুনশী মতিউল্লাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

---

১. 'জয়নালোদ্ধার কাব্যে'র বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ১।।•

২. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৫

৩. চট্টগ্রামের অপর নাম 'ইসলামাবাদ'। ইসলামাবাদের অধিবাসী দেখে তিনি নামের শেষে 'ইসলামাবাদী' ব্যবহার করতেন। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ইসমাইল হোসেনও নামের শেষে 'সিরাজী' ব্যবহার করতেন। এরূপ 'জৌনপুরী' 'দেওবন্দী' প্রভৃতির ব্যবহার আছে

শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের উপর আলোকপাত করে 'সওগাত' পত্রিকায় লেখা হয়, "তিনি (মনিরুজ্জমান) ১৮৮৮ সালে হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। মোল্লা স্বভাবসুলভ 'খতম', 'জিয়ারত' ও 'মৌলুদখানি' প্রভৃতি কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি রেভিনিউ আইন অধ্যয়ন করত মোক্তারী আইন পড়িতে উদ্যত হইয়াই তিনি প্রথমতঃ মাতৃভাষা বাঙ্গালা শিখিতে শুরু করেন।"[১] মাদ্রাসায় শিক্ষাকালে তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। মিসরের 'আল সিনর', 'আল এহরাম' পত্রিকায় তাঁর আরবী প্রবন্ধ ছাপা হত। তিনি পরবর্তীকালে ইংরাজী ভাষাও আয়ত্ত করেন। তিনি টি. ডব্লিউ. আর্নণ্ডের 'প্রিচিং অব ইসলাম'-এর অনুবাদ 'ভারতে ইসলাম প্রচার' প্রকাশ করেন।[২] মনিরুজ্জমান কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলবী, রংপুর কারা-মতিয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে চাকুরী করেন। পরে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কুমেদপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কালে তিনি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। 'মিহির ও সুধাকর' এক সংবাদে লেখে, "... আমাদের প্রিয় সুহৃদ কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত উৎসাহের জলন্ত মূর্তি মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্পারূঢ় হইয়াছেন।"[৩] মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মির্জা ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন প্রমুখের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল; তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার।

মনিরুজ্জমানের প্রথম গ্রন্থ 'তুরস্কের সুলতান' (১৯০১)। এর পরে 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪), 'খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া' (১৯১৬), 'ভারতে ইসলাম প্রচার', 'কনষ্টাণ্টিনোপল', 'খগোলশাস্ত্রে মুসলমান', ভূগোলশাস্ত্রে মুসল-মান', আওরঙ্গজেব', 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', 'ইসলামের উপদেশ', 'সুদ-সমস্যা', 'সমাজ-সংস্কার' প্রবৃত্তি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি বিংশ শতকে প্রকাশিত হয়। তবে মনিরুজ্জমানের মানসিক গঠনটি উনিশ শতকেই সম্পন্ন হয়েছিল; এ পর্বে তিনি যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল সেগুলিকেই পোষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন। তিসি বাগ্মী, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সমাজসেবক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

---

১. বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২৪ (৩ নং)
৩. মিহির ও সুধাকর, ৮ পৌষ ১৩০৬

দেশ দেশান্তরে ভ্রমি সমাজ সেবায়
রাজনীতি সমাজনীতি সাহিত্যচর্চায়
ধর্মপ্রচারের কাজে বিস্তারে শিক্ষায়
এসব কাজতে মোর কেটেছে সময়।[১]

আত্মকর্মের হিসাব দিয়ে স্বয়ং মনিরুজ্জমানের এই উক্তি। এসব কর্মের ভেতর দিয়ে তাঁর পঁচাত্তর বছরের আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হয়।

পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে মনিরুজ্জমানের সাহিত্যিক সূত্রপাত হয়। 'প্রচারক', 'ইসলাম-প্রচারক', 'নবনূর', 'আল-এসলাম' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তাঁর গদ্যভঙ্গি প্রাঞ্জল অথচ বলিষ্ঠ ছিল। ইসলামের আদর্শ প্রচার ও মর্যাদা বৃদ্ধি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি।[২] তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন—'ইসলাম ও বিজ্ঞান' (প্রচারক, মাঘ ১৩০৭), 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' (নবনূর, ভাদ্র ১৩১২) প্রভৃতি প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে। মনিরুজ্জমান হানাফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, লা-মজহাবীদের প্রতি কঠোর বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। 'প্রচারকে' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) তাঁকে 'লা-মজহাব-অরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী শিক্ষিত মৌলবীরা ধর্মপ্রচার অর্থোপার্জনের দিকে বেশী আগ্রহশীল; নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজ-উন্নতি অপেক্ষা আত্মউন্নতির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন—'ইংরাজী ও আরবী শিক্ষার পরিণাম' প্রবন্ধে (ইসলাম-প্রচারক, মে ১৯০৫) তিনি উভয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ তুলেছেন।

'তুরস্কের সুলতান' পুস্তকে তুরস্কাধিপতি 'মহামান্য আবদুল হামিদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক রাজ্যশাসন বিষয়ক কার্যবিবরণী' সংকলিত হয়েছে। লেখক 'ভূমিকা'য় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "ইউরোপের খৃষ্টীয়ান শক্তি-সমূহের নিকট তুরস্ক এতকাল 'রুগ্ন' নামে অভিহিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৭৭ খ্রী: অব্দের রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কীজাতির অদ্ভুত বীরত্ব, অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও রণপাণ্ডিত্য দর্শনে, ইউরোপীয়গণের সেই ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। ... প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, বর্তমানে এই তুরস্কই

১. মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতিবার্ষিকী, ঢাকা, ১৯৬৬

২. মওলানা সাহেব ছিলেন আলেম কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানের পক্ষপাতী। ... নানা অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্য সাধনা ও সমাজসেবা করে গিয়েছেন।" —ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঐ, পৃঃ ৬

মোসলেম জগতের একমাত্র আশা, ভরসা ও গৌরবের স্থল। তুরস্কের সহিত সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেহেতু তুরস্কের সম্রাট পবিত্র স্থান 'মক্কা মাআজ্জমা' ও 'মদিনা মনুওয়ারার' রক্ষক। তিনিই য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণের তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেম বা 'বয়তল মোকাদ্দসে'র তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহার নামেই পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান 'খোতবা' পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অধিনেতা। এইজন্যই তিনি 'আমিরুল মুমেনিন' ও 'খলিফাতুন মোসলেমিন' এই মহা সম্মানিত ও গৌরবান্বিত উপাধিতে বিভূষিত। ... এহেন সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের অতুলনীয় উন্নতি ও অমানুসিক প্রতিভা সমন্বিত অদ্ভূত জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে কাহার না হৃদয়ে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হয়? ... বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চন সমাজসেবক আপাততঃ তুরস্কের বর্তমান সম্রাট মহামান্য সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খানের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশে কৃতসংকল্প হইল।"[১] 'ইসলাম-প্রচারকে' 'তুরস্কের সুলতানে'র সমালোচনা হয়। "এই পুস্তকে মৌলবী সাহেব (মনিরুজ্জমান), বর্তমান সুলতানল্ আজমের শাসনকালীয় সর্ববিষয়ক উন্নতির জ্বলন্ত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তুরস্কের শিক্ষা ও সামরিক উন্নতি, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতি, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বনবিভাগ, খনিবিভাগ, পূর্ত-বিভাগ প্রভৃতি সর্ববিষয়ক উন্নতির বিষয় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সুলতানল আজমের ধর্মপরায়ণতা, স্বজাতি বৎসলতা, স্বদেশহিতৈষণা, সরলতা, উদারতা, মহানুভবতা, রাজনীতিকুশলতা, দয়া ও সৌজন্য, বিলাস পরি-শূন্যতা, আহার-বিহারে আড়ম্বরবিহীনতা, দূরদর্শিতা, সাহস, উদ্যম, কার্যকুশলতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষাও সরল ও সতেজ।"[২] 'ভূতপূর্ব সুধাকর সম্পাদক, বর্তমান ইসলাম-প্রচারক সম্পাদক, মহম্মদীয় পঞ্জিকার সংগ্রাহক, গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ গ্রন্থখানি 'আদ্যোপান্ত' সংশোধন করে দিয়েছেন বলে তিনি ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বের মুসলমানের কাছে তুরস্কের সুলতান 'খলিফা' বা ধর্মীয় নেতা হিসাবে পরিগণিত হতেন। প্যান-ইসলামী ভাবধারার প্রভাবে ভারতের মুসলমানদের চক্ষে তাঁর সম্মান সমুন্নত ছিল। ১৮৭৭ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় আবদুল

১. মোহম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী—তুরস্কের সুলতান, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১, পৃঃ ।০-।০ (ভূমিকা)।

২. ইসলাম প্রচারক, ভাদ্র আশ্বিন ১৩০৮

লতিফ সভা করে আহত সৈন্যদের সেবা ও নিহত সৈন্যদের পরিবারের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন।[১] তখন থেকে শুরু করে ১৯২১ সালে 'খেলাফত আন্দোলন' পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমানগণ তুরস্ক সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল পোষণ করেছেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯), মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর 'তুরস্কের সুলতান', সৈয়দ রওশন আলীর 'তুরস্ক বিগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মৌলিক প্রেরণা ছিল প্যান-ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ। দামেস্ক-হেজাজ রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলে (১৯০০) ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মনিরুজ্জমান, রেয়াজুদ্দীন চাঁদা সংগ্রহের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। হবীবুল্লাহ বাহার বলেছেন যে, মনিরুজ্জমানের উপর শিবলী নোমানীর (১৮৫৭-১৯১৪) বেশী প্রভাব পড়েছিল; উভয়ে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে জাতীয় জাগরণের উৎস খুঁজেছিলেন।[২]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান 'সোলতান' (১৯০১), 'হাবলুন মতিন' (১৯১২) ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। সোলতানের প্রথম সম্পাদক ছিলেন রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জমান পরে সম্পাদক হন। রেয়াজুদ্দীন আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "...তদনন্তর নূতন পলিসিতে (কংগ্রেসী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী সাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে।"[৩] হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী মনিরুজ্জমান বরাবর কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তিনি 'আইন অমান্য আন্দোলনে' (১৯১২) যোগদান করে কারাবরণ করেন। তিনি 'খেলাফত আন্দোলনে'ও (১৯২১) অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র (১৮৯৩) 'মফস্বল সদস্য' ছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩) ও 'বঙ্গীয় মুসলমান ইসলাম মিশন' (১৯০৪) স্থাপনের ক্ষেত্রে যে কয়জন চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্যোগ ছিল, তাঁদের মধ্যে মনিরুজ্জমান ছিলেন প্রধান। শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওয়াহেদ হোসেনের সাথে মনিরুজ্জমানের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, "...অধঃপতিত, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, কুসংস্কার বিজড়িত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান সাহেব দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। ...এই শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার

১. নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফ হিজ রাইটিং এণ্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস, পৃঃ ১৮৫-৬৫
২. হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, পৃঃ ৪৬৬
৩. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫৭

জন্য উপযুক্ত কর্মশীল ও সক্ষম যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এখন পর্যন্ত উহা প্রাপ্ত হয়েন নাই।"[১] মনিরুজ্জমান 'মিহির ও সুধাকরে' এবং 'ইসলাম-প্রচারকে 'যথাক্রমে 'বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি' ও 'ইসলাম ও মিশন' নামে দুটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন। সমাজ উন্নতির কাজে 'যুক্ত-শক্তি'র প্রয়োজন উপলব্ধি করেন তিনি এবং তদ-উদ্দেশ্যে 'জাতীয় মহাসমিতি' গঠনের পরামর্শ দেন। "বলিতে গেলে এখন না আছে আমাদের জাতীয় স্কুল কলেজ, না আছে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কোম্পানি, না আছে সমাজের দুর্দশা নিবারণ সভাসমিতি, না আছে আমাদের সংবাদপত্রিকা এবং সুলেখক ও সুকবি, আর না আছে অর্থ সম্বল, না আছে রাজদরবারে অধিকার। ... এসো ভাই। যুক্তশক্তি দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্ম বলিদান করি। ঐ এসো। জাতীয় মহা-সমিতি স্থাপনপূর্বক শিক্ষা বিস্তার, যৌথ বাণিজ্য কারবার, সমাজের দোষ সংস্কার, উন্নত স্থান পুনঃঅধিকার করার প্রতি ধাবিত হই।"[২] রাজভাষা শিক্ষা, মাতৃ-ভাষা চর্চা, অর্থকরী বিদ্যা অর্জন ইত্যাদি বিষয় সমাজের উন্নতির জন্য আবশ্যক জেনেও লেখক বলেছেন যে, 'মিশন' বা প্রচারনীতির দ্বারাই সর্বাত্মক ফল পাওয়া যায়। তাঁর ধারণা: "সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সর্বপ্রথম সমাজে যে সকল উন্নতির প্রতিবন্ধকতা মূলক দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকলই দূরীভূত এবং সমাজদেহ হইতে সেই সকলকে বিতাড়িত করিতে হইবে। সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করা, কুরীতিনীতি ও অন্যায় প্রথাপদ্ধতির বিনাশ সাধন ইত্যাদি কার্যাবলী নির্বাহ করার গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে কে? ... আমাদের বিবেচনায় 'মিশন' শব্দ ব্যতীত এই সকল প্রশ্নে আর কোন উন্নতির উপযুক্ত উত্তর নাই।[৩] এর পর তিনি ইসলাম মিশনের গঠন পদ্ধতি ও কর্ম পদ্ধতির পরিকল্পনা লিপি-বদ্ধ করেছেন। মনিরুজ্জমানের প্রবন্ধ দুটি সমাজে বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন তুলেছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী পত্রিকায় পত্র লিখে মনিরুজ্জমানের প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৪] পরবর্তীকালে শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন গঠিত হলে তাঁরই চিন্তাধারা ও প্রস্তাবাদি অধিকাংশ গৃহীত হয়। তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। তিনি কলিকাতার 'আঞ্জমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা', 'খাদেমুনল ইসলাম সমিতি' প্রভৃতি ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিলেন।[৫]

---

১. মিহির ও সুধাকর, ১ শ্রাবণ ১৩১০
২. ঐ, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০১
৩. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১১
৪. আবদুল কাদির—নওশের আলি খাঁ ইউসফজয়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭
৫. বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬)

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দামপাড়া গ্রাম সৈয়দ এমদাদ আলীর পৈতৃক নিবাস। তিনি মুন্সীগঞ্জে মাতুল আফতাব উদ্দীন আহমদের (মোক্তার, কায়কোবাদের ভগ্নীপতি) আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া করেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন (১৮৯৫) এবং ঢাকা কলেজে এফএ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন. কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৯০০ সালে নেত্রকোণা দত্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর হন, পরে সি. আই. ডি ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। তিনি সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' উপাধি পান।

ছাত্রাবস্থায় এমদাদ আলীর সাহিত্যানুরাগ জন্মেছিল। 'সুধাকরে' (১৮৯৪) 'চাঁদবিবি' নামে একটি সনেট প্রকাশিত হয়। 'কোহিনূরে' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) 'যুবরাজ মহম্মদ আজমের প্রতি আয়েষা' ও 'ইসলাম-প্রচারকে' (মার্চ এপ্রিল ১৯০৩) 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' প্রবন্ধ ছাপা হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধ লিখে তিনি সুধীসমাজে পরিচিত হয় উঠেন। কলিকাতার 'ইসলামিয়া আর্ট প্রেসে'র মালিক মোহাম্মদ আসাদ আলী এমদাদ আলীর লেখায় মৌলিক চিন্তার ছাপ দেখে তাঁকে 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[১] 'নবনূর'-এ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এমদাদ আলী ঘোষণা করেন, "ভারতবর্ষের অদৃষ্ট ফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখদুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।"[২] 'নবনূর'-এর পৌনে চার বছরের আয়ুতে অনেক সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতা, গল্প প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। মুসলমান যুবক ও হিন্দু যুবতীর প্রণয় দেখিয়ে 'বিমলা' নামে একটি ছোট গল্প 'নবনূরে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০) প্রকাশ করেন। গল্পটি নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার প্রতি অবমাননা করা হয়েছে এরূপ অভিযোগ করে দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও সুধাকরে' (৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০) একটি পত্রে আপত্তি করেছিলেন। 'নবনূরে'-এর আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সম্পাদককৃত পুস্তকের ও মাসিকপত্রের সমালোচনা। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খড়্গহস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ সমাজ ও ধর্মের স্বার্থে তাঁর একটি ঈগলচক্ষু ছিল। এমদাদ আলীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডালি' (১৯১২)। ডালির ভূমিকায় তিনি বলেছেন

১. দেওয়ান আবদুল হামিদ—কবি সৈয়দ এমদাদ আলী, লেখক সংঘ পত্রিকা (ঢাকা), জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
২. নবনূর, বৈশাখ ১৩১০

যে, 'ইসলামী জাতীয়তা' তাঁর কবিতার মূল সুর। তিনি লিখেছেন, "তরুণ বয়েসে যে সুরটি আমাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়াছিল, আমার নগণ্য শক্তি দ্বারা তাহা ভাসিতে তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ... জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি বৃদ্ধির জন্য যে কবির রচনা সমৃদ্ধ নয়, তাঁহার রচনার মূল্য দিতে আমি পূর্বে যেরূপ নারাজ ছিলাম, এখনও তাই আমার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই।[১] বস্তুতঃ তাঁর রচনা ও সমালোচনা এই জাতীয় চেতনার ফল। 'প্রাদেশিকতা বর্জিত' এই ইসলামী জাতীয়তা প্যান-ইসলামী বা 'নিখিল মুসলিম ভাবনা'কেই দ্যোতিত করে। তিনি 'তাপসী রাবেয়া' (১৯১৭) 'সাহিত্যকুসুম' (১৯১৯), 'হাজেরা' (১৯২৮) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর 'সেকেন্দ্রা' (প্রবাসী, ১৯০০) কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়েছিল।[২]

সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী পাবনার সিরাজগঞ্জ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবদুল করিম হেকিমী বা ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। ইসমাইল হোসেন জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে সিরাজগঞ্জ বনোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ে নবমশ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর তাঁর পাঠাভ্যাসে ছেদ পড়ে। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থ পড়ে জামাল উদ্দীন আফগানীর স্বাধীনচিত্ততা ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি ১৮৯৫ সালে তুরস্কে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জামাল উদ্দীন আফগানী ও তুরস্ক তাঁর বাল্যকচিত্তে একটা স্থায়ী রেখাঙ্কন মুদ্রিত করেছিল। ইসমাইল হোসেন শেষ পর্যন্ত তুরস্কে গিয়েছিলেন; ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের সময় তুর্কীর আহত সৈন্যদের সেবা করার জন্য ডাক্তার মোখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান রেড ক্রিসেন্ট'র অধীনে 'অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল মিশন' প্রেরিত হয়, ইসমাইল হোসেন সে-মিশনে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন। তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে 'গাজী' উপাধি নিয়ে পরের বছর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষতঃ তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান যে সুর মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও নিখিল মুসলিম ভাবনা—তাঁর বীজ এখানেই নিহিত।

১. সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত)—ভালি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
২. পূর্বোক্ত, লেখক সংঘ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ইসমাইল হোসেনের সাহিত্যপ্রতিভা ও বাগ্মিতাবৃত্তি মুকুলিত হয়েছিল। জ্ঞানদায়িনী স্কুলে রচনা-প্রতিযোগিতা ও বিতর্কে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্বসমাজের স্বার্থের অথবা আদর্শের বিরুদ্ধে যখন কোন আঘাত এসেছে, ইসমাইল হোসেন তার প্রতিবাদ করেছেন। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মদের এক সভায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোরানকে শেষ গ্রন্থ ও মহাম্মদকে শেষ নবী বলতে চাননি; তিনি শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, মার্টিন লুথার, রামমোহন রায়কে প্রেরিত পুরুষ বলে উল্লেখ করেন। সিরাজী গিরিশ সেনের এই মতের বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন। অনুরূপভাবে বনোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতায় ও 'গো-রক্ষিনী সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত সভায় পণ্ডিত যাদবচন্দ্র তালুকদার গো-হত্যার বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলে ইসমাইল হোসেন হিন্দু শাস্ত্র হতে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেন যে, পূর্ব-কালে আর্যরা গো-হত্যা সমর্থন করতেন।[১] তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে এসব প্রতিবাদ খুব দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল। বনোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে একটি সাধারণ জনসভা হয়; মুনশী মেহেরুল্লা ছিলেন বক্তা: ইসমাইল হোসেন সিরাজী সভায় 'অনল-প্রবাহ' কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি স্বদেশানুরাগিতা ও ইসলামী ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে রচিত। মেহেরুল্লা ইসলামী ভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজ ব্যয়ে 'অনল-প্রবাহ' কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন (১৮৯৯)। ইসমাইল হোসেন পরের বছর অনল-প্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, বীরপূজা, অভিভাষণ; ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো সংকটে, আমীর আগমনে, দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা এই ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' বর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। স্বজাতির অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে জাতীয় মুক্তি ও উন্নতি সাধনের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনি 'অনল-প্রবাহে'র প্রায় প্রতি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। 'ইসলাম-প্রচারকে' কাব্য-খানির সমালোচনা হয়। "... কবিতাগুলি মহাওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদের অতীত গৌরব-কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্য-ময়ী, পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।"[২] 'ইসলাম-প্রচারকে'র সমালোচক মুগ্ধ' হলেও সরকার কিন্তু সন্তুষ্ট হননি। ১৯০৮ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন; কবিকেও দু'বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 'অনল-প্রবাহে'র উৎসর্গ-পত্রে নব্যযুবকদের উদ্দেশ্য করে

১. মোহাম্মদ সেরাজুল হক—সিরাজী-চরিত, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৩০-৩৩
২. ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ ১৩০৭

ইসমাইল হোসেন বলেছেন,

ইসলামের গৌরবের বিজয়-কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্যযুবগণ।
জাগাতে অতীত স্মৃতি
জাগাতে জাতীয় প্রীতি
অনলপ্রবাহ খানি করিয়া রচন;
বহু আশে বহু সাধে
দিনু তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।[১]

'মহাশিক্ষা' (১৮৯৮-১৯১০) নামে কারবালার কাহিনী অবলম্বনে তিনি একখানি মহাকাব্য রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি তাঁর জীবিতাবস্থায় মুদ্রিত হয়নি।[২] 'ইসলাম-প্রচারকে' (১৯০৪-১৯০৫) 'মহাশিক্ষা'র তিন সর্গ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'অনল-প্রবাহে'র বাজেয়াপ্তের সময় কবিকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা জারি করা হয়। তিনি ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে আত্মগোপন করে 'মহাশিক্ষা' রচনা করেন এবং পরে কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[৩] 'এমাম-শহীদ খণ্ড' ও 'এজিদ-বধ খণ্ড' নামে দুই খণ্ডে মোট ৩৬টি সর্গে কাব্যখানি সমাপ্ত হয়েছে। খণ্ড কবিতা রচনা করেই তাঁর কাব্যজগতে আবির্ভাব, তবে খণ্ডকবিতা অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার প্রতি তাঁর মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তাঁর মতে, "সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ... মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিস, যতদিন মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে।"[৪] তিনি কাহিনী ও ভাবের ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পরবর্তী কাব্য 'উচ্ছ্বাস' (১৯০৭), 'উদ্বোধন' (ঐ) একই ভাবধারা নিয়ে রচিত—তিনি ইসলামের গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা করে ভারতীয় মুসলমানদের নব জাগরণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তুরস্কের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হয়েছে 'তুরস্ক ভ্রমণ' (১৯১৩) 'তুর্কী-নারীশিক্ষা' (ঐ)

---

১. সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী—অনল-প্রবাহ, 'উৎসর্গ-পত্র' দ্রষ্টব্য।

২. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, পৃঃ ৪১২ (২ সং)

৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—সিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪২২

৪. ইসমাইল হোসেন সিরাজী—মহাকবি কায়কোবাদ, মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩২৬

প্রভৃতি গদ্য পুস্তক। এর পর তিনি 'স্পেন-বিজয়' (১৯১৪), 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' (১৯১৬), 'প্রেমাঞ্জলি' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্য এবং 'রায়-নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ', 'নূর-উদ্দীন' (১৯২৩) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এসব রচনায় প্রধানতঃ ইসলামী ভাববৃত্তেই বিচরণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক, কোহিনূর, নবনূর, সোলতান প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপা হয়েছে। 'ইসলাম-প্রচারকে'র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলার মুসলমান হীনমন্যতায় ভুগছে; অতীতের বীর্যবত্তা ও জ্ঞানবত্তার বাণী প্রচার করে এই নির্জীব জাতির মধ্যে আত্মমর্যাদা ও জাতীয় গরিমা সঞ্চার করতে হবে। 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "উন্নত জাতি অধঃপতিত হইলে একমাত্র প্রাচীন গৌরব কাহিনীই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করিতে পারে। প্রাচীন গৌরব কথাই তাহাদিগের কর্ণে অমৃতবাণী উচ্চারণ করে। আজ আমরা বঙ্গের মুসলমান, যদি পূর্বপুরুষদিগের শক্তি-সাধনা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত থাকিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দুঃখদুর্দশা-দীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইত।"[১] সমাজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী সেকথাও জোর দিয়ে বলেছেন। আবেদন-নিবেদন তথা যাচঞাবৃত্তি দ্বারা কার্যোদ্ধার হয় না; প্রকৃত মুক্তির পথ শ্রম ও সংগ্রাম-যোগ্যের প্রতিষ্ঠা, অযোগ্যের পতন, এ-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "তাই বলি, বঙ্গের মুসলমানগণ। আলস্য, ঔদাস্য, অদৃষ্টবাদ, রাজার আশা, পরের আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবলে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও। প্রার্থনা, ক্রন্দন, অশ্রুজলে কার্যোদ্ধার হইবে না শক্তিবলে কার্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হও। ... সমাজে শক্তির বিস্ফুরণ কর। শক্তিবলে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা লাভ কর। বিশ্বসংসারে সর্বদা যোগ্যের পূজা-উপযুক্তের আদর-শক্তিশালীর প্রতিষ্ঠা।"[২] উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল লতিফ আমীর আলী প্রমুখের আবেদন-নিবেদনের নীতির স্পষ্টতঃ বিরোধিতা করেছেন তিনি, তাঁর উক্তির মধ্যে বলপ্রয়োগের নীতি আভাষিত হয়েছে। স্বসমাজের সমালোচনায় তিনি ছিলেন নির্ভীক ও অকপট। 'মোল্লাচিত্র' কবিতায় 'কাট-মোল্লা' শ্রেণীকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সেই সঙ্গে যে মাদ্রাসা-শিক্ষা এ শ্রেণীর মোল্লার জন্ম দেয়, সে-শিক্ষা পদ্ধতিরও

১. ইসলাম-প্রচারক, মে-জুন, ১৯০৪

২. ঐ।

সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের সংস্কার এবং মাদ্রাসায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হাদিস এবং তফসীর পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইবে, সে পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা অদ্ভুতজ্ঞান বিশিষ্ট 'কাটমোল্লা' ব্যতীত প্রকৃত আলেম প্রস্তুত হইবার কোনই আশা নাই। মাদ্রাসা পাশকারী যে দুই একজন মহাত্মাকে আলেমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাঁহারা স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা করিয়া বাঙ্গালা বা ইংরাজীর সাহায্যে প্রকৃত আলেমপদে উন্নীত হইয়াছেন। নতুবা মাদ্রাসার শিক্ষায় তাঁহাদিগকে আলেম করে নাই।"[১]

ইসমাইল হোসেন 'নূর' (১৯১৯) নামে একটি মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন। তিনি সোলতান (নবপর্যায়) ১৯২৩ পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। একজন সুবক্তা হিসাবে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সুনাম ছিল। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সপক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনেও তিনি একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি দ্বিতীয় বার কারাবরণ করেছিলেন।[২] 'অনল-প্রবাহে'র প্রকাশকাল ও নজরুল ইসলামের জন্মকাল একই বছর; নজরুল ইসলাম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বয়স ৪০ বছর। সিরাজীর সাহিত্য সাধনা নজরুলের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা চিন্তা প্রভৃতি ভাব রচনায় উভয়ে সমধর্মী ছিলেন। অকপট প্রকাশের দুরন্ত সাহসের জন্য তাঁরা উভয়ে কারাবরণ করেন। নজরুল ইসলাম অনল-প্রবাহের প্রভাব স্বীকার করে বলেছেন, "সিরাজী ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। ... তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল 'অনল-প্রবাহ'। আমার রচনায় সেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ।"[৩]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

বাংলার মুসলমান সমাজে নারীমুক্তির অগ্রদূতী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার সাবের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। সাবের পরিবারের

১. ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩
২. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪০২
৩. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্বজাতি প্রেম' (কলিকাতা, ১৯৪৬, পৃঃ৫) কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত।

মৌখিক ভাষা ছিল উর্দু। দুই ভ্রাতা আবু আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও আবু আসাদ খলীল সাবের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা পান, কিন্তু নারীশিক্ষার প্রচলন না থাকায় করিমন্নেসা খানম ও রোকেয়া খানম আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিতা ছিলেন। তাঁরা নিজ চেষ্টায় ইংরাজী ও বাংলা শিখেছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিলাত-ফেরত উর্দু ভাষী সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকেয়া খানমের বিবাহ হয় (১৮৯৬)। ৯ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর সঞ্চিত অর্থের একাংশ দিয়ে তিনি কলিকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল (১৯১১) স্থাপন করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিঃসন্তানা ছিলেন। স্কুলকে জীবনের সর্বস্ব করে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় 'আঞ্জমন খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য একই—মুসলিম মহিলা, সমাজের দুঃখদুর্দশা ও বন্ধনদশা দূর করা। পুরুষের বহুবিবাহ ও তালাক-প্রথার প্রচলন থাকায় নারীকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়; সমাজে নারীব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে ছিল না। পুরুষ-গণ অবরোধপ্রথার প্রাচীর তুলে নারীকে অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার জন্য তাঁদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। নারীর এসব দুর্গতির কথা ভেবেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একাধারে স্কুল-সমিতি স্থাপন করেছেন, অন্যধারে বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এর কোনটাই নিষ্কণ্টক ছিল না; রক্ষণশীল সমাজ বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিন্তু রোকেয়া দমবার পাত্রী নন। তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে মূঢ় মূক বন্দিনী নারীর জন্য যে আর্তি জেগেছিল, তা কৃত্রিম ছিল না; তিনি সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে যাত্রাভঙ্গ করেননি বরং ব্যক্তিসুখ বিসর্জন দিয়ে এবং নিন্দা, অপযশ, কলঙ্কের ভাগী হয়ে তিনি আজীবন সমাজের সেবা করে গেছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক 'মতিচুর', (১ খণ্ড, ১৯০৪)। এর অধিকাংশ প্রবন্ধ সেকালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের কোন কোন বিষয় নিয়ে বাদ-বিতণ্ডাও হয়েছিল। নারী-মুক্তি ও নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে লেখিকা বলেন, "প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, ... ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কখন'-এর বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন। ... কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতেই হইবে।"[১] নওশের আলী খান

১. নবনূর, ভাদ্র ১৩১১

ইউসফজয়ী এর প্রতিবাদে 'একেই কি বলে অবনতি?' প্রবন্ধে বলেন, "... অলঙ্কারগুলি যেন ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু পোষাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না?"[১] 'কোহিনূর' পত্রিকায় জনৈকা লেখিকা মন্তব্য করেন, "তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তদীয় লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধগুলি পাঠে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি ঘোর সন্দেহ হয়। বোধ হয় যেন তিনি ভ্রাতৃনির্যাতন মূলমন্ত্র লইয়াই লেখিকার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।"[২] 'মতিচুর' (১ খণ্ড) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে 'নবনূরে' এর সমালোচনা বের হয়। "সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচুর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।"[৩] তিনি অবশ্য গ্রন্থের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। সমালোচকের ভাষায় "এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও আমরা কর্তব্যানুরোধে এইরূপ আলোচনার জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"[৪] ১৯২১ সালে 'মতিচুরে'র ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫) একটি রূপক উপন্যাস। তিনি প্রথমে 'সুলতানাস্ ড্রিম' নামে ইংরাজীতে লেখেন, পরে এর বাংলা অনুবাদ ক[illegible]ন। তিনি একটি রূপক কাহিনীর ভেতর দিয়ে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরেছেন; নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেলে রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতাও রাখতে পারেন।[৫] পরবর্তীকালে রচিত 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯২৮) দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

---

১. নবনূর, কার্তিক ১৩১১
২. কোহিনুর, ভাদ্র ১৩১২
৩. নবনূর, ভাদ্র ১৩১২
৪. ঐ।
৫. আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—রোকেয়া-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যিক মন ও প্রতিভা ছিল। উদ্দেশ্য-ধর্মী রচনাগুলিকেও তিনি সরস করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুর মিশ্রিত হয়েছে। তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র ব্যক্তি বিশেষ নয়, সমগ্র সমাজ। তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ বিদ্বেষহীন ও স্থূলতামুক্ত। তিনি নিজে স্বাধীন-চেতা রমণী ছিলেন, সমাজের নারীজাতিকেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মন্ত্র দিয়ে গেছেন।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)

শেখ ফজলল করিম রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর একটি অকৃত্রিম সাহিত্যিক প্রাণ ছিল। তিনি মূলতঃ কবি, তবে তাঁর উত্তম গদ্য রচনাও আছে। শেখ ফজলল করিমের সমস্ত কাব্যভাবনা ও সাহিত্যানু-শীলনের মৌল আবেদন হল ধার্মিকতা ও নৈতিকতা। ইসলাম ধর্মই তাঁর নীতি-জ্ঞান ও আদর্শবুদ্ধির উৎস। তিনি চিশতীয়া সুফীমতের সমর্থক ছিলেন। সুফী-মতের অন্তশীল আবেগ ও শুদ্ধ রসবোধ তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। তবে তিনি যুগের আবেদন ও সমাজ-সমস্যার কথাও উপেক্ষা করেননি। 'রংপুর-দিকপ্রকাশে'র সম্পাদক হরশঙ্কর মৈত্রের কাছে তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তাঁর কবিতা লেখায় হাতে খড়ি হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সরল পদ্য বিকাশ' ছাপা হয়। তখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার আগে তিনি কাকিনার এক 'জুট ফার্মে' চাকুরী গ্রহণ করেন, সেখানে ম্যানেজার হয়ে সাত বছর অতিবাহিত করেন।[১]

সাহিত্য সাধনাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে সাহিত্য সেবা করে গেছেন। তাঁর মোট প্রায় ৪০খানি পুস্তক আছে। সম-কালীন পত্র-পত্রিকায় নানা কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্য রচনা ছাপা হয়েছে। তিনি 'বাসনা' (১৯০৮) নামে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম এরূপ :— ১. 'সরল পদ্য বিকাশ' (১৮৯৪), ২. 'তৃষ্ণা' (১৯০০), ৩. 'পরিত্রাণ কাব্য' (১৯০৩), ৪. 'মানসিংহ' (ঐ), ৫. 'ছামৌতত্ত্ব' (ঐ), ৬. 'ভগ্নবীণা বা ইসলামচিত্র' (১৯০৪) ৭. 'লায়লী-মজনু' (ঐ), ৮. 'হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী' (ঐ), ৯. 'প্রেমের স্মৃতি' (১৯০৫), ১০. 'মহর্ষি হজরত এমাম রব্বাণী মোজাদ্দাদে আলফসানী' (ঐ)। পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আফগানিস্তানের ইতিহাস' (১৯০৯), 'পথ ও

১. বার্ষিক সওগাত, ৯ বর্ষ, ১৩৩৩

পাথেয়' (১৯১৩), 'বিবি রহিমা' (১৯১৮) 'গাথা' (১৯২০), 'বিবি ফাতেমা' (১৯২১), 'রাজর্ষি এবরাহিম' (১৯২৪), 'বিবি খাদিজা' (১৯২৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সরল পদ্য বিকাশ' 'শিশুপাঠ্য কবিতার বই। 'তৃষ্ণা' উর্দু গজলের ভাবালম্বনে রচিত। 'প্রকাশকের নিবেদনে' লেখা হয়, 'তরুণ কবির কয়েকটি ক্ষুদ্র ভক্তি সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য সেবার ফল কবিতাগুচ্ছ সময়ান্তরে 'শেফালিকা' নামে প্রকাশিত হইবে; ... বর্তমান পুস্তক তাঁহার প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস মাত্র। লেখকের কোন বিশেষ পরিবর্তনে রচিত রুচির ঐক্যতায় ইহা ভক্ত পাঠকের উদ্দেশ্য পথের প্রদর্শন (রূপে) গৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।"[১] 'তৃষ্ণা'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯, কবিতার সংখ্যা ১৭টি। গীতিধর্মী কবিতাগুলির ভাববস্তু নির্মল প্রেম। কবির আবেগ স্বচ্ছ ও সচ্ছন্দ।

প্রেম আমি।
ভাষা মোর নয়নে নয়নে
ভাব মোর প্রাণের মিলনে।
আসিতে চাহিলে আসিতে পারি না
হাসিতে চাহিলে হাসিতে জানি না
কাঁদিলে না আসে জল।[২] (প্রেম আমি)

শেখ ফজলল করিম কাব্যখানি 'অশেষ গুণালঙ্কৃত, সমাজ গত প্রাণ, উদার-হৃদয়, মাননীয় মৌলবী ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহমদ প্রচারক সম্পাদক'কে উপহার দিয়েছেন।

হজরত মহম্মদের জীবনাখ্যান 'পরিত্রাণ কাব্য' লিখে ফজলল করিম সাহিত্যিক মহলে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন। তিনি কাব্যরীতিতে নবীনচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। মহম্মদের চারিত্র্যমাহাত্ম্য ও ধর্মজীবনের বর্ণনা করে তিনি ধর্ম ও সত্যের জয় অধর্ম ও অসত্যের বিনাশ—এই চিরন্তন নীতিকথা প্রচার করেছেন। 'নবনূরে' 'পরিত্রাণকাব্যে'র বিরূপ সমালোচনা হয়। 'অল্পদিনের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দ:) সম্বন্ধে আমাদের দুইখানি কাব্য হইল,[৩] ... একখানিও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য নহে। ... কেবল ব্যবহার বিরল

১. শেখ ফজলল করিম—তৃষ্ণা, কাকিনা (রংপুর), পৌষ ১৩০৭
২. ঐ, পৃঃ ৩-৪
৩. অপরখানি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক রচিত 'হজরত মহম্মদ'

আভিধানিক শব্দ সমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এই কাব্যখানিও উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরে বর্ণনা প্রাণহীন ও শ্রীভ্রষ্ট না হইলে অন্ততঃ বিষয়—গৌরবেও লেখকের সমস্ত ত্রুটি মার্জিত হইতে পারিত। লেখক সংযমের অভাবেই স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন। ...বস্তুতঃ ফজলল করিম সাহেবের একটু শক্তিমত্তায় আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তদীয় গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম; তিনি আমা-দিগকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিতেছেন কেন?"[১] 'ভগ্নবীণা' জাতীয় উদ্দীপনামূলক খণ্ড কবিতার বই। এর কয়েকটি কবিতা 'ইসলাম-প্রচারকে' প্রকাশিত হয়। 'ভগ্নবীণা' কবিতায় তিনি বলেছেন,

সভ্যতা-শিয়রে যে ইসলাম বিরাজে
সে বাদশাজাতি ফকির সাজে
স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে
গোলামী হয়েছে জীবনে সার।[২]

'মানসিংহ' ও 'প্রেমের স্মৃতি' কাব্যে ফজলল করিমের ঐতিহাসিক চেতনাব পরিচয় আছে। 'মানসিংহে'র 'নিবেদনে' ফজলল করিম লিখেছেন, "বঙ্গ ভাষায় মানসিংহের জীবনচরিত নাই। পার্শী-উর্দু ইতিহাসগুলিতেও যাহা কিছু আছে, তাহা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। মানসিংহ মুসলমান ভক্ত ছিলেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা বা ঈর্ষাবশে তাঁহার জীবনী সঙ্কলনে সঙ্কুচিত। যাহা হউক, এজন্য মুসলমান গ্রন্থকারগণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা কয়েকখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিযাছি।"[৩] এটি ১৪ পৃষ্টার গদ্য পুস্তিকা 'নবনূরে' মানসিংহের বিরূপ সমালোচনা হয়। "এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন নাই। মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টায় ত্রুটি না হইলেও তাঁহার রচনা পদ্ধতি সর্বত্র চরিতাখ্যায়কদিগের অনুসৃত মার্গানুযায়ী হয় নাই সত্য-নিষ্ঠা যে ঐতিহাসিকের পরম আশ্রয় লেখক তাহা বিস্মৃত হইয়া অনেক স্থলেই কবি-জনোচিত কল্পনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। ... ইতিহাসাদির অনুশীলন আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ নিতান্ত উদাসীন বা পশ্চাৎপদ। আশা করি অতঃপর

১. নবনূর, কার্তিক ১৩১১
২. শেখ ফজলল করিম—ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র, কোহিনূর ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪
৩. শেখ ফজলল করিম—মানসিংহ, বিকাশ মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বরিশাল ১৯০৩

মুসলমান লেখকবর্গ ইতিহাসচর্চার সহিত ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে কদাচ ভুলিবেন না।"[১] 'প্রেমের স্মৃতি' দৃশ্যকাব্য: 'পলাশীর রণাঙ্গনে গভীর নিশীথে সিরাজদ্দৌলা ও লুৎফন্নেসা মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ ত্যাগ হইতে শুরু করিয়া মহম্মদী বেগের অসির আঘাতে সিরাজদ্দৌলার নিধন পর্যন্ত ঘটনাবলী' এতে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে মুসলমান লেখকের এটিই প্রথম রচনা। প্রায় সমসাময়িককালে একই আঙ্গিকে দৌলত আহমদ 'বিংশ পট সম্বলিত' 'জীবন মঙ্গল' (১৯০৫) নামক রূপককাব্য লিখেছিলেন।[২]

'আসবার-উস-ছামী বা ছামীতত্ত্ব' অনুবাদ গ্রন্থ। ছামী সুফীমতের 'ভগবৎ প্রেমবিষয়ক সঙ্গীত'। শরীয়তপন্থীর লোকেরা এরূপ ভাবসঙ্গীতের বিরোধী ছিলেন। ছামী সম্পর্কে তাঁদের বিরূপ মনোভাবের অবসান ঘটাবার জন্য ফজলল করিম এটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন "...ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণের সমীপে সবিনয় নিবেদন; —একথা সর্বজনবিদিত যে, আদিকাল হইতে সঙ্গীত শ্রবণ প্রচলিত আছে। আর হজরত রসুলে করিমের (দ:) সময়েও ইহার প্রচলন ছিল। বিশেষত: সাধু সম্প্রদায় ইহাকে স্বীয় হৃদয়ের একমাত্র তৃপ্তি-দায়ক বস্তু বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ...দু:খের বিষয়—বর্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় কতিপয় অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি (ছামী) ধর্ম সঙ্গীতকে একেবারে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এমন কি যাহাদের তরিকায় সহস্রবার ইহার সিদ্ধত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহারাও 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ:' সাজিয়াছে। অধিকন্তু কাকিনা-নিবাসী মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল অলীক কথা প্রচার করিয়া তুমুল তুফান তুলিয়াছেন, আপাতত: তাহার আলোচনা না করিয়া, তিনি যে ব্যবস্থা খণ্ড (ফতোয়া) প্রকাশ করিয়াছেন, —জেলা মজফর নগর, —পো: কেরায়ানা-মহল্লা দরবারনিবাসী জোনাব হজরত মওলানা, হাজি, হাফেজ, কারী মহম্মদ শাহাবুদ্দীন সাবেরি সাহেবের প্রত্যুত্তরসহ তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। আশা, —অনভিজ্ঞ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাভগ্নিগণ ইহার সাহায্যে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। কারণ দূরদর্শিতাভাবে কতকগুলি ব্যক্তি 'ছামী'কে অসিদ্ধ ও শ্রোতাকে 'কাফের' (বিধর্মী) ও 'বেদাতি' (শাস্ত্র বিগর্হিত নূতন অনুষ্ঠাতা) বলিতেছেন। ... বঙ্গভাষায় 'ছামী' শব্দের ঠিক কোন প্রতিশব্দ নাই; পাঠকদিগের বোধসৌকার্যে আমরা প্রায়শ: অধিকাংশ স্থানে 'গান' ও 'সঙ্গীত' শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা

১. নবনূর, ফাল্গুন ১৩১০
২. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃ: ১১২-১৩

ধারা যাহাতে লোকে যাত্রা, থিয়েটার, খেমটা, বাই প্রভৃতি গানের সহিত ছামীর তুলনা না করেন—এজন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"[১] বলা বাহুল্য, চিশ-তীয়া মতের সমর্থক শেখ ফজলল করিম ছামীর সমর্থক ছিলেন।

'হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি' ও 'মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফসানী' উভয়ই সন্তজীবনী। দ্বিতীয় গ্রন্থের সমালোচনায় 'নবনূর' প্রশংসা করে বলে, "... এই মহাপুরুষের মহনীয় স্বার্থত্যাগ, অপূর্ব দৃঢ়তা ও প্রবল ধর্মানুরাগ মোসলেম জগতের অবশ্য অনুকরণীয়। শেখ সাহেব বঙ্গভাষায় তাঁহার জীবনকথা প্রচারিত করিয়া আমাদিগকে পরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। এই গ্রন্থখানি ... মোটের উপর সুখপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে।"[২]

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)

কাজী ইমদাদুল হক খুলনা জেলার গদাইপুরে কাজী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী আতাওল হক খুলনার ফৌজদারী আদালতের মোক্তার ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে খুলনা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৮ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এফএ এবং ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি ইংরাজী নিয়ে এমএ পড়েছিলেন, এমন কি বিএলও পড়ে-ছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনটাই পরীক্ষা দেননি। তবে পরে বিটি পাশ করেছিলেন (১৯১৪)। তিনি প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন, পরে শিক্ষা বিভাগে যোগদান করে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক ও আরও পরে সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। ১৯২১ সালে ঢাকা ইন্টার-মিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। চাকুরীতে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' (১৯১৯) ও 'খান বাহাদুর' (১৯২৬) উপাধি পান।[৩]

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখনির দুটি ধারা—মননশীল প্রবন্ধ রচনা ও শিক্ষোপযোগী শিশুপাঠ্য বই। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাও আছে। প্রথম গ্রন্থ 'আঁখিজল' (১৯০০) কবিতা-সংকলন, আর শেষ গ্রন্থ 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩) সামাজিক উপন্যাস। মাঝে গ্রন্থাকারে

---

১. শেখ ফজলল করিম—মাসবার-উল-ছামী বা ছামীতত্ত্ব, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, কার্তিক ১৩১০, পৃঃ ৵৹-৶৹ (অবতরণিকা)।

২. নবনূর, মাঘ ১৩১২

৩. সৈয়দ এমদাদ আলী—খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক, সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৩

প্রকাশিত হয়েছে 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা' (১৯০৪), 'নবিকাহিনী', 'প্রবন্ধমালা' প্রভৃতি। 'আঁখিজল' ৯টি গীতিকবিতার সংকলন। কবিতাগুলির অধিকাংশ প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা করে লেখা।[১] তরুণ কবির ভাষা সুমার্জিত। চিত্রকল্প রচনায় বিহারীলালের প্রভাব আছে। 'লতিকা' (১৯০৩) নামে একটি কবিতার বই পাণ্ডুলিপি আকারে 'নবনূরে'র স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আসাদ আলীকে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন; কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। লতিকার 'উদ্বোধন', 'মায়া বালিকা' খেদ', 'জীবনসংগ্রাম' 'নবনূরে', 'হাসি' 'সমালোচনী'তে এবং 'কথা' 'কোহিনূরে' প্রকাশিত হয়।[২]

'মুসলমানগণই আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা'—ইমদাদুল হকের 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' গ্রন্থের ইহাই সারকথা। উল্লেখযোগ্য যে, ইমদাদুল হক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বিএ পড়াশুনা করেছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনার্স ত্যাগ করেন।[৩] সুতরাং বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য: 'গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বহুদর্শী ও চিন্তাশীল ঐতিহাসিক পণ্ডিত-গণ ইসলামের বিজ্ঞানানুশীলনপ্রিয়তার অশেষ প্রশংসা করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; ... আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতিশৈলীর সর্বোচ্চ শিখরবিহারী পাশ্চাত্যজাতিসমূহ কোন কোন বিষয়ে ইসলামের নিকট কতদূর ঋণী, অদ্য আমরা তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।"[৪] 'নবনূরে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঐ পুস্তিকাখানির আলোচনা করেন। তিনি গ্রন্থখানির প্রশংসা করে লেখেন, "পুরাগীতিখানার উদ্বোধনায় ভবিষ্যতের অনন্ত আশা-আশ্বাস লইয়া যে একখানি দীপ্তি উজ্জ্বল পূত পুস্তিকা আদর্শ চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাইয়াছি, তাহা আমাদের ধীমান উদ্যমী বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় মৌলবী ইমদাদুল হক বিএ মহোদয়ের স্বর্ণলেখনী প্রসূত 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা'। শিক্ষিত মোসলেম ভ্রাতার নয়ন পথে এবং হৃদয়পটেও বঙ্গভাষার মহাভ্রাতৃত্বপূর্ণ মহিমায় পূর্ণগৌরবে যে উদ্ভাসিত হইয়াছে, ইহা আমাদের অল্প আশা বা অল্প ভরসার কথা নহে।"[৫] সেযুগে

১. ইমদাদুল হক—আঁখিজল, ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬
২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ: ।।০ (সম্পাদকের নিবেদন)।
৩. পূর্বোক্ত, সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৩
৪. কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী, পৃ: ৩৩৪
৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—দুইখানি নূতন পুস্তক, নবনূর, মাঘ ১৩১১

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষার তেমন চর্চা করতেন না ; ইমদাদুল হকের এপথে আগমনকে তিনি শুভ লক্ষণ হিসাবে দেখেছেন, এজন্যই তাঁর এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় প্রশংসা। তরুণ লেখককে উৎসাহিত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মোসলেম জগতের বিজ্ঞানচর্চা ও আরও পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে 'প্রবন্ধ-মালা' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির নাম এরূপ : 'আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার', 'আবদুর রহমানের কীর্তি', 'ফ্রান্সে মোসলেম অধিকার', 'আল-হামরা', 'পাগল খলিফা'। শিশুদের পাঠোপযোগী 'নবিকাহিনী'তে ১২ জন পয়গম্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'প্রস্তাবনা'য় লেখা হয়, "প্রাচীন নবিগণের জীবনের মোটামুটি কথাগুলি কোমলমতি বালক-বালিকাদিগকে গল্পচ্ছলে শিখাইবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল। কাহিনী-গুলি হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য যথাসম্ভব সরল ভাষায় ও সরল ভঙ্গিতে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।"[১]

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দাপ্রথা, পীরবাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারের চিত্র তুলে ধরে ইমদাদুল হক এসবের অবসান কামনা করেছেন, কেননা এগুলির সমাজের প্রগতির অন্তরায়।[২] আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কাজী ইমদাদুল হক খুব স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারপন্থী ছিলেন। প্যান-ইসলামী চেতনার বশবর্তী হয়ে তিনি বিশ্ব মুসলমানের অতীত গৌরবের গুণগান করেছেন। সমকালের সমাজের সমস্যাগুলিকে বিচার করে-ছেন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে।

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র 'শিক্ষকে'র (মে, ১৯২৩) পুরো ৩ বছর সম্পাদনা ইমদাদুল হকের আর একটি কীর্তি।[৩] এটি তাঁর শিক্ষানুরাগিতারই ফল। তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র কার্যনির্বাহক কমিটির (১৯১৭-১৮) সদস্য ছিলেন।[৪]

---

১. কাজী ইমদাদুল হক—নবিকাহিনী (১ ভাগ), স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩২৪ (২ সং)। 'প্রস্তাবনা' দ্রষ্টব্য।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত পৃঃ ১৮১-৮২ (৪ সং)।

৩. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৩১৬

৪. ঐ, পৃঃ ২০৭

অপ্রধান লেখকবৃন্দ

খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-১৮৭০)

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা গ্রামের অধিবাসী খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক হিসাবে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়ে আসছেন। তিনি আধুনিক গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত 'উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পারমার্থিক ভাব' (১৮৬০) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সুফীতত্ত্বের মোড়কে 'ভাবলাভ' (১৮৫৩) নামে একখানি আখ্যানকাব্য পূর্বেই রচনা করেছিলেন। শামসুদ্দীনের পিতা খোন্দকার গোলাম ফরিদ পীর ছিলেন। পিতার আদেশেই তিনি 'উচিৎ শ্রবণ' লেখেন। গ্রন্থে সুফীতত্ত্বের কথা সে সূত্রেই এসেছে। 'ভাবলাভ' কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন,

রাজধানী বর্দ্ধমান তদন্তঃপো বাসস্থান
বাটি সর্ব্বমঙ্গলাতে ধরো।
ছিদ্দিকী পদ্ধতি ধরি, খোন্দকারি পেশা করি
গোলাম ফরিদ খোন্দকার।
দেসখ্যাতি নাম তাঁর, কি লিখিব গুণ তাঁর,
কেবা নাহি জানে চিনে তাঁরে।
এলেমে আলেম তিনি, ফকিরের চূড়ামণি,
প্রকাশিত বাঙ্গালা ভিতরে।
তত্ত্বজ্ঞানি সাধু যারা, দিবানিসি আসি তারা,
সেবা করে তাঁহার চরণে।
হৃদয়ের রাজ তিনি, তাঁহারে সাধনে চিনি
ফকির হইল কতো জনা।
শুনো সবে সমাচার, আমি মুর্খ পুত্র তাঁর
আর দুই ভ্রাতা আছে মোর
তারাও মৌলুবি হয়ে, ভবভাব তেয়াগিয়ে
প্রভুভাবে হইল ফকির।[১]

---

১. সমছুদ্দি ছিদ্দিকি—ভাবলাভ, হানিফি প্রেস, কলিকাতা, ১৮৫৩ (গ্রন্থে তারিখের উল্লেখ নেই), 'গ্রন্থকারের পরিচয় অর্থাৎ সাইরিন পরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার মাইক্রোফিল্ম নং অ ২.২।৪

'উচিৎ শ্রবণে' গদ্য রচনার মাঝে মাঝে পদ্য কবিতা, গান ও গজল আছে। লেখকের গদ্য-ভঙ্গি কোথাও জটিল, কোথাও সরল, কিন্তু পদ্যরীতি সর্বত্র অবাধ ও সচ্ছল। কোন কোন গানে অন্তর্মুখী গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ফুটেছে। গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য : "...রসনার দ্বারায় ঘোষণা করিলেই বাসনা পূর্ণ হয়, আর যাঁহাকে দৃষ্টি বলা যায় তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে নিরক্ষণ করিলেই অত্র পুস্তকের মধ্যে যে সকল বচন রচন হইয়াছে অমূল্য রতন জ্ঞানে যতন করিলেই শারীরিক পতন ও পতনের মর্ম্ম ও নিরঞ্জন আরাধন ধর্ম আর যে সকল উচিত কর্ম্ম তাহা সকল হইতে জ্ঞাপন হইবে।"[১] তাঁর গদ্য-ভঙ্গির একটি নমুনা এরূপ "তৃতীয় অহঙ্কার ধনের অহঙ্কার এই অহঙ্কারে ফেরাউন নরপতি আপনাকে পরমেশ্বর বলাইয়া নানা মত দৌরাত্ম উপস্থিত করিবাতে হজরত মূছা ও হারুন দুই ভ্রাতাকে মাজেজা শুদ্ধা প্রভু নিরঞ্জন নৈরাকার উহাদিগকে পয়গম্বরি পদবিতে প্রবত্ত করিয়া ঐ ফেরাউনকে সুধরা শিখাইবার জন্য প্রেরিত করিয়া-ছিলেন।"[২] শামসুদ্দীনের একটি সাহিত্যিক মন ছিল; কিন্তু গদ্যরচনায় তা সঞ্চারিত হয়নি। ভক্তগণের মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের গুপ্তকথা প্রচার-উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থে সাহিত্যরস আশা করা যায় না। তবে তাঁর যে কবিত্বশক্তি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা একটি রূপকের মাধ্যমে এভাবে বলেছেন,

ওরে মোর মন ভ্রমরা
কমলের কি মধু পাবি;
কমলের কি মধু খাবি।
জদি কমলিনি মান করে না দেয় মধু দান;
সে সে হয়ে অপমান, অলি নাম কি ডুবাবি।
তাই তোরে আমি বলি
কমলেতে হওগা বলী;
বলী হয়ে অলি হলে, তবে মধু দেখতে পাবি।
আপন দেহে কর বিরাজ,
ছেড়ে দিয়ে লোক লাজ
বানালে জোগির সাজ, তবে মন অলি হবি।[৩]

---

১. খোন্দকার ছমছুদ্দিন মহম্মদ ছিদ্দিকি—উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার্থ লাভ, বিদ্যারত্ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ)।

২. ঐ, পৃঃ ১১

৩. ভাবলাভ, পৃঃ ১৯২

'উচিৎ শ্রবণে'র একটি সুরচিত গজলে কবির সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতা প্রকাশ পেয়েছে :

আমার প্রাণ-প্রেয়সী সরদ শশী হাস্যবদনী।
দীর্ঘনাশি কুটিল কেশী মৃগনয়নী।।
জিজ্ঞাসিল কে হে তুমি
কৈলাস অনুগত আমি
যাবে কোথা জিজ্ঞাসিল আবার কামিনী।।
বল্লেম তারে আদর করে,
যাব আমি তোমার ঘরে
বাঞ্ছা করি তোমার দ্বারে হৈতে দরওয়ানী।।
জিজ্ঞাসিল কি ধন পেলে
তাতে তুমি গেলে ভুলে
কে তোমায় সংসারে বল, কোথায় সাপিনী।।
বল্লেন তব বদন দেখে
হারাইলাম আপন সুখে
সংসারে চাঁচর তোমার হয়ে নাগিনী।।
রবি শশী কিবা নিশি
কার মূল্য বলো বেশী
বল্লেম বেশী তোমার হাসি ঈষদহাসিনী।।[১]

মুনশী আজিমুদ্দীন

মুনশী আজিমুদ্দীন বর্ধমানের মেমারির দক্ষিণে খাঁড়ো গ্রামের জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দুখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—'জামালনামা' (১৮৫৯) ও 'কি মজার কলের গাড়ী' (১৮৬৩)। জামালনামা পদ্যে রচিত রূপককাব্য। 'কি মজার কলের গাড়ী' গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত নকশা জাতীয় রচনা। এদেশে নতুন রেল গাড়ী চালু হলে সাধারণ মানুষের বহির্জীবন ও ভাবজীবনে তার কি কি প্রভাব পড়ে, মুনশী আজিমুদ্দীন ব্যঙ্গের সুরে সে-চিত্র তুলে ধরেছেন। এতে যেমন লেখকের সমাজচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি রচনাভঙ্গি ও ভাষারীতিতে সাহিত্যের স্বাদ ফুটেছে। গ্রন্থের সংলাপগুলি সরল, সরস ও প্রাণবন্ত। শাশুড়ী

১. উচিৎ শ্রবণ।

বউ-এর একটি সংলাপ এরূপ :

"শাশুড়ী। বলি ওগো বয়েরা তোরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই থাকবি গো? ঘরে কি আর কর্ম নেই, বাপের বাসে কখন গাড়ী দেখিসনি নাকি?

বউ। হেঁ বাবু আমরাই না হয় দেখিনি, তোমার বাপ বড় দেখেছে তা কৈ, আই ঠাকরোনকে জিজ্ঞাসি যাই দেখি কেমন তোমার বাপ কলের গাড়ী দেখেছে।"

মুসলমান রচিত প্রথম নক্সা হিসাবে 'কি মজার কলের গাড়ী'র ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকার্য।[১]

মুনশী নামদার

মুনশী নামদার বর্তমানের বলিয়া পরগনার ভূপতিপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর লেখা মুদ্রাকার ১১ খানা পুস্তিকা আছে। পুস্তিকাগুলি অধিকাংশই নক্সা-জাতীয় গদ্য-পদ্যে রচিত। 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ' (১৮৬৩), 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), 'ননদ ভাজের ঝগড়া ও বাঞ্ছারামের গল্প' (ঐ), 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' (ঐ), 'নতুন ঝড়' (ঐ), 'খেদের গান' (১৮৬৮), 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' (ঐ), 'নারীর ষোলকলা' (ঐ), 'মনোহর ফেঁসড়া' (ঐ), 'খেলারামের গীত' (ঐ) ও 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (১৮৬৮)।[২]

প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, সামাজিকবোধ ও রসচেতনা থেকে প্রহসনধর্মী রচনার উদ্ভব হয়। মুনশী নামদার সমসাময়িক কালের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিহীনতা, অন্তঃসারশূন্যতা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণগুলির মুখোশ খুলে দিয়েছেন এসব পুস্তিকায়। তাঁর শ্লীল ও সংযত বাচনভঙ্গিতে ঈষৎ হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। মুনশী নামদার মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি : মধ্য-বিত্তের জীবনে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলি ভেঙে যাচ্ছে তার একটি স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। মুখ্যতঃ এখানেই তাঁর নক্সাগুলির সফলতার কারণ নিহিত আছে।

গোলাম হোসেন

গোলাম হোসেন 'হাড় জ্বালানী' (১৮৬৪) নামে ১৬ পৃষ্ঠার নক্সাজাতীয় পুস্তিকা লেখেন মুনশী নামদারের নামে প্রচারিত 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (১৮৬৮)

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৯৯-১০২

২. ঐ, পৃঃ ১০২-১১৯

পুস্তিকার বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনার সঙ্গে ঐ পুস্তিকার হুবহু মিল আছে। এজন্য মনে করা হয় অল্প খ্যাত গোলাম হোসেনের বই পরবর্তীকালে অধিক খ্যাত মনশী নামদারের নামে প্রকাশক ব্যবসায়ের খাতিরে চালিয়ে দেন।[১] গোলাম হোসেন বসন্তপুরের অধিবাসী ছিলেন।[২]

প্রবাসী পুত্রের অবর্তমানে গৃহে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাথে পুত্রবধুর সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে মনোমালিন্য এবং বৃদ্ধার দুঃখভোগের বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধা মাতাকে শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। পুত্র সব জেনে-শুনে স্ত্রীকেই সমর্থন দেয়। বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ ভেঙে গেছে, পুত্র ও পুত্রবধূর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার। চাকুরী-নির্ভর আর্থিক পটভূমি মানবিক মূল্যবোধ পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। উক্ত নক্সার মধ্যে বাঙালীর মধ্যবিত্ত সমাজের এই পরিবর্তনশীল রূপটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

শেখ আজিমদ্দী

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮, ২ সং) নক্সার লেখক শেখ আজিমদ্দী 'কড়েয়া'র অধিবাসী ছিলেন। এক ধনবান বৃদ্ধ এক ষোড়শীকে বিয়ে করে টাকার জোরে। অল্পকাল পরে তার মৃত্যু হয়। এক যুবককে পতি হিসাবে বরণ করে ঐ কন্যা সুখে জীবন যাপন করে। সরল কাহিনী ও সাধারণ চরিত্র নিয়ে নক্সাটি রচিত। তবে টাকার প্রতাপ সমাজের সুস্থতাকে কিভাবে নষ্ট করছিল তার অশুভ সংকেত শেখ আজিমদ্দী এর মধ্যে তুলে ধরেছেন। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯), দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) একই উদ্দেশ্যে রচিত। ১৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় নাট্যাঙ্গিক পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি।

সংলাপে নাটকীয়তার গুণ আছে:

> "বুড়ী—মর পোড়ার মুখো, হিত বলতে বিপরীত, ফেল্লে বোঝা পরের ঘাড়ে, কেন? আমার কি স্বামী নাই, তুই এ বয়সে বিবাহ করে, বণিতাকে কি আমার স্বামিকে (স্বামীকে) দিয়ে যাবে, তাই বুঝি দুই বেহাই যুক্তিস্থির করিয়াছ। আমার উঠান ঝাট দিবার দীর্ঘ খেঙ্গরা প্রস্তুত আছে।"[৩]

---

১. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ১০৬
২. গোলাম হোসেন—হাড় জ্বালানী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭১
৩. শেখ আজিমদ্দী—কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে, জ্ঞান দীপক যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭৫ (২মুদ্রণ) পৃঃ ৯

আয়েন আলী শিকদার

বরিশাল জেলার মেহেদিগঞ্জ পরগণার অধিবাসী আয়েন আলী শিকদার 'বিধবা বিলাস' (১৮৬৮) নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত একখানি রোমান্টিক রূপকথা রচনা করেন। এর কাহিনী কৃত্রিম, ভাষাও কৃত্রিম। গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম-চন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন: "যুবরাজ প্রেয়সীর পীযূষ বাক্য শ্রবণে হাস্যাননে প্রীতিবচনে কহিলো ওগো প্রেয়সি: নিশামনি করস্পর্শনে রজনীযোগে কুমুদিনী আহ্লাদিনী প্রস্ফুটিতা, মন্দ মন্দ মলয়জ বহিতেছে।"[১] নিছক মধ্যযুগীয় গল্প পরিবেশন ছাড়া 'বিধবা বিলাসে'র আর কোন মূল্য নেই। এটি ঢাকার 'বাঙ্গালা যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়।

মোহাম্মদ ইসমাইল

'শ্রীযুক্ত মহম্মদ স্মাইল উকিল' 'হিন্দু এবং মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব' (১৮৬৯, ২ সং) শিরোনামে একখানি আইনের বই অনুবাদ করেন। লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ধর্মভিত্তিক আইন কানুন 'স্যার উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় সঙ্কলিত হইলে তাঁহার অনুমতিক্রমে' তিনি তা বাংলায় অনুবাদ করেন। এটি মুসলমানের রচিত আইনবিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ। ছাত্র ও আইন ব্যবসায়ীদের পাঠোপযোগী করে তা লিখিত।[২] ১৮৬৪ সালে সরকারের আইনে উর্দু তুলে দিয়ে কেবল বাংলা-ইংরাজীতে ওকালতি ও মুন্সেফগিরি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই অবস্থায় ছাত্রদের জন্য বাংলা আইনের বইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। মোহাম্মদ ইসমাইল সে-প্রয়োজন মিটাবার জন্য এটি রচনা করেছিলেন।[৩]

মোহাম্মদ ইসমাইল রচিত 'জুম্মা ও ঈদের ফতুয়া' (১৯০০) নামে একখানি ধর্মপুস্তিকা পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের ঠিকানা বলা হয়েছে 'বাহাদুরপুর, ফরিদ-পুর'। ১৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানির পরিচয় প্রসঙ্গে বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে মন্তব্য করা হয়েছে, "The Fatwa says that Juma and Id prayers are not allowable in countries where Muhammadan Law is not in force, and specially in those where the Government is Christian and interferces with that Law. The Fatwa is approved by the

১. আধুনিক বাঙ্গলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃ: ১৩৫
২. ঐ, পৃ: ১৬৮
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ চৈত্র, খ, ১৮৬৯

Ulema of Mecca and Medina."[১] ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লা ও দুদু মিঞা প্রবর্তিত ফারায়েজী আন্দোলনের একটি দিক ছিল,—যেদেশে ইসলামী আইন প্রচলিত নেই, সেদেশে জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়া। ফারায়েজীদের মতে ঐরূপ নামাজ 'জায়েজ' বা সিদ্ধ নয়।

উকিল মোহাম্মদ ইসমাইল ও বাহাদুরপুর নিবাসী মোহাম্মদ ইসমাইল দুজন পৃথক ব্যক্তি বলে আমাদের বিশ্বাস। উভয়ের গ্রন্থের রচনার ব্যবধান ত্রিশ বছরের ঊর্ধ্বে।

বগুড়ার মালগ্রাম নিবাসী অপর একজন মোহাম্মদ ইসমাইল 'পরিমল' (১৮৮৭) নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশ করেন। কবি অল্প বয়সে মারা যান।[২]

মীর আশরাফ আলী

মীর আশরাফ আলী প্রণীত চিকিৎসা বিষয়ক তিনখানি পুস্তক আছে— 'ধাত্রীবিদ্যা' (১৮৬৯), 'বাল্যচিকিৎসা' (১৮৭০) ও 'স্ত্রীচিকিৎসা' (১৮৭১)। তিনি 'কলিকাতা শিয়ালদহস্থ কেম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী-চিকিৎসা ও শিশু চিকিৎসার অধ্যাপক এবং চিকিৎসালয়ের স্ত্রীলোক ও বালকদিগের রোগ-পরিদর্শক ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের 'এসিসাটন্ট সার্জ্জন' হিসাবেও কাজ করেন। তিনি প্রধানতঃ কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যোপযোগী করে গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। 'ধাত্রীবিদ্যা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'মেডিকেল কলেজের বাঙলা শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের অধ্যয়নের নিমিত্ত অন্যান্য বিষয় ইংরেজি পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়াছে: তৎসমুদয় পাঠ করিয়া ছাত্রগণ চিকিৎসা বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতেছে, কিন্তু পুস্তকের অসদ্ভাব প্রযুক্ত উক্ত ছাত্রগণ ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে বহুকালাবধি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন।"[৩] পাঠ্যপুস্তকের এই অভাববোধ থেকে মীর আশরাফ আলী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর 'বাল্যচিকিৎসা' প্রণয়নের উদ্দেশ্যও তাই। তিনি ভূমিকায় বলেছেন, অদ্যাবধি অল্প দেশে বঙ্গভাষায় বাল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে কোন বিশেষ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ন্যায় বালকেরা স্বীয় স্বীয় শারীরিক অবস্থান্তর প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই বাল্যচিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সুকঠিন। সুতরাং উপযুক্ত চিকিৎসা-ভাবে অধিকাংশ বালক অকালে কাল কবলে নিপতিত হয়। উল্লিখিত দুর্ঘটনার

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ চৈত্র, খ. ১৯০০
২. হাবেদ আলি—উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য, বাসনা, বৈশাখ, ১৩১৬
৩. ধাত্রীবিদ্যা, দাস এণ্ড সন্স প্রেস, কলিকাতা, ১৮৬৯

কিম্বদংশের প্রতীকার বাসনায় ও কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ বর্ত্তমান ও পূর্বতন ছাত্রদিগের এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পাঠ্যার্থে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বার্ডস প্রণীত ডিজিজেস অব চিলড্রেন, ডাক্তার স্মিথস ডিজিজেস অফ ইনফ্যান্সি এণ্ড চাইল্ডহুড, ডাক্তার ই. স্মিথ ওয়েটিং ডিজিজেস অফ চিলড্রেন, ডাক্তার বেডফোর্ড ক্লিনিকেল লেকচারস এণ্ড ডিজিজেস অফ চিলড্রেন এবং ডাক্তার করবিন্স ম্যানেজমেন্টস এণ্ড ডিজিজেস অফ ইনফ্যান্সি প্রভৃতি সুবিখ্যাত ডাক্তার মহোদয়গণের পুস্তকের সারভাগ নির্বাচন করিয়া এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। বিনা উপদেশে পাঠযোগ করিবার জন্য অতি সরল ভাষায় লিখিতে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি।"[১]

মীর আশরাফ আলী চিকিৎসা বিদ্যার দুরূহ বিষয় সরলভাবে প্রকাশ করলেও তাঁর ভাষা মোটেই সুশোভন হয়নি। তিনি কোনরূপ পরিভাষা ব্যবহার না করে ইংরাজী শব্দগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখেছেন মাত্র।

সৈয়দ আবদুল রহিম

বরিশাল জেলার মাদারীপুরের গোপালপুর গ্রাম নিবাসী সৈয়দ আবদুল রহিম 'ভারত বর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর' (১৮৭০) নামে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০১ পৃষ্টার এই গ্রন্থে 'অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত' ইতিহাস শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমান কর্তৃক বাংলায় ইতিহাস লেখার সম্ভবতঃ এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান আবদুল রহিমের গদ্যের ভাষাকে 'সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল' বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

আবদুল রহিমের অপর কীর্তি 'বালারঞ্জিকা' (১৮৭৩) নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করা ও প্রকাশ করা। মশাররফ হোসেনের 'আজীজননেহার" প্রকাশের আগের বছর 'বালারঞ্জিকা' আত্মপ্রকাশ করে। 'ঢাকা প্রকাশে' (১৬ বৈশাখ ১২৮০) এর সমালোচনা বের হয়। এযাবৎ যতদূর জানা গেছে এটিই মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা।[৩] ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বালারঞ্জিকা'কে 'সাপ্তাহিক' পত্র বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

---

১. বাল্যচিকিৎসা, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৭৫ (২ সং) পৃঃ /. (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

২. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ১৬৯ (২ সং)

৩. এই অধ্যায়ের 'পত্রপত্রিকা' অংশ দ্রষ্টব্য

৪. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃঃ ৩৯৪

মুনশী মোহাম্মদী

বর্ধমানের মুনশী মোহাম্মদী, গোলাম রব্বানী ও দুর্গানন্দ কবিরত্ন 'হাতেমের উপাখ্যান' (১৮৭৪) নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্ধমানের মহারাজা আফতাবচন্দ্র মহতাব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে এটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। হাতেম তাই পারস্য কাহিনীর একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান। সত্যবাদী, নীতিবাগীশ, পরহিতকারী ও দানবীর হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি প্রচারিত হয়ে আসছে। অনুবাদকগণ তাঁদের রচনায় সেই আদর্শই তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, "পাঁচটি প্রশ্ন সম্বলিত 'হাতেমের উপাখ্যান' নামক এই গ্রন্থখানি পুনরায় সংশোধিত হইল, প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে মহাসাহসী পরোপকারী বদান্যবর হাতেমের গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"[১] মুনশী মোহাম্মদী ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নকে 'চাহার দরবেশ' (১৮৮৪) নামে অপর একটি গ্রন্থ অনুবাদে সহযোগিতা দান করেন। ব্রজেন্দ্রকুমার 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, 'মুনশী মহম্মদীর সাহায্যে পারস্য অক্ষরে লিখিত পুস্তক যুগলের সহিত মিলন করিয়া লইয়াছি।"[২] এটিও বর্ধমানের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্য লাভ করে।

মোহাম্মদ আবদুল করিম (জন্ম ১৮৫৪)

মোহাম্মদ আবদুল করিম 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫) নাটক লিখেছিলেন। তিনি মালদহের শ্যামপুর-বাজিতপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাঠশালায় 'দীননাথ মিত্র নামক একজন রাঢ় দেশীয় কায়স্থ' শিক্ষকের কাছে বাংলা শিখে ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শেরশাহাবাদ পরগণার নওয়াদা মহলে জমিদার মিত্রের অধীনে নায়েবের চাকুরী গ্রহণ করেন।[৩] মশাররফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) ও 'জমিদার দর্পণে'র (১৮৭৩) পরেই আবদুল করিমের 'জগৎমোহিনী' নাটক। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "আমি এই জগৎমোহিনী আখ্যায়িকাটি কোন এক সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী মহাত্মার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি কোন এক

---

১. মুন্সী মহম্মদী, গোলাম রব্বানী এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ন—হাতেমের উপাখ্যান, সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বর্ধমান, ১৮৭৩ (২ সং), 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

২. ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন তথা মুন্সী মহম্মদী—চাহার দরবেশ, অধিরাজ যন্ত্র, বর্ধমান, ফাল্গুন, ১২৯১, পৃঃ ।, (বিজ্ঞাপন)।

৩. আব্দুল হক—মহম্মদ আবদুল করিমের 'আশাবৃক্ষ', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮, পৃঃ ১২৪

সুবিখ্যাত গ্রন্থ মধ্যে লিখিত আছে বলিয়া উপন্যাস ছলে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ...ইহাতে জগৎমোহিনীর রূপ বর্ণনা ও রাজসভা বর্ণন এবং পিতাপুত্রের পুনঃ দর্শন, বিলাপ, অবকাশ বিহিনে সংক্ষেপে থাকিল আগামীতে পরিশোধ হইবে।"[১] তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে উক্ত কাহিনীকে নাট্যরূপ দেন। রাজপুত্র-রাজকন্যার রোমান্সসুলভ প্রেমোপাখ্যানকে নাট্যরূপ দিয়ে আবদুল করিম আকর্ষণীয় গল্প ছাড়া কোন নতুন জীবনবোধ বা সামাজিক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করতে পারেননি। বৃদ্ধ রাজা নিশিকান্তের চরিত্র চিত্রণে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 'রোঁ'র (১৮৬০) ভক্ত প্রসাদের ছায়াপাত আছে। বিশুদ্ধ গদ্যে সংলাপ রচিত হয়েছে।

আবদুল করিমের অপর গ্রন্থ 'আশাবৃক্ষ' (১৮৯২, অপ্রকাশিত); এর প্রথম খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিতে নিজ বংশাবলী ও এবং বাল্যজীবনের স্মৃতি কথার বিবরণ আছে।[২] তিনি ভূমিকায় বলেন, "আমার এই আশাবৃক্ষের অনেক আশা। ... প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ক্রমেই লিখিব। যাহা লিখিলাম বা লিখিব প্রকাশ্য নহে। জ্ঞানী পাঠকগণ আশাবৃক্ষ হইতে বুঝিয়া লইতে পারিবেন যে, আমার আশা কি।"[৩] তিনি বলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষ শের শাহের সেনা বিভাগে সুবেদার ছিলেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ মনিরুদ্দীন আর্থিক স্বচ্ছলতা হারিয়ে সাধারণ গৃহস্থে পরিণত হন। তাঁর সাহিত্যচর্চার কোন পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না। গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর শিল্প সাধনা অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। আশাবৃক্ষের গদ্য সরস এবং চিত্রধর্মী। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আত্মজীবনী হিসাবে (মুসলমান রচিত)-এর স্থান হত দ্বিতীয়।

যশোহরের খড়কি গ্রামনিবাসী অপর একজন মোহাম্মদ আবদুল করিম ছিলেন (মৃত ১৯১৫)। তিনি 'এরশাদে খালেকীয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব' (১৯০১) নামে মারফতী তত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে নক্সবন্দিয়া, কাদেরিয়া, চিশতীয়া সুফীমতের আলোচনা আছে। লেখক নিজে নক্সবন্দিয়া মতের সুফী সাধক ছিলেন। গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "স্বদেশীয় ভ্রাতাদিগকে খোদাপ্রাপ্তি পথ প্রদর্শন করা এবং তাহাদিগকে ধর্মে পরিপক্ব করা এই কেতাবের উদ্দেশ্য; অর্থোপার্জ্জন বা বিদ্যা প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। অল্প লোক বিদিত কঠিন বাঙ্গালা শব্দসমূহ

---

১. আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ১৪৮

২. পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৬৮

৩. ঐ, পৃঃ ১১৭

পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণ বিদিত আরবী ও পারসী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং যে শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত নাই ও যে শব্দকে বঙ্গভাষায় আসিলে অর্থের সম্পূর্ণ অঙ্গ পরিস্ফুট হয় না, বরং কোন কোন অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই শব্দকে মূল আরবী ও পারসী ভাষায় রাখিয়া টীকা দ্বারা কিম্বা বন্ধনী চিহ্ন মধ্যে তাহার অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। আর যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অনুবাদ মূল গ্রন্থের ভাবে রাখা হইয়াছে।"[১]

মোহাম্মদ আবেদিন

মোহাম্মদ আবেদিনের 'ধর্মপ্রচারিণী' (১৮৭৫) ধর্ম ও নীতিমূলক কবিতা পুস্তক। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, "এই পুস্তক নানা প্রকার ধর্মশাস্ত্র দৃষ্টে প্রস্তুত করিলাম, ইহার দ্বারা মানবগণের কিছু উপকার হইলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[২] ৬৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৩৩টি কবিতা আছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এগুলি রচিত। পীরবাদী মরমী সাধনার তিনি বিরোধী ছিলেন। নাচ-গান, মাজার-দরগাহ, শিরনী ইত্যাদি আচরণকে 'বেদাত' জ্ঞানে বর্জন করতে বলেছেন।

তবলা বেহালা বিনা (বীণা) করে লয়ে কত জনা,
নাচে সবে নটির সমান
এমামের নামে রাজা, কেহ করে ভূতপূজা,
মাদারের নামে বান্ধে স্থান।
বাপদাদা আদিক্রমে, মুর্দারের নামে নামে,
চিনি রুটি দেয় কতজন।
মোরে (মরে) গেল যেই জন, নাই যার প্রাণধন
সেকি কভু করয়ে ভক্ষণ।[৩] (বেদাত)

'স্বদেশ' নামক কবিতায় 'বোদা' গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে, সম্ভবতঃ ঐ গ্রাম কবির জন্মভূমি।

ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩)

কুমিল্লার হোমনাবাদের জমিদার নবাব ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী মোট চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হল 'রূপজালাল' (১৮৭৬) 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত'

---

১. মোহাম্মদ আবদুল করিম—এরশাদে খালেকীয়া বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (২ সং), পৃঃ ৵., (প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)।

২. মহম্মদ আবেদিন—ধর্মপ্রচারিণী, বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র, কলিকাতা, ফাল্গুন, ১২৮১

৩. ঐ, পৃঃ ২৯

(১৮৮৭), 'সঙ্গীত সার' ও 'সঙ্গীত লহরী'।[১] গদ্যে ও পদ্যে রচিত রূপ-জালাল রূপকধর্মী আখ্যায়িকা। ৪৭৫ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থের পদ্যাংশ মধ্যযুগের পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত, গদ্যাংশ বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম রীতিতে রচিত। তাঁর ভাষা মার্জিত ও বিশুদ্ধ। এ ভাষা আরবী-ফারসীর প্রভাবমুক্ত এবং সংস্কৃতগন্ধী। রূপজালাল আখ্যানের 'বারমাসী'র ঢঙে রচিত একটি অংশ এরূপ :

বৈশাখ আগত পুষ্প বিকশিত
সুগন্ধে আমোদিত অতি।
ঘ্রাণ পেয়ে ভৃঙ্গ করে নানা রঙ্গ
মধু পান করে নিতি॥ ...
কার্তিকে কাতর অবলা অন্তর
চন্দ্রের কিরণ হেরি।
শরদের শশী উজ্জ্বল নিশি
মম বৈরী সে শর্বরী॥[২]

গদ্যের দৃষ্টান্ত : "নিম্ববৃক্ষের মূলে ইক্ষুরস সিঞ্চন করিলেও তাহাতে মিষ্ট ফল ফলে না এবং পলাশ তরুতে সতত পরিমল প্রদান করিলেও তাহার পুষ্পে কখনও সুগন্ধ ধারণ করে না।"[৩]

শিমাইল দেশের রাজপুত্র জালাল ও ওমর নামক এক সাধু পুরুষের রূপবতী কন্যা রূপবানুর প্রণয় কাহিনী রূপজালালের বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে তিনি মধ্য-যুগের প্রণয়োপাখ্যানগুলির কাব্যাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। রূপকথার অলৌকিকতা দ্বারা কাহিনী আচ্ছন্ন। আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার কোন লক্ষণ গ্রন্থের মধ্যে ফুটেনি। ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে ফয়জুন্নেসা 'অনুক্রমণিকা'র উল্লেখ করেছেন।

ফয়জুন্নেসার অন্য গ্রন্থগুলি দুর্লভ। জমিদার পরিবারে বাংলা সাহিত্য চর্চার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। ফয়জুন্নেসা ব্যক্তিগত চেষ্টায় নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে বাংলা পুস্তক পাঠ করে বাংলা ভাষা আরম্ভ করেন। ফারসী ও উর্দু চর্চা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল। বঙ্গের একপ্রান্তে আধুনিক শিক্ষা বঞ্চিতা এক বিদুষী মহিলার এরূপ সাহিত্য সাধনা বিস্ময়কর। তাঁর প্রেরণা ছিল অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত।

১. শতবার্ষিকী স্মরণিকা, কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা, ১৮৭৫, পৃঃ ৩৩
২. ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী—রূপজালাল, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৭৬, পৃঃ ৪১১
৩. ঐ, পৃঃ ৩১৩

শেখ আবদুল লতিফ

'মানব সংস্কারক' (১৮৭৮) গ্রন্থের প্রণেতা শেখ আবদুল লতিফ মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। এটি প্রবন্ধের বই। 'মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা' ও 'মনুষ্য জীবন' এই দুভাগে ভাগ করে মোট ২১টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচিত। 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক ভূমিকায় লেখক পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আজকাল আমাদের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়াছে, তোমরা তোমাদের কার্য্যে অত্যন্ত অযত্ন করিতেছ, কর্তব্য প্রায়ই বিস্মৃত হইয়াছ, বিষময় ফল সহ্য করিতেছ। ...তোমাদের নয়ন উন্মীলন নিমিত্তই ইহা প্রকাশিত হইতেছে।"[১] তিনি অধিকাংশ প্রবন্ধে সাধারণ মানুষকে নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছেন। দু একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদের সুর আছে। 'বঙ্গদর্শনে' 'মানব সংস্কারকে'র সমালোচনা হয়। সেখানে লেখকের ভাষার প্রশংসা করা হয় বটে, কিন্তু বক্তব্যের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। "গ্রন্থকারের নাম পড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ভয় হইয়াছিল কিন্তু পরে দেখিলাম যে গ্রন্থখানি হিন্দুর বাঙ্গালায় লিখিত, কায়স্থের ভাষায় লিখিত, ব্রাহ্মণের ভাষা বলিলেও ক্ষতি নাই। তদ্ব্যতীত প্রশংসার আর কিছুই নাই।"[২] অবশ্য আবদুল লতিফের বক্তব্য একেবারে তুচ্ছ ছিল না। তাঁর চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ ও জড়তামুক্ত ছিল। মননশীল রচনা হিসাবে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

বাংলা গ্রন্থ-প্রণেতা আরও কয়েকজন আবদুল লতিফের নাম পাওয়া যায়। এক আবদুল লতিফ 'ধর্মপ্রকাশ' (১৮৭৩) নামে একখানি মুসলমান আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি আবদুল্লাহ আল ওবায়দীর 'তুহফাতুল-হিন্দ' (উর্দু) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কলিকাতার 'মর্তুজা প্রেস' থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ঐ গ্রন্থে লেখকের ঠিকানা দেওয়া আছে: 'মৌজা খরকা, থানা কুদনা, জেলা পুর্ণিয়া'।[৩]

অপর একজন আবদুল লতিফ 'মসলা বিস্রাট' (১৯০১) নামে ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর ঠিকানা: 'কাকিনা, রংপুর'। এটি কলিকাতার মেরাজ-উল-ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।[৪]

---

১. শেখ আবদুল লতিফ—মানব সংস্কারক, মেদিনীপুর, ১৮৭৮, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।
২. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৫
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ.খ., ১৮৭৪
৪. ঐ, ১ ত্রৈ.খ., ১৯০২

আবদুল লতিফ আহমদ 'ধর্মতত্ত্ব' (১ খণ্ড, ১৮৯৬) শীর্ষক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এটি ঢাকার গোপীনাথ বসাক কর্তৃক 'সামন্তক প্রেসে' মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে বাইবেলের বিরূপ সমালোচনা করে লেখা হয়।[১]

হাকিম আবদুল লতিফ ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় অবস্থান করতেন। 'ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা প্রণালী' (১৮৯২) নামে তাঁর একখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ আছে। 'খিদিরপুর মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।[২]

কাজিম উদ্দীন আলী খান

তাঁর চারখানি কবিতার পুস্তিকা পাওয়া যায়; 'ঘর জামাইর দুঃখের কথা' (১৮৭৯), 'নবলীলা' (ঐ), 'বিধবার মনের কথা' (১৮৮৭) ও 'বাউল সঙ্গীত' (ঐ)। প্রথম দুটি ময়মনসিংহের আনন্দ প্রেস থেকে ছাপা; শেষের দুটি টাঙ্গাইল থেকে ছাপা। কবির ঠিকানা: 'চাবান, আটিয়া, ময়মনসিংহ'। এগুলি লঘুরসের ব্যাঙ্গাত্মক রচনা। 'বাউল সঙ্গীত' বাউল গানের সংকলন।[৩]

কাদের আলী

বালিয়া পালশার অধিবাসী কাদের আলী 'মোহিনী প্রেম-পাশ' (১৮৮০) নাটক রচনা করেন।[৪] চার অঙ্কের এই নাটকটি পারিবারিক অন্তর্জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা: জমিদার পুত্র রসিক ও পুত্রবধূ মোহিনীর দাম্পত্য প্রেম নাটকের বিষয়বস্তু। রূপসী মোহিনী রূপহীন রসিককে অবজ্ঞা করলে রসিক গৃহত্যাগ করে রূপগর্বিনী মোহিনী পর-পুরুষের প্রতি আকৃষ্টা হয়, কিন্তু শীঘ্রই তার চৈতন্যোদয় হয় ও পতিপ্রেম জাগ্রত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলনে নাটক শেষ হয়েছে। সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে একটা চাপা অভিযোগ আছে— নরনারীর বৈবাহিক মিলনে ইউরোপীয় সমাজে যে স্বাধীন নির্বাচন আছে, ভারতীয় সমাজে তা নেই। এজন্য দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ হয়। অনেক সময় ব্যভিচারও প্রবেশ করে। নাট্যকার এরূপ একটা প্রশ্ন তুলেছেন বটে, কিন্তু সমাধান দিয়েছেন চিরাচরিত পদ্ধতিতে। সমাজের নিয়ম ভাঙবার মত মুক্ত চিন্তার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, নাট্যদ্বন্দ্ব

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ,খ., ১৮৯৬
২. ঐ, ৩ ত্রৈ.খ., ১৮৯২; দি মোসলেম ক্রনিকল; ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯০১
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ.খ., ১৮৭৯; ২ ত্রৈ,খ., ১৮৮৭
৪. শ্রী কাদের আলী প্র.স.—মোহিনী প্রেম-পাশ, গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১২৮৭

সৃষ্টিতে কাদের আলীর দুর্বলতা ছিল। নারায়ণ স্কুলের শিক্ষক রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে নাটকখানি উৎসর্গ করা হয়। নাটক রচনার প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন বলে তিনি 'উপহার-পত্রে' উল্লেখ করেছেন।

নাটকের বিজ্ঞাপনে 'প্রণয় কি পদার্থ' নামে কাদের আলীর অপর একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।[১]

মোহাম্মদ আবদুল কাদের

ময়মনসিংহের আবদুল কাদের তিনখানি গ্রন্থ লেখেন: 'সাধু সৌরভ' (১৮৮১), 'পুষ্পোদ্যান' (১৯০১) ও 'গোলেস্তার বঙ্গানুবাদ' (১৯০৫)। প্রথমটি কবিতার বই—নিরাসক্ত অমর্ত্য প্রেমের কথা বলা হয়েছে।[২] 'পুষ্পোদ্যান সাদীর ফারসী কবিতার গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত অনুবাদ।[৩] তৃতীয়টি ফারসী কাব্যের অনুবাদ।[৪]

জহিরুদ্দীন আহমদ

জহিরুদ্দীন আহমদ একজন শল্য-চিকিৎসক হিসাবে কলিকাতায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৭১ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এল. এম. এস. পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি চাকুরী জীবনে কলিকাতার 'ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক ও ক্যাম্বেল হাসপাতালের অস্ত্র চিকিৎসক' ছিলেন। শুধু ডাক্তার হিসাবে নয়, তিনি সমাজ ও সংস্কৃতি সেবক হিসাবেও কলিকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৯৫ সালে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। ঐ বছর সিরাজুল ইসলাম ও বদরুদ্দীন হায়দারও নির্বাচিত হন।[৫]

জহিরুদ্দীন আহমদ 'ভীষক-দর্পণ' (জুলাই ১৮৯১) নামে একখানি 'চিকিৎসা-তত্ত্ব বিষয়ক মাসিকপত্র' সম্পাদনা করেন। পত্রিকাখানি সরকারী অর্থানুকূল্যে চলত। এতে রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসাপদ্ধতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি চিকিৎসা জগতের সংবাদ ও নিবন্ধ স্থান পেত। ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায় সহকারী সম্পাদক ও ডাঃ গিরিশচন্দ্র বাগচী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৯০০ সাল পর্যন্ত 'ভীষক-দর্পণ' চালু ছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকারের লেখা এতে মুদ্রিত হত। ডাক্তার আবদুল আজেদ খাঁ চৌধুরী এবং স্বয়ং সম্পাদক নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন।

১. মোহিনী প্রেম-পাশ, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।
২. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ,খ., ১৮৮১
৩. ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ খণ্ড, পৃ: ১৬৩
৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ,খ., ১৯০৫
৫. দি মোসলেম ক্রনিকল, ১৪ মার্চ, ১৮৯৫

জহিরুদ্দীন আহমদ 'অস্ত্র-চিকিৎসা' (১৮৮৩) নামে একখানি বৃহৎ চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শল্য চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থখানি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূর্ণ করেছিল। তিনি প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, "বঙ্গভাষায় অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকাভাবে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষয়িতব্য বিষয়গুলি স্ব স্ব হস্তে লিখিয়া স্মরণার্থ বহু যত্নপূর্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং শিক্ষকগণকে স্ব স্ব উপদেষ্টব্য বিষয়গুলি ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিতে হয়, ইহাতে উভয় পক্ষেরই অযথা পরিশ্রম ও অনর্থক কালক্ষেপ হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধা নিবারণ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমি স্বয়ং অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ছাত্রগণকে অভিলাষানুযায়ী শিক্ষাদানে যারপর নাই অসুবিধা বোধ করিয়াছি। তাহাতেই তিন বৎসরের অধিক হইল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই যাহাতে উপকার হয়, এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রচার করিতে আমার অভিলাষ জন্মে। ... কিছুদিন পরে, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে মেডিক্যাল স্কুলের জন্য দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার সভ্যগণও এ বিষয়ে আমাকে আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করেন। ... এক্ষণে ঐ কার্য্যে শেষ করিয়া আমার দীর্ঘকালের যত্নপ্রসূত 'অস্ত্র-চিকিৎসা' সাধারণের হস্তে সাদরে সমর্পণ করিতেছি। অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহুবিধ ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র হইতে সংগৃহীত সারাংশের অনুবাদ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আবশ্যক বোধে বঙ্গদেশস্থ লব্ধ প্রতিষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসকগণের মতামতও সংকলন করিয়া স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।"[১] জহিরুদ্দীনের ভাষা শুদ্ধ, তিনি অনেক ক্ষেত্রে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা করেননি। তাঁর রচনার একটি দৃষ্টান্ত এরূপ: "করোটীর উপরিস্থ কোমল গঠনের নাম স্ক্যালপ। উহা অকসিপিটোফ্রন্টালিজ নামক পেশীর এপিনিউরোসিসের সহিত সম্বন্ধ (যুক্ত) এবং তন্মধ্যে বহু সংখ্যক রক্তবহা নাড়ী বিদ্যমান আছে। এজন্য উহাতে ক্ষতাদি উৎপাদিত হইলে স্ল্যাফে পরিণত না হইয়া প্রায়ই শুষ্ক হইয়া যায়।"[২]

১. জহিরুদ্দীন আহমদ—অস্ত্র-চিকিৎসা বা সার্জারি, বরাট প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৩ (২ সং), পৃ: ৵. (বিজ্ঞাপন)।

২. ঐ, পৃ: ১৯৩

আবদুল আলা

ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দের-বেখুলিয়া গ্রাম নিবাসী আবদুল আলা 'কবিতা কুসুমমালা' (১ ভাগ, ১৮৮৩) রচনা করেন। এতে সাদী, হাফেজ ও জামীর ফারসী কবিতার ভাবানুবাদ সহ আরও অন্যান্য কবিতা আছে। কাব্যের প্রেরণা ও উৎস সম্বন্ধে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "কবিতা কুসুমমালা প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার স্থানে মহাকবি সেখ সাদী, মহাত্মা হাফেজ ও মওলানা জামী প্রভৃতি সুবিখ্যাত পারসিক কবিগণ প্রণীত কতিপয় প্রসিদ্ধ ও মনোহর গ্রন্থের অন্তর্গত নানাবিধ সুললিত প্রবন্ধ, গজল ও রেখতা ইত্যাদির অনুবাদ ও মর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। পারসী ভাষা যে অতিশয় মিষ্ট ও সুশ্রাব্য, ইহা কে না স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ পূর্বোক্ত প্রাতঃস্মরণীয় কবিকুল কাব্য-কাননে যে সমস্ত সুরভি কুসুম-তরু রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রস্ফুটিত প্রসূন-রাজির সুবিমল সৌরভে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সেই কবিগণের সুললিত শব্দবিন্যাস ও কমনীয় কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াই আমি তাঁহাদের কতকগুলি খণ্ড কবিতার অনুবাদে ব্রতী হইয়াছি। ... অনুবাদিত খণ্ড কবিতাসমূহের মধ্যে কয়েকটী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।"[১] 'চারুবার্তার ভূতপূর্বক সম্পাদক ও রাজস্থান অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়' আবদুল আলার কাব্যখানি সংশোধন করে দেন বলে তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ৮৪ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১৪টি কবিতা আছে। কোন কোন কবিতার শীর্ষে রাগতালের উল্লেখ আছে। কবির চিত্রধর্মী ভাব ও সঙ্গীতধর্মী ভাষা বেশ উন্নতমানের ছিল।

> গভীর নিশীথ, জগত মোহিত,
> সুখের শয়নে সবে সুশায়িত
> বনপ্রিয় জাগি ধরেছে সঙ্গীত
> মনোমুগ্ধকর মধুর স্বরে।
> প্রকৃতি সুন্দরী মগনা নিদ্রায়
> বোধ হয় যেন জাগাইতে তায় ;
> পিক সুললিত সঙ্গীত শুনায়
> রহিয়ে রহিয়ে ঘুমের ঘোরে।[২] (নিশীথ চিন্তা)

বিশুদ্ধ মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম আবদুল আলার কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। ফারসী কবিতার ভাবকে তিনি আত্মস্থ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছেন।

---

১. আবদুল আলা—কবিতা কুসুমমালা (১ ভাগ), বরার্ট প্রেস, কলিকাতা, কার্তিক, ১২৯০, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. কবিতা কুসুমমালা, পৃঃ ১

সলিমুদ্দীন আহমদ

সলিমুদ্দন আহমদের 'প্রেমাবলী' (১৮৮৩) হাফিজের সুফীমতের ফারসী কবিতার সহজ বঙ্গানুবাদ। সলিমুদ্দীন পটুয়াখালীর মুন্সেফ কোর্টের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি 'হেতুবাদ' শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছেন, "বঙ্গভাষায় সদ্ভাব-শতক নামক যে গ্রন্থ আছে, তাহা অতি কঠিন রূপে প্রায় সংস্কৃত শব্দ দ্বারা লিখিত হওয়ায় সর্বসাধারণের বুঝিবার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর বিধায়, আমি অতি কষ্টের সহিত তাহাকে প্রায় রূপান্তরিত করিয়া সহজ বঙ্গ ভাষায় রচনা করিলাম। প্রার্থনা সর্বসাধারণের মনোরম্য এবং আদরণীয় হয় ও তদহেতু আমি সকলেব আশীর্বাদ ভাজন হই।"[১] পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিশুদ্ধ বাংলায় হাফিজের নীতিমূলক কবিতাগুলি অনূদিত হয়েছে।

আবদুল গণি

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের আবদুল গণির ছোট ছোট ৩খানি বই আছে: 'হেঁয়ালী কৌমুদী' (১৮৮৩), 'মোসলেম সমাজ সমালোচনা' (১৯০৭) ও 'ইসলাম বিলাপ'। প্রথমটি ধাঁধার সংকলন; দ্বিতীয়টিতে বাংলার মুসলমানের সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতির কথা বর্ণিত হয়েছে; তৃতীয়টিতে বাংলার মুসলমানের সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতির কথা বর্ণিত হয়েছে; তৃতীয়টি কবিতার বই।[২]

আজিজুন্নেসা খাতুন

তেঁতুলিয়ার জমিদার-পত্নী আজিজুন্নেসা 'হারমিট বা উদাসীন' (১৮৮৪) নামে টমাস পার্নেলের বীররসাত্মক 'হারমিট' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। হামিদুল্লাহ খান তাঁর স্বামী ছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান মহিলা। সমকালীন সাপ্তাহিক 'মুসলমান-বন্ধু'তে হারমিটের সমালোচনা হয়। তাতে লেখা হয়: "অধুনা বঙ্গদেশে মুসলমান স্ত্রীগণের মধ্যে কবিত্ব বড় দৃশ্যমান হয় না বোধ হয় প্রণয়িত্রী (লেখিকা) পাঠক-পাঠিকাদিগেব নিকট বিশেষ আদৃতা হইবেন।"[৩]

১. ছলিম অদ্দিন আহমদ—প্রেমাবলী, সামন্তক প্রেস, ঢাকা, ১৮৮৩

২. মুসলমান-বন্ধু, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ২৫ আগস্ট ১৮৮৪,

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ,খ., ১৮৮৩; ১ ত্রৈ,খ., ১৯০৮

ফজলর রহমান

ফজলর রহমান পাবনার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পাশ করেন। তিনি কলিকাতায় প্র্যাকটিস করতেন। তিনি মহীশূর রাজ পরিবারের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন।[১] চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর দুখানি পুস্তক আছে: 'যকৃৎ প্লীহা, মূত্র-পীণ্ড ও তদনুসঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্র সকলের পীড়া' (১৮৮৪) ও 'বক্ষঃপীড়া' অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন ও লিম্ফবাহিকা সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকলের পীড়া' (১ও২খণ্ড ১৮৮৬)। রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, 'শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় যে পীড়া ভেষকের অধীন তৎসমুদয় ইহাতে সুবিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, অত্র বক্ষঃপীড়াখানি বিশেষতর রবার্টের প্রণালীমতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে; রবার্ট, নিমায়ার, ফদারজিল্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ ও নব আবিষ্কেত্রতা ও বর্তমান প্রচলিত সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মত হইতে উদ্ধৃত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক খণ্ড অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগের পরীক্ষোপযোগী বিষয় সকল বিস্তারিতরূপে বিবর্ণিত আছে, অথচ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ব্যক্তিগণ স্কুলে অধ্যয়নও না করিয়াছেন তাঁহারাও ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকারে সমর্থ হইতে পারিবেন।"[২] ফজলর রহমানের ভাষা সহজবোধ্য ও ব্যাকরণগত শুদ্ধ; তবে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার বিশিষ্ট শব্দগুলির বাংলা প্রতি-শব্দ প্রায় ব্যবহার করেননি।

মোহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২)

২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার চণ্ডীপুর গ্রামে আব্বাস আলী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার 'আলতাফী প্রেসে'র ম্যানেজার হিসাবে বহু গ্রন্থ প্রচারে সহায়তা করেন। তিনি এক সময় 'মোহাম্মদী' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ হন। 'চণ্ডীপুর ইসলামী মেলা' তিনি প্রবর্তন করেন। তিনি বসিরহাটের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ধর্মবিষয়ক একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যথা 'মেসবাহুল মসলেমিন' (১৮৭৯), 'গোল-জার এসলাম' (১৮৮১), 'মহরম উৎসব' (১৮৮৪), 'ফতুহুস সাম' (১৯০৫), 'বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ' (১৯০৭), 'মসায়েলে জহুরিয়া' (ঐ), 'ফতুহল মেসের' (১৯১২), 'জুম্মার খুতবা' ইত্যাদি।

---

১. ফজলর রহমান—বক্ষঃপীড়া, বিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬, আখ্যা পত্র দ্রষ্টব্য।
২. ঐ, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

'মহরম উৎসব' বিষ-প্রয়োগে ইমাম হাসানের মৃত্যু থেকে কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেনের মৃত্যু পর্যন্ত বিষাদময় কাহিনী নিয়ে রচিত। গ্রন্থরচনার উৎস ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করে লেখক 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন, "... মহম্মদ-দৌহিত্র হাসেন ও হোসেন প্রাণত্যাগ স্মরণ রাখিবার জন্য ও তাঁহাদিগের জন্য শোকপ্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আরব্য ও পারস্য ভাষায় এই সম্বন্ধে বহু সংখ্যক গ্রন্থ আছে। ... বাঙ্গালা দেশের বঙ্গভাষাজ্ঞ মুসলমানদিগের এই সম্বন্ধে সত্য বিবরণ অবগত হইবার কোন উপায় নাই। এই অভাবপূরণ করিবার জন্য, 'সিররুস সাহাদতেন' 'ছাওসাএকে মহবেকা', 'তহরিরুস সাহাদতেন', 'জিকরুস জাহাদতেন' ও 'এনাসিরুস সাহাদতেন' প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সংগৃহীত হইল। ইহা দ্বারা ধর্মবিরুদ্ধ মহরমের আমোদ যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে দমন হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।"[১] তিনি ভারতবর্ষে যেভাবে মহরম উৎসব পালিত হয়, তার বিরোধিতা করেছেন। তাজিয়া নির্মাণ, তাজিয়াদি সহ শোকযাত্রা ও তাজিয়া বিসর্জনকে তিনি হিন্দুদের মূর্তিপূজার ও প্রতিমা বিসর্জনের নকল বলে উল্লেখ করেছেন।[২] তিনি এরূপ শরীয়ত বিরোধী ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ করার সপক্ষে মত প্রচার করেছেন।

সৈয়দ আবদুল আগফর

সৈয়দ আবদুল আগফর শ্রীহট্টের লস্করপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়। 'তরফের ইতিহাস' (১৮৮৬) ও 'ইসলাম দর্পণ' (১৯০৩) 'তরফের ইতিহাস' তরফের শাসনকর্তা আচক, নারায়ণকে পরাভূত করে পাঠান সেনাপতি সৈয়দ শাহ সমিরুদ্দীন কর্তৃক ক্ষমতা বিস্তার ও তাঁর বংশধরগণের শাসনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[৩] লেখকের মতে 'তরফের প্রসিদ্ধ সাত আনী নয় আনীর জমিদারদিগের বিশেষ বিবরণ' এই গ্রন্থখানি। তিনি 'নয় আনী' জমিদারগণের যে বংশ-লতিকা দিয়েছেন, তাতে শেষ অধঃস্তন পুরুষ হিসাবে তাঁর নাম আছে। ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং জাতীয় জীবনে ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য়

---

১. মোহাম্মদ আব্বাস আলী—মহরম উৎসব, পোস্ট-ডেসপ্যাচ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৪, বিজ্ঞাপন

২. বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনারা নিজ হস্তে হাসেন ও হোসেনের 'কবর' প্রস্তুত করিয়া 'জিয়ারৎ' করেন, আর হিন্দুরা মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলিকা গড়াইয়া পূজা করে, এই দুই কার্য্যে প্রভেদ কি? মহরম সরার নিয়মানুসারে কি শিয়া, কি সুন্নি সকল মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে পাপজনক।" ঐ, পৃঃ ।. (উপক্রমনিকা)।

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ. খ., ১৯৮৬

বলেছেন, "'ইতিহাস' এই বর্ণ চতুষ্টয় মানবজগতের অতীত কালের সাক্ষী বর্তমানের উপদেষ্টা ও ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। ইতিহাস জাতীয় উন্নতির এক প্রধান অবলম্বন, পতিত জাতির উন্নতি সাধনে সিদ্ধমন্ত্র, পূর্বপুরুষের শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বলবীর্য্য, ধৈর্য্য ও জ্ঞান গাম্ভীর্য্যাদির অঙ্গ যখন দৃষ্টি পথে পতিত ও মানসক্ষেত্রে প্রতিভাসিত হয় তখন মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে এক প্রকার মহাশক্তি আসিয়া প্রবেশ করে। সেই শক্তিযোগে অতি নির্জীব আত্মাও তেজোবল সম্পন্ন হইয়া উঠে।"[১] তিনি আরও বলেছেন, "কেবল কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহাদি বর্ণনা করিয়া একটা প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিলেই যে তাহা প্রকৃত ইতিহাস নামে বাচ্য হইতে পারে, তাহা নহে। ইতিহাসে যে কোন জাতীয় মানুষের রীতিনীতি কার্যকলাপ ও আচার ব্যবহার ও অবস্থাদি সম্যকরূপে পরিবর্ণিত হওয়া চাই। যাহাতে এক জাতীয়, এক দেশীয় বা এক ধর্মাক্রান্ত সম্প্রদায় বিশেষের যাবতীয় সত্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস।"[২] সৈয়দ আবদুল আগফর বাঙালীর ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, "অধুনা এদেশে যে সমস্ত ইতিহাস প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশীয়ের প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই অনুবাদ মাত্র। তদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যোদ্ধারের জন্য কি অনুসন্ধানের জন্য কেহই যে যত্নপর হইয়াছেন তাহার প্রমাণ অতীব বিরল। ... ভিন্ন দেশীয় যতই কেন দূরদর্শী হউন না, তিনি কখনই সেই ভিন্নদেশের ভিন্ন জাতির ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সামাজিক কি নৈতিক আচার ব্যবস্থার, রীতিনীতি সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারেন না। মাত্র কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত আচার ব্যবহার এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ মাত্র করিয়া থাকেন, আবার তাহাও জাতীয়, স্বার্থপরতা দোষে কলঙ্কিত।"[৩] লেখক এখানে ইংরাজ কর্তৃক রচিত বাংলা ও ভারতের বিকৃত ইতিহাসের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। স্বদেশবাসীর দ্বারাই স্বজাতির প্রকৃত ইতিহাস লেখা সম্ভব বলে তিনি ধারণা করেছেন। ফরিদপুর চাওচা নিবাসী শশিভূষণ গুহ ও ঢাকা বাশরী গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ গ্রন্থ প্রণয়নে লেখককে সাহায্য করেন।[৪] সৈয়দ আবদুল আগফরের ভাষা মার্জিত, বিশুদ্ধ ও সাবলীল। তিনি তাঁর বিঘোষিত নীতির আলোকে 'তরফের ইতিহাস' লেখার চেষ্টা করেছেন। এটি মুখ্যত: পারিবারিক ইতিহাস, তৎসত্ত্বেও লেখক তরফের ভূগোল, প্রকৃতি, জনগণ, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

১. সৈয়দ আবদুল আগফর—তরফের ইতিহাস, জাহ্নবী যন্ত্র কলিকাতা, ১২৯৪, পৃঃ ।৵.(উপক্রমণিকা)।
২. ঐ, পৃঃ ।৵.।।,
৩. তরফের ইতিহাস
৪. ঐ, পৃঃ ৩

হাফেজ নিয়ামতুল্লা

হাফেজ নিয়ামতুল্লা রচিত 'খৃষ্টধর্মের ভ্রষ্টতা' নামে একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মেহের চরিত' (১৯০৯) গ্রন্থে। জমিরুদ্দীন লিখেছেন, 'হাফেজ নিয়ামতুল্লা একজন সুবিখ্যাত তার্কিক ও উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কলিকাতা গোলতালাব (ওয়েলিংটন স্কোয়ার) তাঁহার কার্যস্থল ছিল। তিনি জীবনে অনেক হিন্দু, নেটীভ খৃষ্টান ও ইংরেজকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।'[১]

মুনশী মেহেরুল্লা যশোহরে দর্জির দোকানে যখন কাজ করতেন, তখন পাদরী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাদরী আনন্দ রায়ের প্রভাবে মেহেরুল্লা খ্রীস্টধর্মে আকৃষ্ট হন, কিন্তু সে-সময় হাফেজ নিয়ামতুল্লার 'খ্রীষ্টধর্মের ভ্রষ্টতা' ও মোহাম্মদ এহসানুল্লার 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদের খবর আছে' (১৮৮৫) গ্রন্থ দুখানি পাঠ করে তাঁর স্বধর্মে আস্থা ফিরে আসে।[২] হাফেজ নিয়ামতুল্লার গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। এটি যে ১৮৮৫ সালের পূর্বে লেখা হয়েছিল এবং এতে খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল, তা উপরের তথ্য থেকে বলা যায়।

মোহাম্মদ এহসানউল্লা

এহসানউল্লার পূর্বনাম ছিল ঈশানচন্দ্র মণ্ডল, খ্রীস্টানধর্মাবলম্বী বাঙালী। নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তি দেখে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। নিউ টেস্টামেন্টে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক মহম্মদের আগমনের ভবিষৎ বাণী আছে—সেখানে যীশুখ্রীস্টের অনুসারীদের মহম্মদের ধর্মে দীক্ষা নিতে বলা হয়েছে। এরূপ যুক্তির ভিত্তিতে ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন ও মোহাম্মদ এহসানউল্লা নাম গ্রহণ করেন। তিনি 'ইঞ্জিলে মহম্মদ সাহেবের খবর আছে' (১৮৮৫), 'শ্রীঈশানচন্দ্র মণ্ডল খ্রীষ্টানের মুসলমান হইবার কারণ' (ঐ) নামে দুখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ দুটিতে বাইবেলের বিরোধমূলক তত্ত্ব, পাদরীগণের কার্যকলাপ এবং নিজের ধর্মান্তরগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩] এহসানউল্লা পাঁচ বছর পরে আবার খ্রীস্টান হন।[৪]

---

১. শেখ জমিরুদ্দীন—মেহের-চরিত, সিরাজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃঃ ৮ (পাদটীকা)।

২. ঐ, পৃঃ ৮

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ.খ., ১৮৮৫

৪. "ইনি হাফেজ নেয়ামতুল্লা সাহেবের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া ১২৯১ সালে প্রকাশ্যে মুসলমান হইয়া ৫ বৎসর পরে আবার খ্রীস্টান হইয়াছেন।"
ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ ১২৯৯

দৌলত আহমদ এম. এম. দাহার (১৮৪৯-১৯৪৪)

দৌলত আহমদ ত্রিপুরা সদরের গোনামুড়ার কুলুবাড়ীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি প্রথমে গোনামুড়া স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে বিএল পাশ করে সেখানে কোর্টের উকিল হন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে রাজকবির মর্যাদা পান এবং 'কাব্যবিনোদ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।

দৌলত আহমদ কাব্য, কাব্য-নাট্য, ব্যাকরণ, শিশুপাঠ্য প্রভৃতি বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'কুসুমমঞ্জুরী' (১৮৮৬), 'প্রাণ কাঁদে কেন' (১৮৮৮), 'ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয়' (১৮৯৫), 'কক্‌বরমা বা ত্রিপুরা ব্যাকরণ' (১৮৯৮), 'নামাজের উপদেশ' (১৯০৪) 'পুরুষ প্রসঙ্গ' (ঐ), 'জীবন-মঙ্গল' (১৯০৫) 'স্বপ্নদৃশ্য' (১৯০৬) 'নববোধ', 'মুকুর' (১৯০৯), 'বঙ্গভিখারী', 'রাজউৎসব', 'হর্ষাষ্টক', 'রাজশ্রী', (১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ) ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থের নাম। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু অধ্যাত্ম প্রেম ও নীতিকথা।

'কুসুমমঞ্জরী' ২৪ পৃষ্ঠার কবিতাপুস্তক। এতে শিশুদের পাঠোপযোগী ১৭টি নীতিগর্ভ কবিতা আছে। শিশুপাঠ্য বলে কবির ভাষা সরল, বক্তব্য সরল।

> দেখিতে সুবুদ্ধিমান গম্ভীর প্রকৃতি,
> বিদ্যা শিখিবারে চেষ্টা ; শুভকার্য্যে মতি।
> কারো সাথে করে না অসৎ ব্যবহার,
> সুপথে থাকিয়া করে যশের সঞ্চার।[১] (সুশীল)

'ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয় বা ভূচিত্র দেখিবার সহজোপায়' ৩৬ পৃষ্ঠার ভূগোল বিষয়ক শিশুপাঠ্য বই। লেখক ভূমিকায় বলেছেন, "কোন প্রকার ভৌগোলিক বিবরণ অবগত করান, এই পুস্তক সঙ্কলনের উদ্দেশ্য নহে ; কেবল ভূ-পৃষ্ঠের স্থানসমূহ পরিচয় করিবার সহজোপায়ই ইহার শিক্ষণীয় বিষয়। কোমলমতি বালক বালিকার পক্ষে ভূ-চিত্র দর্শন, ভূ-বিবরণ অধ্যয়ন করার অতি সহজ বলিয়া অনুমান হয়। স্থানসমূহের সাধারণ নামবোধ পরিচায়ক স্থানীয় নামের আকার দর্শন এবং কোন্ কোন্ স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের কোন খণ্ডে আছে এ সমস্ত বিশেষ রূপে জানিয়া লওয়া, নূতন ভূগোল শিক্ষার্থীগণের প্রথম কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সম্পন্নের জন্য ইহাকে নিম্নশ্রেণীতে ১ম পাঠোপযোগী করার বাসনায় অন্যান্য ভূগোল হইতে পৃথকাকারে প্রকাশ করা হইল।"[২] ত্রিপুরার স্কুলসমূহের সব-ইনস্পেক্টর রমেশচন্দ্র দাস বিএ গ্রন্থখানি সংশোধন করে দিয়েছেন বলে দৌলত আহমদ উল্লেখ করেছেন।

১. দৌলত আহমদ—কুসুম মঞ্জরী, সিংহযন্ত্র, কুমিল্লা, মাঘ ১২৯২, পৃঃ ১
২. দৌলত আহমদ—ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয়, অমর যন্ত্র, কুমিল্লা, ১৩০২

দৌলত আহমদ ও মোহাম্মদ উমর যুগ্মভাবে 'কক্‌বরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ' রচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় দৌলত আহমদ লেখেন, "সাধারণ বাঙ্গালী জাতির ন্যায় ত্রিপুরাগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহাদের প্রত্যেককে দফা বলে যথা—সিয়ো, কোয়াই তুইয়া, দুইসিং বা দৈওসিং ও বাসাস ইত্যাদি। ইহারা যে ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকে উহাই ত্রিপুরা ভাষা নামে আখ্যাত। ত্রিপুরা অনতিবিস্তৃত এবং এই ভাষাতে কোন লেখাপড়া প্রচলন নাই, অথচ ইহাতে শব্দের চতুরতা, মধুরতা ও কোমলতা প্রভৃতির সুন্দর পারিপাট্য রহিয়াছে। এমতাবস্থায় এই ভাষার লেখাপড়া ও ব্যাকরণ প্রচলন হওয়া সঙ্গত বলিয়া আপাততঃ এই ভাষার সংক্ষিপ্ত একখানা ব্যাকরণ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।"[১] ১৩০৭ সনের ২০ পৌষের 'এডুকেশন গেজেটে' কক্‌বরমা সমালোচনা হয়। "ব্যাকরণখানি দেখিয়া প্রীত হইলাম। ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধানীর বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের শেষ-ভাগে অনেকগুলি শব্দার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। উহা আরও একটু বিস্তৃত হইয়া প্রকৃত-অভিধানের ন্যায় হইলে আরও ভাল হইত।"[২] 'পুরুষ প্রসঙ্গ' ৩২ পৃষ্ঠার কাব্যপুস্তিকা। এতে যোগতত্ত্বের কথা আছে। তিনি যোগধারায় কবি নবীনচন্দ্র সেনের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন।

অবতার আমি তব
যেন মন প্রাণ,
আর এক কনৌথাকি;
সম্মুখে দর্শন।
কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।...
তোমাতে যেমন তুমি, আমাতে তেমন
বাহ্যদৃশ্য এক কিন্তু শরীর গোপন।[৩]

দৌলত আহমদের 'জীবনমঙ্গল' একটি রূপক কাব্যনাট্য। হিন্দু পুরাণাশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে 'জীবন, নিবৃত্তি, মায়া, প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, স্মৃতি, মোহ ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র কল্পনা দ্বারা এটি রচিত হয়েছে। 'প্রথমপট' থেকে 'বিংশপট' পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে। গ্রন্থখানি ত্রিপুরার 'শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর'কে উৎসর্গ করা হয়েছে।[৪]

১. দৌলত আহমদ—কক্‌বরমা, অমর যন্ত্র, কুমিল্লা, পৌষ ১৩০৭ ত্রিং., পৃঃ /. (ভূমিকা)।
২. এডুকেশন গেজেট, ২০ পৌষ ১৩০৭ (দৌলত আহমদ কৃত 'জীবন-মঙ্গল' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।
৩. দৌলত আহমদ—পুরুষ প্রসঙ্গ, উপেন প্রেস, কুমিল্লা, ১৯০৪, পৃঃ ১৭-১৯
৪. দৌলত আহমদ—জীবনমঙ্গল, উপেন প্রেস, কুমিল্লা, ১৯০৫

আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী (জন্ম—১৮৪০)

পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী 'জীবনচরিত' (১ খণ্ড, ১৮৮৯) নামে আত্মজীবনী লেখেন। বাঙালী মুসলমানের লেখা প্রথম আত্ম-কথা হিসাবে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। বাল্যকাল থেকে শুরু করে চাকুরীজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ পর্যন্ত জীবনকথা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন, "ইহা (জীবনচরিত) পাঠে কি শ্রবণে অন্যের তত সুখ দু:খ বোধ হইতে নাও পারে, কেননা ইহাতে রঙ্গরসের কোনও কথা নাই কিন্তু যিনি আমাকে একটুকু ভালবাসেন কি চিনেন অথবা আমার ন্যায় সুখের তরী দু:খের তরঙ্গিণীতে নিমগ্ন হইয়া তুঙ্গ তরঙ্গে ভাসিতে ২ খোদাতালার নাম স্মরণে ও তাঁহার দয়ার ভেলা অবলম্বনে কূলে উঠিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই পাঠের বা শ্রবণের অযোগ্য হইবে না, সন্দেহ নাই।"[১] জীবন চরিত থেকে জানা যায়, আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী পাবনা জেলার বরাট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ থানার দারোগাগিরি করে জমিদার হন। অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার দোষে তাঁর পিতা ভূসম্পত্তি হারান। আজিমুদ্দীন বগুড়ায় কিছুকাল লেখা-পড়া শিখে প্রথমে পুলিশের থানায় 'বক্সিগিরি ব্যবসা'য় (পত্রনবিশী) শুরু করেন। ১৮৬৮ সালে হেড কনস্টেবল হিসাবে পুলিশের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং পরে সব-ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সরল ও অকপট। সাধারণত: আত্মজীবনীতে ভাষা মুক্ত ও সাবলীল হয়। আজিমুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে ভাবের অন্তরঙ্গতা ও ভাষার স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করতে পেরেছেন। স্বীয় পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি স্বসমাজের ক্ষয়িষ্ণু ছবিটিও তুলে ধরেছেন।

মকবুল আলী (মৃত ১৮৯৯)

মকবুল আলী ত্রিপুরার পুণিয়াউকের জমিদার ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি একাধিক সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাড়াও কয়েকখানি ধর্ম-বিষয়ক পুস্তিকা রচনা করেন যেমন, 'নামাজ' (১৮৮৯), 'রোজা' (১৮৯১), 'মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' (১৮৯৯), 'ইসলাম প্রচারের সহজ উপায়' ইত্যাদি।[২] প্রথম গ্রন্থখানি সৈয়দ আবদুল জব্বারের সহযোগিতায় যুগ্মভাবে প্রণীত। ধর্মকর্ম পালন করার জন্য বাংলা গ্রন্থের অভাব ছিল। মকবুল আলী এই অভাব পূরণ করার জন্য লেখনি ধারণ করেছিলেন। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারি-

১. আজিমদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী—জীবনচরিত, সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১৪ বৈশাখ ১২৯৬
২. ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

লেফটেন্যান্ট আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এমএ এবং পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমান শিক্ষার সহকারী ইনস্পেক্টর আবদুল করিম 'নামাজ' পাঠ করে ব্যক্তিগত পত্রে গ্রন্থের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং লেখকদ্বয়কে উৎসাহিত করেন। মকবুল আলী ও সৈয়দ আবদুল জব্বার তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। আবুল খায়ের লিখেছেন (২০ জুলাই ১৮৯০), "I read lately, with much pleasure. a brochure in Bengali, named 'Namaz' published by Moqbul Ali Shahib and Sayyid Abdul Jabbar Shaib, both students of the Dacca College. The tract consists of an exposition of the temporal and spiritual virtues of the daily prayers enjoined to the Mahomadan religion. The reasons adduced in proof of the statements from the Quran and the Traditions as well as the logical arguments advanced are all convincing and delightful to the reader. ...Similar tract on other observances of our religion will greatly benefit our students and generally all Bengali reading Mussalmans of this Provinces."[১]

আবদুল করিমের বক্তব্য ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন শিক্ষার জন্য মুসলমান তরুণরা স্বধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠে। নামাজ, রোজা, জাকাৎ ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্বের বিষয়গুলি হেগেল, হিউম, মিল প্রমুখের প্রভাব বিস্তারের আগেই মুসলমান তরুণদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে হবে। তাঁর ভাষায় (১৮ জুলাই ১৮৯০), "The publication of the pamphlet is very opportune when the materialistic ideas and their concomitant scepticism and godlessness infused into the minds Young Moslems by the study of modern science and philosophy are leading them astray from the right path of their true religion, such pamphlets may be considered as demand of the time. The publication of a few such fundamental principles of Muhammadaism, such as 'Roza', 'Zakat' & c. is likely to create a reaction in the minds of Young Moslems and give Islam that fast hold, it once had, upon the minds of its young voteries, before works like those of Hegel, Hume, Mill, Bain and others found their way into the hands of our youngmen."[২]

১. মকবুল আলী প্রণীত 'রোজা' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ (১)
২. ঐ, পৃঃ (২-৩)

আবদুল করিম ও আবুল খায়েরের এই প্রেরণা থেকে মকবুল আলী পরের বছর 'রোজা' নামক পুস্তক রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "নামাজের ন্যায় রোজাও ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। কোন বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকিলে, রোজা পালন করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, নব্যশিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই আজ-কাল রোজা পালনে অবহেলা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অনেক মুসলমান ভ্রাতাই বাঙ্গলা এবং ইংরাজী ভিন্ন কোন ভাষা জানেন না; তাঁহারা কোন কার্য্যেরই এমন কি ধর্মবিধিরও গূঢ়তত্ত্ব, উপকারিতা ও আবশ্যকতার বিষয় ভালরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহা প্রতিপালন করিতে চাহেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে ধর্মকার্য্যে রত করিতে হইলে সমুদয় ধর্মকার্য্যেরই গূঢ়তত্ত্ব ও আবশ্যকতা বিষয়ক ছোট ছোট গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ পর্যন্ত বঙ্গভাষাতে অতি অল্প গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে; উক্ত অভাব দূরীকরণার্থে ইতিপূর্বে আমরা 'নামাজ' সম্বন্ধে একখানা ছোট বহি জনসাধারণে প্রচারিত করিয়াছি; এবং এখনও সেই উদ্দেশ্যেই রোজা সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা প্রচারিত হইল। ইহাতে রোজার আবশ্যকতা, মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় কোরান এবং হাদিস হইতে বিশদরূপে বর্ণনা করা গিয়াছে; এবং ইহার শেষভাগে রোজার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি যুক্তি এবং তর্ক দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।"[১]

মকবুল আলীর তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থ 'মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ'। তিনি ভূমিকায় বলেন, 'যে পথে চলিলে, মানুষ, মনুষ্য জন্ম ও নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া, ইহ-পরলোকে সুখসম্মানে কালযাপন করিতে পারে, কোন জাতি বা ধর্মবিশেষে তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কোন জাতিগত ভাব বা ঈর্ষা বিদ্বেষের চিহ্ন নাই। সুতরাং ইহা পাঠে সর্ব সাধারণ উপকার লাভ করিতে সক্ষম।'[২] নীতি বিষয়ক উক্ত ফারসী গ্রন্থের 'মাতৃভাষার ভাণ্ডারে একটি অপূর্ব রত্ন সঞ্চিত হইবে' এরূপ আশার বশবর্তী হয়ে তিনি এটি প্রণয়ন করেন। 'মেন-হাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' রচনার অনতিকাল মধ্যেই লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

অপর এক মকবুল আলী চট্টগ্রামের পটিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'বাল্য খেলা' (১ ভাগ ১৮৮৩) নামে একখানি নীতিশিক্ষা মূলক ক্ষুদ্র কবিতার বই প্রকাশ করেন। তিনি এতে মুসলমানদিগকে অলসতা ত্যাগ করে জাগ্রত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।[৩]

---

১. মকবুল আলী—রোজা, হিতৈষিণী যন্ত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৩১৮ (২ সং) 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
২. মকবুল আলী—মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ, ১৮৯৯, পৃঃ ।/. (ভূমিকা)।
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ য় খ., ১৮৮৩

মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ

তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বাঁশদহ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ডভটন ও সেন্টজেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের আরবী ও ফারসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, অন্যধারে সাহিত্যানুরাগী ও সমাজসেবক ছিলেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁকে 'সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ' বলে উল্লেখ করেছেন।[১] শেখ আবদুল রহিম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) মেয়ারাজউদ্দীনের পরামর্শে ও সাহায্যে প্রণয়ন করেন। 'সুধাকর' পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে মেয়ারাজউদ্দীন উর্দু পত্রিকা থেকে 'মাল-মসলা' সংগ্রহ করে সেগুলি অনুবাদ করে দিতেন। 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র অনুরোধে তিনি ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ একত্রে বালিকাদের শিক্ষোপযোগী 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১২৯০) প্রণয়ন করেন।[২] 'ধর্ম-যুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রন্থখানি মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিম যুগ্মভাবে প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে 'উপক্রমণিকা'য় বলা হয়, "...ইসলাম ধর্ম প্রচারক হজরত মহম্মদের (দঃ) কার্যকলাপের উপর কতকগুলি, বিধর্মী গ্রন্থকার নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন, সেই সকল দোষারোপের মধ্যে 'জেহাদ' 'বহুবিবাহ ও 'স্ত্রীবর্জ্জন' (তালাক) এই কয়েকটী প্রধান। এই সকল বিষয় লইয়া আধুনিক খৃষ্টধর্ম যাজকগণ ইসলামের উপর নানা রূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। আমরা ক্রমান্বয়ে এই পুস্তকে এ সকল দোষারোপের দোষখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোন কোন স্থলে কিরূপ অবস্থায় জেহাদ করা আবশ্যক আমরা প্রথমে তাহার উল্লেখ করিয়া পরে হজরত মহম্মদের (দঃ) জেহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।[৩]

সৈয়দ আহমদ শহীদের ওয়াহাবী আন্দোলনের মূলে ছিল জেহাদনীতি। ইংরাজগণ এজন্য ওয়াহাবীদের সন্দেহের চোখে দেখতেন: ওয়াহাবীদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হত না। হান্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানের মহারানীর শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মতঃ বাধ্য কিনা তা অনুসন্ধান করা। মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিমের লক্ষ্য ছিল ইসলামে জেহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করা যে, ব্রিটিশের রাজত্বে ধর্ম-পালনের যেহেতু কোন বাধা নেই সেহেতু শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রশ্ন অবান্তর।

১. মুহাম্মদ ইদরিস আলী—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ৯
২. ঐ, পৃঃ ৩৩
৩. মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহিম—ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার, মিলন-প্রেস-ডিপজিটার, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃঃ ৵৹ (উপক্রমণিকা)।

তাঁরা বলেন, "আজকাল অনেকে জেহাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমাদের ভারতবর্ষীয় অধঃপতিত মুসলমান ভ্রাতাগণের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নানা প্রকার সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে; কিন্তু ইহারা ইসলাম ধর্মানুমোদিত জেহাদের বিষয় অবগত নহে; যে কোন রাজার অধীনে, মুসলমানেরা আপন ধর্ম ও ধর্ম-কর্মপদ্ধতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারে, সেই রাজার রাজভক্ত প্রজা হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। মুসলমানদিগের আমরা আমাদের উদারনৈতিক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্বিঘ্নে ধর্মপ্রচার ও ধর্মকর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করিতেছি, এমন কি স্বয়ং গবর্ণমেন্ট আমাদের ধর্মকর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করিবার কোন বিঘ্ন ঘটিলে তাহা দূর করিতে যত্নবান হইতেছেন। অতএব এরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকিয়া মহানুভ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"[১]

১৮৭০ সালে ওয়াহাবী বিচারের সাথে সাথে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনে ভাটা পড়ে। মুইর, সেল, হোপী, স্প্রেনজার প্রমুখ ইংরাজ লেখক মহম্মদ ও ইসলামের উপর গ্রন্থ লিখে মহম্মদের জেহাদী মনোভাবের অপব্যাখ্যা দেন। এতে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে ভেবে মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিম এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ সংস্কারে'র দুটি অংশ—প্রথম অংশ ধর্মযুদ্ধ: হজরত মহম্মদের যুদ্ধবৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে তিনি কোথায় কখন কোন প্রকার যুদ্ধ করেছেন; দ্বিতীয় অংশ সমাজ-সংস্কার: এতে তিনটি প্রবন্ধ আছে—'ইসলামে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা' 'ইসলামে বহুবিবাহ' ও 'ইসলামে স্ত্রীবর্জন'। সমসাময়িকালের কোন কোন অমুসলমান লেখক উপরি-উক্ত বিষয়ে আলোচনা করে ইসলামের ধর্মনীতি ও সমাজ-নীতির উপর কটাক্ষ করেন। লেখকদ্বয় এসব অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন এবং ধর্মনীতির আলোকে ঐসব সামাজিক প্রথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থখানির ভাষা পরিপাটি, বক্তব্যও পরিচ্ছন্ন; যুক্তির দ্বারা তাঁরা স্বীয় মত প্রতিশ্রুত করেছেন। করটীয়ার জমিদার 'হাফেজ মহম্মদ আলী খান চৌধুরী'কে এটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

মেয়ারাজউদ্দীন অগ্রজ ছিলেন। শেখ আবদুর রহিম তাঁকে অত্যন্ত মান্য করতেন। তিনি তাঁকে সাহিত্য-গুরুর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি পররর্তীকালে লিখেছেন, "মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা, সমাজগতপ্রাণ, আদর্শ আলেম, জলন্ত উৎসাহী, শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেননা তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত

১. ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার, পৃ: ।।/. (উপক্রমণিকা)

ও অনুপ্রাণিত হইয়া আমার সাহিত্য সাধনা প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছিল।"[১] মোজাম্মেল হক 'ফেরদৌস চরিত' (১৮৯৮) গ্রন্থখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। 'উৎসর্গপত্রে' বলা হয়; 'যে মহাত্মার পবিত্র নামে হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হয়, যিনি অমায়িক সদালাপী মিষ্টভাষী ও সদ্‌গুণসমূহের আধার ছিলেন, সেই বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ডভটন ও সেন্ট জেভিয়াস কলেজদ্বয়ের স্বর্গগত সুযোগ্য আরবী ও পারস্য অধ্যাপক ভক্তিভাজন মাননীয় জনাব মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের স্মরণোদ্দেশে এই পুস্তকখানি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ তদীয় পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হইল।'[২] উল্লেখযোগ্য যে, মেয়ারাজ-উদ্দীনের সাথে মোজাম্মেলের ব্যক্তিগত পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা ছিল।

গোলাম কিবরিয়া (জন্ম ১৮৪৩)

গোলাম কিবরিয়া কাজী কেরামত উল্লার সহযোগিতায় 'উচিত কথা' (১৮৯০) নামে গদ্যে-পদ্যে বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ লিখেন।[৩] উভয়ে বসিরহাটের অধিবাসী ছিলেন। গোলাম কিবরিয়া 'বসিরহাট ইসলামীয়া মাদ্রাসা'য় শিক্ষকতা করতেন। তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শেখ আবদুর রহিমের মাতুল ছিলেন। 'উচিত কথা'র বিষয়বস্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে 'সুধাকরে' লেখা হয়: 'ইহার (উচিত কথার) ভাষা যদিও সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে তবু বেশ সরল: সুতরাং সাধারণের সহজ বোধগম্য। পুস্তকখানির কোন কোন স্থান সুন্দর উপন্যাস এবং নাটকের ন্যায় মনোরম। গ্রন্থকার ভণ্ড ফকিরদিগের ভণ্ডামী কারখানার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে নাস্তিকোপম পাষণ্ড কাফেরদিগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যদিও এই কাণ্ড লিখিতে যাইয়া গ্রন্থকারকে অনেক স্থলে সুরুচীর সীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তবু আমরা তাহাকে তজ্জন্য দোষী করিতে পারি না। কারণ সয়তানের সয়তানী প্রকাশ করিয়া অপর সাধারণকে সতর্ক করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য কর্ম। এই গ্রন্থে গল্প-চ্ছলে যে সকল উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই সবিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে খৃষ্টান ও হিন্দু-ধর্মের অসারতা এবং অত্যাচার অতি-সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।"[৪] উচিৎ কথার পদ্যাংশ মধ্যযুগীয় পয়ারছন্দে রচিত। তাঁর গদ্যভঙ্গিও দুর্বল অপরিণত।

১, শেখ আবদুর রহিম—বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ, মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র [illegible]
২, মোজাম্মেল হক—ফেরদৌস চরিত, 'উৎসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য
৩, সুধাকরে 'গ্রন্থখানির নাম করা হয়েছে 'মনোরঞ্জন উচিত কথা' সুধাকর, ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬
৪, সুধাকর, ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬

চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী (১৮৫০-১৯০০)

চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী শ্রীহট্ট জেলার ভাদেশ্বর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিপুরার রূপসাঁর খান বাহাদুর আবদুর রেজা চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। আর্জুমন্দ আলী বাংলা-ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় সুশিক্ষা পান। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল।[১] তিনি কর্মজীবনে স্কুল সব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান।

আর্জুমন্দের দুখানি গ্রন্থ আছে—'প্রেম দর্পণ'(১৮৯১) ও 'হৃদয় সঙ্গীত'(১৯০৫)। 'প্রেম দর্পণ' সামাজিক উপন্যাস। মুসলমান যুবক ও হিন্দু যুবতীকে নায়ক-নায়িকা করে প্রেমমূলক এই উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। 'হৃদয় সঙ্গীত' কবিতা ও গানের বই। কবির কণ্ঠে আধ্যাত্মিকতার সুর বেজেছে।'[২]

একিনুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)

একিনুদ্দীন আহমদ দিনাজপুর জজকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৮৬ সালে সিটি কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। রংপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তসলিমউদ্দীন আহমদ তাঁর মাতুল ছিলেন। একিনুদ্দীন দিনাজপুর থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন (১৯২১-২৩)।[৩]

একিনুদ্দীন আইন ব্যবসায়ের সাথে সাথে সাহিত্যচর্চাও করে গেছেন। 'ইসলাম' (১৮৮৫) নামে একখানি ক্ষণস্থায়ী মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন।[৪] ঐ সময় তিনি আইন পড়তেন। তিনি 'মিহির ও সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক', 'নবনূর' প্রভৃতি বাংলা সাময়িকে ও 'মোসলেম ক্রনিকল' ইংরাজী সাপ্তাহিকে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। তিনি 'ইসলাম ধর্মনীতি' (১৮৯১) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি লিভারপুলের শেখ আবদুল্লাহ কুইলিয়মের 'দি ফেথ অব ইসলাম' গ্রন্থের অনুবাদ। আবদুল্লাহ কুইলিয়ম ইসলাম গ্রহণ করে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[৫] 'সুধাকরে'র এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়, "ইসলামের যে গুণ দেখিয়া ইংলণ্ডের ৫৫জন ইংরেজ ইসলামধর্ম দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে (ইসলাম ধর্মনীতি) বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একজন

১. বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
২. আলাউদ্দীন আহমদকৃত 'উপদেশ সংগ্রহে'র (১৩১৯ ৩ সং) 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য
৩. মুক্তবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৮
৪. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৬
৫. মিহির ও সুধাকর, ১০ কার্তিক ১৩০২

কৃতবিদ্য মুসলমান গ্রাজুয়েট দ্বারা বিবৃত হইয়াছে।"[১] ইসলামের আদর্শ রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল; কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ 'মুসলমান উত্তরাধিকার আইনে'র পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করলে একিনুদ্দীন তার প্রতিবাদ করেন। উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার ফলে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে বলে দেলওয়ার হোসেন ঐরূপ প্রশ্ন তুলেছিলেন।[২] একিনুদ্দীন বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করেননি। তাঁর যুক্তি ছিল, "দেশের যে সামান্য উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের সমবেত চেষ্টা। গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন।"[৩] 'শান্তিনিকেতন' নামে তাঁর একখানি উপন্যাস সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (বৈশাখ ১৩২৫) একিনুদ্দীন আহমদ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।[৪]

আবিদ আলী খান

'মিহির' পত্রিকায় (মার্চ ১৮৯২) 'শ্রী আবেদ আলী খাঁ কর্তৃক প্রণীত' 'মানসাঙ্ক ও শুভঙ্করী সম্বলিত ধারাপাত' শীর্ষক একখানি বইএর সমালোচনা করা হয়। 'ইসলাম প্রচারকে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৮) 'শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রী আবিদ আলী খাঁ প্রণীত' 'মৌখিক অঙ্ক' নামে আর একখানি পুস্তকের সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "ইহাতে অঙ্কবিদ্যা বিষয়ক অনেক নূতন নূতন প্রণালী ও কৌতুক এবং রহস্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নূতন ধরণের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নাবলী পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।" 'নবনূর' (আষাঢ় ১৩১২) 'শ্রী আবিদ আলী খাঁ কর্তৃক প্রণীত সচিত্র বাঙ্গালা শিক্ষা' গ্রন্থের সমালোচনা হয়।

উক্ত গ্রন্থত্রয়ের প্রণেতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবিদ আলী খান ছিলেন মালদহের অধিবাসী। তাঁর আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, যথা—'সচিত্র নামাজ দর্পণ' (১৯০৬), 'মৌলুদ শরীফ ও হজরত চরিত' (ঐ) 'শাহাদাত নামা বা মহরম পর্ব' (ঐ), গুলশানে হিন্দ' (ঐ)।[৫]

---

১. সুধাকর, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮

২. ২৪ আগস্ট, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬

৩. নবনূর, আশ্বিন ১৩১২

৪. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ২০৬

৫. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ, খ.; ১৯০৬; ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পত্রিকা, পৃঃ ৯৭-৯৮

আলাউদ্দীন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫)

আলাউদ্দীন আহমদ পাবনার শাহজাদপুরের চুহালি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমে ফরিদপুর জেলা-স্কুলের ফারসীর শিক্ষক ছিলেন, পরে শাহজাদপুরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হন। তাঁর প্রথম অনূদিত ধর্মগ্রন্থ 'উপদেশ সংগ্রহ' (১৮৯৪) 'পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা শেখ শাহাবুদ্দীন এবং হজরত মির্জা আস্কোলানী কৃত আরবী 'মোনাব্বেহাত ও অন্যান্য গ্রন্থ' হতে নীতিসমূহের সঙ্কলন। গ্রন্থখানি কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবী গোলাম সারওয়ারের নামে উৎসর্গ করা হয়। লেখক গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও উৎস সম্বন্ধে 'ভূমিকায় বলেন', "একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে মুসলমান সাহিত্য ও ইসলাম ধর্ম জ্যোতিঃ বিকাশের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কেননা মুসলমান সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ সকল বৈদেশিক পারস্য বা আরবী ভাষায় লিখিত। অধুনা কতিপয় ধর্মপরায়ণ, ন্যায় অনুসন্ধিৎসু মহাত্মার প্রাণপণ যত্ন এবং অদম্য চেষ্টায় ইসলাম সাহিত্য ও ধর্মজ্যোতির পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ আজকাল পবিত্র কোরান শরিফ, ফতওয়ায়ে আলমগিরী, তাজকেরাতুল আওলিয়া, কিমিয়ায় সাহাদত, গোলেস্তাঁ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ঘরে ঘরে বিরাজমান থাকায় ইসলাম মাহাত্ম্য সর্বত্র ঘোষণা ও প্রচার করিতেছে। এই সকল গ্রন্থ যে কেবলমাত্র মুসলমান সমাজে আদরণীয় এমত নহে, বরং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ন্যায়দর্শী চরিত্রবান ব্রাহ্ম ও হিন্দু ভ্রাতাগণের হৃদয়পটেও ইসলামের সৌন্দর্য প্রতিফলিত করিতেছে। গভীর চিন্তাপূর্ণ উপদেশ সংগ্রহ, সংসার বিরাগী, খোদা-প্রেমিক তপস্বিগণের পবিত্র উক্তি সমূহ, ধর্মগতপ্রাণ পবিত্র মহাপুরুষগণের হৃদয়গ্রাহী বাক্যাবলী' এবং পরমার্থ জ্ঞানালঙ্কৃত পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত ও ধর্মপথভ্রষ্ট বিপথগামীর তিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃকরণকেও সৎপথ ও আলোকের দিকে ধাবিত করে।"[১] আলাউদ্দীন গ্রন্থ প্রণয়নে মুনশী আবদুল গণি (মোক্তার), শশিভূষণ ভট্টাচার্য (ফরিদপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত) এবং কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদের (রাজবাড়ী রাজস্কুলের ফারসী শিক্ষক) সাহায্য ও সহযোগিতা পান।

আলাউদ্দীনের দ্বিতীয় অনূদিত ধর্মগ্রন্থ 'তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ' 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধারাবাহিক রূপে ছাপা হয়। এর প্রথম খণ্ড ১৯০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তফসীর হাক্কানী কোরানের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ।

---

১. আলাউদ্দীন আহমদ—উপদেশ-সংগ্রহ, নোয়াজুর ইসলাম প্রেস, কলিকাতা ১৩২৮, পৃঃ।৹ (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

স্যার সৈয়দ আহমদের কোরানের উর্দু অনুবাদে 'নাস্তিকতাভাব' আছে। এর প্রতিবাদেই আলাউদ্দীন তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'প্রচারক' পত্রিকার এক বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে বলা হয়: "আলিগড়ই এই নব্যদলের কেন্দ্রস্থল, এই দলের দলপতি এবং এই নবধর্মের অবতার ডাক্তার স্যার সৈয়দ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকতা ভাবে কুরআন মজিদের এক তফসীর লিখিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের নাস্তিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় থাকে না। অত্র তফসীরের যথাস্থানে সৈয়দ সাহেবের নব্য তফসীরের যথোচিত সপ্রমাণ প্রতিবাদ করা হইবেক।"[১]

তাঁর রচিত দুখানি সপ্তজীবনী আছে: 'বড়পীর সাহেবের জীবনচরিত' (১৮৯৯) এবং 'ওমর চরিত' (১৯০৩)। সুফীসাধক আবদুল কাদের জিলানীর জীবনকথা নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচিত। দ্বিতীয় গ্রন্থে 'হজরত ওমরের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত জ্বলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে'।[২] লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "ইসলাম জ্ঞানভাণ্ডারে যে কত অপার্থিব বহুমূল্য রত্ন রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু ঐ রত্নভাণ্ডার সমূহ আরব্য, পারস্য ভাষারূপে সুদূর প্রাচীরের মধ্যে লুকাইত রহিয়াছে বলিয়া বঙ্গবাসীর পক্ষে অতি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে এবং অনেকে ঐ ভাণ্ডারের চতুর্দ্দিকে আগ্রহান্বিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন, কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন বা ভেদ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়েন।"[৩] আরবী-ফারসী ভাষার প্রাচীর ভেদ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের কাছে ইসলামের 'রত্নভাণ্ডার' তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। 'আহকামোল এসলাম' (১৯০৯) নামে ইসলামের রীতিনীতি বিষয়ক তিনি আর একখানি ধর্মপুস্তক লেখেন।[৪] আলাউদ্দীন আহমদ সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ইসলামের ধর্মকথা ও ইতিহাসের গৌরবকাহিনীকে বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন।

তজমুল আলী

শ্রীহট্টের হাজিপুর মৌজার কানিহাটীর অধিবাসী তজমুল আলী প্রণীত 'তোওয়ারিখ হেলিমী' (১ খণ্ড, ১৮৯৪) একটি ১৮ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীহট্ট জেলার কানিহাটীর শাহ হালিমউদ্দীনের পারিবারিক ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে।

১. প্রচারক, আশ্বিন ১৩০৭
২. উপদেশ-সংগ্রহ, পৃ: ৭ (পাদটীকা)
৩. আলাউদ্দীন আহমদ—ওমর চরিত, সত্ত্বম প্রেস, ফরিদপুর, ১৩১০ পৃ: ৶. (ভূমিকা)
৪. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা পৃ: ৯৮

লেখক ঐ পরিবারের বংশধর বলে দাবী করেছেন। গ্রন্থের 'পূর্বাভাষে' তিনি লিখেছেন, "আমার এই প্রচারিত পুস্তকখানা নিজ বংশাবলী। এবং ইহা প্রকাশের কারণ এই যে, আমাদের পূর্ব পুরুষ শাহ হেলীমউদ্দীন নূরল আলী এ দেশীয় লোক নহেন। কোন সময়ে কি জন্য তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং কেনই বা তিনি এখানে অবস্থান করিলেন ... তাহার অনেক বিবরণ লোপ পাইয়াছে। সেইজন্য আমি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরবর্তীদের কষ্টনিবারণার্থে তোয়ারিখে হেলিমী নামে এই পুস্তক প্রচার করিলাম। ... নিজ বংশ তালিকা সুশৃঙ্খল করার মানস ব্যতীত শ্রেণীমর্যাদা বা জাতীয় গৌরব প্রকাশার্থ এই পুস্তক খানা লিখিত হইল না। ইহা যথাযথ বংশতালিকা হইতে লিখিত হইয়াছে।'[১]

মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ

ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জের টেঙ্গাপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ 'জ্ঞানবৃক্ষ' (১ ও ২ ভাগ, ১৮৯৪) নামে স্কুলপাঠ্য বর্ণশিক্ষার বই লেখেন। 'জ্ঞানবৃক্ষে'র 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছেন, "নানা অনুরোধে ও কতকগুলি অপ্রতিহার্য্য কারণেও বাধ্য হইয়া, এই পুস্তক কতকগুলি কঠিন কঠিন শব্দ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এমন কি আদি গুরু মদনমোহন বাবু হইতে, এ পর্যন্ত কেহই এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই। শিশুশিক্ষা প্রভৃতি বর্ণমালার কতকগুলি শব্দ, কেবল অভিধান ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকে. এ পর্যন্ত তাহার ব্যবহার দেখি না। ... কঠিন কঠিন শব্দসকলের অর্থ, পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।"[২] মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ টেঙ্গাপাড়ার 'আঞ্জমনে মফিদুল ইসলাম' (১৯০৪) নামক ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন।[৩] স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে বিখ্যাত 'লাল ইস্তেহার'টি তিনি প্রণয়ন ও প্রচার করেন।

মোহাম্মদ ইয়াকুব

মোহাম্মদ ইয়াকুব নোয়াখালীর সল্লভরটখাল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঐ জেলার পেস্কারহাটের 'আহমদীয়া মাদ্রাসা স্কুলে' শিক্ষকতা করতেন। তিনি পরে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হন (১৯০১)। তিনি 'উদ্যান' (১৮৯৫) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন "উদ্যান'

১, তজম্মুল আলী—তোওয়ারিখ হেলিমী, সামগুক প্রেস, ঢাকা, ১২৯৯, 'পূর্বাভাষ' দ্রষ্টব্য

২, মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁ—জ্ঞান-বৃক্ষ (২ ভাগ), মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৯৪

৩, দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' দ্রষ্টব্য।

নামক একখানি পদ্য ও গদ্যময় গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে 'গোলেস্তান' নামক জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবি মহাত্মা শেখ সাদীর গ্রন্থাবলম্বন পূর্বক রচিত হইয়াছে। ... যদি 'উদ্যান' কিঞ্চিৎ অংশে পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব।"[১] শেখ আবদুল রহিম 'ইসলাম' (১৮৯৭) ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থখানি মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মোহাম্মদ আবদুর রহমানের সহযোগিতায় রচনা করেন। 'মোসলেম ক্রনিকেল'র এক বিজ্ঞাপনে 'ইসলাম' গ্রন্থখানিকে মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রণীত বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২] মোহাম্মদ ইয়াকুবের অপর গ্রন্থ 'ঈদ-বক্রীদে' (১৮৯৫) মুসলমান সমাজের দুটি ঈদোৎসবের নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে।[৩]

মোসলেমউদ্দীন খান

মোসলেমউদ্দীন খান টাঙ্গাইলের গান্দিনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯০১-০৬ সালে করটীয়া হাই স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'হিতকরী' পত্রিকা কুষ্টিয়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হলে (১৮৯২) মোসলেমউদ্দীন খান ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আহমদী প্রেসে'র (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) তিনি ম্যানেজার ছিলেন। পরে মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করলে (আশ্বিন ১২৯৯) মোসলেমউদ্দীন 'টাঙ্গাইল হিতকরী' নাম দিয়ে নিজ সম্পাদনায় সেটি প্রকাশ করেন। ময়মনসিংহ শহরে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষা প্রচার' পত্রিকার তিনি ১৩১৫ থেকে ১৩১৮ সন পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।[৪] ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এডুকেশন কনফারেন্সে' ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আমন্ত্রণক্রমে মোসলেমউদ্দীন খান যোগদান করেন।[৫] মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব্য' (১৩০১) শিক্ষা ও নীতিমূলক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ ও উৎসাহে' 'হিতকাব্য' লিখতে অগ্রসর হন। কাব্যরচনার মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, "অধুনা মুসলমান-সমাজের শোচনীয় অবস্থা

---

১. মোহাম্মদ ইয়াকুব—উদ্যান (গুলিস্তান বঙ্গানুবাদ), গোবিন্দ যন্ত্র, নোয়াখালী, ১৩০২
২. দি মোসলেম ক্রনিকল, ১১ জুলাই ১৮৯৬
৩. মিহির ও সুধাকর, ১০ কার্তিক ১৩০২
৪. ইব্রাহিম খাঁ—টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
৫. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ২৭-২৮

পরস্পর দর্শনে দয়ালু ও উদার ব্রিটিশ গর্বমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছেন। এমন সুযোগ হারাইলে আর পাওয়া যায় না; অর্থাৎ মুসলমানদিগকে রাজকার্যে নিয়োগ, তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ও তাহাদিগের রচিত পুস্তকাদি পাঠ্যলিষ্টভুক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সদাশয় উদার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে শান্তিপুর নিবাসী মাননীয় কবি মোজাম্মেল হক সাহেব কৃত 'পদ্যশিক্ষা' পুস্তক কোন কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহা আমাদের নিতান্তই গৌরবের বিষয়। তবে হিন্দু মহোদয়গণের পুস্তকের সম্মুখে মুসলমানের লিখিত গ্রন্থের আদর নাই। সুতরাং উৎসাহ অভাবে, অনেক লেখকেরও শক্তি বিকাশ পাইবার পক্ষে অন্তরায় ঘটিতেছে—মনের কথা মনেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। অতএব মুসলমানের লেখনী পরিচালনায় ক্ষান্ত দিলে, উন্নতির আশা সুদূর পরাহত; ঈদৃশ অবস্থায় আমার ন্যায় মূর্খ অভাজন 'হিতকাব্য' প্রচারে সাহসী হইল।"[১] ১২৯৯ সনের ২৮ শ্রাবণ ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট টাঙ্গাইল পরিদর্শনে গমন করলে তাঁর অভ্যর্থনা সভায় কবি হিতকাব্যের কতকাংশ আবৃত্তি করেছিলেন বলে ঐ বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তাঁর কাব্য 'উচ্চ ও নিম্ন বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যলিষ্টভুক্ত' করার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়গণের সমীপে আবেদন জানিয়েছেন।[২] কবির আশা পূর্ণ হয়: কাব্যখানি তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে মনোনীত হয়। ১৪টি কবিতার এই পুস্তকখানিতে নীতিজ্ঞান ছাড়াও কবির সমাজ ও অর্থনীতি চেতনার পরিচয় আছে। তিনি দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ হিসাবে ঔপনিবেশিক শোষণের কথা বলেছেন 'দারিদ্র' কবিতায়:

দেখ না অতুল্য ভারতের ধন
শুষে নিয়ে যায় বৈদেশিকগণ
দারিদ্র-অনলে পুড়িছ এখন
কব কত দুখ, ভোগ অনুক্ষণ
আর্যজাতি তুমি, ভস্মপ্রায় পড়ে।[৩]

মোসলেমউদ্দীন খান পরবর্তীকালে ঢাকার 'শিখাগোষ্ঠী'র 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র (১৯২৬) সাথে জড়িত ছিলেন। ঐ সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'

---

১. মোসলেম উদ্দীন খান—হিতকাব্য, টাঙ্গাইল, পৌষ ১৩১১, পৃ: ।. (বিজ্ঞাপন)
২. ঐ, পৃ: ।/.-।৵.
৩. ঐ, পৃ: ২১

(১৯২৯) পত্রিকায় 'ময়মনসিংহের গীত' নামে তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে সাহিত্য সমাজের একটি অধিবেশনে (১২ জানুয়ারী ১৯২৯) তিনি 'একেই কি বলে ইসলাম' নামে একাঙ্ক নাটিকা পাঠ করেন।[১]

সৈয়দ আবদুল গাফফার আলকাদরী

তিনি মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। মেদিনীপুরের 'মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি'র যৌথ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'পবিত্র কোরানের সত্যতা' (১৮৯৬) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[২] কোরান যে অপৌরুষেয়, অপরিবর্তনীয় ও অভ্রান্ত ধর্ম বাণী লেখক তাঁর পুস্তিকায় এটাই প্রমাণ করেছেন।

শেখ জোহাদ রহিম

শেখ জোহাদ রহিম উপন্যাসিক শেখ সাজ্জাদ করিমের সহোদর ভ্রাতা। হুগলীর জয়সিংহচক গ্রামে তাঁদের জন্ম। শেখ জোহাদ রহিম 'বিষাঙ্কুরকাব্য' (১ খণ্ড, ১৮৯৬) লেখেন। এটি আখ্যানমূলক কাব্য, কলিকাতার বাবু শ্রেণীর চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত করে রচিত।[৩]

মোসারত আলী খান

মোসারত আলী খান পাবনার শাহজাদপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুখানি কাব্যপুস্তক আছে—'শোকোচ্ছ্বাস' (১৮৯৬) ও 'সাঁঝের আলো' (১৯০০)। প্রথমখানি করটীয়ার জমিদার হাফেজ মোহাম্মদ আলী খান পত্নীর শোকস্মৃতি-মূলক ১১ পৃষ্ঠার বই; দ্বিতীয়খানিতে বিবিধ বিষয়ক কবিতা সংকলিত হয়েছে।[৪] 'মিহির ও সুধাকরে' কাব্যখানির সমালোচনা হয়, "... কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা প্রাণস্পর্শী। উৎসর্গ, কে গেল, শুধুই স্বপন, মাদকতা, সাধ, অতৃপ্ত, পিয়াস, বিরহিণী রাধা প্রভৃতি কবিতায় গ্রন্থকারের উদীয়মান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৫] তাঁর একটি সমাজ-সচেতন মন ছিল। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' স্থাপিত হলে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেন এবং উদ্যোক্তা-দের প্রশংসা করেন। মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ যে শিক্ষাভাব, তা নিশ্চিত জেনে তিনি ধর্মশিক্ষার সাথে ইংরাজী শিক্ষারও প্রসার চেয়েছেন।[৬]

---

১. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৯৮-৯০
২. দি মোসলেম ক্রনিকল, ১১ জুলাই ১৮৯৬
৩. আবদুল কাদির—বিষাঙ্কুর কাব্য, লেখক সংঘ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ৩ ত্রৈ, খ., ১৮৯৬, ১ ত্রৈ, খ., ১৯০১
৫. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭
৬. মোসারত আলী খান—বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা, মিহির ও সুধাকর, ১ শ্রাবণ ১৩১০

মোহাম্মদ অখিলুদ্দীন

মোহাম্মদ অখিলুদ্দীনের 'তারাবতী-মনোহরা' (১৮৯৬) একটি গল্পের বই। লেখক হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে বিধবা বিবাহের সমর্থনে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১]

মোহাম্মদ কাজেম আলী

ডায়মণ্ড হারবারের ফৌজদারী আদালতের মোক্তার মোহাম্মদ কাজেম আলী 'মানব-সুহৃদ বা চতুর্দ্দর্শ নীতিরত্ন' (১ খণ্ড, ১৮৯৮) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি প্রকৃতপক্ষে ফারসীকাব্য 'আনওয়ার সোহেলী'র বঙ্গানুবাদ। তিনি কাব্যের প্রারম্ভে 'গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী' অংশে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন, ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত মুড়াগাছার বেড়ন্দরি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। তাঁর পূর্বপুরুষ বর্গী আক্রমণের সময় বর্ধমান ত্যাগ করে ঐ গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। কবি তাঁর বাল্যশিক্ষা, আইনশিক্ষা, আইন ব্যবসায়, অন্তঃপর কাব্য রচনার প্রেরণার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> বহুকাল হতে আছে এই অভিলাষ;
> কাব্য এক লিখিবার কবির প্রয়াস।...
> প্রেমালাপ নাটকাদি আদিরস ভিন্ন;
> আজিকালি সমাজেতে আর সব ঘৃণ্য।
> কিন্তু উহা চিরকাল যিনি সুধীজন;
> কখন না সমাদরে করেন গ্রহণ।
> এই হেতু উপেক্ষিয়া সেই আদিরস;
> লিখিতে প্রয়াস পা'নু নীতি চতুর্দ্দশ।[২]

কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে'ও তিনি আধুনিক আদিরসাত্মক নাটকাদির মধ্যে নীতিহীনতার অভিযোগ করেছেন। সমাজের নরনারীকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর ভাষায় "ইদানীন্ত সময়ে অস্মদ দেশনিবাসী অধিকাংশ নরনারীর মনোমন্দিরসমূহ এরূপ বিলাসিতার ঘোর কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে যে তাহাতে কৃতবিদ্য সুবুধ বাবদূকগণের কাকলী সংযুক্তা ও নীতিগর্ভা এবং তেজস্বিনী বক্তৃতা-তপন রশ্মি প্রবেশ করিতে অক্ষম। ... তাঁহাদের অমানুষ অভিলাষ উদ্দীনপনার জন্য আধুনিক বহুল অসম্পূর্ণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণ

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৯৬

২. মোহাম্মদ কাজেম আলী—মানব সুহৃদ বা চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃঃ ২৯

আদিরসে সংযুক্ত নানাবিধ অভিনব নাটক আদি পুস্তক আবিষ্কার করিয়া, সংসারে কলুষবীজ বপন করিতেছেন; উক্ত নরনারীকুল যাহাতে ঐ সকল গরলময় নাটকাদি পুস্তকপাঠে বিরত থাকিয়া, অনুক্ষণ পীযূষপূর্ণিত সকল প্রকার নীতিশিক্ষা করতঃ মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষোপযোগী অশেষ কল্যাণকর কার্যকলাপ নির্বাহ করিতে সক্ষম হন আমি সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য নীতিরত্নের আকর স্বরূপ 'আনওয়ার সোহেলী' নামক জগদ্বিখ্যাত পারস্য মহাকাব্য যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে এককালে সমুদয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া জনসাধারণ সম্মুখে প্রকাশ করা মাদৃশ জনের পক্ষে অসম্ভব এজন্য সম্প্রতি প্রাগুক্ত অনুবাদিত মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কন করাইলাম।"[১] কাব্যে বিভিন্ন গল্পচ্ছলে নীতি-শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এটি রচিত কবির ভাষাভঙ্গি দুর্বল ও উৎকর্ষ বিহীন।

আবদুল করিম বিএ (১৮৬৩-১৯৪৩)

আব্দুল করিম শ্রীহট্ট জেলার পাঠানটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ (ইংরাজী অনার্স) পাশ করেন। তিনি ঐ বছর স্কুল শিক্ষক হিসাবে চাকুরীতে প্রবেশ করেন; ১৮৮৯ সালে 'এ্যাসিস্টান্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ ফর মহামেডান এডুকেশন' পদে যোগদান করেন। তিনি এবং মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রথম মুসলমান এ্যাসিস্টান্ট স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন। আবদুল করিম পরে বিভাগীয় স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। তিনি ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আজীবন ফেলো' মনোনীত হন; ১৮৯৬ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন; ১৯১৫ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি এক সময় 'কাউন্সিল অব স্টেটে'র সদস্য পদে বৃত ছিলেন।

মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফসল 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) নামক ইংরাজী গ্রন্থ। এতে বাংলার তৎকালীন মুসলমান সমাজে শিক্ষাগত অবস্থার বিবরণ আছে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে ছিলেন, তবে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮) আবদুল করিম প্রণীত প্রথম বাংলা গ্রন্থ। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "আজ বিধাতৃবিধানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ইংরাজ রাজাশ্রয়ে শান্তি সুখের অধিকারী। কিন্তু

---

১. মোহাম্মদ কাজেম আলী—মানব সুহৃদ বা চতুর্দশ নীতিহার, মোজাফ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃঃ ৶৹।. (বিজ্ঞাপন)

দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে জানিতে পারেন নাই, অদ্যাপি উভয়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব ও কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। ইতিহাস জাতীয় জীবনচরিত। যেমন জীবনচরিত পাঠ করিলে ব্যক্তি বিশেষের দোষগুণ জানা যায়, সেইরূপ ইতিহাস পাঠে জাতি বিশেষের দোষগুণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মুসলমান বিজেতারা অনেকের মতে পরস্বাপহারী ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। বোধ এই বিশ্বাসই অধিকাংশ কুসংস্কারের মূলীভূত। এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বিদ্যালয় পাঠ্য। মুসলমান রাজত্ব প্রকরণ ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের চর্বিত চর্বণ দ্বারাই পরিপূর্ণ। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের যে সকল অক্ষয়কীর্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্মদ্দেশীয় অনেকেরই অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি মহম্মদ কাসিম ফেরেস্তা ও অন্যান্য পুরাবৃত্তকারদিগের মূল গ্রন্থ হইতে মুসলমান রাজত্ব প্রকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি এতদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অণুমাত্র প্রীতি বর্ধিত হয় যদি এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগের বীরত্ব, উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে লোকের অযথা ধারণার কিঞ্চিৎমাত্রও লাঘব হয়, যদি এতদ্দ্বারা মুসলমান পুরাবৃত্তপাঠে লোকের যৎসামান্য অনুরাগেরও সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই আমি পরিশ্রম সাধক বিবেচনা করিব।"[১] রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে পুস্তকখানির সমালোচনা লেখেন। গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়াটি তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "... এদিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ড বিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণ বলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর লইয়া উত্থিত হইয়াছিল। ... আমরা হিন্দুরা বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না, অন্যোন্য প্রাচীরের সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে শিকড় প্রসারণ করি না— সেইজন্য যাহারা চায় তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কার্য নহে। যাহারা চায়, তাহারা যে কেমন করিয়া চায় এই সমালোচ্য গ্রন্থে (ভারত বর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে) তাহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ংকর কাড়াকাড়ি, রক্তপাত, এত মহাপাতক, একত্র আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ এই রক্তস্রোতের ভীষণ আবর্তের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দয়াদাক্ষিণ্য ধর্মপরতা রত্নরাজির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।"[২] একই সময়ে 'ঢাকা প্রকাশে'

---

১. আব্দুল করিম—ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃঃ ৶৹. (ভূমিকা)

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫ (প্রবন্ধটি আধুনিক সাহিত্যে সংকলিত হয়)

গ্রন্থখানির সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজের লিখিত অথবা তদনুকরণে দেশীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের যে সকল ইতিহাস পঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি অপবাদ পরিলক্ষিত হয়; তাহা দূরীকৃত করিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাস অবলম্বনে মুসলমান রাজত্বের গৌরব ঘোষণা করা এবং তদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমান পরস্পর মধ্যে সম্প্রীতি জন্মান গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য ভূমিকায় ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। গ্রন্থের প্রথমাংশ মুসলমান ধর্মের ইতিহাস ও মুসলমান রাজ্য স্থাপনের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকার যথেষ্ট নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণতঃ মুসলমানগণ ধর্মবীর মহম্মদ ও তৎসহচরাদির সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করেন, গ্রন্থকার সেরূপ কিছু যে করেন নাই, তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্যক্তিরূপে দোষগুণ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বিশিষ্টরূপে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা মুসলমান হইয়া করা সহজ কথা নহে। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন সম্বন্ধেও গ্রন্থকার যথেষ্ট সত্যপরায়ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।"[১]

আবদুল করিম প্রথম গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীকে ও দ্বিতীয় গ্রন্থখানি তদানীন্তন জনশিক্ষার ডিরেক্টর সি.এ. মার্টিনকে উৎসর্গ করেন। তিনি 'প্রফেট অব ইসলাম এণ্ড হিজ টিচিং', 'ইসলাম এ ইউনিভারস্যাল রিলিজিয়ন অব পীস্ এণ্ড প্রোগ্রেস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২]

মোহাম্মদ রহিম বক্স

তিনি বগুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'শোকার্ণব' (১৮৯৮) নামে একখানি শোককাব্য রচনা করেন। এতে তিনটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছেঃ ১. ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পের বিবরণ, ২. নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে (১৮৯৩) স্মৃতিচারণা, ৩. বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরীর একমাত্র কন্যা আলতাফন্নেসার অকাল মৃত্যুতে শোকাতুরতার বর্ণনা। কবির বর্ণনা ঘটনাশ্রিত ও বিবৃতিমূলকঃ অন্তর্মুখী শোকভাব পরিস্ফুট হয়নি। 'শোকার্ণব' বগুড়ার 'চৌধুরী প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়।[৩]

---

১. ঢাকা প্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩০৫

২. নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী—শ্রীহট্ট-প্রতিভা, ১৯৬১ পৃঃ ৯-১২; সৈয়দ মর্তুজা আলী—শ্রীহট্টের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ, খ., ১৮৯৮

কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ

কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ প্রথমে ফরিদপুরের রাজবাড়ী রাজস্কুলের পারস্য-অধ্যাপক ছিলেন, পরে খুলনার বাগেরহাটের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মহাত্মা হজরত ইমাম আবু হানিফা সাহেব" (১৮৯৯)। আরবের কুফার অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা ছিলেন ইসলাম ধর্ম ও আইনের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তিনি 'হানাফী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কাজী নওয়াবউদ্দীনের গ্রন্থে তাঁরই ব্যক্তিগত জীবন ও চারিত্র্য মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস সম্বন্ধে লেখক 'পূর্বাভাষে' বলেন, "যিনি এই অবনী-মণ্ডলে সামান্য বণিকপুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কঠোর পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা বলে অগাধবিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন,—যিনি অদম্য উদ্যম ও অপরিসীম শ্রমবলে পবিত্র ফেকা শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—যিনি স্বীয় ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপরতা ও ধর্মানুরাগ প্রভাবে সমগ্র জগৎ বিমোহিত করিয়া-ছিলেন—সেই পণ্ডিত কুলতিলক সত্যসন্ধ সাধকশ্রেষ্ঠ, ক্ষণজন্মা মহাত্মা হজরত এমাম আবু হানীফা (রঃ) সাহেবের পবিত্র জীবন চরিত প্রসিদ্ধ আরব্য ও পারস্য গ্রন্থাবলম্বনে সরল বঙ্গভাষায় বিরচিত হইল। অত্র রচনায় আলিগড় কলেজের আরব্য প্রফেসর, বিজ্ঞবর মৌলবী শিবলী নোমানী সাহেবের সংকলিত 'সীরাতন নোমান' গ্রন্থই আমাদের প্রধান অবলম্বন।"[১] গ্রন্থখানি প্রণয়নে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (সুধাকরের ভূতপূর্ব সম্পাদক) ও গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (সন্তোষ-জাহ্নবী স্কুলের শিক্ষক) লেখককে সাহায্য করেন। 'জানাজা শিক্ষা' (১৯১৪) ও ''পারসী শিক্ষা' (১ ও ২ ভাগ) নামে তাঁর দুখানি শিক্ষামূলক পুস্তক আছে।[২]

সমিনউদ্দীন আহমদ

'মেদিনীপুর জেলার, পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর' সমিনউদ্দীন আহমদ দুখানি বই লেখেন: 'পঞ্চাইত বিধি' (১৮৯৯) ও 'চৌকিদারী গাইড' (১৯০০)। ১৮৭০ সালের ষষ্ঠ আইনে পঞ্চায়েত প্রথায় চৌকিদার-দফাদারদের দায়িত্ব সম্পর্কে যেসব আইন-কানুন আছে, গ্রন্থকার বই দুটিতে সেসব বিষয় অনুবাদসহ আলোচনা করেছেন। তিনি 'পঞ্চাইত বিধি'র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "পুলিশ কর্মচারিগণের সহিত এই পঞ্চাইত ও চৌকিদারিগণের বিস্তর

---

১. কাজী নওয়াব উদ্দীন আহমদ—মহাত্মা হজরত এমাম আবু হানীফা (রঃ) সাহেব, বাগেরহাট খুলনা, ১লা পৌষ ১৩০৫, 'পূর্বাভাষ' দ্রষ্টব্য।

২. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, পৃঃ ১০৪

সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই নিমিত্ত পঞ্চাইতগণকে তাঁহাদের কর্তব্য কার্যগুলি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া পুলিশ কর্মচারিগণের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। ... পঞ্চাইতগণ যাহাতে অতি সহজে আপন আপন কর্তব্য কার্য্যের বিধি জ্ঞাত হইতে পারেন ও যে উপায়ে হিসাবী কাগজাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র সেরেস্তাটা দুরস্ত রাখিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহারা কোন প্রকার পতিত না হয়েন ও সাধারণ অজ্ঞ প্রজাগণ যাহাতে আইনের মর্ম বুঝিতে পারে এবং যাহাতে চৌকিদারগণ সহজে বেতন পায়, তাহার জন্য আমি অল্প বিদ্যাবুদ্ধিবলে যতদূর পর্যন্ত এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপদেশ দফাওয়ারিতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে পরিণত করিলাম।"[১] গ্রন্থখানি মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কে. বি. টমাসকে উৎসর্গ করা হয়। 'গার্হস্থ্যনীতি' সম্পর্কিত 'কওয়ায়েদে-খানাদারী' (১৯০৯) সমিনউদ্দীন আহমদের লেখা অপর একটি গ্রন্থ। এতে ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ে উপদেশ আছে।[২]

মানিকউদ্দীন আহমদ (১৮৬৮-১৯৪৮)

বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার সুদিনগ্রামে মানিকউদ্দীন আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নর্মাল পাশ পণ্ডিত ছিলেন। রংপুর ট্রেনিং স্কুল থেকে স্পেশাল ট্রেনিং সার্টিফিকেট লাভ করেন। তিনি কিছুকাল পোস্ট-মাস্টারি করেন, পরে বগুড়ার ধুপচাঁচিয়া মডেল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এগুলি হল:

ক. বিবিধ উপদেশ সম্বলিত প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন (১৮৯৯)
খ. সন ১৩০৬ সালের বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৮৯৯)
গ. নবহীরকখনি বা ইসলাম সুহৃদ (১৯০৯)
ঘ. মহম্মদীয় বিবাহ দর্পণ (১৯১১)
ঙ. উপদেশ লহরী (১৯১৩)
চ. বাঙ্গালা শব্দকোষ বা ছাত্র সহচর অভিধান (১৯১৪)
ছ. শোকোচ্ছ্বাস ও বিদায় গীত (১৯১৫)

প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন ২০ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র সংকলন। বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুরস্কের সুলতানের বর্ণনা আছে।[৩]

---

১. সমিনউদ্দীন আহমদ—পঞ্চাইত বিধি, কৃপানন্দ যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃঃ ।. (বিজ্ঞাপন)
২. ন্যাশনাল লাইব্রেরী ক্যাটালগ (বাংলা গ্রন্থ) ৪ খণ্ড কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ২৫
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ. খ., ১৮৯৯

মোল্লা খোদাদাত

মোল্লা খোদাদাত খান বাহাদুর নদীয়ার বামনপুকুরের জমিদার ছিলেন। বনেদী জমিদার হিসাবে এই মোল্লা পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। মোল্লা খোদাদাত এক সময় কৃষ্ণনগরের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট এবং লোকাল বোর্ডের মেম্বর ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন।[১] সাহিত্যানুরাগিতা তাঁর অপর একটি গুণ ছিল। তিনি 'মনাজাত' নামে একখানি ভাবমূলক কবিতার বই লেখেন। পুস্তিকাখানির সমালোচনা করে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয়, "...মনাজাত গ্রন্থকারের হৃদয়ের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস। ... ইহার প্রত্যেক পংক্তিতে খোদা তালার প্রতি ভক্তির প্রবল ফোয়ারা ছুটিতেছে। ... ইহা সরল ও সুমিষ্ট কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। মুসমান জমীদারদিগের মধ্যে আজ পর্যন্ত কাহাকেও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখি নাই। মৌলবী খোদাদাত খান বাহাদুর সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, রাজ-পুরুষদিগের নিকট ইহার যেরূপ উচ্চ সম্মান, আজ মনাজাত লিখিয়া ইনি সাহিত্য জগতেও সেইরূপ যশস্বী হইতে চলিলেন।"[২] কৃষ্ণনগরের অধিবাসী হিসাবে তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)

ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কেবল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বইপুস্তক মুদ্রণে অর্থ সাহায্য দানের মধ্যেই প্রকাশ পায়নি, তিনি স্বয়ং বাংলা পুস্তক রচনা করেছেন। 'ঈদুল আজাহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরিফ' (১৯০৩) নামক ধর্মবিষয়ক দুখানি গ্রন্থ তাঁরই রচনা। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মকথা প্রচার এরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। 'ঈদুল আজাহা'র ভূমিকায় তিনি বলেন যে, ধর্মই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ধর্মই ইহ-লোক ও পরলোকের সহায়। এ নশ্বর জগতে ধর্মই সত্য ও অবিনশ্বর। ঈদের নামাজ, আরবী খোতবা দেশের মানুষ বুঝে না। ধর্মকথা তাদের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্যই তাঁর এ-প্রয়াস।[৩] 'মিহির ও সুধাকরে' এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়, "তিনি (নওযাব আলী চৌধুরী) দুর্বোধ্য ধর্মকথাগুলি বঙ্গভাষায় এমন সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। ... সাধারণকে

১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ ১২৯৯
২. ঐ
৩. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী-ঈদুল আজহা, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ হিজরী (১৯০০ খ্রীঃ), পৃঃ ।।৶. (ভূমিকা)

বুঝাইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক পাঠ না করিলে তাহা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।"[১] গ্রন্থখানি 'সুধাকরে' 'ঈদকাহিনী' শিরোনামে আংশিক প্রকাশিত হয়। এটি 'স্বর্গীয়া সহধর্মিনী সৈয়দানী আলতাফন্নেসা'র নামে উৎসর্গ করা হয়।

নওয়াব আলী চৌধুরীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মৌলুদ শরিফ'। গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'গ্রন্থকারের কথা' শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেন, "ধর্ম সংশ্রব-বিহীন আনন্দ, আনন্দ পদবাচ্যই নহে। ... আমি বহু দিবস হইতেই মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলাম—সত্যই কি আমাদের সমাজে এমন কোন ধর্মানুষ্ঠান নাই তদুপলক্ষে ধর্মালোচনা ও তৎসঙ্গে আনন্দোৎসবও চলিতে পারে? আমার মনে উদিত হইল—সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের জন্মদিনে আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। খৃষ্টানের 'খৃষ্টমাস', হিন্দুর 'জন্মাষ্টমী' প্রভৃতি উল্লিখিত শ্রেণীর আনন্দোৎসবপর্ব। আমাদের মধ্যেও যে এরূপ নাই তাহা নহে। আমাদের পবিত্র ধর্মপ্রবর্তক হজরত মোস্তফার (দ:) জন্মদিনে পুরাকাল হইতেই আনন্দোৎসব প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাই পবিত্র মৌলুদোৎসব। মৌলুদ-উৎসব পৃথিবীতে আনন্দদায়ক ও পরকালে মুক্তির সোপান। এমন কি লোকে ব্যাধিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ কামনায় এই পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। রোগ বা বিপদ মুক্ত হইলে কিম্বা বিবাহাদি কোন প্রকার আনন্দের সময়, মুসলমানদের আনন্দের প্রধান উপকরণ এই পবিত্র মৌলুদ অনুষ্ঠান। ... আমি মনে করিয়াছিলাম, এই সদনুষ্ঠান কিছু দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া করিলে পবিত্র আনন্দ ও ধর্মতৃষ্ণা নিবারণ এবং এই উপলক্ষে দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট সুযোগ হইবে। এইজন্য বিগত ১২৯৭ বঙ্গাব্দ হইতে আমার আবাসবাটী ধনবাড়ীতে রবিউল আউয়াল চান্দ্রমাসের প্রথম হইতে দ্বাদশ দিন ব্যাপী উৎসব হইয়া আসিতেছে। ... আমাদের এই উৎসব ক্ষেত্রে আরবি, পার্শি ও উর্দুতে ধর্মগ্রন্থের আলোচনা, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হইত। কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে ঐ সমস্ত ভাষা সহজবোধ্য নহে বলিয়া আমি তাহাদের জন্য বাঙ্গালায় প্রতি দিবস এক একটি একটি বিষয়ের আলোচনা করিতাম। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই সংগ্রহ বিকাশ তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য, নানাবিধ শাস্ত্রাদির মূল প্রমাণ ও তদনু-বাদাদির সাহায্যে টীকা ও বিশ্লেষণাদি দ্বারায় বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করিতে হইয়াছে। ... আমাদের দেশে চির পদ্ধতি ছিল, স্কুলের ছাত্রগণ সরস্বতী পূজা

১. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭

করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিত। ধর্মশিক্ষা ও ধর্মভাব স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ছাত্রগণ জানিত না যে তাহাদের ঐরূপ কোন পবিত্র উৎসব আছে কিনা। কাজেই তাহারা মুসলমান ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পৌত্তলিকতায় যোগ দিয়া ধর্মভ্রষ্ট হইত। নিতান্ত সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে তাহারা স্ব স্ব অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়াছে—তাহাদেরও একরূপ নির্মল আনন্দদায়ক ধর্মোৎসব আছে জানিয়া এই মৌলুদ উৎসব আরম্ভ করিয়াছে।"[১] এই উক্তি থেকে নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐ সময় মুসলমানের সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মনোভাব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল ধর্ম-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যকামিতা। মৌলুদ উদ্‌যাপন ধর্মানুষ্ঠান বিশেষ, নওয়াব আলী চৌধুরী একে সামাজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। তিনি গ্রন্থখানি পিতা জনাব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। তাঁর ইংরাজী গ্রন্থ 'ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) মূলে ছিল বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে এবং পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করে সমালোচনার জন্য বিভিন্ন সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করা হয়। 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা' শিরোণামে একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে নওয়াব আলী চৌধুরীর পুস্তিকার সমালোচনা করে ছিলেন। তিনি মুসলমান ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরীর অভিমত সমর্থন করেন, তবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষ বিষয়ক প্রশ্নে তাঁর সহিত একমত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সৈয়দ সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে মুসলমান বিদ্বেষের যে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মত লেখকের গ্রন্থে মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। ... মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।"[২] নওয়াব আলী চৌধুরীর শিক্ষা বিষয়ক আর একটি রচনা 'প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ' (১৯০৬)। এটি ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসে ঢাকায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে' পাঠ করেছিলেন।

১. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী—মৌলুদ শরিফ, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২২ হিজরী (১৯০৩ খ্রীঃ), পৃঃ ১-৫

২. ভারতী, কার্তিক ১৩০৭

মোসলেম ইনস্টিটিউট পত্রিকায় পুস্তিকাটির সমালোচনা বের হয়। পত্রিকায় বলা হয় যে, খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তারই উপর ভিত্তি করে তিনি উক্ত পুস্তিকাখানি রচনা করেন। পুস্তিকার সঙ্গে গ্রন্থে প্রদত্ত তৎকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাটি মূল্যবান।[১]

ওহাজুদ্দীন আহমদ

ওহাজুদ্দীন আহমদের একটি মাত্র বই 'গোবধে আপত্তি কেন' (১৯০০) 'নোয়াখালী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়। 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগে' গ্রন্থের পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "এই গ্রন্থে গো-বধ প্রথার সপক্ষে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং এর বিপক্ষে হিন্দুগণের দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। তিনি উপসংহারে মুসলমান ভ্রাতাগণকে নিজ অধিকার সম্পর্কে মিলিতভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাতে অনুরোধ করেছেন।"[২] গ্রন্থের ভূমিকাতেও এ-মতের সমর্থন পাওয়া যায়। লেখক বলেছেন, "It is belived that even in certain districts of Eastern Bengal some Zeamindars are not allowing their ryots to slaughter cows on their estates. This not a very happy sign. We earnetly hope that the benevolent British Government will appoint a special commission enquring and will save the poor Muslim cultivators from the terrible oppression of the Hindu Zeamindars.[৩] ওহাজুদ্দীনের গ্রন্থখানি মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' নিয়ে যখন আন্দোলন চলছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তা 'নোয়াখালী এসলামিয়া সভা'র এক প্রস্তাব থেকে জানা যায়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়: 'গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব শ্রীযুক্ত মুন্সী ওহাজদ্দিন আহমদ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এই সভা তাহার পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন, এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই সভার ব্যয়ে উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহার 4000 সংখ্যা বিনা মূল্যে দেশমধ্যে বিতরিত হউক।"[৪] 'গোবধে আপত্তি কেন' গ্রন্থখানি

১. *Journal of the Muslim Institute*, September, 1906
২. ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩১২
৩. ওহাজুদ্দীন আহমদ—গো-বধে আপত্তি কেন, নোয়াখালী, ১৯০০; *Muslim Community in Bengal*, pp. 363-64
৪. সুধাকর, পৌষ ১২৯৬

যে ঐ সময় লেখা হয়েছিল তা ঐ সংবাদ থেকে জানা যায়। ওহাজুদ্দীন আহমদের 'ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব সামসের গাজী' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশিত হয়।[১]

শেখ সাজ্জাদ করিম

শেখ সাজ্জাদ করিম হুগলী জেলার আড়দি ডাকঘরের অধীনস্থ জয়সিংচক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'আমিনা' (১৯০০) একটি সামাজিক উপন্যাস। তিনি 'ফুলের মালা' (১৯০২) এবং 'সাজ্জাদা' (১৯১২) নামে অপর দু'খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্যোমকেশ মুস্তোফী 'ফুলের মালা'কে কবিতা-পুস্তক বলে উল্লেখ করেছেন।[২] 'সাজ্জাদা বা যোগাসন' রুমীর মসনবী-কাব্যের ছায়াবলম্বনে রচিত একটি আধ্যাত্মিক সাধনার বই।[৩]

বদরুদ্দোজা চৌধুরী

বদরুদ্দোজা চৌধুরী চট্টগ্রামের রাঙ্গুর অধিবাসী ছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে তাঁর রচিত চারখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়—যথা 'মহর্ষি লোক-মানের শত উপদেশ' (১৯০০), 'বদরুল মাআরেক' (১৯০১) 'বদরুল ইসলাম' (১৯০২) এবং 'বদরুল আনোওয়ার' (ঐ)।[৪] ধর্ম ও নীতি কথা প্রচার উদ্দেশ্যেই বদরুদ্দোজা এগুলি প্রণয়ন করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পত্রিকা'য় তাঁর রচিত 'প্রার্থনা', 'নামাজ', 'দেওয়া' প্রভৃতি বইএর উল্লেখ আছে।[৫]

মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল

বগুড়ার সারেকান্দি থানার অন্তর্গত সরিলার গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল 'হায়রে সেদিন কোথায় গেল' (১৯০০) নামে ২৭ পৃষ্ঠার একখানি কবিতার বই লেখেন। এতে 'সাবেক কালের সহিত বর্তমানকালের উপমা' আছে; অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বকালের অবস্থার সহিত কবির সমকালের একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে। একে একটি যুগসমীক্ষা বলা যেতে পারে।' পয়ার ছন্দে সরল ভাষায় কবি বাস্তব

---

১. ইসলাম প্রচারকের ১৯০৫ সালের মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট এবং ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী এই পাঁচ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়।

২. ব্যোমকেশ মুস্তোফী—গত বর্ষের বাঙ্গলা সাহিত্য, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১০

৩. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, পৃঃ ১১১

৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ও ৩ ত্রৈ., খ.; ১৯০১; ৪ ত্রৈ., খ.; ১৯০২

৫. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, পৃঃ ৬৬

অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। যুগের পরিবর্তন দেখিয়ে তিনি এক জাগায় বলেছেন,

এবে আর নাহি দেখি ছোট বড় জ্ঞান;
কুলীনের কুল গেল সম্মানীর মান।
টাকা যার আছে—মান কুল কেবা পুছে
এবে আর কুল নাই, সেদিন গিয়াছে।[১]

পূর্বে রক্তে কৌলিন্যের পরিচয় ছিল, এখন অর্থে আভিজাত্যের পরিচয়। সমাজ-জীবনের এই পরিবর্তনের ধারাটি কবি খুব সহজ কথাই ইঙ্গিত করেছেন। কবির দৃষ্টিতে অতীতের দিনগুলি ধর্মবোধ, নীতিজ্ঞান, আচার-আচরণ ও আহার-বিহারের দিক দিয়ে উন্নত ও আনন্দদায়ক ছিল, এখন সব ক্ষেত্রেই অবনতি ঘটেছে।

সমিরুদ্দীন সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় হাটে ইন্দ্রচাঁদ বাবুর তেজারতী কারবারে মহুরীর কাজ করতেন। পরে তিনি নিজেই তেজারতীর আড়ত খুলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব সামান্যই ছিল।[২] সমিরুদ্দীনের কবিত্বশক্তি ছিল না, তবে একটি সমাজবীক্ষণধর্মী মন ছিল আর সেটাই ছিল তাঁর কাব্য রচনার প্রধান প্রেরণার ক্ষেত্র।

আবদুর রশিদ খান

'১৯০১ সনের নোয়াখালীর মোকদ্দমা। মহাত্মা পেনেলের বিচার। অর্থাৎ রায় ও হাইকোর্টের এবং ভারত ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের টেলীগ্রাম ও গুপ্তরহস্য-পূর্ণ বিধি আদির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। প্রথম খণ্ড। শ্রী আবদুর রশিদ খাঁ কর্তৃক অনুবাদিত। শ্রী সেরাজুল আহম্মদ চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত। নোয়াখালী রামেন্দ্র-যন্ত্রে শ্রী তারকাচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।'—এটি হল আবদুর রশিদ খানের গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি। 'ইসমাইল জাগীরদার' নামে জনৈক ব্যক্তির হত্যা-কাণ্ডের মোকদ্দমা নোয়াখালীর সেসন জজ পেনেল সাহেবের এজলাসে সম্পন্ন হয়। হত্যাকাণ্ডের সাথে পুলিশ জড়িত ছিল। কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে

---

১. মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল—হায়রে সেদিন কোথায় গেল, দাস যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃঃ ১৮

২. তিনি গ্রন্থের শেষে 'রচকের বিনয়' অংশে বলেছেন,

মোহে পড়ে রহিলাম জ্ঞান নাহি হৈল;
রচনা রচিতে শক্তি কিসে হবে বল।

হায়রে সেদিন কোথায় গেল, পৃঃ ২৬

পেনেল সাহেব নির্ভীকভাবে রায় দেন। এ রায় কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায়, তাঁকে চাকুরী থেকে সাসপেণ্ড করা হয়। পেনেল সাহেবের ইংরাজী রায় ও অন্যান্য তথ্যের বঙ্গানুবাদ উক্ত গ্রন্থখানি। গ্রন্থের শেষে 'উপসংহারে' অনুবাদক লেখেন, "এখন দেশের অবস্থা যেরূপ তাহা চিন্তা করিলে ভয় হয়। পূর্বে বৃটিশ সন্তানগণ জেলার মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়া কেবল রাজসিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেন না আর চাটুকার ব্যক্তিগণের কথা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন না। অধস্থন (অধঃস্তন) কর্মচারীদের হাতেই সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজে আয়াসে আরামে সময় কাটাইতেন না এবং 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' এই সমস্যা স্মরণ করিয়া তাহাদের সকল কার্য্যের উপর তীব্র লক্ষ্য রাখিতেন। তখন পুলিশও গোপনীয় অনুসন্ধানের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইত আজকালকার 'ধন উপার্জনে সুযোগ ও সুখের নিদ্রা' পুলিশের ভাগ্যে জুটিত না। ভরসা করি দেশীয় মাজিষ্ট্রেটগণ পূর্বতন বৃটিশ সন্তানগণের অনুসরণ করিবেন।"[১] গ্রন্থের প্রকাশক সেরাজুল আহমদ চৌধুরী 'আমাদের নিবেদন' অংশে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছেন, "আমরা ভরসা করি, ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, দেশীয় শিক্ষিত ও রাজকীয় উচ্চাসনে আসীন ব্যক্তিগণ, তদন্তকারী পুলিশের কর্মচারীগণের দোষ গোপন প্রভৃতি দোষের দণ্ড বিধানের বিধি দণ্ডবিধিতে বিধিবদ্ধ করিতে যত্নবান হইবেন ও পুনঃপুনঃ আন্দোলন করিতে থাকিবেন তাহা হইলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইবেন ও প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিতে যত্নবান হইবেন।"[২]

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ 'সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত' (১৯০১) নামে ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থ লেখেন। 'কুষ্টিয়া মোহামেডান এসোসিয়েসন' এটি প্রকাশ করে। মোহাম্মদ আবদুল আজিজ নদীয়া জেলার শ্যামপুর থানার দৌলতপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, "আমাদের ধর্মগুরু মহম্মদের জীবনচরিত প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া একান্ত কর্তব্য। আমরা মুখে মুসলমান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি অথচ উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অপরে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে নির্বাক হইতে হয়। ...মহম্মদ মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক; সুতরাং তাঁহার জীবনের সহিত উক্ত ধর্মের

১. ১৯০১ সনের নোয়াখালীর মোকাদ্দমা, পৃঃ ১।৶৹।।.
২. ঐ, পৃঃ ।।.

অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে পনর আনারও অধিক লোক তাঁহার মহিমময় জীবনের কণামাত্রও অবগত নহেন। ইহার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, আরবী পারসী ভাষায় লিখিত জীবনী; ঐ সকল ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবোধ্য। দুই একখানি জীবনী যদিও বঙ্গভাষায় বাহির হইয়াছে, তথাপি তাহার মূল্য অধিক এবং ভাষা কঠিন বলিয়া সাধারণে তাহা পাঠ করিতে অক্ষম। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মহম্মদের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাবলী অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আশা করি, ইহাতে অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদিগের অসুবিধা দূর হইতে পারে।"[১] মোহাম্মদ আবদুল আজিজ 'উপদেশমালা' (১৯১৫) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন।

ময়েজউদ্দীন আহমদ (১৮৫৫-১৯২০)

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ময়েজউদ্দীন আহমদ (মধুমিয়া) হাওড়া জেলার ব্যাতোড় ডাকঘরের অধীন বাকসাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শেষের দিকে তিনি যশোহর জেলার অমৃতবাজার ডাকঘরের অধীন আজমপুর গ্রামে বসবাস করতেন।[২] ময়েজউদ্দীনের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল, তা জানা যায় না। 'প্রচারক' মাসিক-পত্রের কোন কোন সংখ্যায় ডাক্তার ময়েজউদ্দীনের নামে 'মধু-বটিকা', 'অদ্ভুত মোদক' প্রভৃতি ঔষধের বিজ্ঞাপন ছাপা হত। ঠিকানা মৌখালি, ব্যাতোড়, হাওড়া। সম্ভবতঃ তাঁর পেশা ছিল ডাক্তারি। ঔষধের নাম থেকে অনুমিত হয়, তিনি হেকিম বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন।

'প্রচারক মাসিকপত্র (১৮৯৯) সম্পাদনা করে তিনি বিদ্বৎসমাজে পরিচিত হন। অনিয়মিত ভাবে হলেও পত্রিকাখানি কিঞ্চিৎ অধিক ৪ বছর স্থায়ী ছিল। নিজ ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি 'ইসলাম' (১৩০৭) ও 'মধুমিয়া' (১৩২৬) নামে অপর দুখানি পত্রিকারও সম্পাদনা করেছিলেন। সেগুলির আয়ু ছিল ক্ষণকালীন।

---

১. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ—সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত, মথুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, ১৯০১ 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য

২. ময়েজ উদ্দীন মহম্মদ প্রণীত 'শান্তিকর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী, ৩ খণ্ড, (১৩২২) টিকের আখ্যাপত্রে ঐরূপ ঠিকানা আছে

ময়েজউদ্দীন আহমদ ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ক. ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ), ১খণ্ড, ১৯০২
খ. মধু-সঙ্গীত, ১৯০৮
গ. জেহাদ বা ক্রুসেড, ১৯০৯
ঘ. শান্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী, ১ খণ্ড (১৯১০), ২ খণ্ড (১৯১৩) ও ২ খণ্ড (১৯১৫)
ঙ. ইসলাম-আলো
চ. তুরস্কের ইতিহাস।[১]

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে ময়েজউদ্দীন রচিত 'বঙ্গানুবাদিত তফসীর হাক্কানী' (১৯০১) নামে একখানি কোরান অনুবাদের উল্লেখ আছে।[২]

খ্রীস্টান মিশনারী পরিচালিত 'প্রচার' পত্রের সহিত 'প্রচারকে'র ধর্ম সম্বন্ধীয় বিতর্ক হত। সম্পাদক স্বয়ং কয়েকটি প্রবন্ধে 'প্রচারে' প্রকাশিত মতামতের আলোচনা করেন। 'সত্যের জয়ে দুঃখ কেন', 'আল্লার দাস', 'সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা' প্রবন্ধগুলি তাঁরই লেখা। খ্রীস্টানরা 'বাইবেল নীতিপূর্ণ গ্রন্থ' বলে দাবী করলে ময়েজউদ্দীন বাইবেলের কয়েকটি ব্যভিচারদৃশ্যের উল্লেখ করে ঐ দাবীর অসারতা প্রমাণ করেন। খ্রীষ্টানরা যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরপুত্র মনে করে পূজা করেন; তিনি এজন্য তাঁদের 'নরপূজক' শব্দে আখ্যায়িত করেছেন।[৩] বাইবেলে হজরত মহম্মদের আগমনসূচক পদবার্তা আছে। অতএব খ্রীস্টানদের উচিত মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলামধর্মের অনুসরণ করা। পাদরী মনরোর এক প্রবন্ধের জবাবে ময়েজউদ্দীন 'সেই ভাবাবাদী বা সত্যের বিভা' নিবন্ধে ঐরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন।[৪] ১৩০৭ সনের চৈত্র সংখ্যায় 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' নিবন্ধে ময়েজ-উদ্দীন লিখেন, "১০ বৎসর ধরিয়া ইসলাম মিশনের চিন্তা করিয়া আসিতেছি। ... মুসলমানেরদিগের চক্ষে আজ খৃষ্টিয়ান মিশনারীরা ত্রিত্ব-ভেলকী লাগাইয়া তাহাদিগকে খৃষ্টিয়ান করিতেছে।"[৫] 'ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ)' গ্রন্থে তিনি এসব প্রসঙ্গই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উত্থাপন করেছেন। সকল প্রকার আক্রমণ কুপ্রভাব থেকে ইসলামকে রক্ষা করার দুর্দমনীয় অভিপ্রায় নিয়ে তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন; রসসাহিত্য সৃজন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

---

১. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা
২. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ. খ., ১৯০১
৩. প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
৪. ঐ, চৈত্র ১৩০৬
৫. ঐ, ১৩০৭

আফতাবউদ্দীন আহমদ

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে আফতাবউদ্দীন আহমদের নামে দুখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে: 'প্রেম পাগল' (১খণ্ড, ১৯০৩) এবং 'অদ্বিতীয় উপদেশ-প্রাণ-প্রিয় তাপস' (১৯০৩)। প্রথমখানিকে 'উপন্যাস' ও দ্বিতীয়খানিকে 'ধর্ম' পুস্তক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'প্রেম পাগল' পূর্ণিয়ার 'দি নিউ সেঞ্চুরী প্রেস' থেকে মুদ্রিত। 'অদ্বিতীয় উপদেশ-প্রাণপ্রিয় তাপস' কলিকাতার 'রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস' থেকে মুদ্রিত।

'নবনূর' ও 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক হিসাবে আফতাবউদ্দীন আহমদের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থ প্রণেতা আফতাবউদ্দীন ও প্রবন্ধ-লেখক আফতাব-উদ্দীন একই ব্যক্তি। তিনি সম্ভবতঃ ঢাকার গড়পাড়া নিবাসী বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী মনিরুদ্দীন আহমদের পুত্র ছিলেন। 'ইসলাম মিশন সমিতি' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'কে সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর মতে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে আবর্জনারাশি জমা হয়ে আছে, সেগুলি ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই দূর করা সম্ভব।[১]

দেওয়ান নাসিররুদ্দীন আহমদ

রাজশাহীর শিকারপুর নিবাসী দেওয়ান নাসিরুদ্দীন 'পুষ্পহার' (১৯০৩) এবং 'হাসির তরঙ্গ' (১৯০৮) নামে দু'খানি কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নাসিরুদ্দীনের কবি-প্রতিভা তেমন ছিল না, তবে জাতীয় চেতনা ছিল প্রখর। 'নূর-অল ইমান' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩০৮) 'আবেদন' নামে সুদীর্ঘ কবিতায় 'এসলাম সমাজ মাঝে, যত রোগ বিরাজিছে, তার মাঝে মুর্খতা প্রধান' বলে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, 'এলেম বিস্তার করি, জেহালৎ পরিহরি, সাধ সবে জাতীর কল্যাণ।' হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া দেশমাতার উন্নতি সম্ভব নয়, বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২] তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 'পতিভক্তি' (১৯০৭), 'সমাজ-সংস্কার' (১৯০৮), 'পবিত্র রমজান মাহাত্ম্য' (১৯০৯), 'আরবী পড়া শিক্ষা' (১৯১০), 'ইসলামী নামকরণ' (১৯১৪), 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও ইমাম মেহেদী আবির্ভাব' (১৯১৫), 'স্বর্গনরক' (১৯২০), 'ধনের সন্ধান' (১৯২৬) প্রভৃতি।[৩] এগুলির অধিকাংশই ধর্মমূলক রচনা। তিনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে গুনশী মেহেরুল্লা ও মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সমকক্ষ ছিলেন।

---

১. ইসলাম প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১১

২. আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, পৃ: ৩৪৩

৩. মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন—দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহমদ, পাকিস্তানী খবর, ২৭ জুলাই, ১৯৬৩

'পুষ্পহার' কাব্যের উৎস ও বিষয় সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় বলেছেন, "মাহাত্মা দেওয়ান হাফেজ ও শেখ সাদি প্রভৃতি মহাকবিগণের রচিত কাব্যোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্প চয়ন করতঃ এই পুষ্পহার গ্রথিত হইয়াছে।"[১] 'নবনূরে' এর সমালোচনা বের হয়। কবির উক্তির সূত্র ধরে সেখানে মন্তব্য করা হয়, "পুষ্প-গুলি বেশ মনোহর ও সৌগন্ধবাহী। ইহার মধ্যে কয়েকটি পুষ্প মহাকবি শেখ সাদির কাব্যোদ্যানের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। লেখক কবিতা রচনায় নতুন ব্রতী; চর্চা করিলে আশা করি তিনি একার্য্যে সফলতা লাভ করিবেন।"[২] কয়েকটি সংবাদ পত্রের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। 'সোলতান' (১৩১২) পত্রিকার তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হন।[৩]

সমীরুদ্দীন আহমদ

রংপুরের রাধাবল্লভপুর গ্রামনিবাসী সমিরুদ্দীন আহমদ 'মোহম্মদীয় ধর্মসোপান' (১৯০৩-০৪) মোট ৫ খণ্ডে সমাপ্ত করেন।[৪] এটি ইসলাম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। লেখক 'নমাজ' খণ্ডের 'সূচনা'য় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "মোসলমানধর্মের মূলশাস্ত্র পবিত্র কোরান শরিফ আরবী ভাষায় লিখিত আছে এবং হদিস ও কেয়াস বা ফেকা শাস্ত্র সমস্তই আরবী ভাষায় বিরচিত ও পারসী উর্দু ভাষায় অনূবাদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রায় মুসলমানগণের জ্ঞানাভাব, সুতরাং দুর্বলমতি বঙ্গবাসীগণ জাতীয় ভাষার ধর্মপুস্তকসমূহের মর্মাবগতিতে অক্ষম জন্য স্বীয় ধর্মাবিশ্বাসে দুর্বল হইয়া যাইতেছে। ধর্মকর্মধর উপদেশদাতা বিদ্বানগণ (মৌলবী সাহেব) সময় ও শিক্ষা দোষে ধর্মভ্রান্তগণকে সরল পথে আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ বঙ্গীয় মোসলমানগণের মাতৃভাষায় সরল ভাবাপন্ন ধর্মবহি প্রকাশ না করিলে উক্ত রোগের উপশম হওয়ার সম্ভব (সম্ভাবনা) নাই। বঙ্গভাষায় উপদেশপূর্ণ শিক্ষোপযোগী ধর্মগ্রন্থ অতি বিরল এবং যাহা কিছু আছে তাহা শ্রেণীভেদে ও সুশৃঙ্খলা অভাবে তদ্দ্বারা যথোচিত সুপ্রণালীতে শিক্ষা লাভ করা অসাধ্য। ...ইসলামের আবশ্যক যাবতীয় বিষয়

১. দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহমদ—পুষ্পহার, ১৯০৩, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
২. নবনুর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০
৩. মাহে-নও, পৌষ, ১৩৬৪
৪. কলেমা, নামাজ, রোজা হজ ও জাকাত এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম-ধর্মের তত্ত্বগত বুনিয়াদ। এগুলি একজন বিশ্বাসীর পক্ষে ফরজ বা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। 'মোহম্মদীয় ধর্মসোপানে'র প্রথম খণ্ডে 'কলেমা' দ্বিতীয় খণ্ডে 'নামাজ 'তৃতীয় খণ্ডে রোজা', চতুর্থ খণ্ডে 'জাকাত' এবং পঞ্চম খণ্ডে 'হজ' সম্পর্কে আলোচনা আছে।

পরিষ্কাররূপে দেখানর মানস ছিল কিন্তু ক্ষুদ্র সোপান ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই ক্ষুদ্র সোপান যোগে আরোহণ করিয়া পঞ্চশাখা বিশিষ্ট (কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্ব, জকাৎ) অক্ষয় কল্পতরুবরে আরোহণ করতঃ অমৃতময় ফলাস্বাদে চরিতার্থ হইবে এবং ক্রমে উর্দ্ধতর সোপানরাজি অবলম্বনে উন্নত হওতঃ আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক যাবতীয় অমৃত ফলাস্বাদে পরম কারনিক সৃষ্টিকর্ত্তার সান্নিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।"[১] 'ইসলাম ইতিবৃত্ত সোপান' (১৯১৫) ও 'সহজ নামাজ শিক্ষা' নামে তাঁর অপর দুখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ও সৈয়দ আমানত আলী সমিরুদ্দীনকে গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেন। মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী অর্থ সাহায্য দান করেন। গ্রন্থখানি জমিদার চৌধুরীর পিতা 'সেয়েখ জেয়াউল্লাহ চৌধুরী'কে উৎসর্গ করা হয়। প্রথম খণ্ড 'কলেমা' অংশের সমালোচনায় 'নবনূরে' বলা হয়, "...এই বিকৃত রুচির দিনে ধর্মতত্ত্বের যতই অধিক প্রচার হয় ততই মঙ্গল। ভরসা করি 'মোহাম্মদীয় ধর্মসোপান' বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সোপানেরই কাজ করিবে।"[২]

'শিক্ষা-সোপান' নামে তিন খণ্ডে সমাপ্ত বর্ণশিক্ষা বিষয়ক তাঁর একটি পাঠ্য-পুস্তকও আছে। তাঁর 'প্রণয় সোপান' কবিতার বই।[৩] সমিরুদ্দীন রংপুরে মোক্তারি করতেন।

শাহ আবদুল্লা

শাহ আবদুল্লা ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার ভাবশিষ্য। তিনি পূর্বে খ্রীস্টান ছিলেন। শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ এহসানউল্লা ও শাহ আবদুল্লা মুনশী মেহেরুল্লার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ধর্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বক্তৃতা দান ও পুস্তক রচনা—বিবিধ উপায়ে তাঁরা প্রচার-কার্য চালাতেন। খ্রীস্টান পাদরীরা ইসলামের প্রতি যে আক্রমণ করতেন ও অপবাদ আরোপ করতেন, তাঁরা তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় তার আক্রমণ বিরোধিতা করতেন এবং ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরতেন। এই উদ্দেশ্যে শাহ আবদুল্লা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন ও পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'নবী মাছুম অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ বেগুনাহ নবী' (১৯০৪) একখানি জীবনী গ্রন্থ।[৪]

---

১. সমির উদ্দীন আহমদ—মোহম্মদীয় ধর্মশোপাশ, নারায়ণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১১, পৃঃ ./.-৵.
(ভূমিকা)
২. নবনূর, ভাদ্র, ১৩১০
৩. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, পৃঃ ১০৩
৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ., খ.; ১৯০৪

দীন মোহাম্মদ (১৮৫৩-১৯১৬)

দীন মোহাম্মদের পূর্ব নাম মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বরিশাল জেলার নথুল্লাবাদ গ্রামের গাঙ্গুলী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকার নোয়াগাঁও-এর মৌলানা ফৈজুদ্দীন লস্করের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীন মোহাম্মদ নামে পরিচিত হন। তিনি সুবক্তা ছিলেন, ইসলাম ধর্ম প্রচার তাঁর প্রধান কাজ ছিল।[১]

দীন মোহাম্মদের লেখা তিনখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়: 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কায় ভারতবাসীর নিকট ফকির দীন মোহাম্মদের আবেদন' (১৯০৪), 'ক্রুসেড ও জেহাদ' (১৯০৮) ও 'কলিকাতায় গো-কোর্বানী হাঙ্গামা' (১৯১১)।[২] গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ অব্যাহত ছিল, দীন মোহাম্মদের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থে তারই অনুবৃত্তি আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে ধর্মের কারণে মুসলমান-খ্রীস্টানের মধ্যেকার ঐতিহাসিক বিরোধের বর্ণনা আছে।

আবদুল বারি (১৮৭২-১৯৪৪)

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বাবুপুর গ্রামে আবদুল বারি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'বরিশাল সার্ভে স্কুলে'র প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর চারখানি গ্রন্থ আছে: 'জরিপ-শিক্ষা' (১৯০৪), 'কারবালা' (১৯১৩), 'ভারতের যুবরাজ' ও 'ইসালে সওয়াব'।[৩]

আবদুর রহমান

আবদুর রহমানের 'অশ্রুহার' (১৯০৪) কবিতা পুস্তক। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' কবি বলেন, "অধুনা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুসলমানীয় সাহিত্যের আলোচনা ও পাঠ করিতেছেন, ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ আনন্দিত। তাঁহাদের মুসলমানীয় সম্প্রীতি বলবতী করিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'অশ্রুহারে'র মধ্যে মুসলমানীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।"[৪]

কাব্যখানির প্রথম সমালোচনা হয় 'ধূমকেতু' পত্রিকায়। সেখানে লেখা হয়, "লেখক, মুসলমান হইলেও বঙ্গভাষায় নিতান্ত অনুরাগিনী। তবে যে কবিতাগুলি নিতান্ত অসার হইয়াছে ইহা তাহার দোষ নহে—কালের দোষ।"[৫]

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২৫ (৪ সং)।
২. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ., খ.; ১৯০৪
৩. ঐ, ৪ ত্রৈ., খ.; ১৯০৪
৪. আবদুর রহমান—অশ্রুহার, কলিকাতা, ১৯০৪, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।
৫, ধূমকেতু, বৈশাখ, ১৩১২

'নবনূরে' এর অপর সমালোচনা হয়। পত্রিকায় বলা হয়, "...মহর্ষি ইউসফের প্রতি জোলেখার উক্তি, বীরাঙ্গনার বিষাদোক্তি, মহর্ষি ইয়াকুবের প্রতি ফরহাদ প্রভৃতি কবিতাগুলির ভাবনিচয় অতি মনোরম; কিন্তু লেখক কবিতাগুলি ভাল-রূপ পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। তবে আমাদের আশা আছে, নবীন লেখক কবিতা লেখার চর্চা রাখিলে সময়ে একজন ভাল কবি হইতে পারিবেন।"[১]

সৈয়দ আবুল হোসেন (জন্ম ১৮৬৪)

সৈয়দ আবুল হোসেন হুগলী জেলার বামনান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৮৭৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৮৮৭ সালে 'ইণ্ডিয়া-পোতে' তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ শেষ করে আমেরিকায় যান এবং নিউইয়র্কে ডাক্তার সাণ্ডবার্গের সাহায্যার্থে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন শুরু করেন। ডেনভারে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন। তারপর জাপান ও চীন ভ্রমণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কলিকাতার কলিঙ্গা বাজারে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন এবং সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।[২]

সৈয়দ আবুল হোসেনের বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। তিনি বিলাতে যাওয়ার সময় জাহাজে 'ভুবন-ভ্রমণ' (১৮৮৭) কাব্য লেখেন। কলিকাতায় তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় এবং কাব্যচর্চা সমানে চলতে থাকে। 'দরবার প্রেস' নামে তাঁর একটি ছাপাখানা ছিল।[৩] তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলির মধ্যে 'যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস' (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যমজ ভগিনীকাব্য 'হোসেনী ছন্দে' লেখা। এটি অমিত্রাক্ষরের প্রকারভেদ: পদ্যের মত চরণস্তবক সজ্জা নেই, গদ্যের ভঙ্গিতে পরিচ্ছেদ আছে। উদাহরণ (শ্বেতাঙ্গিনী কর্তৃক সিরাজদ্দৌলাকে উপদেশ): "হিন্দু-মুসলমান, এই সম্প্রদায়দ্বয়ে, রাখিও বিভিন্ন সদা, কুত্রাপি একটি যেন না হইতে পারে। — ইহারা একত্র মাগো হইবে যেদিন, সেদিন তোমার শিরে উড়িবে গো চিল কাক, কহিনু নিশ্চয়।"[৪] যাত্রার সংলাপের ঢঙে এই গদ্য ছন্দ রচিত। ইতিহাসের উপর খেয়ালি কল্পনার রঙ লাগিয়ে উপন্যাসখানি লেখা হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই লেখক সুরুচির পরিচয় দেননি বরং সাহিত্যের স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন। 'নবনূরে'

১. নবনূর, মাঘ, ১৩১২
২. বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
৩. মাহে-নও, আষাঢ়, ১৩৬৫
৫. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪১৫

সৈয়দ এমদাদ আলী এর দীর্ঘ সমালোচনায় আগাগোড়া নিন্দা করেছেন। তাঁর ভাষায়—"এইরূপ অভিনব নামযুক্ত একখানি গ্রন্থ লইয়া ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন এম. ডি. বিরস চিকিৎসাচর্চা হইতে সরস সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। ...আমরা কিন্তু সুস্থ অবস্থায় ইহা হইতে একবিন্দুও রস সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। ...রচনামাত্রই হয় পদ্য নতুবা গদ্য। ইহা ভাষা ও সাহিত্যরাজ্যের চিরন্তন নিয়ম। যিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন তাঁহার স্থান কোথায় তাহা বোধ হয় এক্ষণে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। বঙ্গ-ভাষা আপনার পুষ্টিকরকল্পে মুসলমান-সাধনা প্রত্যাশা করে সত্য কিন্তু সেই সাধনার পথে এইরূপ সাহিত্যিক ব্যভিচার সংঘটিত হইলে মুসলমান সমাজকেই মস্তক নত করিতে হয়। ...মনে হয় বাঙ্গালা ভাষায় অচিরেই সৈয়দ আবুল হোসেন রচিত একখানি ব্যাকরণ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইবে।"[১] 'ইসলাম-প্রচারকে'ও এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার সাহেব বহুকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানপূর্বক চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমরা মনে করিতাম মাতৃভাষায় তাঁহার কোন অধিকার নাই কিন্তু তাঁহার যমজভগিনী কাব্য পাঠে আমাদের সে ধারণা দূর হইয়াছে।"[২] হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কাব্যের সমালোচনা করেন বলে ঐ পত্রিকায় উল্লেখ আছে। শেখ আবদুর রহিম একটি প্রবন্ধে 'হোসেনী ছন্দে'র প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন গুণীর সম্যক আদর নেই বলে আবুল হোসেন প্রাপ্য মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়েছেন।[৩] তাঁর 'স্বর্গারোহণ কাব্য', (১৯০৬) বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার সংকলন। এরপর তিনি 'জীবন্ত পুতুল' (১৯০৭), 'মোসলেম পতাকা: তারিখুল ইসলাম' (১৯০৮) 'ইংরাজী শিক্ষাসোপান' (১৯১৬), 'সাবিত্রীর সত্যজীবনী' (১৯২৩) 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' (১৯২৪), 'স্পেনে মোসলেম পতাকা বা স্পেন বিজয়' (১৯২৫) প্রভৃতি রচনা করেন।[৪]

খোন্দকার গোলাম আহমদ

বর্ধমানের অধিবাসী খোন্দকার গোলাম আহমদের তিনখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় 'মোসলেম জাতির ইতিহাস', 'এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি' (১৯০৫) এবং

---

১. নবনূর, কার্তিক, ১৩১৩
২. ইসলাম প্রচারক, মাঘ, ১৩১২
৩. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭
৪. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪১৬-১৮

'আজমীর ভ্রমণ' (১৯২৬)।[১] 'এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি' (১৯০৫) গ্রন্থখানি কাটোয়ার 'এডওয়ার্ড প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়। 'নবনূরে' এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়: "প্রধানতঃ মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুদিগকে এসলামের সুমহান কীর্তিগুলি কিছু কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এবং এসলামের পবিত্র সরল নীতি-গুলি তাহাদিগকে মোটামুটিভাবে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ এতৎ গ্রন্থ পাঠে মুসলমান সম্বন্ধে তাঁহাদের চির-পোষিত ভ্রান্ত ধারণার কতকটা পরিহার করতঃ তাঁহাদের অধঃপতিত প্রতিবেশী-দিগের প্রতি প্রীতিমান হইবেন এবং পক্ষান্তরে স্বধর্মে অশ্রদ্ধাবান মুসলমান ভ্রাতারাও তাঁহাদের ধর্মের মোটামুটি বিষয়গুলি জানিতে পারিয়া স্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল হইবেন।"[২] খোন্দকার গোলাম আহমদ বর্ধমানের জজ কোর্টে চাকুরী করতেন।[৩]

খুলনার অধিবাসী ইলাহী বখশের 'সুহেলী য়েমন' (১৮৭১) শ্রীহট্টের হজরত শাহ জালালের জীবনীগ্রন্থ। এটি নসিরুদ্দীন হায়দার রচিত ঐ নামের ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।[৪]

আমিনুদ্দীন রচিত 'প্রবোধ সুধাকর' (১৮৭২) কবিতার বই। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি মোহ অর্থহীন—গ্রন্থে এই নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' এটি ছাপা হয়।[৫]

ভিক্ষাবৃত্তির অপকারিতা বর্ণনা করে শেখ বাবু ওরফে আহমদ 'মনোজ্ঞ কাহিনী' (১৮৭৫) নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন।[৬]

ওবায়েদুল হকের 'পদ্যমালা' (১৮৭৬) গীতিধর্মী রচনা।[৭]

মঈনু আহমদের 'কবিতা-কুসুমাঙ্কুর' (১৮৭৬) খণ্ড কাব্য। তিনি রামনারায়ণ দাসের সহযোগিতায় এটি প্রণয়ন করেন।[৮]

মোহাম্মদ রইসুদ্দীন 'জয়নন্দ বিবাহ' (১৮৭৭) নামে একখানি কবিতার বই বরিশালের 'সত্য প্রকাশ প্রেস' থেকে প্রকাশ করেন।[৯]

---

১. বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
২. নবনূর, ভাদ্র ১৩১২
৩. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, পৃঃ ১০৩
৪. সৈয়দ মর্তুজা আলী—হজরত শাহ জালালের লেখকগণ, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৪৮
৫. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ., খ., ১৮৭২
৬. ঐ, ২ ত্রৈ., খ.; ১৮৭৫
৭. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৯৩
৮. ঐ, পৃঃ ২৯৩
৯. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ., খ.; ১৮৭৭

টাঙ্গাইলের আটিয়ার অধিবাসী হামিদউল্লা 'ব্রজবালা' (১৮৭৭) নামে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। এটি ময়মনসিংহের 'ভারত মিহির প্রেসে' ছাপা হয়।[১]

হতাশ প্রেমের দুঃখ বর্ণনা করে হামিদুল হক রচনা করেন 'বিরহ দর্পণ' (১৮৭৭) কাব্য। কলিকাতার 'সনাতন প্রেসে' এটি ছাপা হয়।[২]

বরিশালের কোরবানউল্লার 'খণ্ড প্রলয়' (১৮৭৭) কবিতার বই। 'সত্যপ্রকাশ প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।[৩]

হালিমউল্লার 'যুবকরঙ্গিনী' (১৮৭৯) কবিতার বই ঢাকার 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল প্রেসে' মুদ্রিত হয়।[৪]

আবদুল গফুর চৌধুরীর 'পড়ে দেখ উচিত কথা' (১৮৭৯) ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ; উর্দু 'তাম্বিকাতুল হিন্দে'র অনুবাদ এটি।[৫] ঢাকার 'বাঙ্গালা প্রেসে' বইটি ছাপা হয়। 'তকবারে মাকুল' (১৮৯৮) তাঁর অপর গ্রন্থ: সেযুগের ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে লেখা—গ্রামে ঈদ ও জুমা ধর্মসিদ্ধ নয় বলে লেখক মত প্রকাশ করেছেন।[৬] ওয়াহাবীপন্থীরা অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন।

মোহাম্মদ সাদুর 'রাজদর্পণ' (১৮৮০) কবিতার বই; ময়মনসিংহের রাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁর প্রশস্তি কীর্তন করে এটি রচিত হয়।[৭]

তশহদোল হোসেনের 'ভগ্নআশা' (১৮৮৪) কবিতার বই; 'ঢাকা প্রকাশে' এর বিরূপ সমালোচনা হয়, 'মিঞা সাহেবের আদিরসে মন বড় খুলিয়া গিয়াছিল, ভাবে গদগদ হইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; অতএব ইহার উপযুক্ত সমালোচনা করিতে আমরা অক্ষম। মিঞা সাহেবের একটুকু লিখিবার ক্ষমতা আছে, তবে ভাবের আবেগটা কিছু না কমাইলে জনসমাজে তাঁহার পরিচয় দিতে আমাদের সাহস হয় না।"[৮] ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' বইটি ছাপা হয়।

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ., খ.; ১৮৭৭
২. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৭৭
৩. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৭৭
৪. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৮০
৫. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৭৯
৬. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮
৭. ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮০
৮. ঢাকা প্রকাশ, ২৭ পৌষ, ১২৯২

রংপুরের আবদুল খালেকের ১৮৮৬ সালের 'ইনকামটেক্সের ২-আইন' (১৮৮৬) সেকালের আয়কর সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা।[১]

কেরামত আলী মিয়া সংকলিত 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৮৭) ধাঁধার বই; নোয়াখালীর 'সাধারণ প্রেসে' এটি ছাপা হয়।[২]

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'নারী চিকিৎসা' (১৮৮৭) লেখেন মুনশী মিঞা এটি ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' ছাপা হয়।[৩]

শ্রীহট্ট নিবাসী হাসমতউদ্দীন আহমদ আইন বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন; এর নাম 'মহম্মদীয় ল'য়ের সরল প্রক্রিয়া' (১৮৮৮)। এটি স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন প্রণীত 'মহামেডান ল' শীর্ষক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় সরল অনুবাদ।[৪]

ব্রহ্মযুদ্ধে নৌ-অভিযানের কাহিনী নিয়ে 'সংক্ষেপে বাহার' (১৮৮৮) নামক ৩৬ পৃষ্ঠার একটি কবিতার বই লেখেন বেলায়েত আলী।[৫] 'মিলন কুটীর' (১৯২১) নামে তাঁর একখানি সামাজিক উপন্যাস আছে।

'যমুনা পুলিনে কে তুই অনাথিনী' (১৮৮৮) শীর্ষক একখানি উপন্যাস লেখেন বর্ধমানের সৈয়দ আবুল কাসেম।[৬]

টাঙ্গাইলের ধল্লা নিবাসী খোন্দকার জোবেদ আলী 'বেহুলা নাটকাভিনয়' (১৮৮৮) রচনা করেন। এটি বহুল প্রচলিত বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কাহিনীর নাট্য-রূপায়ণ।[৭] জোবেদ আলীর ভাষা যাত্রার প্রভাবমুক্ত নয়। তাঁর সমাজবিষয়ক গ্রন্থ 'পর্দা ও মুসলমান সমাজ' (১৯১৮)।[৮]

শেখ গোলাম সোবানী 'হুগলীর পুল বিবরণ' (১৮৮৮) নামে একখানি কবিতার বই লেখেন, এতে হুগলীর জুবিলী ব্রিজের বিবরণ আছে। হুগলীর 'বুধোদয় প্রেস' থেকে এটি মুদ্রিত হয়।[৯]

---

১ অধ্যাপক আলী আহমদের 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।
২ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ. খ ১৮৮৭
৩. ঐ, ৩ ত্রৈ খ. ১৮৮৭
৪ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৮
৫. ঐ, ৩ ত্রৈ খ. ১৮৮৮
৬. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৮৮
৭ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৮
৮. অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।
৯. ঐ

বগুড়ার শেরপুর গ্রামনিবাসী কাজী আশর আলী খান 'রসিক প্রধান' (১৮৮৯) নামে কবিতার বই লেখেন। বগুড়ার 'রায় প্রেসে' এটি ছাপা হয়। তিনি এতে গো-হত্যার বিপক্ষে মত প্রচার করেছেন।[১]

মোহাম্মদ হানিফউদ্দীন কোরানের উপদেশ সম্বলিত 'সারকথা' (১৮৯১) 'বগুড়া রায় প্রেস' থেকে মুদ্রিত করেন।[২]

সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেনের 'উপদেশ কাহিনী' (১৮৯৮) ঢাকার 'সামন্ত প্রেস' থেকে ছাপা হয়। এটি ছোট ছোট কবিতার বই।[৩]

এ. আহমদের 'সংসার চমৎকার' (১৮৯১) নামক কবিতার বই ঢাকা 'আদর্শ প্রেসে' ছাপা হয়।[৪]

আবদুল শাহ কালান্দার 'হীন্দু-জ্ঞানপ্রদ' (১৮৯১) শীর্ষক একখানি পুস্তিকা লেখেন। ঢাকার 'ওরিয়েণ্টাল প্রেসে' তা ছাপা হয়। লেখক ফকীর সাম্প্রদায়ের লোক। 'হীন-দু' অর্থাৎ দুইএর কম—এরূপ অর্থ করে বলেছেন, হিন্দুগণ প্রথমে এক দেবতার পূজা করতেন কিন্তু পরে ঐ পথ বিস্মৃত হয়ে বহু দেবতার পূজা আরম্ভ করেন।[৫] বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

আবদুল হামিদ 'ভক্তি-মঞ্জরী' (১৮৯১) নামে একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। এটি ঢাকার 'গিরিশযন্ত্রে' ছাপা হয়। 'ঢাকা প্রকাশে' এর সমালোচনা হয়। "নবীন কবি, বয়সে বালক, গণিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু মোহনচন্দ্র বসাকের সুযোগ্য ছাত্র, পুস্তকে গুরুভক্তি ও পিতৃ-মাতৃভক্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু শৈশব কবিত্বের গন্ধে বড়ই অভক্তি জন্মে।"[৬]

'শোকোচ্ছ্বাস' (১৮৯৪) নামক শোক কবিতা লেখেন নজিবউদ্দীন আহমদ। মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামনিবাসী জহিরুদ্দীন আহমদের স্মরণে এটি রচিত। জহিরুদ্দীন কলিকাতার নামকরা পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন। এটি ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' ছাপা হয়।[৭]

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৯
২ ঐ, ১ ত্রৈ, খ. ১৮৯১
৩. ঐ, ২ ত্রৈ, খ ১৮৯১
৪. ঐ, ৪ ত্রৈ, খ. ১৮৯১
৫. ঐ, ৩ ত্রৈ, খ ১৮৯১
৬. ঢাকা প্রকাশ, ১ আষাঢ় ১২৯৮
৭. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ. ৪ ত্রৈ. খ; ১৮৯৪

ফজল করিব প্রণীত 'ডিহি সম্বন্ধীয় কার্য চালাইবার নিয়মাবলী' (১৮৯২) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা; এতে হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর করটীয়াস্থ জমিদারী পরিচালনার নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। 'মাহমুদিয়া প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।[১]

বগুড়ার মোক্তার মশিওতুল্লা 'প্রমত্ত প্রেমিক হাফেজের উক্তি' (১৮৯২) শিরোনামে পারস্য কবি হাফেজের কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বগুড়ার 'চৌধুরী প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।[২]

ওহেদুর রহমানের 'মুসলমানের ধর্মবিবরণ' (১৮৯৩) ক্ষুদ্র ধর্মপুস্তক।[৩]

ঢাকার অধিবাসী শাহ গোলাম রহমানের 'সিদ্ধ দর্পণ' (১৮৯৩) উর্দু গ্রন্থ 'সেরাতুল আসফিয়া'র বঙ্গানুবাদ।[৪]

বগুড়ার সারিয়াকান্দির অধিবাসী আকবর হোসেন সরকার 'পদ্য রত্নাকর' (১৮৯৩) নামে ধর্ম ও নীতি বিষয়ক কবিতার বই প্রকাশ করেন। এটি বগুড়ার 'রায় প্রেসে' মুদ্রিত হয়।[৫]

আজিজ আহমদের 'প্রণয় কুসুম' (১৮৯৭) 'সচিত্র উপন্যাস' এটি মধ্যযুগীয় রোমান্সধর্মী রচনা; আধুনিক বিশুদ্ধ গদ্যে রচিত।[৬]

আবদুল গণি খাঁ 'শিশু ব্যাকরণ' (১৮৯৯) নামে একখানি শিশু পাঠ্য ব্যাকরণ লিখেন। 'ঢাকা প্রকাশে' গ্রন্থখানির সমালোচনায় বলা হয় "বাঙ্গালা ভাষার শত শত ব্যাকরণ হইয়াছে; তথাপি এই ক্ষুদ্রতম ব্যাকরণ খানি খাঁ সাহেব বোধ হয় মুসলমান ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচার করিতে পারিবেন।"[৭]

ডাক্তার এম. এইচ. সৈয়দ আবুল কাসেম 'ওলাউঠা চিকিৎসা' (১৮৯৯) নামে ২৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর বিরূপ সমালোচনা করে মন্তব্য করে, "ইহার মধ্যে ওলাউঠার চিকিৎসা সম্যক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহা প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিলাম না।"[৮]

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৯২
২. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৩
৩. ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৯৩
৪. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৩
৫. বাসনা, বৈশাখ ১৩১৬
৬. অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত 'গ্রন্থ-পঞ্জী' দ্রষ্টব্য
৭. ঢাকা প্রকাশ, ১১ বৈশাখ ১৩০৬
৮. ঐ, ১৮ ভাদ্র, ১৩০৬

আবেদ হোসেন সিদ্দিকী 'মেয়রাজল জিন্নাত' (১৮৯৯) নামে একখানি ধর্মপুস্তক লিখেন। 'কোহিনুরে' (১৩০৬) এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।[১]

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সম্পাদনায় বিভিন্ন কবির কবিতার সংকলন গ্রন্থ 'মুক্তার হার' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন, মুনশী মেহেরুল্লা ব্যতীত ঢাকা নিবাসী 'কারী হাফেজ আবদুল করিম' ও বালিগাঁও নিবাসী 'চৌধুরী আবদুল গফুরে'র কবিতা সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ কবিতাটি মীরের 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০০) থেকে এবং পঞ্চম কবিতাটি মুনশী মেহেরুল্লার 'মেহেরুল ইসলাম' (১৮৯৭) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা মৌলুদ পাঠের উদ্দেশ্যে হজরত মহম্মদের রূপ-গুণ-মহিমা ভিত্তিক কবিতাগুলি নির্বাচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা-ভাষী জনসাধারণের কাছে মিলাদকে অর্থবহ ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে এরূপ গ্রন্থ-সংকলন, তাতে সন্দেহ নেই।

বোরহানুদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত ও খন্দকার আবদুর রহিম কর্তৃক প্রকাশিত 'সহজ পারসী-শিক্ষা' (১৯০০) ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ পুস্তক: সংগ্রাহক ভূমিকায় বলেন, "বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে পারসী শিক্ষা করা অতীব দু:সাধ্য ব্যাপার। কেননা, ইংরাজীর সঙ্গে পারসী দ্বিতীয় ভাষা লইলে তাহার অর্থ ও ব্যাকরণ উর্দু ভাষায় পড়িতে হয়; আবার বাঙ্গালা মাতৃভাষা বলিয়া তাহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং মুসলমান ছাত্রবৃন্দকে চারিটী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। এই জন্যই আমি উর্দুর সাহায্য ব্যতীত পারসী শিক্ষার্থীদিগের সুবিধা ও শিক্ষা সৌকার্যার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যদি বালকগণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শে তবে সকল যত্ন সফল জ্ঞান করিব।"[৩]

আসগর আলীর 'পণপ্রথা' (১৯০১) পুস্তিকায় সমাজে পণপ্রথার অপকারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে।[৪]

শেখ চান্দ মোহাম্মদ সরকার 'বিলাপ তরঙ্গিনী' (১৯০১) নামে কবিতার বই প্রকাশ করেন।[৫]

১. সৈয়দ মুর্তজা আলী—কোহিনুর, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭
২. আবদুল লতিফ চৌধুরী—বাঙ্গালা মৌলুদ, মাহে-নও, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৬৭
৩. বোরহানুদ্দিন আহমদ—সহজ পারসী-শিক্ষা, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৭ 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৪. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ, খ, ১৯০১
৫. ঐ, ৪ ত্রৈ, খ, ১৯০১

হেলালউদ্দীন খান কনস্টান্টিনোপল-এর সুলতান সম্পর্কে 'সুলতানে রূম' (১৯০১) কবিতার বই রচনা করেন।[১]

রংপুর জেলার দারোয়ানীর অধিবাসী আমিরুদ্দীন সরকার 'মূল্য প্রকাশিকা' (১৯০১) নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখেন।[২]

এক অজ্ঞাতনামা লেখক হস্তরেখা বিষয়ক 'ফালনামা' (১৯০১) গ্রন্থ লেখেন। সেরাজল আহমদ চৌধুরী নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশ করেন।[৩]

সৈয়দ লুৎফর রহমান চৌধুরী 'ভ্রমণ' (১৯০১) নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী লেখেন।[৪]

ঢাকার আবদুল গণি সুফিয়ানী 'কবিতা দর্পণ' (১৮৮৭) ও 'শোকাচ্ছাস' (১৯০১) নামে দু'খানি কবিতার বই লেখেন।[৫]

রাজশাহীর নাটোর নিবাসী মোহাম্মদ ইয়াসিনের 'মাতা ভিক্টোরিয়া' (১৯০১) কবিতা পুস্তিকায় রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।[৬]

সৈয়দ মোকাম্মেল হোসেনের দু'খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—'মোসলেম সমাজ' (১৯০১) ও 'তত্ত্ব দর্পণ' (১৯০৫)।

শের আলী আহমদের 'সুদ প্রসঙ্গ' (১৯০২) গ্রন্থে সুদপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এটি ৫৪ পৃষ্ঠার বই।[৭]

ইমাম আলী হকের 'বিরহ যাতনা যৌবন বিলাপ' (১৯০২) ক্ষুদ্র কবিতার বই।[৮]

শেখ আবদুল কাদের প্রণীত 'শরেহ বেকায়া' (১ ও ২ খণ্ড, ১৯০২) একটি বৃহৎ গ্রন্থ। মহম্মদীয় আইন বিষয়ক 'ওয়াকায়াত রিওয়ায়াতে'র অনুবাদ এটি। ওবায়দুল্লা আরবী ভাষায় তা প্রণয়ন করেন।[৯]

চট্টগ্রামের অধিবাসী মুখলেসুর রহমান মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র কবিতার পুস্তক লেখেন: এর নাম 'শোকোভারতী' (১৯০২)।[১০]

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ, খ, ১৯০১
২. ঐ
৩. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০১
৪. ঐ
৫. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭ - ১ ত্রৈ, খ, ১৯০২
৬. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭; ১ ত্রৈ, খ, ১৯০২
৬. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৯০১
৭. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০২
৮. ঐ
৯. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৯০২
১০. ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৯০২

টাঙ্গাইলের আটিয়ার অধিবাসী খোন্দকার শাহ মোহাম্মদ বসিরুদ্দীন 'ভাসান-যাত্রা ও বেহুল-লক্ষ্মীন্দরের সংহার জীবনী' (১৯০৩) শিরোনামে নাটক রচনা করেন।[১]

বগুড়ার গঙ্গানগরের অধিবাসী ডাক্তার আবদুর রহমান 'হোমিওপ্যাথিক সরল সংক্ষিপ্ত মেটেরিয়া মিডিকা' (১৯০৩) নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক বই লেখেন।[২]

বেলায়েত হোসেন 'পরমার্থ সঙ্গীত রত্নাকর' (১৯০৩) নামে একখানি বড় বই রচনা করেন। এটি নীতিমূলক কবিতা পুস্তক।[৩]

মোহাম্মদ রওশন আলী 'সাধু রহস্য' (১৯০৩) রচনা করেন।[৪]

শেখ রেয়াজুদ্দীন সরকার লেখেন 'বক্তৃতা ও মন্তব্য' (১৯০৩)। লেখক রংপুরের চিকনমাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৫]

আবু ওয়ায়েজ মোহাম্মদ মওয়ায়েজ 'মহররমাত' (১৯০৩) রচনা করেন। এই পুস্তিকায় মুসলমানের ধর্মমতে যে সকল রমণীকে বিবাহ করা সিদ্ধ নয় তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৬]

খোন্দকার আবুল ফজল আহমদের 'আখেরজ্জোহরের প্রতিবাদ' (১৯০৩) মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের 'আখেরজ্জোহরে'র (১৮৯১) পুস্তিকার প্রতিবাদ। এটি ময়মনসিংহের 'বাসন্তী প্রেসে' ছাপা হয়।[৭]

শাহ মোহাম্মদ কলিমুদ্দী 'কুলপ্রদীপ' (১৯০৪) নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকায় একটি পরিবারের গৌরব বর্ণনা করেছেন।[৮]

সিরাজগঞ্জের জকিউদ্দীন আহমদ 'অবিশ্বাসী ভৃত্য' (১৯০৪) নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন।[৯]

হাকিম এ. কে. খান চিকিৎসা বিষয়ক 'ইউনানী হাকিমী শিক্ষা' (১৯০৪) রচনা করেন।[১০]

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ., খ. ১৯০৩
২. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৩
৩. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
৪. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৯০৩
৫. ঐ; ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৩
৬. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
৭. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৯০৪

রংপুরের আবদুর রহমান আহমদ 'পাষণ্ড দলন বা সমাজ রহস্য' (১৯০৪) নামে কবিতার বই লেখেন। এতে ধর্মত্যাগীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।[১]

বগুড়ার কাজিখানা নিবাসী আবদুল গণি আলা 'খ্রীষ্টীয়ানী ধোকাভঞ্জন' (১৯০৪) নামে পুস্তিকা লেখেন।[২]

আবদুল জব্বারের 'নামাজ শিক্ষা (১৯০৪) ৩২ পৃষ্ঠার বই।[৩]

মোহাম্মদ আবদুল ওহাব চৌধুরী 'শ্রীহট্টের শাহ জালাল' (১৯০৫) নামে একখানি সন্তজীবনী লেখেন। এটি শ্রীহট্টের 'পরিদর্শক প্রেসে' ছাপা হয়। লেখক ঐ জেলার মাড়াইগাঁও-এর অধিবাসী ছিলেন।[৪]

মোহাম্মদ আবদুর রহিম লেখেন 'শ্রীহট্ট-নূর' (১৯০৫)।

ইরসাদউদ্দীন আহমদ পারিলীর 'সুদকাহিনী' (১৯০৫) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[৫] গ্রন্থকার ঢাকার পাবিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ সোলেমান 'বৃহৎ সোলেমানী পঞ্জিকা' (১৯০৫) প্রকাশ করেন।[৬]

রংপুরের মুনশীপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ আশরাফুদ্দীন 'তত্ত্বজ্ঞান' (১৯০৫) নামে পীরবাদের মাহাত্ম্য বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি 'তোহফায়ে বোরজখী' নামে উর্দু-ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, রচয়িতা মৌলানা মোহাম্মদ শাহ সাহাবউদ্দীন চিশতী। 'তত্ত্বজ্ঞান' রংপুরের 'জয় প্রেসে' ছাপা হয়।[৭]

ত্রিপুরার গণ্ডামারা নিবাসী মোহাম্মদ আখতার জামান 'প্রেম কুসুম' (১৯০৫) ও 'প্রেম খেলা' (ঐ) নামে কবিতা পুস্তিকা-রচনা করেন। বই দুটি কুমিল্লার 'সরস্বতী প্রেসে ছাপা হয়।[৮]

কাজী আবদুল আজিজ কোরেশীর 'মসায়েলে এসলাম' (১৯০৫) 'ফেকাহ'র অনুবাদ।[৯] 'ফেকাহ' ইসলামের ব্যবহারশাস্ত্র।

---

১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
২. ঐ
৩. ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
৪. ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম গেজেট, সাপ্লিমেন্ট, ১০ মার্চ ১৯০৫
৫. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৫
৬. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৫
৭. হামেদ আলী—উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য, বাসনা, বৈশাখ ১৩১৬
৮. অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।
৯. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৬

পত্র-পত্রিকা

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের জন ক্লার্ক মার্সম্যান এটি সম্পাদনা করেন। বাঙালী কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' (জুন ১৮১৮); প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে ইংরাজী-বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত হিন্দুগণের সম্পাদনায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

যতদূর জানা যায়, বরিশালের সৈয়দ আবদুল রহিম সম্পাদিত 'বালারঞ্জিকা' (১ বৈশাখ ১২৮০) বাঙালী মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র।[১] এর আগে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (মার্চ ১৮৩১) নামে ফারসী-বাংলা দ্বিভাষী সাপ্তাহিক এবং রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (জুন ১৮৪৬) নামে বাংলা-উর্দু-হিন্দী-ফারসী-ইংরাজী পঞ্চভাষী সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[২] উভয় পত্রিকা স্বল্পায়ু ছিল। একই

---

১. 'বালারঞ্জিকা'র সংবাদ ইতিপূর্বে কেউ দেননি। ব্রজেনবাবুর 'বাংলা সাময়িকপত্র' (২ খণ্ড), বিনয় ঘোষের 'বাংলা সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র (৫ খণ্ড), আনিসুজ্জমানের 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র'ও মুস্তাফা নূর-উল ইসলামের 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত পত্রিকার উল্লেখ নেই। 'ঢাকা প্রকাশে' (১৬ বৈশাখ ১২৮০) মুদ্রিত সমালোচনা থেকে এর নাম-পরিচয় জানা যায়। পত্রিকায় লেখা হয়, 'দুই পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানা ১লা বৈশাখ (১২৮০) হইতে বরিশাল, মাদারীপুরান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবদুল রহিম মহাশয় প্রকাশিত করিতেছেন। মুসলমানগণ পত্রিকা লিখিতে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য লেখনি ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়। সৈয়দ সাহেব এই সৎকার্য্যে কৃতকার্য হন একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মূল্য এক পয়সা করুন, পত্রিকাখানি রেজিষ্টরী করিয়া যাহাতে ১০ টিকিটে চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করুন। নগরে ভাল ২ লেখক এবং উৎসাহশীল ধনিগণের আশ্রয় পাওয়া বিচিত্র নহে।" উদ্ধৃতি থেকে পত্রিকার নাম, সম্পাদকের নাম, পত্রিকার প্রকাশের তারিখ দেখে পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পত্রিকাখানি এখন সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য।

২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯ (৪র্থ সং), পৃঃ ৩৯, ৮৮

সঙ্গে একাধিক ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না; এর জন্য যে অর্থবল ও লোকবল দরকার, পরিচালকদের তা ছিল না। ১৮৬১ সালে আলাহেদাদ খাঁর সম্পাদনায় 'ফরিদপুর দর্পণ' প্রকাশের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, জানা যায় না।[১] ১৮৭৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যেসব বাংলা পত্রিকা মুসলমানদের সম্পাদনায় পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা এরূপ[২]:

সময়	পত্রিকা	শ্রেণী	সম্পাদক	স্থান
১৮৭৩	বালারঞ্জিকা	(সাপ্তাহিক)	সৈয়দ আবদুল রহিম	বরিশাল
১৮৭৪	আজীজননেহার	(মাসিক)	মীর মশাররফ হোসেন	চুচুড়া, হুগলী
,,	পারিল বার্তাবহ	(পাক্ষিক)	আনিসউদ্দীন আহমদ	ঢাকা
১৮৭৭	মহাম্মদি আখবার	(অর্ধ-সপ্তাহিক)	কাজী আবদুল খালেক	কলিকাতা
১৮৮৪	আখবারে এসলামীয়া	(মাসিক)	মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	করটীয়া
,,	মুসলমান	(সাপ্তাহিক)	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
,,	মুসলমান বন্ধু	,,	,,	,,
১৮৮৫	ইসলাম	(মাসিক)	একিনউদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৬	নব সুধাকর	(সাপ্তাহিক)	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	,,
,,	আহমদী	(পাক্ষিক)	আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল
১৮৮৭	হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী	(মাসিক)	গোলাম কাদের	কলিকাতা
১৮৮৯	সুধাকর	(সাপ্তাহিক)	শেখ আবদুর রহিম	,,
,,	ভারতের ভ্রমনিবারণী	(ত্রৈমাসিক)	মোহাম্মদ আবেদীন	,,
১৮৯০	হিতকরী	(পাক্ষিক)	মীর মশাররফ হোসেন	লাহিনীপাড়া
১৮৯১	ভিষক-দর্পণ	(মাসিক)	এম. জহিরুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
,,	ইসলাম-প্রচারক	,,	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	,,
১৮৯২	মিহির	,,	শেখ আবদুর রহিম	,,
,,	হাফেজ	(পাক্ষিক, পরে মাসিক)	.	,,

১. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪
২. ঐ, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত

সময়	পত্রিকা	শ্রেণী	সম্পাদক	স্থান
১৮৯২	টাঙ্গাইল হিতকরী	(সাপ্তাহিক)	মোসলেমউদ্দীন খাঁ	টাঙ্গাইল
১৮৯৫	মিহির ও সুধাকর	(সপ্তাহিক)	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৮৯৮	কোহিনুর	(মাসিক)	মহম্মদ রওসন আলী	পাংশা
১৮৯৯	প্রচারক	,,	মধুমিয়া	কলিকাতা
১৯০০	লহরী	,,	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর
,,	নুর-অল ইমান	,,	মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী
১৯০১	মোসলমান পত্রিকা	,,	মাহাতাবউদ্দীন	যশোহর
,,	সোলতান	,,	এম. নাজিরুদ্দীন আহমদ	কুমারখালি
,,	নূরল ইসলাম	(বার্ষিক)	মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	যশোহর
,,	বালক	(সাপ্তাহিক)	এ. কে. ফজলুল হক ও নিবারণ চন্দ্র	বরিশাল
১৯০৩	নবনূর	(মাসিক)	সৈয়দ এমদাদ আলী	কলিকাতা
,,	মোহাম্মদী	,,	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	,,
,,	হানিফি	,,	নুরুল হোসেন কাসিমপুরী	ময়মনসিংহ
১৯০৪	সুহৃদ	,,	এ. ডি. খান	কটক

এগুলির অধিকাংশের আয়ু ছিল ক্ষণকালীন; অনেক পত্রিকার কেবল নামধাম ছাড়া বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। দু'একটি সাময়িকপত্রেব গুরুত্বও তেমন ছিল না। যেগুলির গুরুত্ব ছিল, সেগুলিও প্রায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। স্বল্প আয়ু, ক্ষীণ কলেবর, খণ্ডদশা যাই থাক না কেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এসব পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র। জনশিক্ষা ও জনমত গঠনেও এগুলির গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি ও দেশের শুধু মুখপত্র নয়, অনেক সময় মেরুদণ্ড হিসাবে পত্রপত্রিকা কাজ করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্র বিষয় সাময়িকপত্রে স্থান পায়, সমাজের মানুষ সুলভে ও সহজে নিত্য নিয়মিত এসব বিদ্যার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ, দাবী-দাওয়ার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়-নীতির প্রচার সাময়িকীর দ্বারাই হয়ে থাকে। বিদেশী ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে দেশী সামন্তরাজের অসির লড়াই শেষ হলে শুরু হয় মসির লড়াই। উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা এ লড়াই শুরু করেন বই-পুস্তক ও পত্র-

পত্রিকার মাধ্যমে। উনিশ শতকের নবজাগরণের উষালগ্ন থেকেই এই সংগ্রামের সূত্রপাত। বলা যায়, বাংলার নবজাগরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল সাময়িকপত্র। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর যৌথ প্রয়াসের ফলে সংবাদ-পত্র-শিল্পের উদ্ভব হয়। সভা-সমিতির গোষ্ঠিচেতনার মত পত্র-পত্রিকার গোষ্ঠী-ভাবনাও সামাজিক বিবর্তনের ফল। বাংলার মুসলিম নবজাগরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে সাময়িকপত্রের আলোচনা আবশ্যক। বিশেষতঃ সাময়িকপত্র সমকালীন সমাজজীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সমাজ মানসের ভাব-আবেগ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার কথা যেসব পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এখানে সেগুলির বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হল।

মোহাম্মদি আখবার (১৮৭৭)

কাজী আবদুল খালেকের সম্পাদনায় '২৪ পরগণা জেলার সিয়ালদহ পল্লী' হতে ১৮৭৭ সালের ৪ জুন 'মহাম্মদি আখবার' অর্ধ-সপ্তাহিক দ্বিভাষী (উর্দু-বাংলা) পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রকাশের ছ'মাস আগে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের সংবাদ প্রচার উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানির জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালের ২১ মার্চ থেকে এটি সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের ৩ তারিখে রুশ তুর্কীর মধ্যে 'সান ষ্টেফানো চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এর অল্পকাল পরে 'মহাম্মদি আখবার' বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ পত্রিকা-প্রচারের মৌল প্রেরণা ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে পত্রিকার আয়ুও শেষ হয়। সেকালের দেশী বিদেশী বিবিধ পত্রিকা থেকে যুদ্ধ সম্পর্কিত খবর, টেলিগ্রামের খবর, হররকমের খবর, বিজ্ঞাপন ইস্তেহার ইত্যাদি দিয়ে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা হত: সুতরাং এটি সাময়িক সংবাদপত্রের দায়িত্ব পালন করেছে, সাহিত্য সংস্কৃতির ধারে কাছে যায়নি। 'মহাম্মদি ছাপাখানা' নামে সম্পাদকের নিজস্ব প্রেসে এটি মুদ্রিত হত। 'মহাম্মদি আখবারে'র ভাষা আড়ষ্ট আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্রিত। সংবাদ 'প্রভাকর' উক্ত পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করার উৎসাহ প্রদান করে, কিন্তু পত্রিকার ভাষার সমালোচনা করে। এর জবাবে 'মহাম্মদি আখবারে' (২০ জুলাই ১৮৭৭) লেখা হয়: "...অত্র আখবারের বাঙ্গালা ভাষা কেবল সাধারণ মোসলমানগণের জ্ঞাপন জন্য। কেননা তাহারা সাধু ভাষা বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং সাধারণ মোসলমানি ভাষা যাহাতে বর্ণশুদ্ধি, স-কার, ন-কার ভেদ এবং সন্ধি আদি কিছু মাত্র নাই, তাহা পূর্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।"[১] সাহিত্য ও ভাষা সৃষ্টিতে

১, আবদুল কাদির—মহাম্মদি আখবার, মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশনস ঢাকা ১৯৬৬, পৃঃ ২১

'মহাম্মদি আখবার' ব্যর্থ হলেও পত্রিকা হিসাবে এর মৌলিক লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। তুর্কী সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের চিত্তে আবেগ ও সহানুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। আবদুল লতিফ আত্ম-জীবনীতে দাবী করেছেন যে, বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তুর্কীবাসীর জন্য অর্থ সংগ্রহ ও সমর্থন দানের প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই।[১] সার্ভিয়া সরকারের সাথে তুর্কী সুলতানের যখন বিরোধ হয়, তখন আবদুল লতিফ কলিকাতার টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (৭ অক্টোবর, ১৮৭৬)। রুশ-তুর্কীর পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে। কাজী আবদুল খালেক আবদুল লতিফের কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ।

আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪)

টাঙ্গাইলের চারান গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের সম্পাদনায় ১২৯১ সনের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৪) মাসিক 'আখবারে এসলামীয়া' প্রথম প্রকাশিত হয়। করটীয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এটি আত্মপ্রকাশ করে। করটীয়ার 'মাহমুদিয়া যন্ত্রে' মীর আতাহার আলী দ্বারা এটি মুদ্রিত হয়। প্রথম দশ বছর চলার পর এটি মাঝে দু'বছর বন্ধ থাকে—১৮৯৫ সালে এপ্রিল মাসে নবপর্যায়ে এর প্রচার আরম্ভ হয়। কিন্তু অল্পকাল পরে এটির প্রকাশনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।[২]

'আখবারে এলামীয়া'র (নবপর্যায়) নামের নীচে লেখা হত: 'উপদেশ, ধর্ম মসলা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সম্বলিত মাসিক পত্রিকা'। 'নিয়মাবলী'তে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "এসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত প্রেরিতপত্র, নূতন সংবাদ ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে প্রকাশ হইবে।"[৩] ধর্মতত্ত্ব, মহাপুরুষজীবনী, পুরাকথা, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে দুটি বিষয় পত্রিকায় গুরুত্ব পেয়েছে সে-দুটি হল: আহলে হাদিস-হানাফী দ্বন্দ্ব এবং গোবধ-গোরক্ষা দ্বন্দ্ব। ঐ সময়ে আহলে হাদিস মতবাদ ও গো-রক্ষা নীতির সমর্থনে 'আহমদী'তে প্রবন্ধ ছাপা হত। 'আখবারে এলামীয়া'য় তার প্রতিবাদ করা হত। মতামত প্রকাশে 'আখবারে এসলামীয়া' প্রধানতঃ রক্ষণশীলতা এবং 'আহমদী' উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

---

১. Abdul Latif—*My Public Life*, Calcutta, 1885, pp. 176-77 (*Nawab Bahadur Abdul Latif: History Writing and Related Documents.*)

২. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫, ১৫

৩. আখবারে এসলামীয়া, বৈশাখ, ১৩০২

মোহাম্মদ নইমুদ্দীন স্বয়ং ইসলাম ধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হানাফী সম্প্রদায়ের পক্ষে ও আহলে হাদিস বা লা-মজহাবিদের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে অনেক প্রবন্ধ লিখেন। তিনি ধর্মীয় বক্তৃতাতেও ঐ নীতি অনুসরণ করতেন। খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের যে সব প্রভাব মুসলমান সমাজকে কলুষিত করেছিল, তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন তিনি। 'আখবারে এসলামীয়া'র নীতি ব্যাখ্যা করে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন, "সাহিত্য চর্চা নয়, ধর্মান্দোলনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শবাশরীয়ৎ সংক্রান্ত রচনাই ছিল পত্রিকার প্রধান অবলম্বন।"[১]

মুসলমান বন্ধু (১৮৮৪)

১৮৮৪ সালের ১১ আগস্ট (সোমবার) সাপ্তাহিক 'মুসলমান বন্ধু' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে কলিকাতাস্থ ভবানী প্রেস ও পরে মুসলমান বন্ধু প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়। সৈয়দ হাসিবুল হোসেন প্রথমে পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন, তিনি পরে কার্য-সম্পাদক হন; নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও আইন-বিদ কে. এম. চট্টোপাধ্যায় এর পৃষ্টপোষক ছিলেন। পত্রিকার দশম সংখ্যায় (৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) লেখা হয়, "ত্রিপুরা জিলান্তর্গত লাকশাম গ্রামে স্বদেশ হিতৈষিণী শ্রীমতি ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার উন্নতি-কল্পে ৫০০৲ এতদ্ভিন্ন আমাদিগের এই পত্রিকাখানির ক্রমোন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।" এতে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমকালীন সমস্যার কথা স্থান পেত। মাঝে-মধ্যে কবিতা ও পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশিত হত। সংবাদাদি তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে 'মুসলমান বন্ধু'র ভূমিকা ছিল পরজীবীর মত—সেকালের দেশী-বিদেশী ইংরাজী-বাংলা-ফারসী পত্রিকা থেকে তথ্য সংগৃহীত ও পরিবেশিত হত। সম্ভবত অর্থবল ও জনবল সীমিত থাকার কারণে এ-নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। মুসলমান সমাজের স্বার্থ—সংরক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেও 'মুসলমান বন্ধু' সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিল। মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগসহ সামগ্রিকভাবে দেশের দুরবস্থা-দুর্গতির কথা নির্ভিকতার সহিত তুলে ধরত। সরকারের আইনসমূহ ও কার্যাবলীর সমালোচনা যেভাবে করা হত, তাতে মনে হয় পত্রিকাখানি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল। কলি-কাতায় 'নর্মাল বিদ্যালয়' তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে পত্রিকায় লেখা হয়, "বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কলিকাতাস্থ নর্মাল বিদ্যালয়টী তুলিয়া দিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন।

---

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ২১৬

...যেমন হিন্দু হেয়ার ও প্রেসিডেন্সি আছে তেমনি বঙ্গবিদ্যালয়টাকে গভর্ণমেণ্টের দেখা উচিত। ...রাজা যদি প্রজার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে সে ভাষা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে...বাঙ্গালা ত একটি ভাষার মধ্যে গণ্য? রাজভাষাই কি ভাষা, প্রজার ভাষা কি ভাষা নয়?" (৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫) আবদুল লতিফ, আমীর আলী প্রভাবিত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে এরূপ কণ্ঠস্বর নতুন। 'মুসলমান-বন্ধু'র বাংলা-ভাষা-প্রীতি অকৃত্রিম। দেশীয়গণের অধিকার ক্ষুণ্নকারী 'ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে মুসলমান-বন্ধু মত প্রচার করে। দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারবেন—এই ছিল ইলবার্ট বিলের প্রস্তাব। ইউরোপীয় কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। সৈয়দ আমীর আলী আপোষের নীতি গ্রহণ করেন। মুসলমান-বন্ধুর কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও নীতি ক্ষুদ্র ছিল না।

আহমদী (১৮৮৬)

পাক্ষিক পত্রিকা 'আহমদী' প্রথম আত্ম প্রকাশ করে ১২৯৩ সনের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৬)। সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী এর সাহায্যদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৯৬ সালে 'আহমদী ও নবরত্ন' নাম গ্রহণ করে এটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এতে, অনুমিত হয় 'নবরত্ন' নামের কোন পত্রিকা এর সহিত যুক্ত হয়।[১] ধর্ম ও সমাজের কথা পত্রিকায় প্রাধান্য পেত। মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'আখবারে এসলামীয়া'র সাথে 'আহমদী'র বিভেদ ও দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বে 'গজনবী' ও 'পন্নী' পরিবারের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। পন্নী পরিবারের সন্তানেরা আধুনিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাঁদের চিন্তাধারায় যে রক্ষণশীলতা প্রশ্রয় পাবে, তা স্বাভাবিক। গজনবী পরিবার মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিল। উপরন্তু মীর মশাররফ হোসেন এর সাথে যুক্ত থাকায় এর উদারনৈতিক মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা থাকায় 'আহমদী' পত্রিকা দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছিল। বাঙালী মুসলমান কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশের আন্দোলন যখন কলিকাতাতেও শুরু হয়নি, তখন টাঙ্গাইলের মত একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে একই সময়ে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছুকাল পরে মশাররফের 'হিতকরী'-ও সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলির ভাষা মার্জিত, বিশুদ্ধ

১. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৬-৭

ও উন্নতমানের ছিল। কেবল সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ নয়, সাহিত্যিক রচনাও পত্রিকাগুলিতে স্থান পেত।

সুধাকর (১৮৮৯)

'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সনের ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর ১৮৮৯)। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মৌলভী মেযারাজউদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, কবি মোজাম্মেল হক ও ডাক্তার হবিবর রহমান এক সময় কলিকাতায় একত্র হযেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বধর্মানুরাগী, সমাজহিতৈষী ও সাহিত্যা-মোদী ছিলেন। তখন কলিকাতায় মুসলমান পরিচালিত কোন পত্রিকা ছিল না, তাঁরা নিজেরা পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাঁদের এমন আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না। অথচ ধর্ম ও সমাজসেবার জন্য তাঁদের চিত্তে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা অর্থ সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলে যান। করটীয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নী, বর্ধমানের কুসুমগ্রামের জমিদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং ত্রিপুরার পশ্চিম-গাঁও-এর জমিদার মোহাম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী মোটা রকম অর্থ দান করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম, ঢাকার জমিদার সৈয়দ হাসান আলী, হোসনাবাদের জমিদার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পদমদীর জমিদার নবাব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।[১] এরূপ যৌথ প্রচেষ্টার ফলে 'সুধাকর' আত্মপ্রকাশ করে। সৈয়দ এমদাদ আলী একে মুসল-মানদের 'প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র' বলে অভিহিত করেছেন।[২] 'সুধাকরে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয়, "স্বর্গীয় মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব এবং সুধাকরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ সমাজের দুর্গতি অনুভব করিয়া মুসলমানদিগকে ধর্মপথের পান্থ করণোদ্দেশে, এই কাগজখানি বাহির করেন। যদিও কাগজখানির মালিকি স্বত্ব পুনঃপুনঃ হস্তান্তরিত হয়, তবু উহা কখনও পবিত্র উদ্দেশ্য বিস্মৃত কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।"[৩] মেয়ারাজউদ্দীন, রেয়াজুদ্দীন ও আবদুর রহিম ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী ; কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিত্তহীন। তাঁদের হাত থেকে প্রথমে সিরাজুল ইসলাম, তারপর

১. আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ২৩৬-৩৭ ; সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত পৃঃ ৪২৯

২. আবদুল কাদির—মিহির ও সুধাকর, মুসলিম সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৭

৩. ইসলাম প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

সৈয়দ শামসুল হোদা এবং তৎপর 'আর একজন ভদ্রলোকে'র হাত হয়ে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মালিক হন। নওয়াব আলী চৌধুরীর সময় পত্রিকার নাম হয় 'মিহির ও সুধাকর'।[১]

সুধাকরের প্রথম সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম, না মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এই নিয়ে মতদ্বৈত আছে। সুধাকরের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রকাশিত হয়, তাতে একস্থলে বলা হয়, "বঙ্গের প্রধান মোসলমান লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এবং যাঁহাদের লেখা পাঠ করিয়া হিন্দু মোসলমান সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন, এসলামতত্ত্ব যাঁহাদের সুপক্ক লেখনিপ্রসূত অর্থাৎ জনাব মৌলবি মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্সী মহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও সেখ আবদুর রহিম সাহেব দ্বারাই এই কাগজখানি সম্পাদিত হইবে।" প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নাম নেই, ম্যানেজার সৈয়দ শরাফত আলীর উল্লেখ আছে। ৭৯ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোডে 'সুধাকর অফিস' ছিল।

পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে উক্ত 'অনুষ্ঠানপত্রে' লেখা হয়, "সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণ-স্বরূপ। ইহা সভ্যতার বিস্তারের উৎকৃষ্ট পন্থা; সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস। বাঙ্গালাদেশের ভাষা বাঙ্গালা, আমরা বঙ্গীয় মোসলমান, অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত সংবাদপত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। ... ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি সমস্তই থাকিবে। ...মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসূচক ইতিহাস সকলকে জলন্তভাবে দেখান যাইবে। এতদভিন্ন এসলামধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতি মাসে এই কাগজে বাহির হইবে। আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা যাইবে। নূতন নূতন আইন কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মর্ম সকলকে জানান যাইবে; এবং যদ্দ্বারা জাতীয় স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হইবে।"[৩]

উদ্যোক্তাগণ ছাড়া মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ 'সুধাকরে'র লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। খ্রীস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' পত্রিকার সাথে 'সুধাকরে'র ধর্মবিষয়ে তর্ক হত। খ্রীস্টানদের আক্রমণ থেকে ইসলামধর্মকে রক্ষা করা 'সুধাকরে'র একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল।

১. ইসলাম প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
২. সুধাকর, ২৩ কার্তিক ১২৯৬
৩. ঐ

গো-হত্যার ব্যাপারে 'সুধাকর' 'আখবারে এসলামীয়া'কে সমর্থন দিত এবং 'আহমদী'র বিরোধিতা করত। গো-হত্যার পক্ষে মোহাম্মদ নইমুদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব সভা হত, 'সুধাকরে' সেসবের বিবরণ ছাপা হত।[১] টাঙ্গাইলে মুন্সেফ আদালতের মীর মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের মামলার বিষয় নিয়ে 'সুধাকর' একাধিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। মামলা সম্পর্কে 'সুধাকরে' এক স্থলে মন্তব্য করা হয়, "মীর মশাররফ হোসেন সাহেব কুক্ষণেই 'গো-জীবন' লিখিয়াছিলেন। ... সাক্ষীগণ একবাক্যে মীর সাহেবকে 'কাফের' বলিয়া 'ফতোয়া' দিয়াছেন। মীর সাহেবের এখনও নিরস্ত হওয়া ভাল। গো-জীবন পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। মীর সাহেব ইসলাম ধর্মে অনভিজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয় এরূপ কাণ্ড করিয়াছেন। ... মীর সাহেব 'তওবা' করিয়া নিবস্ত হইলে আমরা সুখী হইব, সমগ্র মুসলমান জগত সুখী হইবে।"[২] মশাররফ হোসেন স্বীয় পত্রিকা 'হিতকরী'তে গো-হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন। 'সুধাকরে'র প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে 'হিতকরী'তে লেখা হয়, "সহযোগী মাত্রই বুঝিয়াছেন যে, মুসলমান সমাজের একখানি সংবাদপত্র সুধাকর। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাইতে সর্বদা প্রস্তুত। খৃষ্টধর্মাবলম্বী মধ্যে, হিন্দুসমাজ মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে, মুসলমান মধ্যেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সুধাকর এক সম্প্রদায়ের কাগজ। আহমদী এক সম্প্রদায়ের কাগজ। পরস্পরের মতভেদে যেরূপ শত্রুভাব, আহমদী সুধাকরের প্রকাশ্য মতেই সেইরূপ শত্রুভাব। সুধাকর যেমন বিবাদ বাধাইতে সর্বদা প্রস্তুত, আবার আহমদী হিন্দু-মুসলমানের সখ্যভাব রক্ষা করিতে সকলের অগ্রগণ্য।"[৩]

হিতকরী (১৮৯০)

পাক্ষিক পত্র 'হিতকরী'র প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৯৭ সন (এপ্রিল ১৮৯০)। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম স্থান কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া; কুমারখালির 'মথুরানাথ যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। এর প্রকাশের দ্বিতীয় স্থান টাঙ্গাইলের শান্তিকুঞ্জ; 'আহমদী যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের নাম নেই, তবে অনেকের ধারণা, মীর মশাররফ হোসেন এটি সম্পাদনা করতেন। ১২৯৯ সনের আশ্বিন-কার্তিক

১. সুধাকর ৮, ২২ ও ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩ পৌষ ১২৯৬
২. ৬ পৌষ ১২৯৬
৩. হিতকরী, ১৫ কার্তিক ১২৯৭

মাসে মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করলে কিছু কালের মধ্যে ঐ পত্রিকা 'টাঙ্গাইল হিতকরী' নাম গ্রহণ করে; সম্পাদক হন মোসলেম উদ্দীন খান। এর অল্পকাল পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। মীর মশাররফ হোসেন হিতকরীর মুখ্য লেখক ছিলেন। তাঁর 'রাজিয়া খাতুন' উপন্যাস 'হিতকরী'তে (টাঙ্গাইল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা মশাররফ হোসেনের যে লক্ষ্য ছিল, তা 'হিতকরী'তে প্রতিফলিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, "এ পত্রিকা তখন অত্যাচারী জমিদারবর্গ, জমিদারী সেরেস্তার ঘুষখোর কর্মচারী, চরিত্রভ্রষ্ট মহকুমা হাকিম, মুনসেফ, দারোগা প্রভৃতির প্রতি খড়্গহস্ত ছিল।"[১] উল্লেখযোগ্য যে মীর মশাররফ হোসেন এ শ্রেণীর আমলার ষড়যন্ত্রে এক মানহানির মামলায় জড়িত হয়ে এক মাস কারাবাস ভোগ করেন (১৮৯২)।[২] শেষে তাঁর অনুজ ব্যারিস্টার মীর মোহতেশাম হোসেন এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

ইসলাম প্রচারক (১৮৯১)

ভাদ্র ১২৯৮ সনে (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) কলিকাতা থেকে 'ইসলাম ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' 'ইসলাম-প্রচারক' আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। বাংলার মুসলমানের সাংবাদিকতায় রেয়াজুদ্দীনের দান ছিল হিন্দু সমাজের সাংবাদিকতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমতুল্য। বরিশালের অজ্ঞাত পল্লীর সাধারণ মধ্যবিত্তের সন্তান ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় এসে অদম্য বাসনা ও উৎসাহ নিয়ে পুস্তক, পত্রিকা ও প্রেসকে সর্বস্ব করে সংগ্রাম করেছেন। এসব ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে তখন প্রায় শূন্যতা বিরাজ করছিল। তাঁর প্রধান লক্ষ্য একটি—ইসলামধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। সমাজের দুরবস্থা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রীস্টান ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম ও মোহাম্মদকে আক্রমণ করেন এবং সাধারণ শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানদের দীক্ষিত করেন। মুসলমান সমাজকে ধর্মভাবে না জাগালে এই ধর্মান্তরীকরণ বন্ধ হবে না। ধর্মজ্ঞানের অভাবে সমাজের মানুষ ভ্রান্তি ও পঙ্কিলতার দিকে এগিয়ে যায়। ধর্মশিক্ষা ও ধর্ম প্রচার দ্বারা মানুষের অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব। রেয়াজুদ্দীন আহমদ এরূপ বাসনা ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুস্তক প্রণয়ন ও পত্রিকা সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথম

১. আশরাফ সিদ্দিকী—হিতকরী, মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ২৬-৩১
২. ঐ, পৃঃ ৩১

বর্ষ সংখ্যায় ১ম 'সূচনা'র তিনি যে দশটি লক্ষ্য-মাত্রার কথা বলেছেন সেগুলির কেন্দ্রসূত্রই ছিল উপরি-উক্ত উপায়ে বাংলার মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণ। এরূপ ধর্ম-সংস্কারের অর্থ ছিল কোরান-হাদিস ভিত্তিক ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের জাগরণ বলতে ধর্ম প্রচারক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও গৌরবময় অতীত কাহিনীর মহিমা প্রচার দ্বারা সমাজের মানুষকে উদ্দীপিত করা। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'শুদ্ধি-অভিযান' পুরোপুরি 'সংস্কার-আন্দোলন' নয়। পথ ও মতের প্রকৃতি যাই হোক, রেয়াজুদ্দীন ও তাঁর সহযোগিগণ এ উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র 'গোষ্ঠী'র জন্ম দিয়েছিলেন, যাকে 'ইসলাম-প্রচারক-গোষ্ঠী' নাম দেওয়া যায়। 'সুধাকর-গোষ্ঠী'র সহিত তুলনায় এর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল, তবে লক্ষ্যমাত্রা উভয়েরই এক। 'ইসলাম-প্রচারক' প্রথম দু'বছর চলার পর কিছুকাল বন্ধ থাকে; শ্রাবণ ১২০৬ সনে এটি নবপর্যায়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এর আয়ু ছিল বৈশাখ ১৩০৭ সন পর্যন্ত, সর্বমোট ১৩ বছর। সংখ্যা বেশী হলেও নবপর্যায়ে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের কথা উল্লেখ থাকলেও 'ইসলাম-প্রচারকে' রসধর্মী গল্প বা উপন্যাস একটিও প্রকাশিত হয়নি। কবিতা আছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে উদ্দেশ্য প্রচারের বাহন করা হয়েছে। স্বয়ং সম্পাদক ছিলেন রসসাহিত্যের বিরুদ্ধে: তিনি কবিতাময়ী 'লহরী' পত্রিকার সমালোচনা করে 'ইসলাম-প্রচারকে' (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩০৬) বলেছিলেন, 'আমরা নিখুঁত ইংরেজী ছাঁচে ঢালা কবিতার পক্ষপাতী নহি।' 'মিহির ও সুধাকরে' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় তার প্রতিবাদ করে তিনি 'ইসলাম-প্রচারকে' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) লিখেছিলেন, 'মিহির ও সুধাকর থিয়েটারের লম্বাচওড়া সমালোচনা বাহির করিয়া মুসলমানগ্রাহক ও পাঠকদিগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে।' পত্রিকায় নিয়মিত ধর্ম ও জাতীয় সংবাদ, সভাসমিতি সংবাদ ও গ্রন্থ সমালোচনা পরিবেশিত হত। 'ইসলাম-প্রচারকে'র ঘোষিত নীতি স্থির ও অপরিবর্তিত ছিল। 'ইসলাম-প্রচারক' ব্রিটিশ শাসন সমর্থন করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ছিলেন, কেননা ইংরাজ এসে এদেরকে যবন-পীড়ন থেকে মুক্ত করেছেন।[১] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের ধারণা, ইংরাজগণ 'মার্হাট্টা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্ত' হতে মুসলমানদের রক্ষা করেছেন।[২] উভয়ের কণ্ঠ এক: 'আমরা ... পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ৭২-৭৩

২. ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ ভাদ্র ১৩১০

জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।[১] 'আমাদের মাতৃরূপিনী মহারানী ভারতেশ্বরীর আধিপত্যকালে ভারতীয় মুসলমানগণ উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন।'—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।[২] 'ইসলাম প্রচারক' জাতীয় কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানের বিরোধিতা করেছে: বক্তব্য একই—এগুলিতে মুসলমানদের স্বার্থ অপেক্ষা হিন্দুদিগের স্বার্থ অধিক জড়িত। 'ইসলাম-প্রচারক' প্যান-ইসলামী মনোভাবও পোষণ করত। তুরস্কের অধিপতি 'আমিরুল মুমেনিনে'র প্রতি এর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল।[৩] 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে' নির্মাণের অর্থ-সাহায্যের ব্যাপারে 'ইসলাম-প্রচারক' প্রচার কার্য চালায়। 'ইসলাম-প্রচারকে'র লেখকগণের অধিকাংশই আধুনিক উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে স্বজাতিকে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন; তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল না। কালকাতার উঠতি মুসলিম জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত শ্রেণীর কার্যকলাপকে, বিশেষ করে, তাঁদের শিক্ষা-আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে 'ইসলাম-প্রচারক' মুসলমান পুনর্জাগরণের আদর্শ তুলে ধরেছে। কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যখন বাংলা বিরোধী মনোভাব বিরাজ করছিল, তখন 'ইসলাম-প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর' প্রভৃতি সাময়িকীগুলি বাংলা ভাষার সপক্ষে আন্দোলন করেছিল, এমন কি, কোরান, তপসির ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে সমাজের মানুষের ধর্মীয় ভ্রান্তি ও সংস্কারটিকে ভেঙে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে 'ইসলাম-প্রচারকে'র দৃষ্টিভঙ্গি মুক্ত ছিল। হোমনাবাদের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী এবং কাঁকিনার জমিদার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী 'ইসলাম-প্রচারক'কে অর্থ সাহায্য দান করেন।

মিহির (১৮৯২)

শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় 'মিহির' জানুয়ারী ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'আভাষে' বলা হয়েছে: সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, সমাজতত্ত্ব সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার বিষয়-

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩ খণ্ড, পৃ: ৭৩

২. ইসলাম প্রচারক, চৈত্র বৈশাখ, ১৩০৬-০৭

৩. ৩১. আগস্ট তুরস্ক সম্রাট আবদুল হামিদ খানের সিংহাসন আরোহনের দিন। ঐদিন মর্যাদার সঙ্গে উদযাপনের আহ্বান জানিয়ে ইসলাম-প্রচারকে লেখা হয়: "মহামান্য আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মুসলেমিন গাজি সুলতান আবদুল হামিদ খানের দীর্ঘ জীবন এবং রাজপ্রতাপ ও রাজোন্নতি সম্বন্ধে খোদাতালার দরবারে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করিবেন।" ইসলাম প্রচারক, চৈত্র ১৩১৪

ভুক্ত হবে।[১] পত্রিকার আয়ু দু'বছরও পূর্ণ হয়নি। শেষ সংখ্যার তারিখ ছিল জুলাই ১৮৯৩ সাল। এর প্রকাশ খুবই অনিয়মিত ছিল। সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'মিহির'কেই প্রথম বলতে হয়। এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই ১৮৯৩ সালের 'চতুর্মাস্য' সংখ্যায় মিহির ঘোষণা করেছেন, 'মিহির ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা নহে', 'মিহির সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র'। 'ইসলাম-প্রচারক' থেকে 'মিহিরে'র এখানেই মৌলিক পার্থক্য।

'মিহিরে'র লেখকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ হবিবর রহমান, আবদুব আজেদ খাঁ চৌধুরী, একিনুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। বিভিন্ন সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র বাগচী, মধুসূদন সরকার, জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বসু ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। এঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রেয়াজউদ্দীন মাশহাদীর 'সুরিয়া বিজয়' (ধারাবাহিক) শেখ আবদুর রহিমের 'আলহামরা' (ধারাবাহিক), মোজাম্মেল হকের 'শাহনামা' (ধারাবাহিক), মোহাম্মদ হবিবর রহমানের 'চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম' (ধারাবাহিক), একিনুদ্দীন আহমদের 'মনোরমা' (ধারাবাহিক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক-কালে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার সমালোচনা ছাড়াও 'মিহিরে' কলিকাতার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সমালোচনা করা হয়েছে।[২]

সমকালীন 'সময়', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকায় 'মিহির' সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়। উভয় পত্রিকা মিহিরের প্রশংসা করে। 'সময়' পত্রের বক্তব্য: "মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় ক্রমশঃ বিশেষ অধিকার লাভ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি। অতি অল্পদিন পূর্বে মুসলমানী বাঙ্গালা হিন্দুর অপাঠ্য ছিল; কিন্তু শিক্ষার উন্নতি সহকারে এখন হিন্দু-মুসলমানের লেখা প্রভেদ করা যায় না। মুসলমানগণ সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুর ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালা লিখিতে-

---

১. মিহিরের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত উক্ত 'আভাষে' ব্যক্ত হয়েছে। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমাজের চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ দানা বাঁধছে এবং মুসলিম মানস অধিক সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠছে তার পরিচয় এতে বিধৃত।
'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

২. ১৮৯৩ সালের চতুর্মাস্য সংখ্যায় কলিকাতার তৎকালীন এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে 'বিবাদ' ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী এবং মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'বেজায় আওয়াজ' অভিনয়াদির সমালোচনা আছে। দ্র মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৫

ছেন ইহা বঙ্গদেশের গৌরবের বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন যেমন এদেশে কোন হিতকর কার্যই সুসম্পন্ন হইবে না, তেমন এই দুই জাতির পূর্ণ চেষ্টা ভিন্ন বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়ও অসম্ভব। ...মিহিরের লেখা অতি সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ।"[১] "মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া এই পত্রিকা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা এই পত্রিকার নূতনত্ব। বাস্তবিক মুসলমান লিখিত অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকায় আজি-কালি এরূপ নূতনত্ব দেখা যায়।"[২]

মিহির ও সুধাকর

'মিহির ও সুধাকর' 'রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র'। ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর মুস্তফা নূরউল ইসলাম প্রমুখ পত্রিকার প্রকাশের সময় বলেছেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ।[৩] ১০ কার্তিক ১৩০২ সনের (২৬ জানুয়ারী ১৮৯৫) 'মিহির ও সুধাকরে' ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩১শ সংখ্যার উল্লেখ আছে। ১৩০৫ সনে ৩০ পৌষের সংখ্যায় 'নববর্ষ' শীর্ষক একটি কবিতায় মিহির ও সুধাকরের নবম বর্ষ পূর্তির ও দশম-বর্ষ পদার্পণের কথা বলা হয়েছে।[৪] এসব সূত্রানুসারে পত্রিকার প্রকাশ কাল দাঁড়ায় ১২৯৬ সনের পৌষ মাস (জানুয়ারী ১৮৯০)। সমালোচকদের অনেকের ধারণা, সাপ্তাহিক 'সুধাকর' ও মাসিক 'মিহির' একীভূত হয়ে সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৫] 'সুধাকর' ১৮৯০ সালে ও 'মিহির' ১৮৯৩ সালে বন্ধ হয়। তর্কের খাতিরে বলা যায়, 'মিহির ও সুধাকরে'র প্রকাশ এর পরেই হওয়া সংগত। তবে পূর্বের দুটি জাজ্জ্বল্য প্রমাণও অস্বীকার করা যায় না। তিনটি সাময়িকপত্রেরই সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। 'মিহির ও সুধাকর' ১৯১০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকার নবাব

---

১. মিহির, মার্চ ১৮৯২ (উদ্ধৃতি)
২. ঐ
৩. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১২; সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৪৩১
৪. কবিতার কয়েকটি চরণ এরূপ :

নয়টি বৎসর ধরি'
ছয় ঋতু শিরে করি
দশম বৎসরে এবে পড়িল সুদিন।
সুধাকর মিহিরের আজি জন্মদিন।।

৫. আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩০১; মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৬

সলিমুল্লাহ, এতে আর্থিক সাহায্য যোগাতেন। শেষের দিকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ ওসমান আলী পত্রিকার সম্পাদক হন। এর বিষয় ছিল বিচিত্র। 'সংবাদ সরবরাহের অবসরে উপন্যাস, উদ্ভট কাহিনী, খণ্ডকাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা, রসরচনা, জীবন-কথা, ভ্রমণবৃত্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞানতত্ত্ব, বাণিজ্য বার্তা, নাট্যালোচনা, পুস্তক ও পুস্তিকা সমালোচনা প্রভৃতি পরিবেশিত' হত।[১]

'মিহির ও সুধাকরে'র এক সংখ্যায় পত্রিকার ২৯ জন লেখকের নাম প্রকাশিত হয়; তাঁরা হলেন, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, একিনুদ্দীন আহমদ বিএল, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ আবদুল হক সাত্তার, মকবুল আলি বিএ, আবদুস হামিদ খাঁ, নঈমুদ্দীন, তসলিমুদ্দীন আহমদ বিএল, রেয়াজ অল দিন আহমদ, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বিএল, মহম্মদ বদিয়র আলম, আতা এলাহি বিএ, মহম্মদ ইসমাইল, উসমান আলি বিএল, গোলাম সারওয়ার, মহম্মদ ইয়াকুব, আমানতুল্লা, আহমদ হোসেন, তহমিদউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ হবিবর রহমান, আবদুল অজেদ খাঁ চৌধুরী, হাকিম আবদুল লতিফ, মহম্মদ আবুল হোসেন, শেখ আবদুস সোবহান, মহম্মদ সামসুজ্জোহা বিএ, হাকিম শরিয়তুল্লা, মহম্মদ জিয়া-উন্নবি বিএ ও তাইমুর মহম্মদ।[২] আবদুল কাদির লিখেছেন, "বাংলার মুসল-মানকে জ্ঞানে ও ত্যাগে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে সমৃদ্ধবান ও সংঘবদ্ধ করে তোলার জন্য 'মিহির ও সুধাকরে'র পরিচালক ও লেখকগণ অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন। ফলে অচিরকাল মধ্যেই সমাজ-মানস জাগরণের যাদুমন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।"[৩]

হাফেজ (১৮৯২)

'হাফেজ' পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে ১৮৯২ সালের নবেম্বর মাসে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। চার বছর পরে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে মাসিকপত্র হিসাবে 'হাফেজ' পুনরাবির্ভূত হয়। উভয় ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রহমান সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর হাফেজ বন্ধ হয়ে যায়। চার বছর পর 'মিহির ও সুধাকরে' (১৪ কার্তিক ১৩০৯) শেখ ফজল করিমের একটি লেখায় হাফেজের পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু তা আর প্রকাশিত হয়নি।[৪]

---

১. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৬
২. মিহির ও সুধাকর, ১০ কার্তিক ১৩০২
৩. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫২
৪. ঐ, পৃঃ ৬৮

পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে হাফেজ প্রথম সংখ্যায় 'আভাসে' ঘোষণা করেছে, "হে দয়াময়। আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চর্চা ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর সমস্যার শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংস সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ...হাফেজ সেই ভোগবিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্রধর্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।"[১] লক্ষণীয় 'মিহিরে'র বিষয় বৈচিত্র্য ও ব্যাপক উদ্দীপনা 'হাফেজ' সঙ্কুচিত হয়েছে। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তির কাহিনী এবং পবিত্রধর্মের পবিত্র রীতি-নীতির কথা শুনিয়ে তাদের জাগানোর সঙ্কল্প প্রকাশ করেছে। ফলে পূর্বের সেকুলার মনোভাব আর নেই। মিহিরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখক ছিলেন, হাফেজে কেবল মুসলমান লেখকের লেখা দেখা যায়। চার বছরের ব্যবধানে মিহির ও হাফেজের নীতি ও বিষয়ের দিক থেকে এই পরিবর্তন তৎকালীন মুসলিম মানসের পরিবর্তনকে সূচিত করে।

কোহিনুর (১৮৯৮)

'কোহিনূর' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০৫ সনের আষাঢ় মাসে (জুলাই ১৮৯৮)। প্রথমে এটি কিঞ্চিৎ অধিক এক বছর চালু থাকে। ১৩১১ সনের বৈশাখ মাস থেকে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, অনিয়মিত ভাবে তিন বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮ সনের বৈশাখ মাসে তৃতীয় পর্যায়ে এটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। বছর খানেক নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর আবার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ১৩২২ সন পর্যন্ত টিকে ছিল বলে জানা যায়। প্রথমে এটি কুষ্টিয়া, পরে পাংশা এবং শেষে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এস. কে. এম. মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী তিন পর্যায়েই সম্পাদক ছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে 'কোহিনূরে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে লেখা হত 'বিবিধ বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচনা'। দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখা হত 'মাসিকপত্র ও সমালোচনা: হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত'। পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের নিবেদন' ও 'আমাদের কথা'—এই দুটি অংশ

১. হাফেজ, জানুয়ারী ১৮৯৭

পত্রিকার উদ্দেশ্য সংগঠন ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্পাদক নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। "হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ-আশ্রমের সাহার্থে 'কোহিনূর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি ... কোন ধর্ম বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি করিয়া আমরা কোহিনূর পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহি। কোহিনূর সর্বশ্রেণীর উপযোগী করিয়াই পরিচালিত হইবে।"[১] 'কোহিনূর' পরিচালনার জন্য 'কোহিনূর পরিচালক সমিতি' নামে একটি কমিটি ছিল। কমিটির সভ্যগণের তালিকায় ৩৫ জনের নাম আছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন, আবদুল করিম বিএ, শেখ ওসমান আলী বিএল, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ), দুর্গাদাস লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, জমিরুদ্দীন আহমদ, রাইচরণ দাস, বসন্তকুমার চক্রবর্তী, নিখিল নাথ রায়, ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান, কায়কোবাদ, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।[২]

কোহিনূর সূচনায় দাবী করেছিল, 'বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দু-মুসলমান লেখক-গণকে একত্রিত ও একসূত্রে গ্রথিত' করাব উদ্দেশ্য নিয়ে কোন পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। কোহিনূরের এই প্রথম প্রচেষ্টা। হিন্দু ও মুসলমানেব বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সেযুগে একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা 'কোহিনূর'কে অবলম্বন করে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন লেখায় সম্প্রীতির ভাব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। গোপালচন্দ্রের 'সংস্কার ও সংস্কারক', মশাররফের 'সৎপ্রসঙ্গ', যদনাথের 'হিন্দু ও মুসলমান', সতীশচন্দ্রের 'হিন্দু ও মুসলমান', দক্ষিণা-রঞ্জনের 'হিন্দু-মুসলমলমান', কিশোরী মোহনের 'সম্প্রীতি', ওসমান আলীর 'হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতায় এই মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। এসব কিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী। তিনি একজন অতন্দ্র প্রহরীর মত পত্রিকার লেখাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করতেন। কোন বিরোধী মতামতের ফলে ভারসাম্যের সামান্যতম বিঘ্ন ঘটলে তিনি টীকায় স্বীয় মন্তব্য জুড়ে দিতেন। শহর নয়, মফস্বল থেকে এরূপ কার্যে ব্রতী হওয়া মহৎ প্রাণেরই লক্ষণ। 'এডুকেশন গেজেট' (৭ শ্রাবণ ১৩০৫) মন্তব্য করেছিলে—'কোহিনূরের' উদ্দেশ্য অপর সাময়িক পত্র হইতে একটু ভিন্ন এবং আমাদের চক্ষে খুবই মহৎ।" 'এডুকেশন গেজেট' ছাড়াও

১. কোহিনুর, আষাঢ় ১৩০৫

২. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ১০৪

'মিহির ও সুধাকর' (৩২ আষাঢ় ১৩০৫), 'সাহিত্য' (শ্রাবণ ১৩০৫), 'বসুমতী' (২৭ শ্রাবণ ১৩০৫), 'অনুসন্ধান' (৩০ ভাদ্র ১৩০৫), 'পূর্ণিমা' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) 'হিতবাদী' (১৮ চৈত্র ১৩০৫) প্রভৃতি কোহিনূরের (প্রথম সংখ্যার) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ক রচনা 'কোহিনূরে' প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে রওশন আলী চৌধুরী দেশের দুরবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, "আমরা আজকাল সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, নিজের বলিতে আমাদের কিছুই নাই। আমাদের দেশে যাহা কিছু ছিল, অনাদরে তাহা সমস্তই হারাইয়াছে। খাদ্যের জন্য, পরিধেয়ের জন্য, পথ্যের জন্য, শারীরিক সুস্থাবস্থার বিধানের জন্য যাহা কিছু আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহার সমস্ত বিষয়ের জন্যই আমরা পরের দিকে চাহিয়া থাকি।"[১] সম্পাদকের একপ আক্ষেপোক্তির মধ্যে আছে রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত মর্ম্মন্তুদ বেদনাবোধ। মীর মশাররফ হোসেনের 'নিয়তি কি অবনতি', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান', মোজাম্মেল হকের 'তাপস-কাহিনী' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। সবদিক দিয়ে বিচারে 'কোহিনূর' একটি সাহিত্য পত্রের আখ্যায় ভূষিত ছিল। 'কোহিনূরে'র প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কথা' অংশে সম্পাদক বলেন, "সাহিত্যের সহিত সমাজের অতি নিকট সম্বন্ধ: জাতীয় সাহিত্যের উপর জাতীয় সমাজের অনেক আশা ও ভরসা নির্ভর করে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সমাজের লোকে যতই অগ্রসর হইবে, সমাজ ততই উন্নত হইতে থাকিবে। সাহিত্যের প্রতি হতাদর হইলে, সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।"[২] সাহিত্য-উন্নতির সঙ্গে সমাজ-উন্নতির সম্পর্কে আস্থা পোষণ করেন বলেই তিনি স্বসমাজের 'সমাজহিতৈষী মহাত্মাগণের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ' করেছেন দেখে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। "সুখের বিষয়, মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ না করিলে, জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। মুসলমানগণ এখন ভ্রান্তির মোহান্ধকার দূর করিয়া এবং আলস্য-শয্যা পরিত্যাগ করতঃ ধীরে ধীরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিতেছেন।"[৩] আধুনিক সাহিত্যের প্রতি মুসলমান সমাজের একটি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। শেখ আবদুর রহিম এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে 'সুধাকর' থেকে 'হাফেজে' প্রত্যাবর্তন করেছেন। সমাজমনোভাবকে স্মরণ রেখে রওশন আলী চৌধুরীর চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা

১. কোহিনূর, আষাঢ় ১৩০৫
২. ঐ
৩. ঐ

বিচার করলে এর গুরুত্ব বুঝা যায়। তিনি স্বমতে শেষ পর্যন্ত অবিচল ছিলেন।

আপনি সুন্দর হই
সবারে ডাকিয়া লই,
একাকারে ডুব দেই সুখের সংসার
দৈন্য ঘৃণা, শোক আসি দুর্বল হৃদয়
কভু নাহি করে অধিকার।[১]

এটাই ছিল রওশন আলীর আদর্শ ও চিন্তা-দর্শন।

প্রচারক (১৮৯৯)

মযেজউদ্দীন আহমদ ওরফে মধু মিয়া সম্পাদিত 'প্রচারক' মাসিকপত্র কলিকাতা থেকে মাঘ ১৩০৫ সনে (জানুয়ারী ১৮৯৯) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'প্রচারকে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে কোরানের একটি 'আয়াতে'র বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হত: 'যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহা প্রচার কর'। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও মুসলমান সমাজের হিতসাধন—এই দুটি মূলমন্ত্রকে সর্বস্ব করে 'প্রচারক' কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানি খ্রীস্টান পাদরী ও লা-মজহাবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মসি চালনা করে। গোপালচন্দ্র সম্পাদিত 'প্রচার' নামে একখানি খ্রীস্টান পাদরী পরিচালিত পত্রিকায় ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা করা হত। 'প্রচারক' এর প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখতো। মযেজউদ্দীন আহমদ হানাফী ধর্মমত সমর্থন করতেন। আহলে হাদিস বা লা-মজহাবী, ওয়াহাবী, গায়ের মোকল্লেদ মতবাদীদের সাথে হানাফী মজহাবের দ্বন্দ্ব ছিল। লামজহাবীদের মতামত ও আচরণের সমালোচনা করে প্রচারকে একাধিক প্রবন্ধ লেখা হয়। রক্ষণশীল মনোভাবের বশবর্তী হয়ে 'প্রচারক' স্যার সৈয়দ আহমদের যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক ধর্ম ব্যাখ্যারও বিরোধিতা করে। সৈয়দ আহমদের কোরানের ব্যাখ্যা 'নাস্তিকতাভাবে' লিখিত বলে মন্তব্য করা হয়।[২]

প্রচারকের মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬ সনে 'বর্ষ-সমালোচনা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়, "হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকত্ব এবং হৃদয়ের বিভিন্নতা যতদূর সাধ্য মোচন করিতে যত্নশীল থাকিব। পবিত্রতার আধার সমাজ-সংস্কারক শিক্ষকগণের বর্তমান আসরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর

---

১. সৈয়দ মর্তুজা আলী—কোহিনূর, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃ: ৩

২. প্রচারক, আশ্বিন ১৩০৭ (ক্রোড়পত্র)

হইব। শিক্ষাই একমাত্র জ্ঞানের ভিত্তি, জ্ঞানই বিবেকের ভিত্তি; বিবেকই আত্মোদ্ধারের প্রধান ভিত্তি। সেই স্বর্গীয় ভাব সকলের প্রাণে জাগরিত হউক, ইহাই একান্ত বাসনা।'[১] জ্ঞান সাধনায় বিবেকের মুক্তি, আত্মোদ্ধারের উপায় বলে সম্পাদক মাদ্রাসাসমূহে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার কামনা করেছেন।[২] ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিক্ষার সপক্ষেও প্রচারক প্রচার করে। ধর্মচিন্তায় রক্ষণশীলতা ও সমাজচিন্তায় সংস্কারমুক্তির বৈপরীত্য প্রচারকে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মমাহাত্ম্য প্রচার ও অতীত গৌরবকীর্তন দ্বারা সমাজকে জাগানোর প্রয়াস এখানেও বিদ্যমান।

ধর্মকথা, সমাজকথা প্রাধান্য পেলেও প্রচারকে সাহিত্যকথাও উপেক্ষিত হয়নি। শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ', 'মানসিংহ' ও 'লায়লী-মজনু', মতিয়র রহমান খানের 'নব-কুমুদ' ধারাবাহিকভাবে এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ওসমান আলী, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখের কয়েকটি কবিতা প্রচারকে প্রকাশিত হয়।

বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা ও উন্নতমানের রচনার জন্য প্রচারক সেকালের সাময়িক-পত্রের নিকট থেকে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। কয়েকটি পত্রিকার মত এরূপ:

> "মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় শিক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধরূপে প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছেন, ইহা কম আহ্লাদের বিষয় নহে। ..প্রচারকের ভাষায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি।"—সময়, ৮ অগ্রহায়ণ ১৩০৭।

> "আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা যে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করেন, ইহা আমাদের সাহিত্যের সৌভাগ্য ও জাতীয় একতার সোপান বলিতে হইবে। '—আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ সুপাঠ্য।"—বঙ্গভূমি, ৭ ফাল্গুন ১৩০৭।

কখন নিয়মিত, কখন অনিয়মিত ভাবে চলে 'প্রচারক' ১৩০৯ সনের চৈত্রের পর বন্ধ হয়ে যায়। মধু মিয়ার সম্পাদনায় 'ইসলাম' (বৈশাখ ১৩০৭) এবং 'মধু-মিয়া' (কার্তিক ১৩০৬) নামে আরও দুখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দু'খানির আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী।[৩]

১. প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

২. ঐ, কার্তিক ১৩০৭

৩. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ৮৪

লহরী (১৯০০)

বৈশাখ ১৩০৭ সনে (মে ১৯০০) 'লহরী' নদীয়ার শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক। লহরী ছিল 'নানাবিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা'। কেবল কবিতা নিয়ে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করা মুসলমান সম্পাদক কর্তৃক এই প্রথম দেখা যায়। এর আয়ু এক বছর পূর্ণ হয়নি, অনিয়মিতভাবে দশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। কবিদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ মীর আলী, তোফাজ্জল হোসেন, জীবনকৃষ্ণ দত্ত প্রমুখ। আত্মগত ভাব কল্পনাকে আশ্রয় করে আধুনিক খণ্ড কবিতা লহরীতে প্রকাশিত হয়। সমকালীন সামাজিক সমস্যা এবং তৎসঙ্গে অতীতের গৌরব ও মহিমা কবিতাগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

নূর-অল-ইমান (১৯০০)

রাজশাহী থেকে আষাঢ় ১৩০৭ সনে (জুলাই ১৯০০) মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল রাজশাহীর 'নূর-অল-ইমান সমাজে'র মুখপত্র। নিতান্ত অনিয়মিত ভাবে মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়: "বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে কতকগুলি হানিকর দোষ প্রবেশ করিয়া মুসলমান কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পূর্বকালের মুসলমানদিগের কি কি সদগুণ ছিল, কোন কোন গুণের জন্য তাঁহারা জগতের পূজা পাইয়াছেন নূর-অল-ইমান তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন। ... কি কি দোষে মুসলমান কওমের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করিল, কোন কোন মারাত্মক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে তাহাও নূর-অল-ইমান দেখাইবে। কোন দোষ দূর করিবার কি উপায়, কোন রোগ নিবারণের কি ঔষধ, নূর-অল-ইমান তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে।" 'নূর-অল-ইমানে'র লেখকগণের মধ্যে ছিলেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। পত্রিকায় ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাগুলিকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার সুর ছিল উদ্দীপনামূলক ও আশাব্যঞ্জক।

নবনূর (১৯০৩)

সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় বৈশাখ ১৩১০ সনে (এপ্রিল ১৯০৩) 'নবনূর' মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। নবনূর প্রকাশে সৈয়দ এমদাদ আলী, কাজী ইমদাদুল হক, মোহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ এবং মোহাম্মদ আসাদ আলী এই চারজনের দান ছিল। এঁরা সকলেই তরুণ, আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত। প্রথম তিনজন সাহিত্যিক ছিলেন, আসাদ আলী 'নবনূরে'র স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ছিলেন, তিনি পরে পত্রিকার সম্পাদক হন। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং তার ভেতর দিয়ে সমাজকে জাগাবার ঐকান্তিক প্রেরণায় তাঁরা এই সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এতে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং সমালোচনা নিয়মিত স্থান পেত। তাঁরা মাতৃভাষার সেবা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাকে অঙ্গীকার করে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেকথা সূচনায় উল্লেখ করেছেন: "যে সমাজে 'আখবারে ইসলামীয়া', 'ইসলাম', 'মাসিক মিহির', 'হাফেজ', 'কোহিনূর' এবং 'লহরী' জন্মের কিছুকাল পরেই অকাল-মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সেই সমাজে কেন আবার এই প্রয়াস? ... ইহার উত্তরে আমরা কেবল মাত্র একটি কথা বলিতে পারি, মাতৃভাষার সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্যই আমরা বাহিরের পূর্ণালোকে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাদের অন্য সাধ নাই, অন্য লক্ষ্যও নাই। ... নবনূর যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্য-চর্চার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন।"[১] সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতির সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এজন্য তাঁরা 'সূচনায়' ঘোষণা করেছিলেন, "মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ... পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য। সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হয় এবং যদি কখনও মুসলমান জাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহা সাহিত্য-চর্চালব্ধ শক্তি দ্বারাই হইবে।"[২] অধঃপতিত মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করে সমাজের উন্নতি বিধান করা 'নবনূরে'র লক্ষ্য ছিল। পত্রিকার লেখকগণ অতীত ইতিহাস, দর্শন, শিল্প-সাহিত্যে প্রেরণার উৎস খুঁজেছেন।

১. নবনূর, বৈশাখ ১৩১০
২. ধূমকেতু, আষাঢ় ১৩১০

কোন কোন হিন্দু লেখক মুসলমান চরিত্র, সমাজ ও ইতিহাসকে বিকৃত করে সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা লিখে থাকেন, 'নবনূরে' সেগুলি সম্পর্কে প্রতিবাদ করা হয়। এসব রচনা মুসলমান জাতি সম্পর্কে হিন্দু শিক্ষিত সমাজের ঘৃণা ও সন্দেহ সৃষ্টির সহায়ক হয় এবং বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতিবন্ধক হয় —সে বিষয়ে পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। 'ধূমকেতু'তে 'নবনূরে'র সমালোচনা হয়। এতে প্রশংসা-নিন্দা দু-ই আছে। পত্রিকায় লেখা হয়, "আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। নবনূরের বাঙ্গালা গতমাসের ধূমকেতুতে প্রদর্শিত মুসলমানী বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালা নহে। ...দেখিলাম মুসলমান লেখকদিগের লেখাও হিন্দুর লেখার প্রবন্ধের সহিত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে অভিন্ন। ইহা খুবই প্রশংসার কথা। ...'নবনূর' যদি আরবি, পারসি ও উর্দু হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া মাতৃভাষারূপিনী বাঙ্গালাকে আরবি পারসিক উপাদেয় মোগলাই আভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার জীবনব্রত সিদ্ধ হইল, মনে করিয়া সকলে তাহার সংবর্দ্ধনা করিবে। কিন্তু কোন কোন বিকৃতরুচি অদূরদর্শী হিন্দুলোকের মুসলমান দ্বেষ লক্ষ্য করিয়া যদি 'নবনূর' ফুর ফুর জ্বলিতে না জ্বলিতেই অর্থাৎ জন্মমাত্রই, অহি-রাবণের ন্যায়, হিন্দুবিদ্বেষে গর্জিয়া উঠেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোন কর্ম হইবারই প্রত্যাশা নাই। 'নবনূরে'র এ অংশে মতিগতি ভাল দেখিলাম না।"[১]

নবনূর ৩ বছর ৯ মাস নিয়মিত চলার পর বন্ধ হয়ে যায় (পৌষ ১৩১৩)।